Peace tv

ড. বেলাল ফিলিপস্

লেকচার সমগ্র

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

ড. বিলাল ফিলিপস্

লেকচার সমগ্র ১

ড. বিলাল ফিলিপস্

লেকচার সমগ্র ১

সংকলন

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

সম্পাদনা

পিস সম্পাদনা পর্ষদ

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ড. বিলাল ফিলিপস্

লেকচার সমগ্র ১

প্রকাশক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রকাশনায় : পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা – ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি – ২০১২ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাঁধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : নিউ এস আর প্রেস, সূত্রাপুর
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ইমেইল : peacerafiq@yahoo.com

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা।

ISBN : 978-984-8885-26-0

ড. বিলাল ফিলিপ্‌স-এর জীবনী

ড. আবু আমীনাহ্ বিলাল ফিলিপ্‌স ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এর জ্যামাইকায় জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি বড় হন কানাডায় এবং সেখানে ১৯৭২ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী মৌলনীতি ফ্যাকাল্টি (كُلِّيَةُ أُصُوْلِ الدِّيْنِ) থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং ১৯৮৫ সালে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষা ফ্যাকাল্টি (كُلِّيَةُ التَّعْلِيْمِ وَالتَّرْبِيَةِ) থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে ওয়েল্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইসলামি শিক্ষা বিভাগ থেকে ইসলামি ধর্মতত্ত্বের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

১৯৯৪ইং সাল থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে 'ইসলামি তথ্য কেন্দ্র দুবাই (IICD)' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। (বর্তমানে যা 'ডিসকভার ইসলাম' নামে পরিচিত।) এ ছাড়াও তিনি শারজাহ-এর দারুল ফাতাহ্ ইসলামিক প্রেস বৈদেশিক সাহিত্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। ড. বিলালই সর্বপ্রথম ইন্টারনেট-এ স্বীকৃত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাকে ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি বলা হয়। তিনি আজমান ইউনিভার্সিটি এবং আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ইন দুবাই-এর আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এবং বর্তমানে আজমান-এর প্রিস্টন ইউনিভার্সিটির ইসলামি শিক্ষা বিভাগের প্রধান।

লেখকের প্রকাশিত কর্মগুলোর মধ্যে

অনুবাদগুলো হলো–

1. Arabic Calligraphy in Manuscripts;
2. Ibn al-Jawzee's the Devil's Deception;
3. Ibn Taymiyyah's Essay on the Jinn;
4. Khomeini : A Moderate or Fanatic Shiite;
5. The Mirage in Iran and General Issues of Faith.
6. Polygamy in Islam. (অনূদিত)
7. Arabic Grammar Made Easy Book 1 & 2;
8. Arabic Reading and Writing Made Easy.
9. Did God Become Man?
10. Dream Interpretation; (অনূদিত)
11. Islamic Studies Book 1, 2, 3, 4;
12. Foundations of Islamic Studies;
13. Salvation Through Repentance;
14. Tafseer Surah al-Hujuraat
15. The Ansar Cult;
16. The Best in Islam (অনূদিত)
17. The Evolution of Fiqh
18. Exorcist Tradition in Islam;
19. Spirit World in Islam;
20. The Possession and Exorcism
21. Muslim Exorcists;
22. Satan in the Qur'aan;
23. Dajjal : The Anti -Christ
24. Fundamentals of Tawheed;
25. Purpose of Creation;
26. The Qur'aans Numerical Miracle
27. The True Message of Jesus Christ;
28. The True Religion of God;
29. Usool at-Tafseer
30. The Prayer for seeking Good;
31. A Clash of Civilizations.
32. The Moral Foundations of Islamic Culture.
33. Seven Habits of Truly Successful People;
34. In the Shade of the Throne.

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ। এ পর্যায়ে বিশ্বখ্যাত ইসলামী গবেষক, পণ্ডিত, বিশ্লেষক ও লেখক ড. **আবু আমীনাহ বেলাল ফিলিপস্ এর লেকচার সমগ্র-১** পাঠক-পাঠিকাদের জন্য পেশ করতে পারলাম। সালাত ও সালাম মানুষের মহান ও সর্বোত্তম আদর্শ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি। ড. বিলাল ফিলিপস্ লেকচার সমগ্র-১ এ স্থান পেয়েছে–

১. জনতার উদ্দেশ্য বক্তৃতা, ২. সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ৩. ইসলামের সর্বোত্তম, ৪. তাওহীদের মূল সূত্রাবলী, ৫. স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

ড. বিলাল ফিলিপস্ এর কুরআন ও হাদীসের সংগ্রহ মানব জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে জীবন সংগ্রামে পাথেয় হিসেবে কাজ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই পাঠকদের এ বইটি সত্যিকার অর্থেই অতীব প্রয়োজন পড়বে। শত ব্যস্ততার মাঝেও বইটি দ্রুত প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি যেহেতু অনুবাদের তাই সম্পাদনা করতে হয়েছে পাঠকদের দিক বিবেচনা করে। এতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে কোন হৃদয়বান ব্যক্তি গোচরীভূত করলে কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তীতে তা সংশোধন করব।

আমরা আশা করি অচিরেই ড. **আবু আমীনাহ বেলাল ফিলিপস্ এর লেকচার সমগ্র**-২ বের হবে ইনশাল্লাহ।

দু'আ করি লেখক এর জন্য যে অক্লান্ত শ্রমের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসের এ নির্যাস বের করে আমাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহের বাস্তব অনুসরণকে সহজসাধ্য করেছেন। আমাদের এ প্রচেষ্টা তখনই সার্থক হবে যখন পাঠক-পাঠিকা এ বই থেকে আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম বা প্রিয়তম হবার প্রেরণা লাভ করবেন। আল্লাহর নিকট উভয় জগতের কল্যাণ কামনায় শেষ করছি। আমিন ॥

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

১. জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. সৃষ্টির উদ্দেশ্য

তৃতীয় অধ্যায়

৩. ইসলামের সর্বোত্তম

চতুর্থ অধ্যায়

৪. তাওহীদের মূল সূত্রাবলী

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

এগারোতম অধ্যায়

বারোতম অধ্যায়

তেরতম অধ্যায়

চৌদ্দতম অধ্যায়

পনেরোতম অধ্যায়

৫. স্বপ্নের ব্যাখ্যা

ষোলতম অধ্যায়

ফর্মা—০০; লেকচার সমগ্র

সতেরতম অধ্যায়

আঠারোতম অধ্যায়

উনিশতম অধ্যায়

জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা

ড. বিলাল ফিলিপস্

সংকলন

মোঃ রফিকুল ইসলাম
সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

সম্পাদনা

পিস সম্পাদনা পর্ষদ

প্রথম অধ্যায়

জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা

ড. আবু আমিনাহ্ বিলাল ফিলিপ্স

পরিচালকের বক্তব্য

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আজকে আপনাদেরকে ড. আবু আমিনাহ্ বিলাল ফিলিপ্স-এর বক্তৃতা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ড. ফিলিপ্স যে বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন তা হচ্ছে– আমরা সবাই জিতবো। "বিশ্বাসীদের আদর্শ" এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন- ড. আবু আমিনাহ্ বিলাল ফিলিপ্স।

ড. আবু আমিনাহ্ বিলাল ফিলিপ্স

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং শান্তি বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর, যাকে আল্লাহ তা'আলা সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। এছাড়া ওই সকল লোকদের ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক যারা সত্য গ্রহণের পর তার ওপরে অটল থেকে ইহজীবন ত্যাগ করেছেন।

আমরা সবাই জিতবো : বিশ্বাসীদের আদর্শ

আমার আজকের বক্তব্যের বিষয় হলো– "আমরা জিতবো : বিশ্বাসীদের আদর্শ।" বিষয়টি সম্পর্কে আমি ধারণা পেয়েছি 'দ্য সেভেন হ্যাবিট অব হাইলি ইফেক্টিভ পিপলস' নামক গ্রন্থ থেকে, যা লিখেছেন- 'স্টিফেন জে ববি'।

বইটির সাতটি হ্যাবিট এর মধ্যে চার নম্বর হ্যাবিট, যেখানে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিলো- "আমরা কীভাবে বিভিন্ন লোকের সাথে আমাদের সম্পর্ক বজায় রাখি।"

আর এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো- ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমরা কীভাবে আমাদের চারপাশ অবলোকন করি। চারপাশ বলতে আমি বুঝাতে চাচ্ছি- ওই সকল কিছুকে যেখানে আছে- মানুষ, মানুষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, যে পরিস্থিতিতে আমাদের জন্ম হয়েছে সেসব বিষয়। এখানে সব কিছুই আছে, শুধুমাত্র মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্কের কথা আমরা বলছি না।

তবে বিশ্বাসীদের এ দর্শনটা অর্থাৎ "আমরা জিতবো : বিশ্বাসীদের আদর্শ" দেখার আগে আমরা দেখবো যে, অবিশ্বাসীদের দর্শনটা কি? আর এতে করে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবো বিশ্বাসীদের দর্শনটা কেমন হওয়া উচিত।

আমরা মুসলমানরা বিশ্বাসের কথা বলতে গিয়ে বলি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ "নেই কোনো ইলাহ, আল্লাহ ব্যতীত।" আমরা এখানে প্রথমে মিথ্যা ইলাহকে অস্বীকার করি, এরপর সত্যিকারের ইলাহকে স্বীকার করি। এজন্য আসুন আমরা আগে দেখি, যারা অবিশ্বাসী তাদের দর্শনটা কি? তাদের জীবনটাকে তারা কীভাবে দেখে?

আর এখানে তাদের দর্শনটা হলো- 'জেতো অথবা হেরে যাও'। অবিশ্বাসীরা তাদের চারপাশের পৃথিবীটাকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে সেটা হলো- জেতা অথবা হারা। এর সাথে আরো যে বিষয় রয়েছে তা হচ্ছে– 'সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য'।

জেতা অথবা হারা'র সাথে 'সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্যের' সম্পর্ক অর্থাৎ তারা বলে- "যদি আমার ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে আমি জিতবো, আর ভাগ্য যদি খারাপ থেকে থাকে তাহলে হেরে যাবো।" এটাই হলো অবিশ্বাসীদের জীবন দর্শন।

আর এ ব্যাপারটা একজন নাস্তিকও মেনে থাকে। যে লোকটা বিশ্বাস করে ঈশ্বর বলে কেউ নেই; সত্যকে বিশ্বাস করে না; এ দর্শনটা সেও মেনে চলে।

তাহলে আপনারা দেখবেন, একজন নাস্তিকও হার-জিত অথবা সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য দর্শকের মাধ্যমে তার জীবনকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ সে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যকে মেনে চলে। তাছাড়া অবিশ্বাসীরা তাদের সারা

জীবনব্যাপী এ চেষ্টাটাই করে যায়- কীভাবে তারা তাদের সৌভাগ্যকে নিশ্চিত করবে এবং একই সাথে কীভাবে তাদের দুর্ভাগ্যকে রোধ করবে। এটা তাদের জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আর আপনারা দেখবেন, পশ্চিমা বিশ্বে বিশেষ করে আমি যে স্থান থেকে এসেছি- সেখানে ৭ সংখ্যাটিকে তারা সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করে। আর তাই তারা ৭টার সময় তাদের কাজ শুরু করে। এছাড়া তারা ৪ সংখ্যাটাকেও সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করে। আর তাই তিন পাতা বিশিষ্ট বিশেষ একটি গাছে যদি কখনও চারটি পাতা দেখা যায় তাহলে তারা সেটাকে বিশেষভাবে যত্ন করে রাখে এবং বিশেষ প্রক্রিয়ায় তা হাতে অথবা গলায় পড়ে। আর এটা করে তারা সৌভাগ্য অর্জন করতে।

একই সাথে তারা দুর্ভাগ্য মনে করে কিছু সংখ্যাকে এড়িয়ে চলতে চায়; যেমন-১৩। পশ্চিমা বিশ্বে ১৩ হলো একটা দুর্ভাগ্যের সংখ্যা। আপনারা যদি পশ্চিমা বিশ্বে কোনো হোটেল, বিল্ডিং, অ্যাপার্টমেন্ট ইত্যাদিতে যান এবং এলিভেটরে উঠেন তাহলে দেখবেন, সেখানে ১০, ১১, ১২ ও ১৪ আছে কিন্তু ১৩ নেই।

আবার আপনি হয়তো রাস্তায় হাটছেন; সেখানকার রাস্তার বাড়িগুলোর হোল্ডিং নম্বর দেখবেন যে, সেখানে রয়েছে- ৯, ১০, ১১, ১২, সাড়ে ১২, ১৪, ১৫। এখানেও আপনি ১৩ নং হোল্ডিং দেখতে পাবেন না। এটাই হলো সেখানকার সামাজিক নিয়ম।

আর এখানে অর্থাৎ ভারতে দুর্ভাগ্যের নম্বরটি হচ্ছে- ৮। যদি কোনো গাড়ির লাইসেন্স প্লেটে ১৭ লেখা থাকে আর এটা এভাবে দেখা হয় যে, ১+৭=৮; আর ৮ হলো দুর্ভাগ্যের সংখ্যা; এমতাবস্থায় গাড়ির দাম কমে যাবে। তার মানে এটা দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে।

এছাড়াও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বিধবা। যদি আপনার কোনো কাজের সময় কোনো বিধবা আসে তাহলে মনে করা হয় আপনার সে কাজটি সফল হবে না।

মৃতদেহও তাদের কাছে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। কোথায়ও বের হওয়ার সময় যদি কেউ কোনো মৃতদেহ দেখে, তাহলে সে ধরে নেয় তার যাত্রা শুভ নয়। সামনে তার দুর্ভাগ্য ওঁত পেতে রয়েছে।

জ্বালানী কাঠ কিম্বা ধোপার সাথে দেখা হওয়াও তাদের কাছে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। কোনো কাজে বের হয়ে যদি কোনো ধোপার সাথে দেখা হয়, তাহলে সেটাকে তারা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করে।

এছাড়া ভারতে দিনের বেশ কিছু সময়কেও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করা হয়। আপনাদের পঞ্জিকা আছে সেখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে যে, দিনের মধ্যে এমন কিছু সময় অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা বা ৪ ঘণ্টা সময় এমন আছে, যে সময়ে কোনো কাজে হাত দেওয়া যাবে না।

তার মানে আপনাদের এখানে (ভারতে) এমন কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে যেগুলো মান্য করার মাধ্যমে লোকজন নিজেদেরকে অশুভ জিনিসের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রয়াসী হয় এবং নিজেদের জন্য সৌভাগ্য আনয়নের চেষ্টা করে।

আমরা অন্যান্য মানুষদের এ সকল বিশ্বাস নিয়ে হাসাহাসি করতে পারি; কিন্তু মজার বিষয় হলো মুসলমানদের মধ্যেও এরকম কিছু নিয়ম-কানুন আছে। যা আপনারা অনেকেই জানেন।

মুসলমানদের একটি সৌভাগ্যের সংখ্যা হলো-১৯। এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হলো- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" লিখতে আরবিতে ১৯টি হরফ বা অক্ষর লাগে। আর তাই কিছু মুসলমান এমন আছে যাদের নিকট ১৯ হলো একটি সৌভাগ্যের সংখ্যা বা প্রতীক। আবার ৯৯ সংখ্যাটিও অনেকের কাছে সৌভাগ্যের সংখ্যা। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার ৯৯টি নাম রয়েছে।

তারা মনে করে এটা একটা বরকতপূর্ণ সংখ্যা। যেমন– কারো সন্তান হচ্ছে না; তাহলে আপনি আল্লাহর ৯৯টি নামের যে কোনোটি এত সংখ্যকবার পড়ে কোনো পানির গ্লাসে ফুঁক দিন এবং ওই পানি পান করুন; তাহলে আপনার স্ত্রীর সন্তান হবে। একইভাবে কোনো মানুষ দেখলো তার ব্যবসা ভালো যাচ্ছে না; তাহলে সে আল্লাহর ৯৯টি নামের একটি বাছাই করে উদাহরণস্বরূপ اَلرَّزَّاقُ (আল রাজ্জাক) সে দোকানে একটি রুটি তৈরি করে, যেটা করতে গিয়ে সে কড়াইতে এমনভাবে আটা ঢালে যে সেখানে اَلرَّزَّاقُ (আর রাজ্জাক) শব্দটি ফুটে উঠে। এরপর সে সেই রুটি ভক্ষণ করে আর মনে করে যে, আল্লাহ্ চাহে তো তার ব্যবসায় উন্নতি হবে।

এছাড়া তাদের মধ্যে রয়েছে তাবিজ, যা রক্ষা কবজ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নামকে তাবিজ বানানো হচ্ছে। এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। এগুলো মনগড়া নিয়ম-পদ্ধতি। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহতে এগুলোর কোনো স্থান নেই।

এছাড়াও দেখতে পাবেন 'ছোট আকারের কুরআন'। এ কুরআনটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে ১ ইঞ্চি এবং ১ ইঞ্চি পুরু। এটি নিজের কাছে রেখে মানুষের কাছে গর্ব করে "আমার নিকটে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট কুরআন শরীফ আছে।" এ কুরআন শরীফ কোন কাজে লাগবে? সর্বোচ্চ একে লকেট বানিয়ে গলায় ঝুঁলিয়ে রাখতে পারেন আর ভাবতে পারেন এটি আপনাকে রক্ষা করবে। অনেকেই এভাবে কুরআন শরীফকে রক্ষা কবজ বানিয়ে ফেলে। তাদের নিকট কুরআন শরীফ পড়বার জন্য নয়। কারণ, উক্ত কুরআন শরীফ খুলে দেখবেন, অক্ষরগুলো এত ছোট যে সেটা পড়তে গেলে আপনার ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস লাগবে অথবা মাইক্রোস্কোপ প্রয়োজন হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে অবিশ্বাসীরা এসব নিয়ম-কানুন মেনে চলে আর বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী, যারা সামাজিকভাবে বিভিন্ন রীতি-নীতি আর সংস্কার মেনে চলে; কুরআন হাদীসকে মেনে চলে না তারাও এমনটি ভাবে।

কুরআন আর সুন্নাহকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কিরাম যেভাবে বুঝতেন, আমি আপনিও সেভাবেই বুঝি তেমনটা নয়। আধুনিক মুসলমানরা যেমন করে ভাবে আধুনিক বিশেষজ্ঞরা তেমন করে ভাবেন না। কুরআন এবং সুন্নাহকে ভালোভাবে মেনে চলতেন আমাদের নবীজী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ। তারাই এটাকে ভালোভাবে বুঝতেন।

পৃথিবী একটি পরীক্ষাক্ষেত্র

তাহলে আমরা অবিশ্বাসীদের দর্শন চিন্তা-ভাবনা "কেউ হারবে কেউ জিতবে" দর্শনকে বাদ রেখে ইসলামী দর্শন নিয়ে আলোচনা করবো; আর তা হলো "আমরা সবাই জিতব"। এ ধারণাটার ভিত্তি হলো ইহকাল সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি।

এ পৃথিবীটা আমাদের জন্য একটা পরীক্ষাক্ষেত্র। এ পৃথিবীর সকল কিছুই একটা পরীক্ষাক্ষেত্র সব মানুষের জন্য।

আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা মুলকের ২নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

অর্থাৎ, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবন। তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? [৬৭–মুলক্ : আয়াত-২]

সূরা কাহফের ৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই পৃথিবীর ওপরে যা কিছু রয়েছে আমি সেগুলোকে তার শোভা করেছি, মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ?
[১৮– কাহফ : আয়াত-৭]

তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কারভাবেই বলেছেন, এ পৃথিবীর উদ্দেশ্য কি? এ পৃথিবীটা আমাদের জন্য একটা পরীক্ষাক্ষেত্র। এ পরীক্ষাটা আল্লাহর জন্য নয় যে তিনি খুঁজে বের করবেন আমাদের মধ্যে কে সৎকর্মশীল। কারণ এ ব্যাপারটা তিনি আগে থেকেই জানেন। এ পৃথিবীটা সৃষ্টি করার আগে থেকেই জানেন যে, আমাদের মধ্যে কে তার কর্মে ভালো। তিনি আগে থেকেই জানেন যে, আমাদের মধ্যে কে জাহান্নামে যাবে আর কে জান্নাতে যাবে। এসব কথা আগে থেকেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবগত রয়েছেন।

তাহলে এ পরীক্ষা যদিও পবিত্র কুরআন বলছে আল্লাহ্ এর মাধ্যমে দেখছেন আমাদের মধ্যে কে কর্মে ভালো; কিন্তু তিনি এর মাধ্যমে প্রমাণ করবেন তার ন্যায় বিচার ও মহানুভবতাকে। দয়াময় আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের সাথেও ন্যায় বিচার করবেন; কিন্তু কেন? কারণ, মহান আল্লাহ্ জানেন আমরা কেন সৃষ্টি করেছেন আর আমাদের কি হবে?

তিনি সহজেই বিশ্বাসীদের সৃষ্টি করে জান্নাতে রাখতে পারতেন আর অবিশ্বাসীদের জাহান্নামে রাখতে পারতেন সৃষ্টির শুরু থেকেই। তাহলে এ পৃথিবীর কোনো দরকার হতো না আর কোনো পরীক্ষাও থাকতো না। আল্লাহ চাইলেই এমনটি করতে পারতেন। কারণ তিনি জানেন যে আমরা কি করবো। যাই হোক, এখানে আসল কথা হলো– বিশ্বাসীদের যদি প্রথম থেকেই জান্নাতে রাখা হতো তাহলে তারা কখনই প্রশ্ন করতো না যে, হে আল্লাহ্ আমাকে কেন জান্নাতে রেখেছো?

আপনাকে যদি জান্নাতে রাখা হতো তাহলে কি আপনি প্রশ্ন করতেন যে, কেন আপনাকে জান্নাতে রাখা হয়েছে? না, প্রশ্ন করতেন না। কিন্তু আপনাকে দুনিয়াতে পাঠানোর পরে যখন আপনার হিসেব হবে অতপর আপনাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তখন আপনি আপনার কৃতকর্ম দেখবেন যে, আপনি সারা জীবন কি কি করেছেন; তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে, শুধুমাত্র আপনার সৎকর্মের কারণে আপনার জান্নাত পাওয়া সম্ভব ছিলো না বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দয়াতেই আপনি জান্নাত পেয়েছেন তখন আপনি বলবেন 'আলহামদুলিল্লাহ'।

আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোনো মানুষ শুধুমাত্র সৎকর্মের ওপর ভিত্তি করে জান্নাতে যেতে পারবে না।" আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি দয়া না করেন তাহলে কোনো মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না। সাহাবীগণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন- 'আপনিও কি জান্নাতে যেতে পারবেন না, হে আল্লাহর রাসূল'? নবীজী বললেন-'আমিও না'।

দেখা যাচ্ছে- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দয়ার কারণেই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। তাহলে পৃথিবীর জীবন শেষে আমরা যখন জান্নাতে যাবো তখন আল্লাহর দয়াকে স্মরণ করবো।

তবে অবিশ্বাসীরা যাবে জাহান্নামে। এ ব্যাপারটাকে তারা কীভাবে দেখবে? অন্যরা জান্নাতে যাবে আর তারা জাহান্নামে যাবে, এ ব্যাপারটাকে তারা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে? তারা তো জানে না তাদেরকে কেন জাহান্নামে দেওয়া হয়েছে। আর তাই তারা আল্লাহকে বলবে, আমাদেরকে কেন জাহান্নামে দেওয়া হয়েছে? কী কারণে আমরা এ শাস্তি পাচ্ছি? আমরা কেন অন্যদের মতো জান্নাতে যেতে পারবো না?

এমতাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি তাদের বলতেন, তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠালে এ অন্যায় করতে , সেই অন্যায় করতে, আমাকে মানতে না, আমার নাফরমানি করতে, আত্মীয়তার হক নষ্ট করতে আর এ কারণেই তোমাদেরকে জাহান্নামে দেওয়া হয়েছে। তাহলে তারা এ বিষয়টাকে কীভাবে নিতো? তারা কখনই স্বীকার করতো না যে দুনিয়ায় পাঠালে সে জাহান্নামে যাওয়ার মতো কোনো কাজ করতো। সে বলতো, না, আমি কখনই ওই সব কাজ করতাম না। যদি আমি জানতাম যে, দুনিয়ার কাজ কর্মের কারণে পরকালে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে তাহলে আমি ওই কাজগুলো কখনই করতাম না।

মানুষ যে এরকম কথা বলবে তা আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন; আর তাই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর এতে করে পৃথিবীর জীবন শেষ হলে যখন তাকে জান্নাত বা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন কেউ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে এ প্রশ্ন করবে না যে, কেন আমাকে এখানে পাঠানো হচ্ছে বা ওখানে পাঠানো হচ্ছে?

সেই সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিচার করে অনেক মানুষকেই জাহান্নামে পাঠাবেন; কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা করবে না যে, কেন আমাকে জাহান্নামে দেওয়া হলো? সে সময় সব মানুষই বলবে- হ্যাঁ, এখন আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, কেন আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। তবে তারা তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে বলবে, "আমাদেরকে আর একবার সুযোগ দাও হে রব! আমরা আর কখনই কোনো অন্যায় কাজ করবো না, শুধু ভালো কাজই করবো। কিন্তু তাদেরকে আর কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না।

তখন যারা জাহান্নামে যাবে তারা আর কোনো প্রশ্ন করবে না। কারণ তারা জানবে, যারা জাহান্নামের উপযুক্ত, যারা জাহান্নামে যাওয়ার মতো কাজ করেছে তাদেরকেই জাহান্নামে দেওয়া হচ্ছে। তারা এও জানবে, যে জাহান্নাম উপার্জন করেছে আর ইচ্ছা করলেই দুনিয়াতে তারা জান্নাত উপার্জন করতে পারতো। তারা জাহান্নামকে নিজেরাই বেছে নিয়েছে। তাদের প্রত্যেকেরই ক্ষমতা ছিলো জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ বিচার সব রকম বিতর্কের উর্ধ্বে। আল্লাহর আইন সবার ওপরে সেটাই প্রতিষ্ঠিত হবে কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের ময়দানে সেদিন আমাদের সবাইকেই বিচারের মুখোমুখী হতে হবে।

এখন আমাদের জন্য, পৃথিবীর সকল মানুষদের জন্য দুনিয়াটা একটা পরীক্ষার স্থান। এখানে আমরা যে ফলাফল পাবো তা হতে পারে ২ প্রকার। প্রথমটা হলো আত্মার উন্নতি; আর এটা হলো বিশ্বাসীদের জন্য। দ্বিতীয়টা হচ্ছে- শাস্তি; আর এটা হলো অবিশ্বাসীদের জন্য। আমাদের পৃথিবীতে যে পরীক্ষা তার ফলাফল হতে পারে এ দুটি; অর্থাৎ-আত্মার উন্নতি অথবা শাস্তি।

এখন যদি আত্মার উন্নতির দিকে মনোযোগ দেই; তাহলে আমরা দেখবো যে, কীভাবে আমরা আত্মার উন্নতি করতে পারি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন- 'তিনি বিভিন্ন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আর্থিক দিক থেকে বিভিন্ন স্তরে।

তিনি বলেছেন-

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ জীবনোপকরণের দিক থেকে তোমাদের কাউকে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (সূরা নাহল : আয়াত-৭১)

যদি আল্লাহ্ চাইতেন তাহলে তিনি সব মানুষকে সমানভাবে বানাতে পারতেন। তাহলে প্রতিটি মানুষের সম্পদের পরিমাণ সমান থাকতো। কেউ কারো চেয়ে গরিব বা ধনী থাকতো না। সমাজে কোনো ধনী গরিবের অস্তিত্ব থাকতো না। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা চাইলে এমনটা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যদি এটা করতেন তাহলে আমাদের মধ্যে দানশীলতা বলে কিছু থাকতো না। দান করার মতো কোনো পাত্র না পেলে আমরা দানশীল হতাম কী করে? আপনি তখনই দানশীল হবেন যখন দেখা যাবে আপনার আছে কিন্তু অন্যের নেই; তখনই আপনি দানশীল হতে পারবেন।

আপনি যাতে দান করতে পারেন সেজন্য পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ থাকতে হবে, যাদের সম্পদ আপনার চেয়ে কম। তাহলে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীটা একটা পরীক্ষার ক্ষেত্র। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের মধ্যে কিছূ

সংখ্যক মানুষকে বেশি সম্পদ দিয়েছেন; আর এটা আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা। এ পরীক্ষা আমাদের অবশ্যই দিতে হবে।

আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দিক নির্দেশনার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কীভাবে আমরা পরীক্ষাটা দিব। তিনি বলেছেন- "তোমরা এমন লোকদের দিকে তাকিও না যারা তোমাদের উপরে।"

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন। তাদেরকে অনেক সম্পদ দিয়েছেন। এজন্য তাদের দিকে তাকিও না। কোনো সময় ভুল করেও তাদের দিকে তাকিও না। আর পশ্চিমা বিশ্ব সেটাই করে। তারা তাদের মিডিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর ধনী আর বিখ্যাত ব্যক্তিদের 'হাইলাইটস' করে আপনাদের সামনে প্রদর্শন করে আর আপনারা সেটাই দেখেন। আপনারা দেখেন সেই সব সেলিব্রেটিদের জীবন কতো সুখময়।

তাদের এ আছে, তাদের সেই আছে; তাদের জীবনটা কত উপভোগ্য। এতে করে আমাদের মনে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। আমি তাদের মতো হতে চাই। আমি চাই তাদের যা কিছু আছে আমাদেরও সেই সবকিছু প্রয়োজন বলে মনে করি। আমাদের মনে তখন ঈর্ষা তৈরি হয় ও আকাঙ্ক্ষা জাগে এগুলোর জন্য। তাই রাসূল ﷺ আমাদের বলেছেন- "তোমরা ওদিকে তাকিও না যারা তোমাদের ওপরে।" কারণ তুমি যদি তাকাও তাহলে তুমি ভুলে যাবে যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের জীবনে কী কী সুবিধা দিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন- '(আর্থিকভাবে) যারা তোমার নিচে তাদের দিকে তাকাও'।

তাহলে আপনি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেওয়া নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় করতে পারবেন। এটাও পরীক্ষার একটা অংশ। কারণ আপনি সব সময় আপনার চেয়ে খারাপ অবস্থায় কাউকে পাবেন। আপনার অবস্থা যতটাই খারাপ হোক না কেন তবুও আপনি দেখবেন, অন্য কেউ বা অন্য কারো অবস্থা আপনার চেয়ে আরো অনেক খারাপ। তাই আপনি তাদের দিকে তাকান আর্থিক দিক দিয়ে যারা আপনার নিচে।

এরপরে জীবনে আছে বিপর্যয়। এটাও জীবনের একটা পরীক্ষা, যাকে ছোট করে দেখা উচিত নয়।

ঈমানদারদের জন্য বিপর্যয় আশির্বাদ

এখন আমরা আমাদের জীবনে নানা বিপর্যয় ও বিপর্যয়গুলোর ক্ষতিকর প্রভাব দেখবো। আমরা মানুষেরা যাতে আমাদের আত্মার সার্বিকভাবে উন্নতি সাধন করতে পারি সেজন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে বিভিন্ন বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলেন।

একবার সাহাবীগণ নবীজী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মানুষের মধ্যে কারা জীবনে সবচেয়ে বেশি বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়। তখন নবীজী ﷺ বললেন, নবী-রাসূলগণ।" নবী-রাসূলগণ অন্যদের চেয়ে বেশি বিপর্যয়ে পড়েন। যারা নবী-রাসূল তাদের জীবনেই বিপর্যয় সবচেয়ে বেশি। তাহলে বিপর্যয় নিশ্চিতভাবে একটি আশির্বাদ। নবী-রাসূলগণের নিকট বিপর্যয় হলো আশির্বাদ।

আপনারা এ ব্যাপারে নবী ইউসূফ (আ)-এর জীবন কাহিনী দেখতে পারেন; যা পবিত্র কুরআনে বিবৃত হয়েছে। নবী ইউসুফ (আ) অনেক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলেন। তার ভাইয়েরা তার বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করেছিলো। তারা তাকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো, এমনকি দাস হিসেবে বণিক সম্প্রদায় তাকে বিক্রি করে দিলে তাকে মিশরে নিয়ে যাওয়া হলো। অবস্থা যখন একটু ভালো মনে হলো তখনই সেখানকার শাসকের স্ত্রী ইউসূফ (আ)-কে প্রলুব্ধ করতে চাইলেন। এক পর্যায়ে তিনি কারাগারে বন্দি হলেন।

ভালো একজন মানুষ যিনি সব সময় ভালো কাজ করতেন সেই তিনি তার জীবনে একের পর এক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে লাগলেন। অবস্থা আরো খারাপের দিকে মোড় নিল। যখন তিনি কারাগারের মধ্যে ছিলেন সেখানে তিনি দু'জন ভৃত্যের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিলেন। তাদের একজনকে তার কথা মনে রাখতে বললেন, যখন সে মুক্ত হবে। অথচ ভৃত্যটি মুক্ত হয়ে নবীর কথা বেমালুম ভুলে গেলো এবং এমতাবস্থায় সে অনেক দিন কাটিয়ে দিলো। কয়েক বছর পর তার মনে পড়ল নবী ইউসূফ (আ)-এর কথা আর নবীকে বিশেষ পরিস্থিতিতে বের করলো।

এখানে দেখুন, এ যে লোকটা ভুলে গেলো; আপনি হয়তো বলবেন, ভৃত্যটি ভুলে গেলো এটা আসলে ঠিক নয়। নবী ইউসূফ আরো ৬ বা ৭ বছর আগেই বের হতে পারতেন। কিন্তু লোকটা ভুলে যাওয়ার কারণে তিনি আরো

দীর্ঘদিন কারাগারে বন্দি হিসেবে আটক থাকলেন। তবে এখানে কিছু বিশেষজ্ঞ ভেবে-চিন্তে বের করেছেন, যখন ভৃত্যটি মুক্ত হয়েছিলো ইউসূফ (আ) যদি তখন মুক্ত হতেন তাহলে তিনি হয়তো আবারো সেখানে ভৃত্য হিসেবে নতুন করে নিযুক্ত হতেন।

সেই ভৃত্য মুক্ত হয়ে যদি রাজাকে বলতো 'দেখুন এ হলো একজন নবী, খুবই ভালো মানুষ এবং মহিলার কাছে আনা হতো আর মহিলাও বলতো যে- হ্যাঁ, আমি তাকে প্রলুব্ধ করেছিলাম; তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্যি নয়। এমতাবস্থায় ইউসূফ (আ)-এর কি হতো? তাহলে তিনি হয়তো আবার একজন ভৃত্যই হতেন। তাই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে আরো ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে তাকে আরো বেশি সময় কারাগারে রাখার ব্যবস্থা করলেন লোকটার স্মৃতি শক্তিতে অকার্যকর করে দিয়ে।

আর ইউসূফ (আ) যখন বের হলেন তার পূর্বে সেখানকার যে রাজা তার দেখা এক বিচিত্র ধরণের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন। এতে করে তিনি সেখানে এক বিশেষ সম্মান পেলেন আর রাজা ইউসূফ (আ)-কে সে রাজ্যের সব ফসল দেখা-শোনা করার এক বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে- ইউসূফ (আ)-এর এ অতিরিক্ত ৭ বছরের কারাদণ্ডটা তার ভালোর জন্য ছিলো।

আর একই ঘটনা ছিলো নবী ইবরাহীম (আ)-এর ক্ষেত্রে। তাঁর সন্তান ছিলো না। তার স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন; অথচ বৃদ্ধ বয়সে এক সুন্দর ফুটফুটে সন্তান ইসমাঈল জন্ম নিলেন। পিতা-পুত্র একসাথে কা'বা ঘর নির্মাণ করলেন আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বললেন যে, 'হে ইবরাহীম তোমার সন্তানকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করো'। এ ছেলে তখন নবী ইবরাহীম (আ)-এর কাছে সবচেয়ে আদরের ধন; এমতাবস্থায় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বললেন 'তাকে কুরবানী দাও'।

এটা ব্যক্তিগতভাবে নবী ইবরাহীমের কাছে একটা বিপর্যয়। এটা একটা পরীক্ষা ছিলো আর তাতে নবী ইবরাহীম (আ) উত্তীর্ণ হয়েছেন। এবং সেই নবী ইবরাহীমের বংশধরেরাই নবী হলেন। এমনই হলো নবী-জীবন কাহিনী। তবে বাহ্যিকভাবে এটাকে বিপর্যয় মনে হলেও আল্লাহ্ বলেছেন, এতে করে তোমাদের মাঝে সার্বিকভাবে জন্ম নেবে ধৈর্য। আর ধৈর্যই হলো আমাদের জীবনের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ .

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। [সূরা–২ বাক্বারা : আয়াত-১৫৫]

আর ঈমানদারদের এটা বিশ্বাস যে, এসব বিপর্যয় দিয়ে তাদের পরীক্ষা হয় ঈমান ও ধৈর্যের। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পুরস্কার দেন বেশি করে। যেমনটা দিয়েছেন নবী-রাসূলগণকে।

এ সব বিপর্যয় আমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেয়। পবিত্র কুরআনের সূরা সাজদাহের ২১ নং আয়াতে রয়েছে-

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

অর্থাৎ, গুরু শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাবো, যাতে করে তারা ফিরে আসে। [সূরা–৩২ সাজ্‌দা : আয়াত-২১]

আর কোনো বিশ্বাসী লোক যদি কোনো বিপদে পড়ে বা কোনো বিপর্যয়ে পড়ে তাহলে তার মনে পড়বে যে, এ বিষয়ে আল্লাহর আদেশ মানতে হবে। বিপর্যয় আসলে ভালোর জন্য। যদি কখনও কোনো বিপর্যয় না আসতো তাহলে এ সমাজের মানুষগুলো সব হয়তো বিপথে চলে যেতো আর তাতে করে তারা জাহান্নামে যেতো। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এ বিপর্যয় মানুষকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করে। এ বিপর্যয়ের সময় আমরা অন্য লোকদেরও ভালো মতো চিনতে পারি।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ .

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী।

(সূরা আনকাবূত : আয়াত-২-৩)

অন্য দিকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবিশ্বাসীদেরকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলেন শাস্তি হিসেবে। আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

অর্থাৎ, সতর্ক হোক তারা যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করো এবং আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে চলে। তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসবে অথবা তাদেরকে খুব কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। (সূরা নূর : আয়াত–৬৩)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ج وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

অর্থাৎ, ভয় করো, সতর্ক হও সেই বিপর্যয়ে জন্য যে বিপর্যয়ে যারা গুনাহগার তাদেরই শুধু ক্ষতি হবে এমন নয়; তুমি যদি তাদের সাথে থাকো তাহলে তোমারও ক্ষতি হতে পারে। জেনে রাখো, আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। (সূরা আনফাল–আয়াত-২৫)

তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের জীবনের বিপর্যয়গুলো হতে পারে আমাদের জন্য পরীক্ষা। অথবা সেগুলো শাস্তিও হতে পারে।

পৃথিবীতে এখন একটা রোগ দেখা দিচ্ছে যার নাম 'এইডস' যা মহামারীর মতো। বিষণ্ণতা থেকে আত্মহত্যা করাটাও এখন মহামারীর মতো। এভাবে কিন্তু আজকাল অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। তবে এখানে 'এইডস'এর কথাটাই ধরুন। এখনকার দিনে আপনারা প্রায় সকলেই 'এইডস' এর ব্যাপারটা জানেন। খলিফা ওমর (রা) একটি হাদিসের কথা বলেছেন যা

আপনারা পাবেন সুনানে ইবনে মাজায় যেটা সহীহ্ হাদীস। সেখানে তিনি বলেছেন- "মহানবী ﷺ বলেছেন, যখন সমাজের লোকজন যথেচ্ছারভাবে যৌনাচার শুরু করবে, একটা ভয়াবহ মহামারী তখন তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে; যে রোগ সম্পর্কে তাদের পূর্ব-পুরুষগণ কিছুই জানতো না।"

(প্রকাশ্যে যৌনাচার কীভাবে করবে? আমরা সেটা টেলিভিশন খুললেই দেখতে পাই। অশ্লীলতা, যৌনাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি আজকাল মানুষ বেডরুমে বসেই দেখছেন। আর এ জিনিসগুলো বিভিন্ন সমাজে বর্তমানে প্রকাশ্যেই হচ্ছে।) যখন এ যৌনাচার শুরু হবে তখন এ পৃথিবীতে একটা ভয়াবহ মহামারী ছড়িয়ে পড়বে। যে রোগ সম্পর্কে তাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন না। 'এইডস' সম্পর্কে আমাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানতেন না। এ হাদীসে 'এইডস'-এর কথাই বলা হয়েছে।

লোকে হয়তো বলবে, আমরা কীভাবে বুঝবো যে এ বিপর্যয় আমাদের শাস্তির জন্য অথবা এ বিপর্যয় একটি আশির্বাদ? সেটা আপনি নিজেই বুঝবেন যে, কোন বিপর্যয় শাস্তি এবং কোন বিপর্যয়টি আশির্বাদ।

এখন আমরা কীভাবে রক্ষা পাবো তা জানতে পারবো হাদীসে রাসূল ﷺ থেকে যা আমাদের রাসূল ﷺ বলে গেছেন আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে। তিনি একটি হাদীসে বলেছেন- "বিশ্বাসীরা যে কাজ করে সেগুলো খুবই বিস্ময়কর। সত্যি বলতে তাদের সবগুলো কাজই ভালো, আর শুধুমাত্র সত্যিকারের বিশ্বাসীদের জন্য এটা প্রযোজ্য। যদি তার ভালো কোনো কিছু হয় তাহলে সে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে ধন্যবাদ জানায়। আর অবশ্যই সেটা তার ভালোর জন্য। যদি তার খারাপ কোনো কিছু হয় তাহলে সে ধৈর্য ধরে এবং এটাও তার ভালোর জন্য।"

এখানে বলা হচ্ছে- বিশ্বাসীরা যে কাজ করে সেগুলো খুবই বিস্ময়কর। আর এটা শুধুমাত্র সত্যিকারের বিশ্বাসীদের জন্য প্রযোজ্য। এটাই হচ্ছে আমাদের মূলনীতি। বিশ্বাসীদের সামনে যখন কোনো বিপর্যয় আসে সেই বিশ্বাসী তখন ধৈর্যধারণ করে। তাদের বিশ্বাস, এ বিপর্যয় আসলে তাদের ভালোর জন্যই। আমরা সেই বিপর্যয়ে ভালো কিছু দেখি কিম্বা না দেখি তথাপি সেটা আমাদের ভালোর জন্যই। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যা আমাদেরকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে। কারণ, এটা বুঝতে পারলে আমরা এ মূলনীতি ভালোভাবে মেনে চলতে পারবো।

আপনারা দেখবেন, বিপর্যয় যখন আসে তখন লোকজন এ বিপর্যয়কে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। সেটা তার ভালোর জন্যও হতে পারে; আর আল্লাহ্ হয়তো এটা তার ভালোর জন্যই দিয়েছেন। কিন্তু তারা তা বুঝতে না পারার কারণে হতাশ হয়ে যায় এবং তারা অবিশ্বাস করা শুরু করে।

যদি আপনি কোনো অবিশ্বাসী বা নাস্তিকের কথা শুনেন এবং জানতে চান যে কেন তিনি নাস্তিক হলেন; সেই নাস্তিক তখন হয়তো আপনাকে বলবে, "আসলে আমি একজন মহিলাকে চিনতাম যে কি না খুব ভালো একজন মানুষ ছিলো, খুব দয়ালু ছিলো; একেবারে মাদার তেরেসার মতো। সেই মহিলা সব মানুষেরই অনেক উপকার করে বেড়াতো। একদিন সেই মহিলা রাস্তা পার হচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় একটি ট্রাক এসে তাকে ধাক্কা দিলো এবং জায়গায় মেরে ফেললো। সব শেষ। এমনটি কেনো হলো? এভাবে তিনি কেনো মারা গেলেন? এটা কি ঠিক? সে মহিলা কী অপরাধ করেছিলো? যেহেতু সে এ প্রশ্নগুলোর কোনো বিশ্বাসযোগ্য উত্তর খুঁজে পায়নি, সে জন্য তার মধ্যে এ অবিশ্বাস জন্ম নেয় যে, আল্লাহ্ বলতে কিছু নেই। কারণ, আল্লাহ্ যদি থাকতেন আর তিনি যদি ভালো হতেন তাহলে এ ভালো মহিলাটি এভাবে মারা যেতো না।"

কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা এ ব্যাপারটিকে দেখবে অন্যভাবে। তারা মূসা (আ) এবং খিজির (আ)-এর দৃষ্টান্তটা এ সময় মনে করবে। আমরা সবাই এ গল্পটা জানি যা সূরা কাহাফে বর্ণিত হয়েছে। গল্পটা আমাদেরকে এ মূলনীতির কথাই বলেছে যে, 'আমরা সবাই জিতবো'। এটা বর্ণিত হয়েছে একটি গল্পের আকারে যা সত্যি গল্প।

যখন মূসা ও খিজির (আ) নদী পার হলেন তখন মূসা (আ) দেখলেন যে, খিজির (আ) নৌকাটি ভেঙ্গে ফেলছেন। যে নৌকায় তারা নদী পার হলেন, পার হওয়ার পর সেই নৌকাতেই খিজির (আ) লাঠি দ্বারা আঘাত করে একটি ফুটো করে দিলেন। মূসা (আ) তখন বললেন, আপনি এটা কেনো করলেন? এটাতো ভালো কাজ নয়? লোকটা আমাদেরকে নদী পার করে আনলো আর আপনি সেই নৌকাটা ভেঙ্গে ফেললেন। এখনতো এ নৌকাটা ডুবে যাবে। তারপর সেই নৌকার মালিক তীরে এসে যখন দেখলো তার নৌকা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে তখন সে বললো, এটা কে করেছে? এটাতো ভালো কাজ নয়!

এ ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই সেই দেশের রাজা সেই নদীর পারে আসলো এবং নদীর তীরে যে নৌকাগুলো ছিলো তা দখল করতে লাগলো। এক সময় রাজা বর্ণিত ব্যক্তির নৌকার নিকটে আসলো এবং নৌকার গর্তটা দেখলো আর বললো এটা দরকার নেই; কারণ এ নৌকাটা ভাঙ্গা। তখন নৌকার মালিক কী বললো জানেন? সে বললো, আলহামদুল্লিাহ! আমার নৌকাটা ভাঙ্গা থাকার কারণেই আমি নৌকাটাকে পেলাম।

এমন ব্যাপার আমাদের সবার জীবনেই হয়ে থাকে। আপনার জীবনে একটা ঘটনা ঘটলো আর আপনি ভাবলেন সেটা খারাপ আর এজন্য আপনি কষ্টও পেলেন। তার কিছুদিন পরেই একটি ঘটনার ফলাফলে দেখতে পেলেন যে, পূর্বের খারাপ ঘটনাটাতো আমার জন্য ভালোই ছিলো; কারণ ওই ঘটনা না ঘটলে এ ভালো ঘটনাটা আপনার জীবনে ঘটতো না।

উদাহরণ হিসেবে বলি, একবার মিশরের কায়রো শহরের একটি পত্রিকায় একটি খবর দেখেছিলাম, যে খবরের পাশে এক ভদ্রলোকের ছবি ছিলো। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছিল যে, তিনি দুহাতের বুড়ো আঙ্গুল তুলে হাস্যোজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে আছেন আর তার বাবা মা তার দু গালে চুমো দিচ্ছেন। ছবির নিচে খবরটা দেওয়া আছে যা লোকটার জীবনে সদ্য ঘটে যাওয়া এক আশ্চর্য ঘটনা।

ঘটনাটা হচ্ছে- ভদ্রলোক একজন শিক্ষক। আগের দিন তার বাহরাইনে যাওয়ার কথা ছিলো প্লেনে চড়ে। তার যে ফ্লাইটে যাওয়ার কথা ছিলো তা ছিলো তার জন্য শেষ ফ্লাইট। ছুটি শেষ হয়ে গেছে, তাই সে আবার তার আগের কাজে যোগ দিতে বাহরাইন যাচ্ছে। এটা ছিলো তার শেষ ফ্লাইট আর সেখানেই তার টিকেট করা। ভদ্রলোক তার লাগেজ নিয়ে নির্ধারিত সময়ে বিমান বন্দরে গেলেন, পাসপোর্ট দেখালেন, তারপর প্লেনে আরোহণ করলেন।

সেখানকার অফিসার পাসপোর্ট দেখে বললো, পাসপোর্টে একটি সিল কম আছে। (মিশরে যে কোনো কাজ করতে গেলে অনেকগুলো সিল-এর প্রয়োজন হয়। একজনের কাছে সিল মারলে চলবে না; বরং বিভিন্ন জনের কাছে স্ব-স্ব স্থানের সিল মেরে আবার পূর্বজনের কাছে ফিরে এসে দেখাতে হবে এবং সে ক্লিয়ারেন্স দিলে তবেই যেতে পারবেন।) তার পাসপোর্টে

একটা সিল কম ছিলো বিধায় অফিসার বললো- আপনি প্লেনে আরোহণ করতে পারবেন না।

লোকটা বললো, আমাকে অবশ্যই এ ফ্লাইটে যেতে হবে, আর না গেলে আমার চাকরি চলে যাবে। তারা বললো- না, এ সিলটা অবশ্যই লাগবে; আপনি অফিসে যোগাযোগ করুন, এছাড়া আমরা আপনাকে যেতে দিতে পারি না। কিন্তু দেখা গেলো সে দিনের অফিস টাইম শেষ অর্থাৎ সে আর সেদিন বাহরাইন যেতে পারলো না বরং সেই ফ্লাইটটা মিস করলো।

এখানে নির্ধারিত ফ্লাইটটা মিস করলো এর অর্থ হচ্ছে সে তার চাকরিটা হারালো। তার মানে বিপর্যয়। এতে করে বিষণ্ন মনে সে বাসায় ফিরলো। সে ভাবলো তার ক্যারিয়ার ধুলিসাৎ হয়ে গেছে।

পরের দিন সে খবরের কাগজে দেখলো অথবা কারো কাছে শুনলো যে, গালফ ইয়ারের সেই ফ্লাইটটা যেটা বাহরাইন যাচ্ছিল সেটা একসিডেন্ট করেছে। ফলে সেই প্লেনের আরোহী সমস্ত লোক মারা গেছে কেউ বাঁচেনি। তখন সে বুঝলো আগের দিনের যে বিপর্যয়টা তার জীবনে ঘটেছিল সেটাই হয়েছে তার জন্য সৌভাগ্যের একটি ঘটনা। কারণ, আগের দিনের ঘটনা না ঘটলে আজ সে বেঁচে থাকতো না। তাই তার মুখে বিশ্ব জয়ের হাসি দেখা যাচ্ছে। আর এমনই হলো আমাদের প্রত্যেকের জীবন।

আমাদের জীবনে যা-ই ঘটুক না কেনো আর সেই ঘটনাকে যত খারাপই লাগুক না কেনো সে ঘটনার পিছনে আমাদের জন্য ভালো কিছু অবশ্যই অপেক্ষা করছে।

এ ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে। আমরা কখনও এ ব্যাপারগুলো বুঝতে পারি আবার কখনও সেটা বুঝতে পারি না। আমরা সেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারি না। আর এসব ক্ষেত্রে একজন নাস্তিক বলে থাকে ঠিক আছে আমি মেনে নিলাম এ বিপর্যয়টা আমার ভালোর জন্যই ঘটেছে; কিন্তু ভয়াবহ যে বিষয়গুলো যেমন 'সুনামী'। যেখানে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে, সেখানে আপনি ভালোর কী দেখছেন? ছোটো ছোটো মানুষ মারা গেছে। বহু নিরপরাধ মানুষ যারা কোনো অপরাধ করেনি তারা মারা গেছে। এর মধ্যে ভালো কী দেখছেন? এটার মধ্যে তো ভালো কিছু দেখছি না।

আসলে আল্লাহ্ বলে কেউ নেই। নাস্তিক যে, সে বলছে- আল্লাহ্ বলতে কেউ নেই। তাদের কথা অনুযায়ী যদি আল্লাহ্ থাকতো আর তিনি ভালো হতেন তাহলে এ ঘটনা কখনই ঘটতে দিতেন না। যদি না তিনি ভালো এবং খারাপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। হিন্দু ধর্মে এরকম কিছু ব্যাপার আছে যাতে তারা ভালো এবং খারাপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বলে মনে করে যে, কেনো ভালো আর খারাপ বিষয়গুলো ঘটছে। আপনি অগ্নি উপাসকদের দেখবেন তারা ভালো এবং খারাপ দু জন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে যত ভালো কাজ আছে সেগুলো ভালো ঈশ্বর ঘটিয়ে থাকেন আর সুনামীসহ এ ধরনের যত খারাপ বিপর্যয় ঘটে সেগুলো খারাপ ঈশ্বর ঘটিয়ে থাকেন।

আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? আমরা মূসা (আ) এবং খিজির (আ)-এর ঘটনাটাতে আবারও ফিরে আসি। খিজির (আ) নৌকা ভাঙ্গার পর মূসা (আ)-কে নিয়ে সামনে গেলেন। তখন তারা নদীর তীর ধরে হাঁটছিলেন। এমতাবস্থায় তারা দেখলেন, কিছু ছেলে সেখানে খেলা করছে। তার মধ্যে ১০ বা ১২ বছরের এক বালককে খিজির (আ) ধরলেন আর তার মাথা ছিড়ে ফেললেন।

মূসা (আ) বললেন, খিজির! আপনি কী করলেন? আপনি নিরপরাধ একটা ছেলেকে একেবারে মেরে ফেললেন? আপনি এটা কীভাবে করলেন? খিজির তখন মূসাকে বুঝিয়ে বললেন (আরো কয়েকটা ঘটনার পরে) যে, এই ছেলেটা যখন বড় হতো তখন সে তার বাবা-মা-কে অনেক কষ্ট দিতো অথচ তার বাবা-মা খুবই ধার্মিক। কিন্তু তাদেরকে এ ছেলেটা এমন কষ্ট দিতো যে, এর কারণে তারা দু'জনেই ঈমানহীন হয়ে যেতো। তার বাবা-মা'র ভালোর জন্য আমি এ ছেলেটিকে মেরে ফেললাম।

তবে এখানে বাবা-মা যখন তাদের এ ছেলেটার মৃত্যুদেহ দেখতে পাবে তখন তারা বলবে, "এটা খুবই বিপর্যয়কর ব্যাপার। কে আমাদের ছেলেটাকে হত্যা করলো? কোন নিষ্ঠুর এ কাজ করলো?" যদিও আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে আরো একটি মেয়ে সন্তান দিলো; যে তাদেরকে শ্রদ্ধা করতো, ভালো ব্যবহার করতো এবং তারাও তাকে ভালোবাসতো। কিন্তু তার পরেও তাদের মনে একটি দুঃখ থেকে গেলো যে, আমাদের প্রথম

সন্তানকে কেউ একজন মেরে ফেলেছিলো। একেবারে কিয়ামত দিবসেও তারা আল্লাহর কাছে দাড়াবে এবং আল্লাহ তাদেরকে দেখাবেন যে, তাদের জীবনে কী কী ঘটনা ঘটতে পারতো। তখন তারা বলবে যে, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের ছেলে মারা গেছে এজন্য আমরা অখুশি নই।

এটা হলো সেই ধরনের বিপর্যয়, যার ভিতরে আমরা কোনো ভাবেই কোনো ভালো কিছু খুঁজে পাই না। এ বিপর্যয়ের মধ্যে ভালো কিছু আমরা কোনোভাবেই খুঁজে পাই না। এটাই হচ্ছে জীবন; আমাদের জীবনটাই এরকম।

মনে করুন, আপনার ৩ বা ৪ বছর বয়সের বাচ্চা ছেলেকে ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে গেলেন। আপনি তাকে ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে বললেন, তোমাকে যার কাছে নিয়ে যাচ্ছি সেই ডেন্টিস্টটা খুবই ভালো একজন মানুষ এবং তিনি একজন ভালো ডাক্তার। এবং নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তারকে দেখিয়ে বললেন, দেখেছো! কত সুন্দর লোকটা? কত সুন্দর তার পোষাক? ইনি খুবই ভালো মানুষ।

কিন্তু সেই ডেন্টিস্ট যখন সুঁইটা নিয়ে আপনার ওই ছেলেকে ইনজেকশান দিলো তখন সে চিৎকার করে উঠলো। এমতাবস্থায় আপনার ছেলে সেই ডেন্টিস্টের সম্পর্কে কী ভাববে? সে কি ডেন্টিস্টকে ভালো মানুষ মনে করবে? না, সে তাকে ভালো মানুষ মনে করবে না; বরং ভাববে সে খারাপ মানুষ। এরপরও যদি ছেলেকে ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে যেতে চান, সে বলবে– না, যাবো না। সে কোনো ভাবেই সেখানে তার কাছে যেতে চাইবে না। সে যেতে চাইবে না আর আপনিও আপনার সেই ছেলেকে কোনোভাবেই বুঝাতে পারবেন না যে এ ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়াই তার জন্য ভালো। সে বুঝবে না।

আপনার ছেলে তখন চিন্তা করবে সেই ব্যথার কথা, যন্ত্রণার কথা যা সে প্রথম দিন পেয়েছে। কিন্তু আপনার মানসিকতা পরিণত বিধায় আপনি বুঝেছেন, এ যন্ত্রণা আরো বড় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে, আরো বেশি কষ্ট থেকে মুক্তি দেবে। কারণ এখন চিকিৎসা না করলে দাঁত ব্যথা করবে, রুটক্যানেল করাতে হবে অথবা দাঁতকে উঠিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু আপনার ছেলে সেটা বুঝতে পারছে না। সে দেখছে যে, ডেন্টিস্ট তাকে সুঁই ঢুকিয়ে দিয়েছে; এতে ব্যথা লেগেছে।

আর আমরা সবাই এরকমই। আমরা এ সব বিপর্যয়ের পিছনে ভালো কিছু দেখতে পাই না। কারণ, আমরা আমাদের বুদ্ধিতে সেসব কিছু বুঝতে পারি না; আল্লাহ্ আমাদেরকে সেসব বুঝার মতো জ্ঞান দেননি। কিন্তু আমরা এজন্য বলতে পারি না যে, এটা আসলে ভালো নয়। এটার মধ্যে ভালো কিছু দেখছি না। বরং আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, এটা আমাদের ভালোর জন্যই। সে যে ঘটনাই ঘটুক না কেনো। কারণ, আল্লাহ্ আমাদের বলেছেন–

وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ -

অর্থাৎ, তিনি এ বিশ্ব জগতের সব কিছুর স্রষ্টা।

জগতের ভালো জিনিস এবং খারাপ জিনিস সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা হলেন তিনি। জগতে যা কিছু হচ্ছে তার সব কিছুই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার অনুমতিতে। আর সেজন্য আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবো যে, 'তিনি যা কিছু করছেন তা আমাদের ভালোর জন্যই করছেন।'

আমরা যদি এটা করি তখন আমরাও ভালোভাবে থাকতে পারবো। এটা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আর এভাবে আমরা সবাই জিতবো। ভালো ঘটনাতেও আমরা জিতবো; আমাদের জীবনে ভালো কিছু যখন ঘটবে তখন জীবনটা ভালো যাবে। আমরা ভালোমন্দ কোনো পরিস্থিতিতেই আল্লাহকে ভুলবো না। কারণ এসব কিছুই হতে পারে পরীক্ষা। ভুল করে আমরা ভুল পথে চলে যেতে পারি; তাই আমাদেরকে সব সময় সচেতন থাকতে হবে আর আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে।

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা আমাদের ভালোর সময়, সুখের সময় আল্লাহকে মনে রাখি না; যেনো এটা খুবই কঠিন কাজ। অথচ আমাদের খারাপ সময়ে খুব সহজেই আল্লাহকে স্মরণ করি। আনন্দ আর সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখা এটা আসলেই খুব কঠিন এবং জটিল একটা কাজ আর খারাপ সময়ে আল্লাহকে মনে করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এটা মনে রাখবেন। আমরা অনেক সময় ভাবি যে, খারাপ সময়ে আল্লাহকে স্মরণে রাখা কঠিন কাজ। না, তা নয়; এমনকি যে লোকটা আল্লাহ্ তা'আলাকে বিশ্বাস করে না সেও কখনও কখনও মনে করে অথবা ধৈর্য ধরবে।

কিছু মানুষ আছে যারা খারাপ সময়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলো। কিন্তু অনেকেই বলে এখানে ধৈর্য হারিয়ে লাভ কী? এতে তো পরিস্থিতি বদলাচ্ছে না। তখন তারা ঠিক করে যে, আমরা এ সময় ধৈর্য ধরে থাকবো। আমরা এখানে কোনোভাবেই ধৈর্য হারাবো না। অবিশ্বাসীরাও এটা করতে পারে।

তবে আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে সাফল্যের সময়ে যা আসলেই একটি কঠিন কাজ। শুধুমাত্র বিশ্বাসীরাই এ কাজটা করতে পারে।

ধৈর্য মানে আমরা বুঝি যে, সেই খারাপ সময় ইসলাম ধর্মের সব নিয়ম আমরা মেনে চলবো। এটা আসলেই একটা পরীক্ষা। গরিব থাকতে ভালোই ছিলেন কিন্তু সম্পদশালী হওয়ার পর জীবন আপনার বদলে গেলো। আপনি তখন লোভী হয়ে উঠবেন, কাউকে কিছু দেবেন না। এরকম আরো অনেক কাজই আপনি করবেন। আপনার পার্সোনালিটি বদলে যাবে। এটা খুবই বড় একটি পরীক্ষা।

“তোমাদের সন্তান এবং সম্পদের মধ্যে আছে তোমাদের জন্য বিপর্যয় ও পরীক্ষা। এ ব্যাপারে সাবধান থেকো।

আর তা হলো সত্যিকারের বিশ্বাসীরা কোনো কাজে সফল হলে তারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আর আল্লাহ তাদের পুরস্কার দেন। ধৈর্য ধরে তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এবং জীবনে সফলকাম হয়। তারা তাদের সম্পদ সব ভালোভালো কাজে ব্যবহার করে। যেসব কাজে ব্যবহার করলে তাদের নিজেদের তাদের সন্তানদের, তাদের পরিবারের এবং সমাজের উপকার হবে সেসব কাজেই তারা তা ব্যয় করে। কিন্তু এ সম্পদ পেয়ে যদি তারা ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে তাহলে আসলে তাদের কোনো উপকারই হবে না।

আর যখন দেখা যায়, তারা কোনো বিপর্যয় বা কোনো পরীক্ষার ভিতরে পতিত হয় তখন তারা ধৈর্য ধরে এবং তারা এ কথাটা জানে যে,

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ـ

অর্থাৎ, “আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন।” এ ব্যাপারে তিনি কথা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۔

অর্থাৎ, আমি কাউকেই তার সাধ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করি না।

এজন্য কোনো অযুহাত দাঁড় করানো যাবে না যে, তাকে যে বিষয়ে ধৈর্য ধরতে বলা হচ্ছে তা তার সাধ্যাতীত। যদি কেউ বলে, আল্লাহ্ আমাকে সাধ্যের অতীত দায়িত্ব দিয়েছেন এজন্য আমি আত্মহত্যা করবো। না, তা করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ্ কাউকেই তার সাধ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেন না। আর এ কারণেই আত্মহত্যা করা হারাম।

যে আত্মহত্যা করে সে আসলে আল্লাহ্কে বলে যে, তুমি আমাকে আমার সাধ্যের অতীত দায়িত্ব দিয়েছো; এ দায়িত্ব আমি পালন করতে পারছি না। আর এটা আসলে সত্যি নয়; বরং আল্লাহ্কে মিথ্যা অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের মধ্যে কেউই তার সাধ্যের অতীত দায়িত্ব পালন করে না। এমনটা না হলে সেটা অবিচার হতো, আল্লাহ্ অবিচার করতেন; আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবিচার করেন না।

তাহলে একজন বিশ্বাসী যখন কোনো বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে সে তখন ধৈর্য ধরে আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে পুরস্কার প্রদান করেন। তাহলে আগের কথাতেই ফিরে আসি আর তা হলো- সত্যিকারের বিশ্বাসীদের আদর্শ হবে, 'আমরা সবাই জিতবো'। তবে এটাও মানতে হবে যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেটা করেন সেটা আমাদের ভালোর জন্যই করেন; আর আমাদেরকে এভাবেই চিন্তা করতে হবে।

এটা করলেই আমরা আমাদের মানসিক দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারবো, আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো এবং আমাদের জীবনের নানা চড়াই-উৎরাই পার হতে পারবো। সেক্ষেত্রে আমাদের মনে শান্তি আসবে এবং আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবো।

আমি আমার এ বক্তব্য শেষ করার আগে আপনাদের মনে করিয়ে দেই যে, আমরা যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে বিশ্বাস করি, আমাদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একটি বিশেষ পবিত্র দায়িত্ব দিয়েছেন। আর

সে দায়িত্ব হচ্ছে- ইসলামের দাওয়াত, সত্য ধর্মের বার্তা পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে ঘরে সব মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

তাহলে আসুন, আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে, আমরা সবাই জিতবো। আমরা কখনই হারবো না; বরং আমরা সব মানুষই জিতবো।

আপনাদের এ ভারতবর্ষে অনেক মানুষ আত্মহত্যা করছে। আত্মহত্যার হার এখানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। যারা আত্মহত্যা করে তাদের এ কথাগুলো শোনা প্রয়োজন যে, সত্যিকারের বিশ্বাসীরা কখনই হারবে না। হার-জিত নয় বরং আমরা সবাই জিতবো। আমরা সবাই এটা বিশ্বাস করবো।

আমি দু'আ করছি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদের সবাইকে এ সামর্থ্য দেন, যাতে করে আমরা আমাদের দায়িত্বগুলো পালন করতে পারি আর সেই সাথে আমাদের মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী যেন এ বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারি সকল মানুষের মাঝে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

পরিচালক : এখন শুরু হচ্ছে আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। এ পর্বে দর্শকদের প্রশ্নের জবাব দেবেন আমাদের আজকের বক্তা ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস। দর্শকদেরকে বলবো তারা যেন আজকের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশ্ন করেন। যাতে করে সকল দর্শক ও শ্রোতা উপকৃত হয়।

প্রশ্ন-১. আমার নাম সত্যেন্দ্র। আমার বিশ্বাস অনুযায়ী জান্নাত আর জাহান্নাম বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। এগুলো বানিয়েছে পৃথিবীর মানুষেরা। এগুলো আসলে নেই। আমার বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যুর পরের জীবন বলেও কিছু নেই। আমার বিশ্বাস, আমি মরে যাবো যেভাবে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আর আমার ধারণা বিজ্ঞানও এমন কথাই বলে। আমার প্রশ্ন হলো- আপনি বললেন, বিপর্যয় আসে কখনও ভালো আবার কখনও খারাপ দৃষ্টিকোণ থেকে। আপনি এখানে যে উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলো আসলে একজন মাত্র মানুষের জীবনের উদাহরণ; যেমন- নৌকায় ছিদ্র করে দেওয়া। নৌকায় ছিদ্র করে দেওয়ার পর নৌকাটি ডুবে গেলো। তবে যদি এ ধরনের বিপর্যয়ের কথা বলেন, ২০ লাখ ইহুদি মারা গিয়েছিলো জার্মানীতে, এছাড়া সুনামীর বিপর্যয়, ইরাকেও এক ধরনের বিপর্যয় এখন চলছে। তাহলে এ ধরনের ঘটনায় আপনি হয়তো বলবেন জার্মানীতে ইহুদী নিধনের ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে ৫০ বছর আগে; এটা বলতে পারবেন না যে, সব কিছু ভালোর জন্যই ঘটে। আপনি এখানে বলেছেন একজন মানুষের উদাহরণ। কিন্তু বৃহত্তর বিপর্যয়গুলোর ব্যাপারে কী বলবেন?

ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস : ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার এ প্রশ্নের জন্য। তবে এটা আসলে কোনো প্রশ্ন নয় বরং আপনি এখানে একটি মন্তব্য করলেন যে, আপনি জান্নাত আর জাহান্নাম বিশ্বাস করেন না; আর আপনি মারা গেলে কোনো কিছুই হবে না।

আপনি এ পৃথিবীর যে স্থানেই যান না কেনো সেখানে আপনি কোনো না কোনো ধর্ম পাবেন যেখানে দেখবেন তারা জান্নাত-জাহান্নাম বিশ্বাস করে। পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তর সমাজ, সবচেয়ে আদি, সবচেয়ে আধুনিক এমনকি প্রত্নতাত্ত্বিকরাও মাটি খুঁড়ে বিভিন্ন সভ্যতার নিদর্শন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, পৃথিবীর আদি থেকেই জান্নাত ও জাহান্নামের ধারণাটা ছিলো এবং এখনও তা আছে। কিন্তু আপনি বলছেন যে, এসব কিছুর অস্তিত্ব নেই; আপনি এগুলো মানেন না।

এখানে আমি বলবো, আপনি হয়তো নিজের অজান্তেই এসব সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা নিজের মধ্যে লালন করছেন। যখন পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ এ কথাটি বিশ্বাস করে, হোক তা যুক্তির মাধ্যমে বা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে। তখন আপনি এখানে বলছেন বা আপনার মতো গুটি কয়েক মানুষ বলছে যে এগুলো বলে কিছু নেই অর্থাৎ জান্নাত জাহান্নাম বলতে কিছু নেই। এখানে আপনার কথাটা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ আমরা বুঝার চেষ্টা করি, আমরা অনুধাবণ করার চেষ্টা করি যে, কোন কথাগুলো সত্যি আর কোন কথাগুলো মানুষের বানানো কথা। সে সাথে যে ব্যাপারগুলো আমরা সব জায়গায় দেখি যা অধিকাংশ মানুষের মধ্যে সাধারণ, এ সাধারণ ব্যাপারগুলো সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক অনেক গুণ বেশি।

আর যে ব্যাপারগুলো আমরা অল্পকিছু জায়গায় দেখি সে ব্যাপারগুলো কিন্তু একেক জায়গায় একেক রকম; যা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। আমি এখানে আসলে আপনার মন্তব্যটার উত্তর দিচ্ছি; তবে এ ব্যাপারে আপনার আরো বেশি চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। আপনি এ ব্যাপারগুলো আপনার ইচ্ছামতো দেখতে পারেন, আপনি যেমন ইচ্ছে ধারণা করতে পারেন।

কিন্তু জেনে রাখুন, পৃথিবীর ইতিহাসে আপনার মতো বিশ্বাস খুব কম লোকেরই ছিলো এবং আছে। আর সংখ্যালঘুর দলে থাকা এটা আসলে খুবই ভয়ানক বিপর্যয়মূলক একটি কাজ।

এক নম্বর কারণ, ধরুন জান্নাত-জাহান্নাম বলতে যদি কিছু না থাকে তাহলে যারা জান্নাত জাহান্নামে বিশ্বাস করে ভালো ও সৎকাজ করার চেষ্টা করছে তারা কিন্তু কিছুই হারাবে না। কিন্তু যদি জান্নাত ও জাহান্নাম বলে কিছু থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি হেরে যাবেন। আপনি এবং আপনার মতো যারা বিশ্বাস করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বলে কিছু নেই তারা হেরে যাবে।

আপনাদেরকে এখন আমি বলবো উদাহরণগুলো নিয়ে। আমি সহজভাবে বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম। আমাদের সহজভাবে অনুধাবন করার জন্য কুরআনে কারীমে বিভিন্ন সত্য গল্প বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের একটি সূরা হচ্ছে- সূরা বুরূজ। এ সূরা বুরূজে একটি সত্য ঘটনা বিবৃত হয়েছে। ঘটনাটা হচ্ছে- কিছু লোক তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো আর সে জন্য তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিলো।

এখানে একটি কিশোরের ঘটনা বিবৃত হয়েছে (আর তা আমাদের নবীজী ﷺ ব্যাখ্যা করেছিলেন) যাকে সেই দেশের রাজা প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন একজন যাদুকর হয়ে ওই রাজার পক্ষে কাজ করার জন্য। ছেলেটি যাদুর প্রশিক্ষণ নিতে যেখানে যেতো তার আসা-যাওয়ার পথে এক দরবেশের কাছে আল্লাহর কথা শুনলো এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করলো।

পরবর্তীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে দিয়ে অনেক অলৌকিক কাজ করালেন। এক সময় সে মৃত্যুবরণ করলো আর সে যে শহরে থাকতো সেই শহরের লোকজন তার মাধ্যমে সত্য ধর্মটাকে গ্রহণ করেছিলো। এ ঘটনাটা ঘটেছিলো ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলে। তাদের এ বিশ্বাস দেখে রাজা একটা গর্ত খুড়লো; কেননা রাজা চায়নি যে তার প্রজারা আল্লাহকে বিশ্বাস করুক এবং তারপর তাদের সবাইকে সে গর্তে আগুন জ্বালিয়ে তাতে পুড়িয়ে হত্যা করা হলো।

অর্থাৎ সেই শহরের সব লোকজনকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হলো। আল কুরআনের সূরা আল বুরূজে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে সত্য ধর্ম বিশ্বাস করার কারণে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। তখন সে শহরের অনেক মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

এর মধ্যে আপনি ভালো কী দেখতে পাচ্ছেন? বলুন? ঘটনাটাতো খুবই মর্মান্তিক। আল্লাহ্কে বিশ্বাস করার কারণে তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হলো। তবে ইতিহাস আমাদেরকে বলে যে, তারা মারা যাওয়ার পরে এ ধর্মটা উক্ত ঘটনার প্রভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। (আর এটাই ছিলো প্রকৃতপক্ষে যিশুর শিক্ষা। যিশুখ্রিস্ট যা দিয়েছে সেটা কিন্তু এখনকার খ্রিস্টান ধর্ম নয়; আপনারা আজকের খ্রিস্টান ধর্ম মনে করবেন না।) তাদের মৃত্যুর কারণে আল্লাহর সত্য ধর্ম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এটা একটা উদাহরণ। একদল মানুষ, তারা যেভাবে মারা গেলো সেটা খুবই মর্মান্তিক, ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক; আর এখানে ভালো ফলাফলটা হলো সত্য ধর্ম এ ঘটনার প্রভাবে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

তাই আমি বলছি, একজনের জন্য এ ব্যাপারটা ঘটতে পারে, আবার একদল লোকের ক্ষেত্রেও এমনটা হতে পারে। এমনকি একজন লোকের জীবনে যে বিপর্যয় ঘটে সে বিপর্যয়ের পিছনেও আমরা ভালো কিছু দেখতে পাই না; একইভাবে একদল লোকের ক্ষেত্রেও আমরা হয়তো ভালো কিছু দেখতে পাবো না। তবে আমরা বিশ্বাসীরা এটা মানি যে, এগুলো ভালোর জন্যই হয়ে থাকে। নিশ্চয় প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন-২. জনৈক প্রশ্নকারী : স্যার, হিন্দুইজমে মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতির পূজা করে। যেমন- নদী, গাছ, সূর্য, নক্ষত্র, পাহাড় ইত্যাদি। তবে অন্যান্য ধর্মে এ ব্যাপারটা তেমন একটা দেখা যায় না। আমরা যেগুলোর পূজা করি সেগুলো আসলে প্রকৃতির একটা অংশ; যেমন- সেবা, তিনি প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। তাহলে এসব বিশ্বাসের ভিত্তিটা আসলে কী?

ড. আবু আমিনাহ্ বিলাল ফিলিপস : আসলে ইসলামে আমরা উপাসনা করি সৃষ্টিকর্তাকে, একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে। অর্থাৎ আমরা সর্বশক্তিমান একজন ঈশ্বরকেই বিশ্বাস করি, যাকে আমরা আল্লাহ্ বলে সম্বোধন করি। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের উপকার করেন, আমাদের সব কিছু দেন। সৃষ্টিকর্তার প্রতি এ বিশ্বাসটা আসলে খুবই প্রাকৃতিক একটি অনুভূতি।

আপনারা নিজেদের পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করেন, তাদেরকে খুব ভালোবাসেন; কেননা তারাও আপনাকে ভালোবাসে, আপনার যত্ন নেন। একইভাবে যে গরুটা আপনাকে দুধ দেয়, সে প্রাণীটাকে আপনি ভালোবাসেন। আপনার হয়তো একদল ভেড়া আছে যেগুলোর লোম দ্বারা আপনি উল বোনেন; এ ভেড়াটাকেও আপনি ভালোবাসেন। এভাবে আপনি যাদের থেকে কোনো উপকার পাবেন তাদেরকে আপনি ভালোবাসবেন বা শ্রদ্ধা করবেন এটাই স্বাভাবিক।

যাই হোক, পূজা করা ব্যাপারটা একটু আলাদা। পূজার সময় যা করছেন আপনি কাউকে বলছেন আপনার কাজটা করে দিতে। যে কাজটা আপনার নিজের পক্ষে করা সম্ভব নয় আপনি পূজার মাধ্যমে কতগুলো প্রাকৃতিক জিনিসের কাছে নিজেকে সমর্পন করছেন; অথচ এ উপাসনাটা একমাত্র সৃষ্টিকর্তার প্রাপ্য। কেননা, আল্লাহর সৃষ্টি এই গরু, এই ভেড়া, এই গাছ, নদী অথবা প্রকৃতি ইত্যাদি তারা আমাদের কথার উত্তর দিতে পারে না।

তারা আমাদের সেবা প্রদান করে। মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে এমন কিছু দিয়েছেন যেটার কারণে তারা আমাদের সেবা প্রদান করছে। এটা তারা স্বেচ্ছায় করছে না। একটা গরু কখনও এভাবে ভাবে না যে, আমি মানুষকে দুধ দেব না কি দেব না। এসব চিন্তা করে গরু মানুষকে দুধ দেয় না; তার সেই ক্ষমতা নেই। গরু এসব ব্যাপারে চিন্তা করতে পারে না।

একইভাবে ভেড়া আমাদের উল দেয়, নদী মাছ দেয়, গাছ ফল দেয়; এটা তারা আল্লাহর হুকুমে করে। তাই আল্লাহ কুরআনে কারীমে উল্লেখ করেছেন- "তিনি সমগ্র পৃথিবীকে বানিয়েছেন আমাদের জন্য।" তাই পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিস থেকে আমরা উপকার পাই। সেগুলো আসলে আমাদের জন্য উপহার দিয়েছেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা; যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন।

তাই আমরা যার উপাসনা করবো, যার কাছে সাহায্য চাইবো, যার কাছে সত্য পথের দিক নির্দেশনা চাইবো, আমাদের জান-মালের নিরাপত্তা চাইবো, তিনি এ বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনি আল্লাহ। আর মুসলিমরা এটাই বিশ্বাস করে।

স্রষ্টার সৃষ্টিকে পূজা করা, যেটাকে বলা হয় শিরক। দুঃখজনক ব্যাপার আপনারা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে স্রষ্টা হিসেবে মানছেন। হতে পারে সেটা একজন মানুষ, জড় পদার্থ অথবা পশুপাখি। এটা হলো স্রষ্টার সৃষ্টিকে পূজা করা। স্রষ্টাকে ভুলে গিয়ে তার সৃষ্টিকে পূজা করা।

প্রশ্ন-৩. আমার নাম শ্যাম মেথি। আমি এখানে একটা ব্যাপার ভালোভাবে খেয়াল করলাম যে, এখানে এমন দু'জনকে দেখছি যারা আগে খ্রিস্টান ছিলেন। আপনারা এখানে সংখ্যাগুরু। আমিও একজন খ্রিস্টান, তবে আমি এখানে বলতে চাচ্ছি না যে, খ্রিস্টান ধর্ম সবার ওপরে; ব্যাপারটা দেখলাম তাই বললাম। এখন মিস্টার বিলালের নিকটে আমার প্রশ্নটা হলো- প্রথমে এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন, জান্নাত ও জাহান্নাম আছে কি না। আপনি তার উত্তরে বললেন যে, পৃথিবীর বেশিরভাগ লোক যারা সংখ্যাগুরু তারা যেভাবে ভাবছে অর্থাৎ জান্নাত-জাহান্নাম আছে আপনি সেই দলে। তাহলে আপনি একজন ব্যক্তি হিসেবে সেই সংখ্যাগুরু লোকদের বিশ্বাস কি মানছেন? যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ মানে যে জান্নাত ও জাহান্নাম আছে, তাই আপনি মানছেন। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হলো- যদি এমনটা হয়ে থাকে যে, হিন্দুইজম একটি ধর্ম আর এ ধর্মের লোক এ দেশে বেশি অর্থাৎ এখানে তারা সংখ্যা গুরু; তাহলে আপনি হিন্দু ধর্মটাকে মানছেন না কেন?

আমার কথা ঠিক হলে বর্তমান বিশ্বে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী বেশি, তাহলে আপনি খ্রিস্টান ধর্মটাকে মানছেন না কেন? যেহেতু আপনি নিজেই বলছেন যে, জান্নাত ও জাহান্নাম আছে, একথা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক বিশ্বাস করে, আর তাই আপনিও বিশ্বাস করেন।

ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস : ধন্যবাদ। আসলে আপনি আমার কথাকে বুঝতে পারেননি। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম আছে আর তাই আমি বিশ্বাস করি, আমি আসলে এ কথাটা বলিনি। আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন, প্রশ্নকারী ভদ্রলোক যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বিশ্বাস করেন না সেটা নিয়ে কথা বলেছিলাম। আমি তখন তাকে

জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে বলেছিলাম। কোনো ধর্ম নিয়ে বলিনি বরং বেশিরভাগ মানুষের কথা বলেছি, মানুষের বিশ্বাস নিয়ে বলেছি।

তবে আমি কেন এসবে বিশ্বাস করি তার উত্তর হচ্ছে- এ বিশ্বাসের পিছনে মূল কারণ হলো, আমি মনে করছি যে ইসলামই পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার সত্যিকারের ধর্ম। আর ইসলাম ধর্মের শিক্ষাগুলো অর্থাৎ যে জীবন বিধান বলে গিয়েছেন আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ, আরো বলেছেন আগের নবী-রাসূলগণ- নবী ঈসা (আ), ইবরাহীম (আ), মূসা (আ), দাঊদ (আ), নূহ (আ); তারা সবাই বলে গিয়েছেন এ জান্নাত ও জাহান্নামের কথা।

সুতরাং আমি বিশ্বাস করি এ পরিপূর্ণ জীবন বিধানকে, যে ধর্মের নাম হলো ইসলাম। আমাদের ধর্মটা আমাদেরকে এটাই শেখায়। অর্থাৎ আমি যে ধর্মটা গ্রহণ করেছি, আমি যে ধর্মে বিশ্বাস করেছি সে ধর্ম এটা মেনে নিয়েছে এমনকি এটাকে ইসলাম বিশ্বাসের অঙ্গ বলে মনে করে। আর যদি অন্যদের দিক থেকে দেখি তাহলেও এটা হওয়াটা অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নাম থাকাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

কারণ, আমাদের এই যে জীবন এ জীবনটাই সব কিছু নয়। এ জীবনের পরে আরো একটি জীবন রয়েছে। আর আমাদের এ জীবনে কিন্তু অনেক বিষয়েরই সমাধান হয় না। ঘৃণিত হিটলার; মরে গেলো তো সব শেষ হয়ে গেল, আর একজন ভালো মানুষ মারা গেল এবং সেখানেও সবকিছু শেষ হয়ে গেল। দু'টি ব্যাপারই কি এক হলো? কখনই নয়। দু'টো ব্যাপার একরকম ঘটলে আসলে সেটা খুবই অন্যায় হয়ে যায়।

একজন আত্মহত্যা করলো আর একজন স্বাভাবিকভাবে মারা গেল আর মারা যাওয়ার পরে সব শেষ হয়ে গেল; একজন কাজ করেছিল খুব খারাপ আর অন্যজন কাজ করেছে খুব ভালো, তারা দু'জনেই মারা গেলো আর সব শেষ? না, এটা আসলে যৌক্তিক নয়; এটা অযৌক্তিক, এটার কোনো মানে হয় না।

এখানে যেটা যৌক্তিক সেটা হলো- এ জীবনের পরে আরো একটা জীবন আছে যেখানে খারাপ কাজকারী ব্যক্তি তার খারাপ কাজের জন্য শাস্তি পাবে

এবং যে লোক সবসময় ভালো কাজ করেছে সে লোকও তার ভালো কাজের পুরস্কার পাবে। এটাই আমার কাছে যৌক্তিক মনে হয়।

তাহলে আমি জান্নাত ও জাহান্নাম আছে এটা বিশ্বাস করি, অবশ্যই করি; কারণ আমি যে সত্য ধর্ম গ্রহণ করেছি তা আমাকে এমনটাই শেখায়। আর বিশ্বাসের দিক থেকে এটাই আমার কাছে অধিক যৌক্তিক মনে হয়। আর আমার ধর্ম আমাকে সে শিক্ষাই দেয় এবং এ ধর্মে আমি যাকে নবী বলে মানি তিনি এ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

এছাড়াও আমি একথা বলবো যে, যৌক্তিকতার দিক থেকেও বলা যায়, এ বিশ্বাসটাই সঠিক বিশ্বাস।

আমি জান্নাত ও জাহান্নাম আছে বিশ্বাস করি, তার মানে এ নয় যে, বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ এটা বিশ্বাস করে; বরং আমার ধর্মে এটা বিশ্বাস করতে বলে বলেই আমি তা বিশ্বাস করি। আর যৌক্তিকতার দিক থেকে আমার মতে এটাই স্বাভাবিক।

পরিচালক : জাযাকাল্লাহ খায়ের, ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ড. বিলাল ফিলিপস্

সংকলন

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

সম্পাদনা

পিস সম্পাদনা পর্ষদ

দ্বিতীয় অধ্যায়
সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ভূমিকা

'সৃষ্টির উদ্দেশ্য' বিষয়টি জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের চিন্তাকে আলোকিত করে। কোন এক সময় প্রত্যেকে নিজ সত্তার নিকট প্রশ্ন রাখে "আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কি?" কিংবা "আমি কেন দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করলাম?"

এ নিখিল বিশ্ব জগতের নির্মাণশৈলী ও গঠনতন্ত্রের বৈচিত্র্য ও জটিলতা, সেই সর্বোচ্চ ও মহত্তম সত্তার অস্তিত্বমান করে– যিনি এ সবকিছুর স্রষ্টা। যে কোন পরিকল্পনার অধীনে অবশ্যই একজন পরিকল্পনাকারী থাকেন। সমূদ্র সৈকতের পদচিহ্ন চোখে পড়লে তৎক্ষণাৎ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কোন ব্যক্তি কিছুক্ষণ পূর্বে সে পথ দিয়ে হেঁটে গেছে।

কেউ বিন্দুমাত্রও কল্পনা করবে না সমুদ্রের ঢেউ ঘটনাক্রমে বালুর ওপর মানুষের পায়ের ছাপের অনুরূপ তৈরি করেছে। কিংবা এও চিন্তা করবে না যে, কোন কারণ ছাড়াই ওগুলো অস্তিত্ব লাভ করেছে। মানব-বুদ্ধিমত্তার সহজাত প্রবণতা হলো ঘটনার পিছনে কারণ খুঁজে বের করা।

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মহান স্রষ্টার যাবতীয় সৃষ্টির পিছনেও কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। জীবনকে অর্থবহ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তুলতে এবং মানুষ যাতে তার পক্ষে পরিশেষ যা কল্যাণকর তা অর্জনে সচেষ্ট হতে পারে, সেজন্য অস্তিত্বের কারণ প্রসঙ্গে জ্ঞান রাখা আবশ্যক।

সর্বযুগে মানবজাতির একটি সংখ্যালঘু অংশ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এসেছে। তাদের মতে, বস্তু (Matter) অনাদি ও অনন্ত এবং এর

বিভিন্ন উপাদানে সংঘটিত বিন্যাসের উপজাত হিসেবে ঘটনাক্রমে মানবজাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। কাজেই, "স্রষ্টা কেন মানুষ সৃষ্টি করলেন?" এ প্রশ্নের কোন সঠিক জবাব তাদের নিকট খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের ভাষ্যানুযায়ী, মানবজাতির অস্তিত্ব উদ্দেশ্যহীন। অথচ শাশ্বতকাল ধরে মানবজাতির অধিকাংশই বিশ্বাস করে আসছে এক মহামহিম, সর্বোচ্চ সত্তার অস্তিত্বে যিনি যথাযথ উদ্দেশ্যে বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। তাদের নিকট সৃষ্টিকর্তার পরিচয় ও মানবসৃষ্টির কারণ প্রসঙ্গে জ্ঞান থাকা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

উদ্ধৃত প্রশ্নের জবাব

"সৃষ্টিকর্তা কেন মানব সৃষ্টি করলেন?" এ প্রশ্নের জবাব খোঁজ করার পূর্বে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটি করা হয়েছে তা নির্ধারণ করা আবশ্যক। স্রষ্টার দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ "কোন কারণে স্রষ্টা মানব সৃষ্টি করেছেন?" অন্যদিকে মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝায় "মানব সৃষ্টির পিছনে স্রষ্টার উদ্দেশ্য কি?" উভয় দৃষ্টিকোণই "উপরিউক্ত কৌতুহলোদ্দীপক জিজ্ঞাসার বিভিন্ন কাঠামো তুলে ধরে। পরবর্তী আলোচনায় কুরআনের আলোকে উল্লেখিত প্রশ্নের উভয় দিকের ওপর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হবে। আলোচ্য বিষয়ের সমাধান মানুষের নিজস্ব অনুমানের ওপর নির্ভরশীল নয়। কারণ মানব-অনুমানপ্রসূত মতামত এ বিষয়ের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ সত্যোদঘাটনে একেবারেই অপারগ।

মানুষ যেখানে তার নিজের মন-মস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্ম প্রসঙ্গে পূর্ণ অবহিত নয়, সেখানে কেমন করে শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তার অস্তিত্বের বাস্তবতা প্রসঙ্গে নির্ভরযোগ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব? যুগে যুগে বহু দার্শনিক এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর অনুসন্ধানে অনুমানের আশ্রয় নিয়ে অগণিত সিদ্ধান্তে পৌছেছেন, যার কোনটির দলিলই প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। কেউ কেউ একথা পর্যন্ত বলেছেন যে, বাস্তবে আমাদের কোন অস্তিত্বই নেই বরং গোটা বিশ্বই একটি কল্পনামূলক বিভ্রম। যেমন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (৪২৮-৩৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) যুক্তি দেখান যে, মানবেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিক জগত ও এর পরিবর্তনশীল বস্তুসমূহের কোনটিই মূলতঃ বাস্তবে অস্তিত্বশীল নয়, আপাত প্রতীয়মান ছায়ামাত্র।

অনেকে দাবি করেছেন এবং করে চলেছেন যে, মানবজাতির সৃষ্টির মূলে মূলত: কোন উদ্দেশ্যই নেই। তাদের মতে দুনিয়ায় মানুষের অস্তিত্ব লাভ

একটি দৈবাৎ ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। নিষ্প্রাণ জড়বস্তু থেকে ঘটনাচক্রে প্রাণের উৎপত্তি অর্জনের কারণে উদ্ভূত যে জীবন তার পিছনে কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। মানবজাতির কথিত পূর্বপুরুষ বানর-প্রজাতির। এ বিষয়ে কোন কৌতুহল নেই, তাহলে মানুষেরই বা তা নিয়ে এত চিন্তা চেতনার দরকার কি?

মানব অস্তিত্বের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে ধারণা লাভ করা আবশ্যক, যদিও অধিকাংশ মানুষ তা নিয়ে সাময়িক চিন্তাভাবনার পর হাল ছেড়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে সঠিক জ্ঞানের অভাব মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর সমপর্যায়ভুক্ত করে ফেলে। প্রাণী জগতের খাবার-পানীয় ও বংশ রক্ষার অভাব পূরণের সহজাত প্রবণতা মানুষের ক্ষেত্রেও জীবনের আসল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মানব জীবনের যাবতীয় কর্ম-প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এ আবর্তনে। জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যখন হয় শুধুমাত্র বস্তুগত সন্তুষ্টি অর্জন, মানবোস্তিত্ব তখন হীনতম জীবের চেয়েও মর্যাদাহীন হয়ে পড়ে।

মানুষ তার জীবন ও অস্তিত্বের বাস্তব উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে অনবহিত থাকার ফলে ক্রমাগত স্রষ্টা প্রদত্ত মূল্যবান বোধশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার করে চলে। মানুষের মন তার দক্ষতা ও সামর্থ্যকে মাদকদ্রব্য ও জীবননাশক বোমা উদ্ভাবন, ব্যভিচার বিস্তার, অশ্লীল চিত্র রচনা, সমকামিতা, ভবিষ্যৎ গণনা, আত্মহত্যা ইত্যাদি হীন ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত করে। অস্তিত্বের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে অজ্ঞতার কারণে মানুষ জীবনের অর্থবহতা হারিয়ে নিস্ফল ও বিধ্বস্ত হয় এবং মৃত্যু পরবর্তী শেষ জীবনের যাবতীয় প্রাপ্তি থেকেও হয় বঞ্চিত। কাজেই, "আমরা কি উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় অস্তিত্ব লাভ করেছি" এ প্রশ্নের সঠিক জবাব জানার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা আবশ্যক।

অধিকাংশ সময় মানুষ আলোচ্য প্রশ্নের জবাব খুঁজতে তারই মতো অন্য একজনের শরণাপন্ন হয়। একমাত্র স্রষ্টার নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থসমূহেই এ প্রশ্নের যথার্থ জবাব মেলা সম্ভব। মানুষের পক্ষে নিজ প্রচেষ্টায় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা অসম্ভব বলে সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং মানবজাতিকে অস্তিত্বের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে অবহিত করেছেন তাঁর মনোনীত ও প্রেরিত পুরুষদের মাধ্যমে। অতীতের আম্বিয়ায়ে কেরাম (রা) তাঁদের অনুসারীদের জানিয়েছেন, "সৃষ্টিকর্তা কি উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।"

ইহুদী-খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থ

বাইবেল গ্রন্থের গবেষণা সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিকে সমাধানহীন গোলকধাঁধায় ফেলে দেয়। পুরাতন বাইবেলে (The old Testament) মানবসৃষ্টি প্রসঙ্গে জরুরি প্রশ্নের জবাবের চেয়ে ধর্মীয় বিধি-বিধান, পূর্ববর্তী ইহুদী ও অন্যান্য ব্যক্তি-চরিত্রের ইতিহাস বর্ণনাই অধিক স্থান পেয়েছে। জেনেসিস অধ্যায়ে দেখা যায় সৃষ্টিকর্তা পৃথিবী এবং আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে ছয় দিনে সৃষ্টি করলেন, অতঃপর সপ্তম দিনে তিনি 'বিশ্রাম' নিলেন।

আদম ও হাওয়া সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হলেন। তাদের পুত্র কাবীল (Cain) আপন ভাই হাবিলকে (Abel) হত্যা করে নড (Nod) ভূমিতে বসবাসের উদ্দেশ্যে গমন করল। আরো পাওয়া যায়, স্রষ্টা মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন বলে 'অনুতপ্ত' হলেন। কেন সেখানে সুস্পষ্ট ও নির্ভুল জবাব অনুপস্থিত? ভাষাই বা এত প্রতীকধর্মী কেন যে পাঠককে অর্থোদ্ধারের জন্য অনুমানের আশ্রয় নিতে বাধ্য করে? উদাহরণস্বরূপ, জেনেসিস ৬ : ৬ এ বলা হয়েছে,

"When the men began to multiply on the face of ground, and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of men were fair, and they took to wife such of them as theyy chose".

অর্থাৎ, "ভূ-পৃষ্ঠে যখন মানুষের সংখ্যা বাড়ল এবং তাদের কন্যারা জন্ম নিল, ঈশ্বরের পুত্রগণ এ কন্যাদের সুশ্রী দেখে তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে লাগল নিজ অভিরুচি অনুযায়ী।"

এখানে 'ঈশ্বরের পুত্রগণ' কারা? ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে উদ্ভূত প্রত্যেক উপদলের (sects) এ বিষয়ে যার যার নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে। কোন ব্যাখ্যাটি সঠিকতম? প্রকৃত সত্য হলো, পূর্ববর্তী নবীগণ মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে অভিহিত করে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের অনুসারীর দাবিদারদের মধ্যে কেউ কেউ শয়তানের প্ররোচণায় পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো বিকৃত করেছে। ফলে এগুলোর জবাব অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে এবং উপমা ও প্রতীকের আড়ালে দৈবজ্ঞানের বেশির ভাগই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। সৃষ্টিকর্তা ঈসা মসীহ (আ)-কে ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করলে তিনি উপাসনালয়ের অভ্যন্তরে

ব্যবসারত বণিকদের টেবিল উল্টে ফেলেন। তাওরাতের বিধি-বিধানের শাস্ত্রীয় যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইহুদী পণ্ডিতগণ চর্চা করছিলেন তিনি তার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন।

মূসা (আ)-এর অনুসৃত মৌলিক হুকুম আহকামের সত্যতা প্রতিপাদন করে তিনি তা পুনরুজ্জীবিত করেন এবং পৃথিবীর বুকে তাঁর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভক্তদের শিক্ষা দিয়ে যান– জীবনের উদ্দেশ্যও তা পূরণ করার ব্যবহারিক পথ। কিন্তু পৃথিবী থেকে তাঁকে তুলে নেবার পর কিছু সংখ্যক লোক নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী দাবি করে সে শিক্ষাকে বিকৃত করে ফেলেছে। ফলে পূর্বের নবীদের মতো ঈসা (রা) আনীত জাজ্বল্যমান সত্য অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে উপমা ও প্রতীকের ব্যবহার, এক্ষেত্রে জনের লেখা গসপেল উল্লেখযোগ্য।

এভাবে ঈসা (আ)-এর ওপর নাযিলকৃত মূল ইনজিল কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। হারানো গ্রন্থ ইনজিলকে পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় ৪র্থ শতাব্দীর বিশপ এথানাসিয়াস মানব রচিত চারটি গসপেল নির্বাচন করেন। এছাড়াও পল রচিত ২৩টি গ্রন্থ ও আরো অন্যান্য রচনা নতুন বাইবেলের (The New Testament) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ কারণে নতুন বাইবেলের পাঠকদের পক্ষে "স্রষ্টা কেন মানুষ সৃষ্টি করলেন"– এ প্রশ্নের যথাযথ জবাব পাওয়া সম্ভব হয় না। সমস্যা সমাধানকল্পে প্রত্যেকে নিজ নিজ উপদল বা সম্প্রদায় প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও মতবাদ অন্ধভাবে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। সুসমাচারগুলো (Gospel) নিয়েও প্রত্যেক দলের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও অভিমত রয়েছে। সত্যানুসন্ধানী মন পরিশেষে অনিশ্চয়তায় ঘুরপাক খেতে থাকে– কোন অভিমতটি সঠিক?

সৃষ্টিকর্তার কথিত দেহধারী আবির্ভাব

খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিমত পোষণ করলেও একটি বিষয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ। তা হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তা নিজে মানবাকৃতি ধারণ করেছিলেন যাতে তিনি মৃত্যুবরণ করে মানবজাতিকে সে পাপ থেকে পবিত্র করতে পারেন, যে পাপ তারা আদম (আ) ও তাঁর বংশধর থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তাদের যুক্তি অনুযায়ী মানুষের জমাকৃত অপরাধ এত বিপুলাকার ধারণ করেছে যে, কোন ধরনের প্রায়শ্চিত্ত কিংবা অনুশোচনা

তা নিশ্চিহ্ন করতে অক্ষম। সৃষ্টিকর্তা এত মহান যে পাপী মানুষের পক্ষে তাঁর সামনে আসা অসম্ভব। শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার আত্মত্যাগই পারে মানবজাতিকে পাপের বোঝা থেকে মুক্তি দিতে।

গীর্জাগুলোতে, মানবোদ্ভাবিত এ অবিশ্বাস্য মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করাকেই মানুষের জন্য মুক্তির একমাত্র উপায় বলে প্রচার করা হয়ে থাকে। অতএব খ্রিস্ট-ধর্মমতে জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে– স্রষ্টার আত্মত্যাগ ও ঈসা (আ)-কে উপাস্য প্রভু বলে স্বীকৃতি দান করা। বাইবেলে জন বর্ণিত সুসমাচারে ঈসা (আ)-এর বর্ণিত উদ্ধৃতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে,

"For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life"..

অর্থাৎ, "ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে তাঁর একমাত্র সন্তানকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই সন্তানের ওপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়"।

যদি এটাই হয় মানবজীবনের আসল উদ্দেশ্য ও অনন্ত জীবন হাসিলের পূর্বশর্ত। তবে পূর্বে আদম (আ) ও তাঁর বংশধরদের যুগে স্রষ্টা কেন মানবাকৃতি ধারণ করলেন না, যাতে সকল মানুষ তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হাসিলে সমান সুবিধা এবং আখিরাতের অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে? নাকি, ঈসা (আ)-এর পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ছিল আলাদা? এ যুগের মানুষ ঈসা (আ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেনি বলে তারাও জীবনের উদ্দেশ্য পূরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। দেখা যাচ্ছে, সমগ্র মানবজাতির স্বাভাবিক উদ্দেশ্য পূরণে এ ধরনের মতবাদ নিতান্তই অপর্যাপ্ত।

সমস্ত কিছুই স্রষ্টা

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোয় একাধিক উপাস্য, ভূ-পৃষ্ঠে স্রষ্টার অনেক অবতার এবং পরিশেষে সমস্ত কিছুই উপাস্য: ব্রাহ্মণ এ মতবাদ বিবৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রাণীর আত্মাই মূলতঃ পরমাত্রা : ব্রাহ্মণের অংশ - এরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতি সত্ত্বেও হিন্দুধর্মে বর্ণ-বৈষম্য প্রথার উদ্ভব ঘটেছে। এতে ব্রাহ্মণ শ্রেণী জন্মসূত্রে আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব অর্জন করে। শুধুমাত্র তারাই বেদের শিক্ষক হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় এবং শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতা ও যাবতীয় সামাজিক মর্যাদার

প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। অপরদিকে ধর্মীয় মর্যাদা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত শুদ্র বর্ণ, বাকি তিন শ্রেণী ও তাদের হাজারো উপশ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত থাকাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে ধারণা করে।

হিন্দু অদ্বৈতবাদী (Monist) দার্শনিকদের মতবাদ অনুযায়ী– মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজ দেবত্ব উপলব্ধি করা এবং মানবাত্মা ও পরমাত্মা: ব্রাহ্মণের মিলনে পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি অর্জন করা 'ভক্তি-পথ' অনুসারীদের নিকট স্রষ্টাকে ভালবাসার মাঝেই জীবনের উদ্দেশ্য নিহিত। কারণ মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্রষ্টার সাথে 'পিতা-পুত্রের' (শ্রীমৎ ভগবৎ) ন্যায় সম্পর্ক উপভোগ করার জন্য। অন্যদিকে একজন সাধারণ হিন্দুর নিকট দুনিয়াবী জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজ বর্ণের যাবতীয় পুরুষানুক্রমিক আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক, শাস্ত্রীয় দায়-দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে 'কর্ম-পথ' অনুসরণ করে চলা।

বৈদিক ধর্মের বেশির ভাগ আচার-অনুষ্ঠান অগ্নি কেন্দ্রিক হলেও অন্যান্য হিন্দু রচনাবলিতে ভিন্ন ধারার মতবাদও চর্চা করতে দেখা যায়। তা সত্ত্বেও সকল হিন্দু উপদলগুলোর ওপর বেদ এর আধিপত্য একচ্ছত্র ও অলঙ্ঘণীয়। বেদ মূলতঃ চারটি সংকলনের সমন্বয়ে রচিত। এদের মধ্যে 'রিগ্বেদ' প্রাচীণতম। এ সমস্ত রচনায় উপাস্যের ধারণা বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর ভাষায়। রিগ্বেদে আলোচিত ধর্ম-দর্শনে প্রতিফলিত হয় বহু-ঈশ্বরবাদ (Polytheism) এবং আকাশ ও পারিপার্শ্বিক জগত বিষয়ক বেদ-দেবীর প্রতি ভক্তি নিবেদন। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন-ইন্দ্র (আকাশ ও বৃষ্টির দেবতা), বরুণ (মহাজাগতিক কর্ম-নিয়ন্ত্রক), অগ্নি (বলি বিষয়ক আগুন) ও সূর্য।

পরবর্তীকালের বৈদিক রচনায় পূর্বের রিগ্বেদিক দেব-দেবীর প্রতি আগ্রহ স্তিমিত হতে দেখা যায় এবং বহু-ঈশ্বরবাদ প্রতিস্থাপিত হয় 'প্রজাপতি' (সৃষ্টজগতের প্রভু) নামক সর্বেশ্বর দ্বারা, যিনি একযোগে সবকিছু। 'উপনিষদে' (মহাজাগতিক গুপ্ত রহস্য) প্রজাপতি স্বতন্ত্রতা হারিয়ে পরম বাস্তবতা ও নিখিল বিশ্বের মূল সত্ত্বা ব্রাহ্মণের সাথে বিলীন হয়ে যায় এবং এভাবে পৌরাণিক শাস্ত্র এক পর্যায়ে বিমূর্ত দর্শনে রূপ নেয়। এ ধর্মগ্রন্থসমূহের সারবস্তু থেকে পাঠক পরিশেষে যে সিদ্ধান্তে পৌছান তা হলো, সৃষ্টিকর্তা মানব জাতির নিকট নিজের পরিচয় এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রকাশ না করে গুপ্ত রেখেছেন।

মূলত: সৃষ্টিকর্তা মানুষের জন্য কোন কাঠিন্য কিংবা বিভ্রান্তি চান না। তিনি মানবজাতির জন্য চৌদ্দশ বছর পূর্বে নাযিলকৃত কুরআনে কারীমের মাধ্যমে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, একে তিনি ভবিষ্যতের সকল মানুষের জন্য অবিকৃত ও সংরক্ষিত রাখবেন। স্রষ্টা সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ কুরআনে মানুষ সৃষ্টির পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য সন্দেহাতীত ও বোধগম্যরূপে বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি যাবতীয় সূক্ষ্ম বিষয় সর্বশেষ রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এ ঐশীবাণী ও রাসূল ﷺ-এর ব্যাখ্যার আলোকে "স্রষ্টা কি উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন" এ প্রশ্নের জবাব বিশদভাবে বর্ণনা করা হবে।

স্রষ্টা কেন সৃষ্টি করলেন?

সৃষ্টিকর্তার প্রেক্ষিতে আরো একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করা যাক— "স্রষ্টা কেন নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করলেন"? এরকম প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, যেহেতু নিখিল বিশ্বে মানুষই কেবল কেবল সৃষ্টিকর্তার সর্বোত্তম সৃষ্টি নয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরাহ্ গাফির'এ আল্লাহ্ বলেন—

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থাৎ, মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও যমীনের সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না। (সূরা মু'মিন : আয়াত-৫৭)

যে সুবিস্তৃত মহাবিশ্বে মানুষের অবস্থান তার নিখুঁত নির্মাণকৌশল, মানবদেহের গঠন কৌশলের তুলনায় বহুগুণ অধিক জটিল। ভূ-পৃষ্ঠের বুকে বিচরণরত অন্যসব প্রাণীর তুলনায় মানুষের বাহ্যত-প্রতীয়মান শ্রেষ্ঠত্বের কারণে কম সংখ্যক লোকই এ বাস্তবতা বুঝে থাকে। মহাশূন্য পরিভ্রমণ, প্রগতির উৎকর্ষতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ ঔদ্ধত্যবশত: নিজেকে দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠতম বলে ভাবতে শুরু করেছে।

একটি বিষয় লক্ষণীয়, মানুষের বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই মানব বিষয়ক নয়; বরং তার পারিপার্শ্বিক জগতকে নিয়ে। অর্থাৎ, মানুষের নিয়োজিত কর্ম-প্রচেষ্টা মানবজীবনের চেয়ে পার্থিব বস্তুজগতকে কেন্দ্র করে

অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে সৃষ্টিকর্তা নিখিল বিশ্বে মানুষের সত্যিকার অবস্থান প্রসঙ্গে জানিয়েছেন। মানুষ, স্রষ্টার সীমাহীন শক্তিময়তার একটি অতি ক্ষুদ্র নিদর্শন। এ কারণে "স্রষ্টা কেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন" জানার পূর্বে "স্রষ্টা কেন নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন" এর জবাব খুঁজে বের করা আবশ্যক।

সৃষ্টিকর্তা

নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি প্রবল প্রতাপশালী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 'স্রষ্টা' নামের পরিণতি। যদি কোন কিছুই সৃষ্টি করা না হয় তবে তা 'সৃষ্টিকর্তা' নামের সাথে বিরোধিতা করে। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট জগতের মুখাপেক্ষী। তিনি যাবতীয় চাহিদা ও প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বরং প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। একজন সুদক্ষ লেখকের প্রতিভা যেমন প্রতীয়মান হয়ে ওঠে তার লেখনীতে, মহান স্রষ্টার সুনিপূণ ও ক্রটিহীন সৃষ্টিগুণের বহিঃপ্রকাশও তেমনি তাঁর সৃষ্টজগত। মূলত: 'সৃষ্টি' হচ্ছে এমন একটি ক্ষমতা যা একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের কর্মের সাথে 'সৃষ্টি' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে বটে; কিন্তু একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা যায় যে, মানুষ বাস্তবে কোনকিছুই সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। সৃষ্টিকর্তা যা ইতোপূর্বে সৃষ্টি করে রেখেছেন, মানুষ তা ব্যবহার করে কেবল বিভিন্ন রূপ ও কাঠামো তৈরি করতে পারে। গাছ থেকে কাঠ সংগ্রহ করে টেবিল তৈরি করা হয়। এ কাজে পেরেক, স্ক্রু ইত্যাদি আবশ্যক। যা তৈরি হয় খনিজ থেকে সংগৃহীত ধাতু দ্বারা। মানুষ গাছ কিংবা পাথর কোনটারই স্রষ্টা নয়। মূলত: মানুষের সমস্ত সৃষ্টির পিছনেই আছে কোন না কোন মৌলিক উপাদান যা মানুষ নিজে সৃষ্টি করেনি। এমনকি একজন শিল্পীর শিল্প-গুণের উন্মেষ ঘটে চারপাশের দৃশ্যমান জগতকে নির্ভর করেই।

তার পক্ষে এমন কিছু আঁকা অসম্ভব যা সে কখনও ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করেনি। অর্থাৎ সমস্ত শিল্পীর সৃজনশীল কল্পনা বাস্তবে দৃশ্যমান সৃষ্টজগতের প্রতিফলন। একমাত্র আল্লাহই উপকরণহীন শূন্য থেকে সৃষ্টি করেন। কারো কারো নিকট এ সত্য একটি বোধাতীত বিষয়। অতীত ও বর্তমানের কিছু দার্শনিক যারা আল্লাহর শূন্য থেকে সৃষ্টির বিষয়টি বুঝতে অপারগ তারা

বলেন যে, সৃষ্টজগত ও এর মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টি মূলত: সৃষ্টিকর্তার অংশ। তাদের মতে, আল্লাহ্ নিজ অংশ থেকে নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। এ জাতীয় বক্তব্য দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে সেই মানুষের সাথে তুলনা করা হয় যে সৃষ্ট উপকরণ ছাড়া কোন কিছু উদ্ভাবন করতে অক্ষম। বাস্তবতা হলো, আল্লাহ নিজেই নিষেধ করেছেন সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সাদৃশ্য স্থাপনে বা উপমা রচনায়। সূরাহ আশ-শুরা'য় তিনি ঘোষণা করেন–

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

অর্থাৎ, কোনকিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

(সূরা আশ-শুরা : আয়াত-১১)

নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির ঘটনা সৃষ্টিকর্তার অনুপম ঐশী ক্ষমতার ফলাফল। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের কতিপয় আয়াতে আল্লাহ্ নিজেকে 'আল-খালিক' বা 'সৃষ্টিকর্তা' নামে নামকরণ করেছেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে সৃষ্টজগতের সমস্ত কিছুর ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর কর্মবিধায়ক।

(সূরা যুমার : আয়াত-৬২)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও। (সূরা সাফ্ফাত : আয়াত-৯৬)

মানুষের জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া এ নিখিল বিশ্বে কোন ঘটনাই সংঘটিত হয় না। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট কল্যাণ কামনা ও অকল্যাণ থেকে মুক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা জানানো চরম ভ্রান্তি। দুর্ভাগ্য এড়াতে ও সৌভাগ্য অর্জনের নিমিত্তে অনেক লোক অজ্ঞতাবশত: বিচিত্র রকম তাবিজ-তুমার, রাশিচক্র, জ্যোতিষী ইত্যাদির শরণাপন্ন হয়। অথচ আল্লাহ্ তাঁর সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ কুরআনে কারীমে মানুষকে আহ্বান করেছেন শুধুমাত্র তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ -

অর্থাৎ, বল : আমি আশ্রয়, প্রার্থনা করছি উষার স্রষ্টার। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। (সূরা ফালাক : আয়াত-১-২)

সর্বশক্তিমান পালনকর্তা আল্লাহ কোন অশুভ শক্তি নন, তিনি কল্যাণময়। তিনি এমন জগত সৃষ্টি করেছেন যেখানে সৃষ্টিকে ভাল অথবা মন্দ সাধনের স্বাধীনতা ও সক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তবে কোন ভাল কিংবা মন্দ সর্বপরিজ্ঞাতা আল্লাহর জ্ঞানের আড়ালে কিংবা তাঁর অনুমতি ছাড়া ঘটে না। এ কারণেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট সাহায্য ও আশ্রয় চাওয়া নিস্ফল প্রচেষ্টা মাত্র।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না।

(সূরা তাগাবুন : আয়াত-১১)

আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ ﷺ ব্যাখ্যা– বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এভাবে: "জেনে রেখ, সকল মানুষও যদি একত্রিত হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবে তারা তা করতে পারবে না এতটুকু ছাড়া, যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে লিখে রেখেছেন। অনুরূপভাবে সকল মানুষও যদি তোমার একবিন্দু ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, তবে তারা কিছুই করতে পারবে না কেবল ততটুকু ছাড়া, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন"।

পরম করুণাময়, ক্ষমাশীল আল্লাহ

নিখিল বিশ্বে মানবসৃষ্টির ঘটনায় আল্লাহর ক্ষমা, কৃপা ও করুণার গুণাবলি পরিপূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে। সৃষ্টিগতভাবে কল্যাণময় ও পাপ পঙ্কিলতামুক্ত মানুষকে ভাল-মন্দের সহজাত বোধ দেয়া হয়েছে। সর্বশক্তিমান পালনকর্তা মানুষকে মানবিক প্রবৃত্তিসহ সৃষ্টি করেছেন, পাশাপাশি দান করেছেন ঐশী বিধি-বিধান অনুসারে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার কিংবা লাগামহীন প্রবৃত্তির অন্ধ অনুসরণ করবার স্বাধীনতা। সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ অবশ্যই জানতেন যে, মানুষ কোন কোন সময় তাঁর অবাধ্য হবে। এ কারণে, আদম (আ)-এর

থেকে আল্লাহ মানুষকে অনুশোচনা ও তওবার মাধ্যমে অপরাধমুক্ত হবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর ঘটনাবলি গোটা মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়, উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁরা উভয়ে আল্লাহর আদেশ ভুলে গিয়েছিলেন, শয়তান তাদের প্রবৃত্তিকে প্ররোচিত করেছিল। আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘনের পর তারা অনুতপ্ত হয়ে তাদের রবের নিকট অপরাধ স্বীকার করেন, পরিণামে তিনি তাদের ভুল ক্ষমা করে দেন। অবাধ্যতার পর মানবজাতি যখন আল্লাহর নিকট অনুশোচনার মাধ্যমে ফিরে আসে তখন আল্লাহর ক্ষমাশীলতা ও সীমাহীন করুণার গুণাবলি প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে সর্বশেষ নবী ﷺ তাঁর সঙ্গীদের জানিয়ে দেন এই বলে: "যদি তোমরা গুনাহ্ না করতে ও আল্লাহর নিকট ক্ষমার আশায় ফিরে না আসতে, তবে তিনি তোমাদের স্থলে অন্য জাতি আনয়ন করতেন যারা গুনাহ্ করত ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করত এবং তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন"।

আল কুরআনের ১১৪ টি সূরাহ্'র মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলোর শুরুতে রয়েছে এ প্রার্থনা, "দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে"। আল্লাহর সীমাহীন করুণা ও অনুগ্রহের গুণাবলি বার বার উল্লেখিত হয়েছে যাতে মানুষ নিরাশ না হয়ে পড়ে। কেউ যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ফিরে আসতে ও সংশোধিত হতে চায়, তবে তার গুনাহ্র ভার যত বেশিই হোক না কেন আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা মাখলুককে সৃষ্টি করার পর লাওহে মাহফুযে লিখে দেন— আমার রহমত (করুণা) আমার ক্রোধের ওপর জয়লাভ করবে"।

তিনি আরো বলেছেন : "মহান আল্লাহর একশতটি রহমত আছে, তন্মধ্যে মাত্র একটি রহমত জ্বীন, মানুষ, জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গের মাঝে দিয়েছেন। এ কারণেই তারা পরস্পরের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ও প্রেম-প্রীতি প্রদর্শন করে এবং বন্যজন্তু তার সন্তানকে স্নেহ করে। আল্লাহ বাক্য নিরানব্বইটি রহমত জমা করে রেখেছেন, এগুলো দ্বারা তিনি শেষ বিচার দিবসে তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন"।

আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে সেই সব ফেরেশতাদের মত করে সৃষ্টি করতে পারতেন, যারা যে কোন অবাধ্যতা ও অপরাধমূলক কাজে জড়াতে অপারগ।

কিন্তু এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল না, যেহেতু তিনি ইতিপূর্বেই ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে ভুল করবার স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ভুল উপলব্ধি করে তারা যখন আল্লাহর নিকট ক্ষমা লাভের প্রত্যাশায় ফিরে আসে, সে মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তার করুণা ও ক্ষমার গুণাবলি প্রকাশ পায়।

চূড়ান্ত ন্যায়বিচার

দুনিয়াবী জীবনের পরিসমাপ্তির পর মানবজাতির কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে এবং এ বিষয়টি স্রষ্টার সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতি সৃষ্টির পর দুনিয়ায় না পাঠিয়ে সরাসরি তাদের কাউকে জান্নাত ও অবশিষ্টদের জাহান্নামে প্রেরণ করতে পারতেন। কেননা, সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ জানেন দুনিয়ায় প্রত্যেকে কোন্ পন্থা অবলম্বন করবে, তাদের জন্য কি কি জীবনোপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা দান করা হবে এবং তারা বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাসের কোন্ অবস্থার ওপর মারা যাবে। এক অর্থে বলা যায়, কিছু সংখ্যক লোক সৃষ্ট হয়েছে জান্নাতের জন্য আর কিছু জাহান্নামের জন্য। আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন : "তোমরা কি জানো না, আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন উভয়ের অধিবাসীদেরও"?

যাদের জন্য জান্নাত অবধারিত, আল্লাহ যদি তাদের জান্নাতে দেরীতে প্রেরণ করতেন তবে তারা তাঁর এ সিদ্ধান্তে কোন অভিযোগ পেশ করত না। জান্নাতীরা সুখ-সম্ভোগের অনন্ত জীবনকে আনন্দচিত্তে গ্রহণ করত এবং তাদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার জন্য কৃতজ্ঞ থাকত। কিন্তু, সরাসরি জাহান্নামে প্রেরিতরা দাবি জানাত— কেন তাদের সেখানে নিক্ষেপ করা হল? দুনিয়ায় তাদের ক্রিয়াকর্ম প্রসঙ্গে অজ্ঞতার কারণে তারা একে অন্যায্য সিদ্ধান্ত বলে মনে করত। জাহান্নামীরা ক্রমাগত বিতর্ক করত, দুনিয়ায় তাদের বসবাসের সুযোগ দেয়া হলে তারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে। এ সমস্ত কারণে, আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার বুকে নির্দিষ্টকাল জীবনোপভোগ করবার ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দিয়েছেন। ফলে যাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়েছে তারা বুঝতে পারবে এ তাদের কৃতকর্মের পরিণতি। তারা ইহকালে তাদের ওপর আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ

অনুধাবন করবে এবং পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত নিদর্শন ও প্রদর্শিত পথ প্রত্যাখ্যান করার গুরুতর অপরাধ স্বীকার করবে। বিনা অভিযোগে তারা আল্লাহ্‌র বিচারকে ন্যায়সঙ্গত ও ত্রুটিহীন হিসেবে মেনে নেবে। তবুও তারা সেদিন দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে এসে নেক আমল করার সুযোগ প্রার্থনায় ক্ষান্ত হবে না। যেমন সূরা আস-সাজদাহ্'য় আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন—

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ـ

অর্থাৎ, এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশিরে বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শুনলাম, এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় পাঠান আমরা নেক আমল করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা আস-সাজদাহ্ : আয়াত-১২)

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আল্লাহ তাদের দুনিয়ায় পুনরায় প্রেরণ করলেও তারা জাহান্নামে যা প্রত্যক্ষ করছে তা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আবারো অবাধ্যতার পথ বেছে নিত এবং পরিশেষে জাহান্নামেই পরিণতি লাভ করত। সূরা আল-আন'আমে আল্লাহ এ বাস্তবতা ঘোষণা করেছেন,

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ـ

অর্থাৎ, আর একান্তই যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যেতে দেয়া হয়, তবু যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা-ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আল-আন'আম : আয়াত-২৮)

আল্লাহর ভালবাসা

বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী উভয়ই সাময়িক সময়ের জন্য হলেও দুনিয়ায় জীবনোপভোগ করার সুযোগ পায় যা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর প্রীতি ও ভালবাসার নিদর্শন। ভালকে মন্দের ওপর প্রাধান্য দানকারীদের জন্য পুরস্কার হিসেবে মনোরম জান্নাত সৃষ্টির মধ্যেও সৃষ্টিকর্তার এ গুণ উপলব্ধি করা যায়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর ভালবাসা তাদের

জন্য নির্ধারিত যারা সৎকর্মশীল (সূরা মায়িদা : আয়াত-১৩), ন্যায়বিচারক (সূরা মায়িদা : আয়াত-৪২), আল্লাহ-ভীতিসম্পন্ন (সূরা তওবা : আয়াত-৪), ধৈর্যও ধারণকারী (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১৪৬)

শুধুমাত্র তাঁরই ওপর ভরসাকারী (আলে-ইমরান : আয়াত-১৫৯) এবং অধিক তওবাকারী ও নিজেদের সংশোধনকারী (সূরা বাকারা : আয়াত-২২২)। আল্লাহ ধর্মগ্রন্থ ও প্রেরিত নবীদের মাধ্যমে মানুষকে অবগত করিয়েছেন কোন্‌টি নেক আমল, কোন্‌টি ন্যায় আর কোন্‌টি তাকওয়া (আল্লাহ্‌-ভীতি)'র পথ। কাজেই, যে সমস্ত লোক এসব ক্ষেত্রে প্রেরিত রাসূলদের অনুসরণ করে চলে তারাই তাদের পালনকর্তার নিকট অধিক প্রিয়। সূরা আলে-ইমরানে নবী করীম ﷺ বিশ্বাসীদের নিকট ঘোষণা দিতে আদিষ্ট হয়েছেন–

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ـ

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন।

(সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-৩১)

শুধুমাত্র আবশ্যকীয় ইবাদত ও নেককাজেই নয়, বরং ঐচ্ছিক ইবাদতের ক্ষেত্রেও নবী-রাসূলগণ অবশ্য অনুসরণীয়।

যোগ্য-অযোগ্য উভয়ের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর করুণা দানেও তাঁর ভালবাসা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এ ভালবাসা বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত হয় তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দেবার আগ্রহের মাঝে। সর্বপ্রথম মানব-মানবী আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর তওবা কবুলের মাধ্যমে অপরাধ ক্ষমা করে দুনিয়ার আগমনকারী ভবিষ্যতের সকল মানুষের জন্য এক দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। পাপ যত বড়ই হোক না কেন, পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের জন্য তওবার দরজা খোলা থাকবে।

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "আল্লাহ তা'আলা বলেন— 'হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট আশা করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি

তোমাকে ক্ষমা করতে থাকব যা কিছু গুনাহ্ তোমার দ্বারা সংঘটিত হবে। আর আমি তোমার পাপরাশিকে মোটেই গ্রাহ্য করব না। তুমি যদি আমার নিকট জগতপূর্ণ পাপরাশি নিয়ে আস তবে আমি তোমাকে জগতপূর্ণ ক্ষমা প্রদান করব, যদি তুমি আমার সাথে কাউকেও অংশীদার না করে থাক। যদি তোমার পাপরাশি আকাশচুম্বিও হয় এবং তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে আমি তোমাকে সমপরিমাণ ক্ষমা দান করব।'

আল্লাহর অনুগ্রহ

শুধুমাত্র নেক আমল কোন ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশাধিকার অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ তাকে এ চিরস্থায়ী আবাসে প্রবেশ করাবে। নবী করীম ﷺ বলেছেন : "সাধ্যানুযায়ী নেক আমল কর ও সন্তুষ্ট থাক, কারণ শুধুমাত্র নেক আমল কাউকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না"। তাঁর সঙ্গীরা জানতে চাইলেন : "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনাকেও নয়"? তিনি জবাব দিলেন : "আমাকেও নয়, যদি না আল্লাহর রহমত ও করুণা আমার ওপর বর্ষিত হয়। এবং জেনে রাখ, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল (কর্ম) হচ্ছে তাই যা নিয়মিত করা হয়ে থাকে, যদিও তা অতি ছোট হয়"। এখানে একটি বিষয় স্মরণযোগ্য, আল্লাহর অনুগ্রহ খাম-খেয়ালের ওপর ভিত্তি করে বর্ষিত হয় না; বরং তা ব্যক্তির বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও নেক আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সূরা আল-আন'আমে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন–

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى اِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, কেউ কোন ভাল কাজ করলে সে তার দশগুণ প্রতিফল পাবে, আর কেউ পাপ ও অন্যায় কাজ করলে তাকে শুধু ততটুকুই প্রতিফল দেয়া হবে যতটুকু সে করেছে, আর তারা অত্যাচারিত হবে না।

(সূরা আল-আন'আম : আয়াত-১৬০)

আল্লাহ যদি মানুষের আমলের হিসাব কঠোরভাবে নিতেন তাহলে কারো নেক আমল তার অসৎকর্মকে ওজনে অতিক্রম করতে পারত না। নেক আমলের প্রতিফল বহুগুণে বৃদ্ধি করে অথচ মন্দ আমলের জন্য সমান প্রতিফল নির্ধারণ

করে, আল্লাহ্ মানুষের প্রতি তাঁর সীমাহীন অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এভাবে বিশ্বাসীরা আল্লাহর অনুগ্রহের ফলে জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। তার অর্থ এ নয় যে, নেক আমল মূল্যহীন ও অনর্থক। নেক আমলের গুরুত্ব অপরিসীম, তবে এটাই একমাত্র মীমাংসাকারী বিষয় নয়। আল্লাহ্র করুণা মানুষের নেক আমলকে ছাড়িয়ে যায়।

অতএব বোঝা গেল— মানবজাতির সৃষ্টি, তাদের কৃত পাপ ও নেক আমলের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার করুণা, ক্ষমা ন্যায়পরায়ণতা ও অনুগ্রহের গুণাবলি প্রকাশিত হয়। স্রষ্টা তাঁর গুণাবলি এভাবে প্রকাশের সিদ্ধান্ত কেন নিলেন— মানুষের জন্য তা জানতে চাওয়া শোভনীয় নয়। আস্থা থাকতে হবে যে, এটাই সর্বোত্তম পন্থা। কারণ আল্লাহ্ নিজেকে বর্ণনা করেছেন প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞরূপে এবং তিনি যতটুকু প্রকাশ করেছেন মানুষের পক্ষে শুধু ততটুকুই জানা সম্ভব, এর বেশি নয়।

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۔

অর্থাৎ, তিনি যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেউ ধারণা করতে পারে না। (সূরা–২ বাকারা : আয়াত–২৫৫)

মানুষের উচিত নয় স্রষ্টার পর্যায়ে চিন্তা করা। আল্লাহ্ যদি মানবজাতিকে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে জানিয়ে দেন, তবে মানুষের জন্য প্রশ্ন করা অনুচিত কেন তিনি এ সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছা করলেন। এ জাতীয় জিজ্ঞাসা অন্তহীন এবং তা মানব-জ্ঞানের আয়ত্বাধীনও নয়। আল্লাহ্ নন, বরং মানুষ তার কর্ম ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হবে মহাবিচার দিবসে। সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ্ ঘোষণা করেন—

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۔

অর্থাৎ, তিনি যা করেন সে প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-২৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা কর, আল্লাহকে নিয়ে নয়"। আল্লাহর স্বরূপ নিয়ে গবেষণা করার অর্থ হচ্ছে এক সীমাহীন অনন্ত সত্তাকে

নিয়ে গবেষণা করা। মানব-মন যেখানে সসীম নিখিল বিশ্বের অসংখ্য ছায়াপথ ও নক্ষত্র নিয়ে ভাবতে বসে বিমূঢ় হয়, সেখানে অসীম সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ কল্পনা তাকে আরো পরাভূত করে। নবী করীম ﷺ সতর্ক করেছেন যে, শয়তানী প্ররোচণায় মানুষের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্রষ্টা প্রসঙ্গে নানারূপ প্রশ্ন জেগে উঠতে পারে।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করবে– এটা কে সৃষ্টি করল? ঐটা কে সৃষ্টি করল? যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রশ্ন করে— তোমার রবকে কে সৃষ্টি করল? যখনই এরূপ প্রশ্ন কারো মনে আসবে, তখনই তার আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা আবশ্যক (এ বলে: আমি আল্লাহ ও তাঁর নবীদের ওপর বিশ্বাস এনেছি) এবং (এরূপ চিন্তা) পরিহার করে চলা অপরিহার্য"।

সৃষ্টিকর্তা কেন মানুষ সৃজন করলেন?

মানবজাতির পরিপ্রেক্ষিতে "সৃষ্টিকর্তা কেন মানুষ সৃজন করলেন?" প্রশ্নটি ইঙ্গিত করে "মানুষকে কোন্ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে?" সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে নির্ভুল ও দ্ব্যর্থহীনভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতিটি মানুষ স্রষ্টা প্রসঙ্গে সহজাত বোধ নিয়ে দুনিয়ায় জন্ম নেয়। তিনি সূরা আল-আরাফে ঘোষণা করেন–

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ اَوْتَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ -

অর্থাৎ, (হে নবী সা!) যখন তোমার পালনকর্তা নবী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা সমস্বরে বলল

হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম; (এ স্বীকৃতি ও সাক্ষী বানানো এ জন্য যে,) যাতে তোমরা শেষ বিচার দিবসে বলতে না পার— আমরা এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম। অথবা তোমরা যেন শেষ বিচার দিবসে এ কথা বলতে না পার, আমাদের পূর্ব পুরুষরাই তো আমাদের পূর্বে শির্‌ক করেছিল, আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর, অতএব আপনি কি আমাদেরকে সেই ভ্রান্ত ও বাতিলদের কৃতকর্মের দরুণ ধ্বংস করবেন।

(সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৭২-১৭৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন যে, সর্বপ্রথম মানব আদম (আ)-কে সৃষ্টির পর দ্বাদশ মাসের নবম দিনে না'মান নামক স্থানে, আল্লাহ্ তাঁর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। এরপর নিখিল বিশ্বে জন্মগ্রহণকারী সমস্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের আদম (আ)-এর শরীর থেকে বের করে এনে তিনি সন্মুখে ছড়িয়ে দিলেন। অতঃপর তাদের কাছেও অঙ্গীকার নিলেন। তারা সবাই সাক্ষ্য দিল যে, আল্লাহ্ই তাদের একমাত্র রব। তাই প্রত্যেকটি মানবসন্তান আত্মায় জন্মগতভাবে লিপিবদ্ধ এ অঙ্গীকারের কারণে সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস স্থাপনে দায়বদ্ধ। জন্মগত এ বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন সূরা যারিয়াতে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ .

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে এজন্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। (সূরা যারিয়াত : আয়াত-৫১)

অর্থাৎ মানবজাতিকে যে প্রাথমিক মূল উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা হলো, স্রষ্টার ইবাদত। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপাসনার মুখাপেক্ষী নন, তিনি মানুষকে 'তাঁর' কোন অভাব পূরণে সৃষ্টি করেননি। মানুষ যদি আল্লাহ্র ইবাদত সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়, তবু তাঁর মহিমা ও মর্যাদা বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না। অপরদিকে, সমস্ত মানবজাতির ইবাদত তাঁর মর্যাদা বিন্দুমাত্র বাড়াতে সক্ষম নয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ত্রুটিহীন, নিখুঁত। একমাত্র তিনিই অস্তিত্বের জন্য কারো ওপর নির্ভরশীল নন, অথচ গোটা সৃষ্টজগত তাঁর ওপর নির্ভরশীল। অতএব মানুষের নিজের প্রয়োজনেই সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করা আবশ্যক।

‘ইবাদত’ বা উপাসনা বলতে কি বোঝায়?

স্রষ্টার ইবাদত করা কেন আবশ্যক তা বুঝতে হলে, ‘ইবাদত’ বা উপাসনা বলতে কি বোঝায় তা জানা আবশ্যক। ইংরেজি 'Worship' শব্দটির উৎপত্তি প্রাচীন 'Weorthscipe' শব্দ থেকে যার শাব্দিক অর্থ শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন। ইংরেজিতে Worship দ্বারা উপাস্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে ভক্তিমূলক প্রার্থনা ও আরাধনাকে বোঝানো হয়ে থাকে। এ অর্থের ভিত্তিতে, সৃষ্টিকর্তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা নাসর এ আল্লাহ ঘোষণা করেন—

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ.

অর্থাৎ, তখন তুমি তোমার পালনকর্তার কৃতজ্ঞতাবাচক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (সূরা নাস্‌র : আয়াত-৩)

স্রষ্টার পবিত্রতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষ গোটা সৃষ্টিজগতের সাথে ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত হয়। কারণ, নিখিল বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই সর্বক্ষণ স্রষ্টার মহিমা বর্ণনায় নিয়োজিত। মহিমান্বিত কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এ সত্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সুরা আল-ইস্‌রায় বলা হয়েছে—

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ.

অর্থাৎ, সপ্ত আকাশ, যমীন এবং ওদের অন্তর্বর্তী সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা বুঝতে পার না। (সূরা আল ইস্‌রা : আয়াত-৪৪)

যে আরবি ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে তাতে উপাসনাকে উল্লেখ করা হয়েছে ‘ইবাদত’ শব্দ দ্বারা। ইবাদত শব্দটি ‘আব্দ’ অর্থাৎ ‘দাস’ শব্দের সাথে সম্পর্কিত। দাস তাকেই বলা হয়, যে তার রবের ইচ্ছার আনুগত্য করে। অতএব, কুরআনের পরিভাষায় ‘ইবাদত’ অর্থ “আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছার নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করা”। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল আল্লাহর প্রেরিত

সমস্ত নবী-রাসূলের প্রচারিত বাণীর সারকথা। বাইবেলে ম্যাথিউ বর্ণিত সুসমাচারে ঈসা (আ)-এর উদ্ধৃতিতে ইবাদতের এ মর্মার্থই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে,

"None of those who call me 'Lord' will enter the kingdom of God, but only the one who does the will of my Father in heaven".

অর্থাৎ, "যারা আমাকে 'প্রভু' বলে তারা প্রত্যেকে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে তা নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে সেই প্রবেশ করতে পারবে"।

উল্লেখ্য যে এ বাক্যে 'ইচ্ছা' বলতে "আল্লাহ্ মানুষের জন্য যে কাজ ইচ্ছা করেন" বোঝানো হয়েছে; "আল্লাহ্ মানুষকে যে কাজের অনুমতি দান করেছেন" তা নয়। কেননা এ নিখিল বিশ্বে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোন ঘটনা ঘটে না। অনুরূপভাবে অন্যান্য নবীগণ (আ) তাদের অনুসারীদের যে ঐশীবাণী শিক্ষা দিয়েছেন তাতেও সর্বোপরি 'আল্লাহর ইচ্ছা' প্রাধান্য পেতে দেখা যায়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার আনুগত্যই যাবতীয় ইবাদত বা উপাসনার মূল। এ অর্থে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা বিষয়ে আল্লাহ্ যে আদেশ দিয়েছেন তা মান্য করা উদ্দেশ্য হলে, স্রষ্টার প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনাও এক ধরনের ইবাদত।

ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা

ধর্মীয় আইন অনুসরণ করে আল্লাহর ইবাদত ও প্রশংসা জ্ঞাপনের কি দরকার? এ জন্য দরকার যে, স্রষ্টা প্রদত্ত ঐশীবিধানের আনুগত্যই দুনিয়া ও মৃত্যু পরবর্তী উভয় জীবনে মানুষের জন্য সফলতা অর্জনের চাবিকাঠি। আদি মানব ও মানবী আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাতে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং ঐশী আদেশ অমান্য করার কারণে তাঁরা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। মানুষের জন্য কাঙ্খিত বাসস্থান জান্নাতে ফিরে আসার একমাত্র পথ হলো আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা। ম্যাথিউ বর্ণিত গসপেলে ঈসা মসীহ (আ)-এর উক্তিতে ঐশী আদেশ পালনকে জান্নাতে প্রবেশের চাবি বলা হয়েছে,

"Now behold, one came and said to him, 'Good teachre, what good thing shall I do that I may have eternal life?' So he said to him, 'Why do you cal me good? No one is good but One, that is, God. But if you want to enter into life, keep the commandments".

অর্থাৎ, "পরে একজন যুবক এসে যীশুকে বলল, 'গুরু, শেষ জীবন পাবার জন্য আমাকে ভাল কি করতে হবে?' তিনি তাকে বললেন, 'ভালো প্রসঙ্গে কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছ? ভাল মাত্র একজনই আছেন। যদি তুমি অনন্ত জীবন পেতে চাও তবে তাঁর সব আদেশ পালন কর"।

ম্যাথিউ'র বর্ণনায় স্রষ্টার বিধানের শর্তহীন আনুগত্যের ওপর জোর দিয়ে ঈসা (আ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে এভাবে,

"Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of beaven".

অর্থাৎ, "আদেশগুলোর মধ্যে ছোট একটা নির্দেশও যে কেউ অমান্য করে এবং লোককে তা অমান্য করতে শিক্ষা দেয়, তাকে স্বর্গরাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলা হবে। কিন্তু যে কেউ সেই আদেশগুলো যথাযথ পালন করে ও শিক্ষা দেয় তাকে স্বর্গরাজ্যে বড় বলা হবে"।

সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত নিয়ম-কানূন সর্বস্তরের, সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য পথনির্দেশ দান করে। এ যেমন সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি, তেমনি তা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র পরিচালনার জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধানতন্ত্র। একমাত্র স্রষ্টাই ভাল জানেন তাঁর সৃষ্টির জন্য কোন্‌টি শুভ আর কোন্‌টি অশুভ। তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক, শারীরিক ও সামাজিক চেতনাকে নিরাপদ ও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে বিভিন্ন কাজ ও বস্তু মানুষের জন্য আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র ইবাদত ও হুকুম আহকামের অনুসরণ, মানুষকে পবিত্র ও মঙ্গলজনক জীবন যাপনে এবং তার অপরিসীম প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার পথে সাহায্য করে।

স্রষ্টার স্মরণ

আসমানী বিধান নির্দেশিত ইবাদতের যাবতীয় উপায় পরিকল্পিত হয়েছে, মানুষের অন্তরে স্রষ্টার স্মরণকে জাগ্রত রাখার লক্ষ্য। মানুষের পক্ষে সবচেয়ে অপরিহার্য বিষয়ও ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। দুনিয়াবী বিষয়াদিতে মানুষ কখনও বা এত অধিক ব্যাপৃত হয়ে পড়ে যে সে তার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের কথা ভুলে যায়। নিয়মিত সালাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো, দৈনন্দিন কাজকর্মকে স্রষ্টার স্মরণে আবর্তিত রেখে সুসংবদ্ধ করা। সালাত মানুষের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক চাহিদার মাঝে সমন্বয় সাধন করে থাকে।

খাবার, জীবিকান্বেষণ, বিশ্রাম প্রভৃতি প্রাত্যহিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত কাজ যা পালনকর্তার সাথে মানুষের নির্ভরতাসুলভ সম্পর্ককে প্রাণবন্ত রাখে। সালাত প্রসঙ্গে সূরা ত্বো-হা'য় আল্লাহ্ ঘোষণা করেন—

إِنَّنِىٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ -

অর্থাৎ, আমিই আল্লাহ্ আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত প্রতিষ্ঠা কর। (সূরা ত্বো-হা : আয়াত-১৪)

সিয়াম অর্থাৎ রোযা প্রসঙ্গে সূরা আল-বাকারা'য় আল্লাহ্ বলেন–

يَٓا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের ওপরও রোযাকে ফরয করা হয়েছে যেন তোমরা সংযমশীল হতে পারো।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৩)

ঈমানদারদের উদ্বুদ্ধ করা হয় আল্লাহ্কে সাধ্যানুযায়ী স্মরণ করতে। সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত জীবনবিধানে শারীরিক কিংবা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করা হলেও আল্লাহর স্মরণের বেলায় তা ব্যতিক্রম। বাস্তবক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করা প্রায় অসম্ভব। তাই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা আল-আহ্যাবে বিশ্বাসীরা যথাসম্ভব তাঁকে স্মরণ করতে আদিষ্ট হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন–

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ـ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে। (সূরা আহযাব: আয়াত-৪১)

আল্লাহর স্মরণের ওপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করার কারণ হলো, সাধারণত ঐসব মুহূর্তেই মানুষের পদস্খলন ঘটে যখন তার অন্তর সৃষ্টিকর্তার স্মরণ থেকে উদাসীন থাকে। আল্লাহ্-ভীতির অনুপস্থিতির সুযোগে অশুভ শক্তি মানুষের ওপর কর্তৃত্বশীল হয়ে পড়ে। এ কারণেই অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনা ও কামনার দ্বারা মানুষের অন্তরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত করতে শয়তান সারাক্ষণ সচেষ্ট। মন থেকে সৃষ্টিকর্তার চিন্তা বিলীন হলে মানুষ বিভিন্ন রকম অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়। সূরা আল-মুজাদালায় এ প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে—

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, শয়তান তাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তাদের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত"। (সূরা মুজাদালাহ্: আয়াত-১৯)

আসমানী বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মাদক ও জুয়াকে যে নিষিদ্ধ করেছেন তার প্রধান কারণ হলো, এসব জিনিস মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়। মানব দেহ ও মন অতি সহজে নেশাকারক দ্রব্য ও ভাগ্যের খেলার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। একবার আসক্তি জন্মালে মানবপ্রবৃত্তি লাগামহীন হয়ে যায় ও যে কোন ধরনের উগ্র ও হিংসাত্মক অপরাধের দিকে ধাবিত হতে দ্বিধাবোধ করে না। সূরা আল-মায়িদাহ্'য় আল্লাহ ঘোষণা করেন—

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ـ

অর্থাৎ, শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে' শক্রতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখে, সুতরাং এখনও কি তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে"? (সূরা মায়িদাহ্ : আয়াত-৯১)

উক্ত আলোচনায় স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, মানুষের নিজ মুক্তি ও উত্তরণের জন্যই আল্লাহ্‌র স্মরণ অপরিহার্য। যে কোন মানুষই দুর্বল সময় অন্যায়ে লিপ্ত হতে পারে। আল্লাহ্‌র স্মরণের কোন উপায় না থাকলে তারা ক্রমশ পাপের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেত। আল্লাহ্‌র বিধান মান্যকারীরা তাঁকে বেশি স্মরণ করে যা তাদের জন্য অনুশোচনা ও সংশোধনের দ্বার খুলে দেয়। সূরা আল-ইমরানে এ প্রসঙ্গটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ -

অর্থাৎ, এবং যখন কেউ অশ্লীল কার্য করে কিংবা নিজ জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে..। (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১৩৫)

ইসলামী জীবন বিধান

বান্দার জন্য ইবাদতের পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-পদ্ধতি যে জীবন বিধানে বিদ্যমান তা হলো, ইসলাম। 'ইসলাম' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ'। সাধারণতঃ ইসলামকে প্রধান তিনটি একত্ববাদী ধর্মের মধ্যে অনূজ তৃতীয়টি হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও মূলত: এটি কোন নতুন ধর্ম নয়। ইসলাম হলো সেই চিরন্তন ধর্ম যা আল্লাহ্‌র প্রেরিত সকল নবী-রাসূল (আ) মানবজাতির জন্য প্রচার করে গেছেন। আদম (আ), ইব্রাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ) প্রত্যেকেই ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন। ইব্রাহীম (আ)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা এ সত্যকে এভাবে উপস্থাপন ধরেন—

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

ফর্মা-০৬; লেকচার সমগ্র

অর্থাৎ, ইব্রাহীম ইয়াহুদী ছিল না এবং খ্রিস্টানও ছিল না; বরং সে সুদৃঢ় মুসলিম ছিল এবং সে অংশীবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

(সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-৬৭)

নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয় এবং মানবজাতি একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, তাই স্রষ্টা মানুষের জন্য এক ধর্ম বিধিবদ্ধ করেছেন। তিনি ইহুদীদের জন্য এক, ভারতীয়দের জন্য আর এক, ইউরোপীয়দের জন্য পৃথক ধর্ম নির্ধারণ করেননি। মানুষের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রয়োজন সর্বকালে সর্বত্র অভিন্ন। সর্বপ্রথম মানব-মানবী থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষের সহজাত বোধ ও প্রবণতাও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। ইসলাম ছাড়া আর অন্য কোন জীবনবিধান যে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় তা তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন সূরা আলে ইমরানে—

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম'।

(সূরা আলে- ইমরান : আয়াত-১৯)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

অর্থাৎ, আর যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম খোঁজ করে তা কখনই তাঁর নিকট থেকে গ্রহণীয় হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৮৫)

প্রত্যেকটি কর্ম ইবাদত

ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী, মানুষের প্রতিটি কৃতকর্ম ইবাদতের শামিল হতে পারে। মূলত: আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার সমস্ত জীবন স্রষ্টার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা আল-আন'আমে তিনি বলেন—

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও; আমার সালাত, আমার সকল ইবাদত (কুরবানী ও হজ্জ্ব), আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছু গোটা জাহানের রব আল্লাহর জন্য। (সূরা আল-আন'আম : আয়াত-১৬২)

উল্লেখ্য যে, উৎসর্গীকৃত প্রচেষ্টা স্রষ্টার নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হলে দুটি শর্ত অবশ্য পূরণীয় হতে হবে।

প্রথম শর্তানুযায়ী, কর্ম বা আমল আন্তরিকভাবে হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, মানুষের স্বীকৃতি কিংবা প্রশংসা কুড়ানোর আশায় নয়। ঈমানদার ব্যক্তিকে এ বিষয়ে অবগত ও সচেতন থাকতে হবে যে, কৃত কর্মটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে কিনা।

জাগতিক ক্রিয়াকর্মকে ইবাদতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া সহজ করতে আল্লাহ্ নবী করীম ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন দৈনন্দিন যাবতীয় কাজ-কর্ম, তা যত সাধারণই হোক না কেন, প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু করতে। প্রত্যেক কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' ('আল্লাহর নামে') বলা এরকম সংক্ষিপ্ততম একটি প্রার্থনা। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্য বা সময়ে বিভিন্ন রকম প্রার্থনার আদেশ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নতুন কাপড় পরিধানের সময় নবী করীম ﷺ তাঁর অনুসারীদের নিম্নের দোয়াটি পাঠ করতে প্রেরণা দিতেন—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! যাবতীয় প্রশংসা আপনার জন্য। আপনিই আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করেছেন। আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ প্রার্থনা করি ও যে উদ্দেশ্যে একে তৈরি করা হয়েছে তারও কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি এর অনিষ্ট থেকে ও যে উদ্দেশ্যে একে তৈরি করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, নেক কাজটি সম্পাদিত হতে হবে নবী করীম ﷺ-এর প্রদর্শিত পন্থায়— যা আরবি ভাষায় 'সুন্নাহ্' নামে অভিহিত। অতীতের সকল নবী (আ)'ই নিজ নিজ অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছেন তাদের অনুসরণ করে চলতে, কেননা তাঁরা স্বয়ং আল্লাহর দ্বারা পরিচালিত ছিলেন। তাঁরা যা কিছু

শিখিয়েছেন ও প্রচার করেছেন তা ছিল ঐশী সত্য। কাজেই যারা তাদের অনুসরণ করেছে ও তাদের আনীত সত্যকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে, তারাই জান্নাতে অনন্ত জীবন লাভ করবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাইবেলে জন বর্ণিত সুসমাচারে ঈসা (আ)-এর কথিত উক্তি উল্লেখযোগ্য,

"I am the way, the truth and the life; no man cometh unto the Father but by me".

অর্থাৎ "আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার নিকট যেতে পারে না"।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার নবী করীম ﷺ মাটিতে স্বহস্তে একটি রেখা এঁকে তাদের বললেন: "এটাই আল্লাহ্‌র সরল সোজা রাস্তা"। অতঃপর তিনি ডানে ও বামে আরো কতগুলো রেখা টেনে বললেন: "এগুলো হচ্ছে ঐসব পথ যেগুলোর প্রত্যেকটির ওপর একজন করে শয়তান বসে রয়েছে এবং ঐ দিকে (মানুষকে) ডাকছে"। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন যার অর্থ "আর এ পথই আমার সরল পথ; এ পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এ পথ ব্যতীত অন্যান্য কোন পথের অনুসরণ করে চলবে না, করলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সতর্ক হও"।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য ইবাদত হলো তা-ই যা নবী করীম ﷺ-এর সুন্নাহ্‌র অনুসরণে করা হয়েছে। এ কারণে ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কৃত বিষয় আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য। নবী করীম ﷺ বলেছেন: "ধর্মের ব্যাপারে নিকৃষ্টতম বিষয় হলো বিদ'আত (নবাবিষ্কৃত পন্থা), প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা ও প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিয়ে যাবে"।

ধর্মে বিদ'আতের আবিষ্কার নিষিদ্ধ ও আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাখ্যাত। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "যে আমাদের এ প্রসঙ্গে (ধর্মের বিষয়ে) নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে"।

বস্তুতঃ ধর্মে সংযোজন-বিয়োজনের ফলেই পূর্ববর্তী রাসূল (আ) এদের মৌলিক শিক্ষা অপভ্রংশ ও বিকৃত রূপ লাভ করে পরিশেষে বর্তমানে দৃষ্ট মানব রচিত নানা ভ্রান্ত ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। ধর্মে বিদ'আত পরিত্যাগের লক্ষ্যে শরীয়তের সাধারণ নিয়ম হলো, যাবতীয় ইবাদত নিষিদ্ধ যদি না তা আল্লাহর নির্দেশিত ও নবী করীম ﷺ দ্বারা প্রদর্শিত বা উপদেশকৃত বলে প্রমাণিত হয়।

সৃষ্টির সেরা

যারা অংশী স্থাপন ব্যতীতই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও নেক আমল (পূর্বোক্ত শর্তানুযায়ী সম্পাদিত) করে তারাই সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। অতএব সৃষ্টিগতভাবে মানুষ শ্রেষ্ঠ না হলেও শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা ও সামর্থ্য তার রয়েছে। সূরা আল-বায়্যিনাহ্'য় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۔

অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।
(সূরা বাইয়্যিনাহ্: আয়াত-৭)

বৃহত্তম অপরাধ

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, যে মূখ্য উদ্দেশ্য পূরণে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার বিরোধিতা করাই চূড়ান্ত ও বৃহত্তম অপরাধ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট কবীরা গুনাহ (বৃহৎ পাপ) প্রসঙ্গে জানতে চান। তিনি ﷺ জবাবে বলেন: "আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা যদিও তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন"। 'শির্‌ক' অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন একমাত্র পাপ যা ক্ষমার অযোগ্য। কোন ব্যক্তি পাপ থেকে তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ্ শির্‌ক ব্যতীত তার অন্যান্য যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন। সূরা আন-নিসার আয়াতে আল্লাহ্ বলেন—

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۔

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং তাছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪৮)

মহান আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কারো ইবাদতের অর্থ হলো, সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার গুণাবলি ও ক্ষমার অধিকারী মনে করা। প্রত্যেক ভ্রান্ত ধর্ম ও দলই নিজস্ব, অভিনব পন্থায় এ কাজটি করে থাকে। ছোট একটি দল আবহমানকাল থেকে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে আসছে। তাদের বক্তব্যের সমর্থনে দলিল প্রমাণ দেখানোর দাবি করা হয় যে, পৃথিবীর কোন সূত্রপাত নেই। তাদের এ দাবি অমূলক কেননা, নিখিল বিশ্বের যাবতীয় দৃষ্টিগোচর অংশ কালের স্রোতে উৎপত্তি লাভ করেছে।

যুক্তিসঙ্গতভাবে, বিভিন্ন অংশের সমষ্টি যে পৃথিবী তারও উৎপত্তি রয়েছে। এও বিশ্বাস করা অযৌক্তিক নয়, যে 'কারণ, দ্বারা পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে তা শুরুতে পৃথিবীর অংশ ছিল না কিংবা তা স্বয়ং নিখিল বিশ্বের মত অস্তিত্ব লাভ করেনি। নাস্তিক মতবাদ অনুসারে নিখিল বিশ্বের কোন সূত্রপাত নেই, অর্থাৎ বিশ্বজগত যে বস্তু দ্বারা গঠিত তা আদি ও অন্তহীন। এ জাতীয় বক্তব্য শির্কের পর্যায়ে পড়ে। একমাত্র স্রষ্টাই আদি ও অন্তহীন। স্রষ্টার এ গুণকে সৃষ্টির ওপর আরোপ করা হয়।

সাধারণত সব যুগে নাস্তিক মতাবলম্বীদের সংখ্যা কম হয়ে থাকে বাইরে মৌখিকভাবে ঘোষণা দিলেও অন্তরের সহজাত বোধ থেকে তারা জানে যে স্রষ্টা অস্তিত্বশীল। একারণে দেখা যায়, বহু দশক ধরে কম্যুনিস্ট মতবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া ও চীনের বেশির ভাগ মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সূরা আন-নাম্‌ল'এ আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি তুলে ধরে ইরশাদ করেছেন—

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ـ

অর্থাৎ, তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করলো; যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (সূরা নাম্‌ল : আয়াত-১৪)

নাস্তিক ও বস্তুবাদীদের নিকট প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূর্ণ করা ব্যতীত জীবনের আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। ফলস্বরূপ, স্রষ্টার পরিবর্তে যে প্রবৃত্তির তাড়নার নিকট তারা আত্মসমর্পণ করে তা-ই তাদের উপাস্যে পরিণত হয়। সূরা আল-ফুরকানে আল্লাহ ঘোষণা করেন—

اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ ـ

অর্থাৎ, তুমি কি দেখো না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? (সূরা ফুরকান : আয়াত-৪৩)

খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা নবী ঈসা (আ)-কে 'ঈশ্বরের পুত্র' উপাধিতে ভূষিত করে তাঁকে স্রষ্টার পর্যায়ে উন্নিত করেছে। অপরদিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে স্রষ্টা বিভিন্ন যুগে 'অবতার' (Incarnate) রূপে মানবদেহ ধারণ করে যমীনে নেমে আসেন। তারা এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ও গুণাবলি বিভক্ত করেছে— স্রষ্টা ব্রহ্মা, প্রতিপালক বিষ্ণু ও প্রলয়কারী শিব এ তিন মুখ্য দেবতার মাঝে।

সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালবাসা

মানুষ সৃষ্টিকর্তার চেয়ে সৃষ্টির প্রতি অধিক ভালবাসা, আস্থা ও ভয় প্রদর্শন করলেও আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়। সূরা আল-বাকারা'য় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ـ

অর্থাৎ, এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ আছে - যারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে সদৃশ স্থির করে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালবেসে থাকে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে - আল্লাহর প্রতি তাদের প্রেম দৃঢ়তর।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৬৫)

সৃষ্টির প্রতি এ জাতীয় ভাবাবেগ যখন তীব্রতর হয়ে পড়ে তখন মানুষ অন্য মানুষের সন্তুষ্টি লাভে স্রষ্টার অবাধ্য হতেও দ্বিধাবোধ করে না। একমাত্র আল্লাহই মানুষের পরিপূর্ণ আবেগ ও মানসিক ভারার্পণের যোগ্যতা ও ক্ষমতা রাখে; তাই তাঁকে তাঁর সৃষ্টির চেয়েও অধিক ভালবেসে ও ভয় করে চলতে হবে। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন: "যার মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে সে ঈমানের স্বাদ পায়।

১. তার নিকট অপর সকলের চেয়ে আল্লাহ ও রাসূল প্রিয়তর হয়।
২. কাউকে ভালবাসলে আল্লাহর জন্যই ভালবাসে।

৩. আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন পছন্দ করে না, কুফরীতে (অবিশ্বাসে) ফিরে যাওয়াকেও তেমনি পছন্দ করে না"।

যেসব কারণে মানুষ একে অপরের প্রতি প্রীতি বা আকর্ষণ অনুভব করে, সেসব কারণ স্রষ্টার মাঝে সর্বাধিক উপস্থিত বলে তাঁকে আরো অধিক ভালবাসা অপরিহার্য। মানুষ ভালবাসে দীর্ঘ জীবন ও সাফল্য এবং অপছন্দ করে মৃত্যু ও ব্যর্থতা। আল্লাহ্ তা'আলাই জীবন ও সাফল্যের চূড়ান্ত উৎস বলে মানবজাতির পরিপূর্ণ ভক্তি-ভালবাসা ও উৎসর্জনের দাবিদার একমাত্র তিনিই। মানুষ আরো ভালবাসে যাদের থেকে তারা উপকার লাভ করে ও প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য পায়। যাবতীয় কল্যাণ (আল-আরাফ : ১৮৮) ও সহায়তা (আলে-ইমরান : ১২৬) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয় বলে তিনিই মানুষের সর্বোচ্চ ভালবাসা অর্জনের যোগ্য।

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوْهَا ۔

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা করলে এর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। (সূরা ইব্রাহীম : আয়াত-৩৪)

এখানে উল্লেখ্য যে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি সীমাহীন ভালবাসার রূপ সৃষ্টির প্রতি আবেগপ্রবণ ভালবাসার সদৃশ হওয়া অপরিহার্য নয়; যেমনভাবে জীবজন্তুর প্রতি মানুষের অনুভূত ভালবাসা, ব্যক্তির প্রতি ভালবাসার অনুরূপ নয়। স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা যেন মানুষের পারস্পরিক ভালবাসার সীমাকে অতিক্রম করে যায়। স্রষ্টার প্রতি অনুরাগ আবশ্যকীয়রূপে নিহিত থাকে তাঁর আজ্ঞানুবর্তীতার মাঝে। সূরা আলে-ইমরানে বলা হয়েছে, যার অর্থ "তুমি বল: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন"। আয়াতের ভাষ্য কোন দুর্বোধ্য বা অবাস্তব ধারণা নয়। বাস্তবেও মানুষের পারস্পরিক ভালবাসা পরোক্ষভাবে পরস্পরের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা দাবি করে। প্রিয়জনের পক্ষ থেকে যখন অনুরোধ আসে ব্যক্তি তখন ভালবাসার গভীরতা অনুযায়ী আন্তরিকভাবে তা বাস্তবায়নে সজাগ থাকে।

এছাড়াও সৃষ্টিকর্তার প্রতি ব্যক্তির ভালবাসা প্রকাশিত হয় স্রষ্টার পছন্দনীয় ব্যক্তির প্রতি অনুভূত ভালবাসায়। আল্লাহকে যে ভালবাসে তার পক্ষে আল্লাহর অতীব প্রিয়ব্যক্তিকে ঘৃণা করা যেমন অসম্ভব, তেমনই তার পক্ষে অচিন্ত্যনীয়

আল্লাহর ঘৃণ্যপাত্রকে ভালবাসা। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালবাসে ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্য খরচ করে ও আল্লাহর জন্য খরচ না করে সে তার ঈমানকে পূর্ণ করেছে"। অর্থাৎ দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি এমন সবার প্রতি প্রীতি অনুভব করে যারা আল্লাহকে ভালবাসে। সূরা মরিয়মে আল্লাহ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি বিশ্বাসীদের অন্তরে নেককারদের জন্য ভালবাসা স্থাপন করে দেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ـ

অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে দয়াময় তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা। (সূরা মরিয়ম : আয়াত-৯৬)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরাঈল (আ) -কে আহ্বান করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন এজন্য তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরাঈল (আ)ও তাকে ভালবাসে। অতঃপর জিবরাঈল (আ) আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন এজন্য তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আকাশবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তারপর নিখিল বিশ্বের মানুষের অন্তরেও তাকে গ্রহণীয় ও বরণীয় করে রাখা হয়"।

প্রার্থনা

শুধুমাত্র আল্লাহই প্রার্থনার জবাব দেন বলে যাবতীয় প্রার্থনা হওয়া অপরিহার্য শুধুমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্য। বান্দা যতক্ষণ তাঁকে আন্তরিকভাবে ডাকতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সে ডাকে সাড়া দেন।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ـ

অর্থাৎ, এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার প্রসঙ্গে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তাদেরকে বলে দাও: নিশ্চয় আমি সন্নিকটবর্তী; কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে ডাকে তখনই আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৬)

নবী করীম ﷺ বিষয়টি পরিষ্কার করে বর্ণনা করেন : "যদি প্রার্থনা করতে হয় তবে আল্লাহর নিকট কর, আর যদি সাহায্য খুঁজতে হয় তবে তাও আল্লাহর নিকটই কর।" সুতরাং, জীবিত অথবা মৃত মানুষের কাছে কিংবা তাদের মাধ্যমে প্রার্থনা করা এক ধরনের শির্ক। যার প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করা হয় সে ইবাদতের লক্ষ্যতে পরিণত হয়। আন-নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন: "প্রার্থনা হচ্ছে ইবাদত"।

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর, তারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা। (সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত-১৯৪)

এ কারণে ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা সাধু-সন্তদের প্রতি যে প্রার্থনা নিবেদন করে থাকে তা সন্দেহাতীতভাবে শির্ক। উদাহরণস্বরূপ, হারানো বস্তু খুঁজে পেতে থিব্সের সেইন্ট এন্টনীর কাছে প্রার্থনা করা হয়। অসম্ভবের পৃষ্ঠপোষক সাধু সেইন্ট জিউড থ্যাডিয়াসকে চিকিৎসার অসাধ্য রোগের নিরাময়, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদির জন্য আহ্বান করা হয়।

অতীতে কেউ ভ্রমণে বের হলে সেইন্ট ক্রিস্টোফারকে নিরাপদ যাত্রার জন্য আহ্বান করা হত। পরবর্তীতে সেইন্ট ক্রিস্টোফার একটি কাল্পনিক চরিত্র বলে প্রমাণিত হলে ১৯৬৯ সালে পোপের নির্দেশে তাকে সন্তদের তালিকা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। ঈসা (আ)-এর জননী মরিয়ম (আ) ও অন্যান্য ফেরেশতাদের কাছে প্রার্থনা (যেমন মাইকেলমাস দিবসে পালনকৃত প্রার্থনা) সবই শির্কের অন্তর্গত। বহু খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বী সাধু-সন্তদের উপাসনা সমর্থন করেন না বটে, কিন্তু ঈসা (আ)-এর কাছে, তাঁর মাধ্যমে অথবা তাঁর নামে প্রার্থনা করে তারাও শির্কে জড়িয়ে পড়ে। একইভাবে যে কোন মুসলিম নবী করীম ﷺ-এর কাছে প্রার্থনা জানালেও শির্কে পতিত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-কে ঘোষণা দিতে আদেশ করেন–

قُلْ لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ ـ

অর্থাৎ, (হে নবী)! তুমি ঘোষণা করে দাও: আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই, আমি যদি অদৃশ্য তত্ত্ব ও খবর জানতাম তবে আমি প্রভূত মঙ্গল হাসিল করতে পারতাম আর কোন অমঙ্গল ও অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। (সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত-১৮৮)

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, যখন "তোমার নিকটাত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও" এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন নবী করীম ﷺ তাঁর আত্মীয়দের উদ্দেশ্য করে বলেন: "হে কুরাইশ বংশের লোকসকল! আল্লাহ্র কাছে মুক্তি চাও (সৎকর্মের মাধ্যমে), কেননা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে সমর্থ নই।... হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ! আমার নিকট (পার্থিব) যা কিছু চাওয়ার চেয়ে নাও, কিন্তু আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তোমার জন্য কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই"।

জগতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

এ বিষয়ক আলোচনায় নিখিল বিশ্বকে বাসস্থান করে মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাকে বিস্তৃত করা যেতে পারে। ফলে প্রশ্নের রূপ দাঁড়ায়– "স্রষ্টা কেন জগতে মানব সৃষ্টি করলেন"? এ প্রশ্নের যথাযথ জবাব মহিমান্বিত কুরআনের সূরা মুলক ও সূরাহ্ আল-কাহ্ফে নিম্নরূপে দেয়া হয়েছে,

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ـ

অর্থাৎ, যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্যে – কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? (সূরা মুলক : আয়াত-২)

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

অর্থাৎ, নিখিল বিশ্বে যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে ওর শোভা করেছি মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।

(সূরা কাহ্ফ : আয়াত-৭)

অতএব জগতে মানুষ সৃষ্টির মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্ম, স্বভাব ও আচরণকে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করা। এ দুনিয়ায় জীবন-মৃত্যু, প্রাচুর্য-দারিদ্র্য, সুস্বাস্থ্য-ব্যাধি ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে পুণ্যাত্মা ও পাপীষ্ঠ আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। মানুষের চরিত্র ও পারস্পরিক আচরণ তার হৃদয়স্থিত ঈমানের মাপকাঠি হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

মনে রাখা দরকার যে, যোগ্যতা নির্ণয়ের এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলাকে মানুষ সম্পর্কে জানানো নয়, কারণ তিনি সৃষ্টির বহু পূর্বে থেকেই তাদের সমস্ত বিষয়ে জ্ঞাত। এ পরীক্ষা মহাবিচার দিবসে মানুষকে নিশ্চিত করতে যে, জাহান্নামবাসীরা সেখানে পৌছাবে ন্যায়সঙ্গত কারণে আর জান্নাতবাসীরা তাদের গন্তব্যে পৌছাবে আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহের কল্যাণে। পার্থিব জীবনে মানুষকে পরীক্ষা করার প্রধানত: দু'টি কারণ বিদ্যমান। এক. মানুষের আধ্যাত্মিক ও চরিত্রগত উত্তরণ এবং দুই. দুনিয়াবী শাস্তি অথবা প্রতিদান দেয়া।

আধ্যাত্মিক উত্তরণ

এ জগতের যাবতীয় পরীক্ষার উদ্দেশ্য মূলত: মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন! নিখাদ সোনাকে যেমনভাবে আগুনে পুড়িয়ে খনিজ আকরিক থেকে আলাদা করা হয়, জীবনের নানা পরীক্ষা বিশ্বাসী ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রকে তেমনিভাবে পরিশুদ্ধ করে। পরীক্ষাগুলো ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে হীন প্রবৃত্তির ওপর উচ্চতর প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিতে। জীবনের সব পরীক্ষায় সাফল্য অর্জিত না হলেও, ব্যর্থতার মধ্য দিয়েও মূল্যবান শিক্ষা লব্ধ হয় যা বান্দাকে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে।

ঔদার্য ও আত্মতৃপ্তি

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উদারতা ও পরিতৃপ্তির গুণাবলি মানব সমাজের সর্বত্র উচ্চস্তরের মানবীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। অথবা উভয়ের কোনটিই বিকশিত হয় না যদি সমাজে প্রত্যেক সমপরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়। ঔদার্যের গুণাবলি অর্জিত হয় তখনই যখন মানব প্রবৃত্তি সম্পদ-বৃদ্ধির লিপ্সার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অভাবগ্রস্তের সাথে নিজের সম্পদ ভাগাভাগি করাকে উত্তম মনে করে। অপরদিকে পরিতৃপ্তি জন্ম নেয়, যখন হৃদয় হিংসা ও লোভ এর মতো কুরিপুকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা বান্দার মাঝে

সম্পদের অসম বন্টন করে আধ্যাত্মিক যুদ্ধের এ মঞ্চ সাজিয়েছেন। সূরা আন-নাহলে আল্লাহ্ বলেন—

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ -

অর্থাৎ, আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকেও কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (সূরা নাহল : আয়াত-৭১)

লিপ্সা ও কার্পণ্য মানুষের সম্পদ কুক্ষিগতকরণের হীন প্রবৃত্তি। স্রষ্টার বাণীর মাধ্যমে মানুষকে অবগত করা হয়েছে যে, যাবতীয় সম্পদ মানুষের নিকট স্রষ্টার প্রদত্ত আমানত। মানুষ অস্তিত্ব হাসিলের পূর্বে দুনিয়ায় সম্পদ বিদ্যমান ছিল এবং মৃত্যুর পরও তা বাকি থাকবে। যদি ধন-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি স্রষ্টার নির্দেশানুযায়ী এর সদ্ব্যবহার করে তবে তা তার জন্য উভয় জীবনে কল্যাণকর হবে। শুধুমাত্র স্বার্থোদ্ধারে ব্যবহৃত হলে তা তার জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক– উভয় জীবন অভিশাপ বয়ে আনবে। ধন-সম্পদ ও সন্তান প্রসঙ্গে সূরা আল-আনফালে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীদের সতর্ক করেছেন এভাবে—

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ -

অর্থাৎ, আর তোমরা জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির আসক্তি ও অনুরাগ বিশ্বাসীকে আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য থেকে বিচ্যুত না করে। কারণ এ সব কিছু তাদের পরীক্ষা করবার উপকরণ মাত্র।

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। (সূরা মুনাফিকুন : আয়াত-৯)

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ اٰتَاكُمْ -

অর্থাৎ, এবং তোমাদের কিছু সংখ্যক লোককে কতিপয়ের ওপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন, উদ্দেশ্য হলো তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা। (সূরা আল-আন'আম : আয়াত-১৬৫)

মূলত দুনিয়াবী জীবনে সম্পদ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কখনই পরিপূর্ণ হবার নয়। মানুষের প্রবণতা হলো, সে যত পায় তত চায়। নবী করীম ﷺ বলেছেন : "মানুষের নিকট এক উপত্যকা পূর্ণ স্বর্ণ থাকলেও সে আরো একটির প্রত্যাশা করত, কারণ (কবরের) মাটি ছাড়া আর কিছুই তার পেট ভরে না এবং আল্লাহ্ আন্তরিকভাবে তওবাকারীকে ক্ষমা করেন"। সম্পদ কুক্ষিগত করার এ হীন প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করা সম্ভব শুধুমাত্র দানশীলতার মাধ্যমে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের নির্দেশ দিয়েছিলেন সমাজের ধনীদের কাছ থেকে দান সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করতে।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا -

অর্থাৎ, (হে নবী)! তুমি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ কর, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করে দেবে। (সূরা তওবা : আয়াত-১০৩)

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই 'যাকাত' (বাধ্যতামূলক দান) নামে দানশীলতার রীতি আবশ্যিকরূপে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। উদ্বৃত্ত সম্পদের অধিকারী প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির জন্য প্রতি বছর সম্পদের নির্ধারিত ন্যূনতম অংশ গরিব মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। যাকাতের দান বিলম্বিত করা গুরুতর পাপ হিসেবে বিবেচিত। এ বদান্যতা ও দানশীলতা ব্যক্তিকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে যে, অধিকারভুক্ত সম্পদ তাদের নিজস্ব নয় যা যেভাবে খুশী ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশ্বাসীরা অনুধাবন করে, তারা দুনিয়াবী সম্পদের সাময়িক জিম্মাদার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী মাত্র যার ওপর অর্পিত হয়েছে অভাবীদের মাঝে তা বণ্টন করার দায়িত্ব। কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃত বিশ্বাসীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেন যে, তারা তাদের সম্পদে অভাবগ্রস্তদের হক বা প্রাপ্ত অংশকে স্বীকার করে।

وَفِيٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ -

অর্থাৎ, এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।

(সূরা যারিয়াত : আয়াত-১৯)

উল্লেখ্য যে, দান-সদকাহ হতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে; প্রদর্শনী কিংবা কারো ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য নয়। দুনিয়াবী স্বার্থ দান

করা হলে এর প্রতিদান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। সূরা বাকারা'য় আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ـ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! কৃপা প্রকাশ করে ও ক্লেশ দান করে নিজেদের দানগুলো ব্যর্থ করে ফেলো না। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৬৪)

প্রাচুর্যের লিপ্সা অন্তরে ঈর্ষার জন্ম দেয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা উপদেশ দিয়েছেন, অন্যকে তিনি যে অনুগ্রহ দান করেছেন তার প্রতি প্রলোভিত না হতে। সূরা আন-নিসায় এ প্রসঙ্গে মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি বলেন—

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ـ

অর্থাৎ, এবং তোমরা ওর আকাঙ্ক্ষা করো যার দ্বারা আল্লাহ্ একের ওপর অপরকে গৌরবান্বিত করেছেন। (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৩২)

নবী করীম ﷺ এ ঐশী উপদেশকে আরো বিস্তৃত করে বলেন : "তোমা অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের মানুষের দিকে দেখ, তোমা অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের মানুষের দিকে দেখ না। এতে তোমার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতরাজীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে; এটা তোমার জন্য কল্যাণজনক যাতে তোমার প্রতি আল্লাহর বর্ষিত অনুগ্রহকে তুমি অস্বীকার করে না বস'।

মানুষ যখন তার চেয়ে অধিক সম্পদশালীর প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে তখন অন্তরে ঈর্ষা জন্ম নেয়া বিচিত্র নয়। কখনও বা সে অনুভব করে ও মৌখিকভাবেও প্রকাশ করে যে, আল্লাহ্ তার প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণ করেননি। পরিণামে, ঈপ্সিত পর্যায়ে উন্নীত হতে সে বিভিন্ন ধরনের অন্যায়ের আশ্রয় নেয়। এর বিপরীতে ইসলামের উপদেশ হলো অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবানদের অবস্থা বিবেচনা করা। মানুষ যত প্রতিকূলতার মোকাবিলা করুক না কেন, তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় কেউ না কেউ আছে। অতএব তাদের কথা চিন্তা করলে, আল্লাহ্ তাকে যে অগণিত অনুগ্রহের মাঝে রেখেছেন তা বুঝা যাবে। ঈর্ষাকে উৎখাত করার এ আধ্যাত্মিক সাধনার ফলস্বরূপ অন্তরে জন্ম নেয় আত্মতৃপ্তির উচ্চতর অনুভূতি।

নবীদের শিক্ষানুযায়ী, বস্তুগত মালিকানাই এ জগতে প্রকৃত সম্পদ নয়। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম ﷺ বলেছেন : "মালের অধিকারী আসল ধনী নয়, আসল ধনী সে-ই যে পরিতুষ্ট থাকে"।

পরিতৃপ্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মানুষ সকল পরিস্থিতি প্রতিক্রিয়াহীনভাবে গ্রহণ করবে ও নিজের অবস্থা উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ নেবে না। পরিতৃপ্তির নিগূঢ় অর্থ হচ্ছে, সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু প্রাপ্তি হয় তা বিনা অভিযোগে মেনে নেয়া। যথাসাধ্য প্রচেষ্টার পর, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা সহকারে নিজের বিষয়াদি ছেড়ে দেয়াতেই অন্তর দুনিয়াবী লিপ্সা থেকে মুক্ত হয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। সূরা রা'দ-এ আল্লাহ তা'আলা বলেন—

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

অর্থাৎ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত (অন্তর) প্রশান্ত হয়। (সূরা রা'দ : আয়াত-২৮)

দুঃখ-দুর্দশা

মানব জীবনের পরীক্ষা কোন কোন সময় দুর্ভাগ্য ও দুঃখ-দুর্দশার রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়, যা পরিশেষে ঈমানদার ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ও পাপ মোচনে ভূমিকা পালন করে। বিপদাপদজনিত পরীক্ষা বিপথগামী বিশ্বাসীকে সঠিক রাস্তায় ফিরিয়ে আনে এবং অবিশ্বাসীদের আখিরাত জীবনের পূর্বেই দুনিয়াবী জীবনের শাস্তি আস্বাদন করায়।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

বান্দার দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-আপদ উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক গুণ 'ধৈর্য' বিকাশের ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করে। এ কারণে নেককার ব্যক্তি, বিশ্বাসী ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে বিভিন্ন ধরনের কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন তা বিস্ময়কর নয়। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, মানবজাতির মধ্যে কারা সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন? জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন : "নবীগণ, অতঃপর তাদের অনুরূপগণ, অতঃপর তাদের অনুরূপগণ। মানুষকে তার ঈমানের গভীরতা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি ঈমান শক্তিশালী হয়, তবে তার পরীক্ষাও তীব্র হয় এবং যদি ঈমানে দুর্বলতা থাকে তবে সে অনুযায়ী তার পরীক্ষা হয়"।

বিপদের সময় মহান আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ আস্থাসহ নির্ভর করার মাঝেই প্রকৃত ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টিকর্তার ওপর ভরসা করা ইবাদতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং অন্তরস্থ ঈমানের অঙ্গ। যেহেতু 'আল্লাহর ওপর বিশ্বাস' এর অর্থ এটা মেনে নেয়া যে– এ নিখিল বিশ্বে তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন ঘটনা ঘটে না; সেহেতু আল্লাহই মানুষের সর্বোচ্চ আস্থাপূর্ণ আনুগত্য লাভের যোগ্য। একমাত্র আল্লাহর অঙ্গীকারই কখনও ভঙ্গ হবার নয়। যত নেককারই হোক না কেন, ব্যক্তির পক্ষে মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মানুষ তার ভুল করার সহজাত স্বভাবের জন্য অন্যকে কখনওবা আশাহত করে। সূরা ইউসুফে আল্লাহ তা'আলা নবী ইয়াকূব (আ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেন—

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, বিধান আল্লাহরই, আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহরই ওপর নির্ভর করুক। (সূরা ইউসুফ : আয়াত-৬৭)

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, কেউ তাঁর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করলে সবচেয়ে প্রতিকূল সময়েও তিনি তার সহায়তায় যথেষ্ট হবেন।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

(সূরা তালাক : আয়াত-৩)

একমাত্র স্রষ্টাই জানেন মানুষের জন্য কোন সিদ্ধান্তটি সর্বোত্তম– এ বিশ্বাস মূর্ত হয়ে ওঠে আল্লাহর ওপর মানুষের নির্ভরশীলতায়। মানুষ নিজের জন্য যা মঙ্গলজনক মনে করে তা পরিশেষে তার জন্য অমঙ্গল বয়ে আনতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-বাকারায় ঘোষণা করেছেন—

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, বস্তুত: তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই কল্যাণকর, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্যে বাস্তবিকই অনিষ্টকর, এবং আল্লাহই জানেন এবং তোমরা তা জান না। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২১৬)

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যা দ্বারা পরীক্ষা করেন তা সাধারণত ব্যক্তির নিজস্ব দরকার ও পরিপ্রেক্ষিতের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি মানুষের জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী পরীক্ষার আয়োজন করেন যাতে তার শ্রেষ্ঠ গুণাবলির উন্মেষ ঘটে। মানুষের ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত পরীক্ষার ভার অর্পিত হলে এবং প্রতিটি পরীক্ষায় ব্যর্থতার জন্য শাস্তি আপতিত হলে, তা হত অন্যায় ও অযৌক্তিক। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কখনও কারো সাথে অন্যায়াচরণ করেন না। যেমন সূরা আল-কাহ্ফে ঘোষণা করেন—

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۔

অর্থাৎ, তোমার পালনকর্তা কারো প্রতি যুলুম করেন না।

(সূরা কাহ্ফ : আয়াত-৪৯)

আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ, এ কারণে মানুষ দুনিয়াবী জীবনে যে সব পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে তার কোনটাই তার জন্য দূর্বহ বা সাধ্যের অতিরিক্ত নয়। মানুষকে উদ্বেগমুক্ত করতে আল্লাহ্ তা'আলা এ সত্য বারবার তুলে ধরেছেন মহিমাময় আল কুরআনে। যেমন সূরা আল-বাকারায় তিনি ঘোষণা করেন—

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۔

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ্ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৮৬)

আল্লাহ্ আরো অঙ্গীকার করেছেন যে, মানুষের জীবনে পরীক্ষা অবিরাম নয় বরং সাময়িক বিরতির পর পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত হবে। কারণ পরীক্ষা ক্রমাগত উপস্থিত হতে থাকলে মানুষের পক্ষে তা হবে দূর্বহ ও অসহনীয়। প্রতিটি পরীক্ষার শেষে আসে স্বস্তির বিরতি। এ মর্মে সূরা আল-ইনশিরাহ'য় আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۔

অর্থাৎ, কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে। অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।
(সূরা ইনশিরাহ : আয়াত-৫-৬)

নৈরাশ্য ও হতাশা

ইসলামে আত্মহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে। সূরা আন-নিসায় আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন—

وَلاَ تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۔

অর্থাৎ, এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল। (সূরা আন নিসা : আয়াত-২৯)

আত্মঘাতি ব্যক্তি যেন এ ভাষ্য উপস্থাপন করতে চায় যে, স্রষ্টা তার ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা অর্পণ করেছেন যা অন্যায় ও অসঙ্গত। সে সৃষ্টিকর্তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং পরিণামে কুফর বা অবিশ্বাসে পতিত হয়। বিশ্বাস বা ঈমানের অনুপস্থিতিতে তার অন্তরে স্রষ্টা প্রসঙ্গে বিরূপ ধারণা জন্ম নেয় এবং ক্রমশ হতাশা ও নৈরাশ্য তাদের গ্রাস করে। তাদের মুখে প্রায়ই এ বীতশ্রদ্ধ উক্তি ধ্বনিত হয়, "জীবন এতটাই অযৌক্তিক যে তা বয়ে বেড়ানো অর্থহীন"।

اِنَّهُ لاَ يَيْاَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ ۔

অর্থাৎ, কাফিরগণ ছাড়া কেউই আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ হয় না।
(সূরা ইউসুফ : আয়াত-৮৭)

এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জানিয়েছেন যে, তাঁর ব্যাপারে বিরূপ ধারণা পোষণকারীর শাস্তি জাহান্নামের অনন্ত নিকৃষ্ট আবাস। সূরা আল-ফাতহ' এ তিনি ঘোষণা করেন—

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۔

অর্থাৎ, এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা মহিলা, যারা আল্লাহ্ প্রসঙ্গে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। অকল্যাণ চক্র তাদের জন্য, আল্লাহ্ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে লা'নত করেছেন আর তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন; ওটা কত নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা ফাত্হ : আয়াত-৬)

আশা ও আকাঙ্ক্ষা

অন্যদিকে মহান আল্লাহ্প্রদত্ত ন্যায় ও করুণার প্রতিশ্রুতি মু'মিনের হৃদয় আত্মবিশ্বাস পূর্ণ করে যা ধৈর্যের সাথে কঠিন সময় মোকাবেলায় তার জন্য সহায়ক হয়। আল্লাহর দয়া ও করুণার আশা পোষণ করা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ধৈর্য সহকারে ন্যায়ের জন্য লড়াই করে তারাই তাঁর করুণার প্রত্যাশী। কারণ এমন ধৈর্যশীলদের জন্যই আল্লাহ তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতার ওয়াদা করেছেন।

يَـا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সাথে রয়েছেন। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৫৩)

اِنَّ الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوْا وَالَّـذِيْـنَ هَـاجَـرُوْا وَجَـاهَـدُوْا فِـىْ سَـبِـيْـلِ الـلّٰـهِ اُولٰـئِـكَ يَـرْجُـوْنَ رَحْـمَـتَ الـلّٰـهِ وَالـلّٰـهُ غَـفُـوْرٌ رَّحِـيْـمٌ ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় দেশ ত্যাগ করেছে ও ধর্মযুদ্ধ করেছে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহের প্রত্যাশী এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা বাকারা : আয়াত-২১৮)

আল্লাহর ওপর আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনের প্রতিদানস্বরূপ সবরকারীদের জন্য নির্ধারিত আছে জান্নাত। আল্লাহ্ তা'আলা এ পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে বিশ্বাসীদের বলেন–

وَبَشِّـرِ الـصَّـابِـرِيْـنَ الَّـذِيْـنَ اِذَاۤ اَصَـابَـتْـهُـمْ مُّـصِـيْـبَـةٌ قَـالُـوْۤا اِنَّـا لِـلّٰـهِ وَاِنَّـاۤ اِلَـيْـهِ رَاجِـعُـوْنَ ـ

অর্থাৎ, এবং ঐসব সবরকারীকে সুসংবাদ প্রদান কর, যাদের ওপর কোন বিপদ আপতিত হলে তারা বলে: নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই জন্যে এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৫৫-১৫৬)

যা কিছু দুর্যোগ মানুষের ওপর আসে তা মূলতঃ তার নিজ মন্দকর্মের প্রতিদান এ উপলব্ধি ব্যক্তির সবরের বিকাশে সহায়ক হয়। আল্লাহ্ মানুষকে এ সত্য স্মরণ করে দেন সূরা আশ-শুরায়—

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা শুরা : আয়াত-৩০)

মূলত: আল্লাহ্ মানুষের অধিকাংশ অপরাধ মাফ করে দেন। তিনি যদি প্রতিটি অন্যায়ের জন্য কঠোরভাবে শাস্তি দিতেন তবে দুনিয়ার বুকে কোন প্রাণীর অস্তিত্ত্ব থাকত না। সূরা আল-ফাতিরে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন—

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। (সূরা ফাতির : আয়াত-৪৫)

উপরিউক্ত আলোচনায় বোঝা গেল, ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার পরীক্ষাই মু'মিনের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। প্রকৃত বিশ্বাসীর জীবন মানবাচরণের চরমসীমার মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় অবিচলিত থাকে। জীবনের সুখ-সাফল্যে যেমন তারা কখনও স্রষ্টার স্মরণ থেকে বিমুখ হয় না, তেমনি প্রতিকূল সময়ের গভীর নৈরাশ্যও তাদের স্রষ্টার করুণা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থেকে হতাশ করে না। বরং তারা তাদের করুণাময় পালনকর্তাকে সর্বক্ষণ স্মরণ করে ও তাঁরই ওপর নির্ভর করে। সুহায়েব ইবনে সিনান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "ঈমানদার ব্যক্তির সব বিষয়ই আশ্চর্যজনক! তার সমস্ত জীবন কল্যাণময় এবং তা শুধুমাত্র ঈমানদার ব্যক্তির জন্যই। উত্তম সময় আসলে সে কৃতজ্ঞ হয় যা তার জন্য কল্যাণকর এবং মন্দ সময় আসলে সে ধৈর্য ধারণ করে যা তার জন্য কল্যাণকর হয়"। এ সেই ব্যক্তির অবস্থা যে আল্লাহর সকল সিদ্ধান্ত মেনে নেয় দ্বিধাহীন চিত্তে। উল্লেখ্য

যে, তাকদীরে নির্ধারিত ভাল-মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামে 'ঈমানের ষষ্ঠ স্তম্ভ' বলে বিবেচিত।

অন্যদিকে জীবনে ন্যূনতম পরীক্ষার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করলে যে কোন ঈমানদার ব্যক্তির উদ্বেগ বোধ করা স্বাভাবিক। এ অবস্থায় প্রকৃত বিশ্বাসীর উচিত তার জীবনের বাস্তবতা পর্যালোচনা করে দেখা। হয় তার ওপর আপতিত পরীক্ষাগুলো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান নয় বলে সে এ বিষয়ে অসচেতন আর নতুবা সে নিজে বিপথগামী হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার উদ্দেশ্য করে সূরা আত-তওবায় ঘোষণা করেছেন যে, পার্থিব সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা অবিশ্বাসীরা যে ভোগ-বিলাসের জীবন বেছে নিয়েছে তা তাদের জন্য শাস্তি বৃদ্ধির উপকরণ মাত্র।

وَلاَ تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلاَدُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন আশ্চর্য না করে; আল্লাহ শুধু এটাই চাচ্ছেন যে, এ সমস্ত বস্তুর কারণে ইহকালে তাদেরকে শাস্তিতে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণবায়ু কুফরীর অবস্থাতেই বের হয়। (সূরা আত-তওবা : আয়াত-৮৫)

তাই বলে ধারণা রাখা উচিত নয় যে, সমস্যা ও বিপদাপদ আমন্ত্রণের জন্য ঈমানদারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কারণ আল্লাহ স্বয়ং আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন : "হে আমাদের প্রভু! আমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন, আমাদের ওপর তদ্রূপ ভার অর্পণ করবেন না"। আল্লাহ যে সমস্ত পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন তা স্মরণ করে মানুষের কৃতজ্ঞ বোধ করা আবশ্যক। সুসময়ে ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ থাকা এবং পরীক্ষা প্রসঙ্গে উদাসীনতাকে প্রশ্রয় না দেয়া। কেননা সুখ-সাফল্যের উপস্থিতি প্রায়ই মানুষকে জীবনের পরীক্ষা সম্পর্কে উদাসীন ও অন্ধ করে রাখে।

অনুস্মারক

মাঝে মাঝে শাস্তি হিসেবে পরীক্ষা আগমন করে, মতিভ্রম ব্যক্তিকে তার বিভ্রান্তি স্মরণ করে দিতে ও তাকে সরল সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে। মানুষ

গোমরাহীর পথে পা বাড়ালে আশেপাশের হিতৈষীর সদুপোদেশে তার বোধোদয় হয় না। কিন্তু যার অন্তরে ঈমান সুপ্ত ছিল, নিজের অথবা নিকটজনের জীবনে অতর্কিত নেমে আসা কোন দুর্যোগ তাকে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। এতে সে নিজের ভুল উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হয়।

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ـ

অর্থাৎ, বড় শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি (পৃথিবীতে) অবশ্যই ছোট শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে। (সূরা সাজদাহ : আয়াত-২১)

মানুষকে তার বিপথগামিতা স্মরণ করে দিতে দুর্যোগরূপে যে সমস্ত পরীক্ষা আপতিত হয়, তা অন্য কোন মানুষের অমানবিক আচরণরূপে আবির্ভূত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ইসলামের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত বসনিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর আপতিত সার্বদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ঘটনা। অথবা কুয়েতে সাদ্দামের বর্বর বহিরাক্রমণ এবং প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বেসামরিক ইরাকবাসীদের ওপর আমেরিকার বাছবিচারহীন বোমা নিক্ষেপণের ঘটনা। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, অন্যের হাতে মানুষ যে নির্যাতন ও দুর্ভোগ পোহায় তা তাদের নিজ কর্মের প্রতিফল। তবে এ দুর্ভোগ তাদের সঠিক পথে ফিরে আসার সতর্কীকরণ হিসেবে কাজ করে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ـ

অর্থাৎ, মানুষের কৃতকর্মের কারণে সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা রূম : আয়াত-৪১)

কপটতা ও ভণ্ডামী

মানুষের মধ্যে যারা ঈমান আনয়নের মিথ্যা দাবিদার, জীবনে আপতিত পরীক্ষা কখনও তাদের স্বরূপ উন্মোচন করে দেয়। অবিশ্বাসীদের নিকট

এটাও স্পষ্ট করে তুলে যে, জাহান্নামের আবাস তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছে। এ জাতীয় দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয় যে, মানুষ ভুল কারণে ইসলামে প্রবেশ করে জীবনের পরীক্ষায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পুনরায় পূর্বের ধর্মে ফিরে গেছে। সূরা আল-আনকাবুতে আল্লাহ্ বলেন—

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ .

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি– একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যহতি দেয়া হবে? আমি তা তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আর আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবুত : আয়াত-২-৩)

শাস্তি

যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করতে তারা দুনিয়াবী ও পারলৌকিক উভয় জীবনে শাস্তি আস্বাদন করে। কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা অতীতের অগণিত জাতির ঘটনা উল্লেখ করেছেন যারা ঐশী বিধান প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের ধ্বংসকে আবশ্যক করে তুলেছিল। মানবজাতির জন্য এ সমস্ত কাহিনীতে আছে স্রষ্টার আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারীর পরিণতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সূরা আন-নূরে আল্লাহ্ বলেন—

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

অর্থাৎ, যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের ওপর আসবে অথবা আসবে তাদের ওপর কঠিন শাস্তি।

(সূরা আন-নূর : আয়াত-৬৩)

মানুষের ওপর শাস্তি আসতে পারে বিভিন্নভাবে। বর্তমান বিশ্বে যে এইড্স রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে তা যে মানবজাতির জন্য শাস্তিস্বরূপ, এ

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আশির দশকের শুরুতে এ রোগ প্রথম প্রকাশ পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসংযত যৌনসম্ভোগপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ব্যক্তিরাই এইড্সের শিকার হয়। প্রথমে সমকামী, এরপর উভকামী অত:পর নিয়ন্ত্রণহীন ইতররতি-প্রবণ এবং মাদকদ্রব্য সেবনকারীদের মধ্যে এইড্সের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি দেখা যায়।

সৃষ্টিকর্তা- নারী ও পুরুষের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্কে সীমাবদ্ধ দৈহিক মিলনের এবং মাদকদ্রব্য পরিহারের যে হুকুম আহকাম বিধিবদ্ধ করেছেন, এরা সবাই তার প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণকারী। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে যে, এক দেহ থেকে অন্য দেহে রক্ত স্থানান্তরের ফলে নিরীহ মানুষ অথবা নিষ্পাপ শিশুদের মাঝে মাঝে এইড্স রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। অবশ্য ডাক্তারী পরিসংখ্যানে এ জাতীয় রোগীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। সূরা আল-আনফালে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করেছেন যে, তাঁর শাস্তি আপতিত হলে তা শুধু সীমালঙ্ঘকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং গোটা সমাজ তাতে প্রভাবিত হবে।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

অর্থাৎ, তোমরা সে ফিতনাকে ভয় কর যা তোমাদের মধ্যকার জালিম ও পাপিষ্ঠদেরকেই বিশেষভাবে ক্লিষ্ট করবে না। (বরং সবারই মধ্যে এটা সংক্রমিত হয়ে পড়বে এবং সকলকেই বিপদগ্রস্ত করবে), তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহ শাস্তিদানে খুব কঠোর। (সূরা আনফল : আযাত-২৫)

চৌদ্দশ বছর পূর্বে নবী করীম ﷺ এ ধরনের ফিতনা বা পরীক্ষার ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : "মানুষের মধ্যে যখন অবাধ যৌনাচার বেড়ে যাবে তখন যন্ত্রণাদায়ক এক প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে যা পূর্ববর্তীদের কাছে অপরিচিত ছিল।" বলাবাহুল্য, এইড্স এ জাতীয় অসংখ্য রোগের মধ্যে একটি মাত্র নাম। এর পূর্বে ষাট ও সত্তরের দশকে 'হারপিস' নামে আরো একটি রোগের বিস্তার ঘটেছিল

উশৃঙ্খল সমাজে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি আমেরিকায় এ হারপিস মহামারী আকার ধারণ করেছিল এবং এখন পর্যন্ত এ রোগের কোন প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি। সত্তরের শেষের দিকে জনসমাজের দৃষ্টি হারপিস থেকে এইডস রূপান্তরিত হয়, কারণ হারপিসে জীবনাশংকা না থাকলেও এইড্‌সে আছে।

স্রষ্টা কেন বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করলেন?

সৃষ্টিকর্তা পৃথিবী ও এর মধ্যকার যাবতীয় বস্তু সৃষ্টির পেছনে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন সবশেষে ঐশীগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ـ

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্যে ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীনে করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে ওটা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিবসকে। (সূরা ইব্রাহীম : আয়াত-৩২-৩৩)

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তিনিই রাত্রির আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গীন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রজনীকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন : এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্বপরিজ্ঞ তার (আল্লাহর) নির্ধারণ। আর তিনিই তোমাদের জন্যে নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা এগুলোর সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার, স্থলভাগেও এবং সমুদ্রেও; নিশ্চয়ই আমি প্রমাণসমূহ খুব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি ঐ সব ব্যক্তির জন্যে যারা জ্ঞান রাখে। (সূরা আন'আম : আয়াত-৯৬-৯৭)

এ দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ ও উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের উপকারার্থে; তা সে মানবোদ্ভাবিতই হোক যেমন, নৌযান ইত্যাদি কিংবা হোক প্রাকৃতিক। সব কিছু মানুষের মঙ্গল সাধনের নিমিত্তে সৃষ্টিকর্তার অপার করুণা। কিন্তু এ দান দায়িত্বশূন্য নয়। মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দান স্বীকার করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তাঁর মহিমা প্রকাশ করা। উদাহরণস্বরূপ, সূরা আয-যুখরুফে কোন যানবাহন অথবা জীবে আরোহণের সময়ে মানুষকে নিম্নোল্লিখিত বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে—

لِتَسْتَوُوْا عَلٰى ظُهُوْرِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ.

অর্থাৎ, তারপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা এর ওপর (চতুষ্পদ জন্তুর পৃষ্ঠে) স্থির হয়ে বস; এবং বল: পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম নই। আমরা আমাদের পালনকর্তার নিকট অবশ্যই ফিরে যাব। (সূরা যুখরুফ : আয়াত-১৩-১৪)

মানুষের ওপর অর্পিত দায়িত্ব হলো, স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিজগতের যাবতীয় উপকরণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা। এটাই মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক জগতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অভিষ্ট লক্ষ্য। মানুষ আদিষ্ট হয়েছে দুনিয়াবী সম্পদ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করতে। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন :

"দুনিয়া সুন্দর ও শ্যামল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এর পরিচালক করে প্রেরণ করেছেন দেখতে তোমরা কোন আচরণ কর"। নিজের খেয়াল খুশী মত দুনিয়াবী উপকরণ অপব্যবহারের স্বাধীনতা মানুষকে দেয়া হয়নি। প্রকৃতির প্রতি বর্তমান বৈষয়িক সমাজের ভোগবাদী মনোভাব যে ঐশী বিধানের বিপরীতে ধাবমান তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রকৃতিকে বস্তুবাদী সমাজ এমন এক দুশমন হিসেবে গণ্য করে যাকে জয় করাই তার প্রধান লক্ষ্য। এভারেস্টের সৌন্দর্য দেখা যথেষ্ট নয় বলে প্রতি বছর শৃঙ্গ জয়ের অভিযানে বহু প্রাণ হারিয়ে যাচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণরত বিভিন্ন রকম জীবজন্তুর বৈচিত্রে বিস্মিত হওয়াতে মানুষের তৃপ্তি মেটেনি, পশ্চিমের বৈঠকখানা সুশোভিত করতে গত কয়েক শতকে শিকার অভিযানের নামে নিরীহ প্রাণী দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়েছে। নির্বিচারে বন্যপশু হত্যা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হলেও, রাইনোসেরসের মত অনেক প্রাণী ক্রমশ: বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। দূরপ্রাচ্যে ঐতিহ্যবাহী কামোদ্দীপক ঔষধ প্রস্তুতের জন্য মূল্যবান উপাদান হিসেবে রাইনোসেরস-শৃঙ্গের অসাধারণ চাহিদা এর কারণ।

প্রাণীজগত

ইসলামের নিছক ক্রীড়া ও আমোদের উদ্দেশ্যে নিরীহ প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ এবং তা স্রষ্টার দৃষ্টিতে অন্যতম জঘন্য অপরাধ বলে বিবেচিত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "কোন জীবন্ত প্রাণীকে লক্ষ্য-ভেদের নিশানা হিসেবে ব্যবহার করে না। খাদ্য-বস্ত্রের চাহিদা মেটানো ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া কোন প্রাণীর জীবন কেড়ে নেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বাস্তবে আনন্দ-উপভোগের জন্য প্রাণসংহার একটি নিম্নমানের ঘৃণ্য আচরণ। এমনকি সামাজিক অপরাধে দায়ী কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিতে অথবা খাবারের জন্য কোন প্রাণীকে হত্যা করতে হলেও, তা হতে হবে যথাসম্ভব যন্ত্রণাহীন উপায়ে। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা), নবী করীম ﷺ থেকে দুটি বিষয় স্মরণ করে বলেন : "আল্লাহ্ প্রত্যেক জিনিসের প্রতি দয়া-মায়াপূর্ণ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছেন। অতএব তোমরা কোন প্রাণীকে হত্যা করলে

উত্তমভাবে যবেহ্ করবে। তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার ছুরিকে শাণিত করে নেয় এবং যবেহ্ করার প্রাণীকে আরাম দেয়"। পশ্চিমের তথাকথিত কিছু 'পশু-প্রেমিক'কে প্রাণী যবাইয়ের ইসলামী পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের তরিতাহত অথবা মস্তকচূর্ণ করে হত্যা করার বিকল্প পদ্ধতি অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক। অত্যধিক ধারালো ছুরি দ্বারা যবাই করা হলে, অন্তর ক্যারোটিড শিরা থেকে রক্ত সঞ্চালন করবার সময় প্রাণীটি কিছু বুঝে উঠবার পূর্বেই চেতনা হারিয়ে ফেলে।

মুসলিম গৃহে অনভিপ্রেত যে কুকুর, তার ক্ষেত্রেও দয়া-মায়া প্রদর্শনের নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "এক ব্যক্তি হাঁটতে হাঁটতে পিপাসার্ত হয়ে পড়ল। পথে একটি কূপে নেমে সে তৃষ্ণা মিটাল। ফেরার সময় সে লক্ষ্য করল একটি কুকুর তীব্র পিপাসায় হাঁপাচ্ছে আর মাটি চাইছে। ব্যক্তিটি (নিজেকে) বলল, জন্তুটি আমার মতই তৃষ্ণার্ত। সে কূয়ায় নেমে তার জুতা পানিপূর্ণ করল।

অত:পর জুতাটি দাঁতে কামড়ে ধরে কূয়ার দেয়াল বেয়ে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ্ এ কাজ কবুল করলেন ও তাকে ক্ষমা করে দিলেন (এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট করালেন)"। মানুষ জানতে চাইল, "হে আল্লাহ্র নবী ﷺ! জীবজন্তুর সেবা করেও কি পুণ্য অর্জন করা সম্ভব?" জবাবে তিনি বললেন : "প্রত্যেকটি প্রাণীর সেবার জন্য আছে একটি নেকী"।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের এক পতিতাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যে তার জুতা ওড়নায় বেঁধে (কূয়া থেকে) পানি তুলে এক মৃতপ্রায় তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পান করিয়েছিল। এরই জন্য আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন"। অন্যদিকে জীবজন্তুর অনিষ্ট করা ইসলামী শরিয়তে গুরুতর পাপ হিসেবে বিবেচিত। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "একজন নারী একটি বিড়ালকে আমৃত্যু আটকে রাখার কারণে জাহান্নামের শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। বিড়ালটিকে মহিলা না খেতে দিয়েছিল, না পান করিয়েছিল আর না সে তাকে মাটি থেকে ইঁদুর ধরে খাবার জন্য ছেড়ে দিয়েছিল"।

কখনও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন জীবজন্তুকে আঘাত করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। যেমন- জায়গা থেকে অপসারণের জন্য প্রাণীর ওপর বল প্রয়োগ করা কিংবা চিহ্নিত করার জন্য সীল মারা ইত্যাদি। এ সমস্ত পরিস্থিতিতেও আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, "নবী করীম ﷺ পশুর চেহারায় আঘাত কিংবা সীল মারতে নিষেধ করেছেন"।

উদ্ভিদ জগত

পৃথিবীর প্রতি মানুষের দায়িত্ব শুধুমাত্র জীবজন্তুর প্রতি করুণাপূর্ণ আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহর বিধানে উদ্ভিদ জগতও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচ্য। বিষয়টি এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে, যুদ্ধবিগ্রহে নিয়োজিত থাকাকালে যে কোন ফলের বৃক্ষ কাটতে ও ধ্বংস করতে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামে বৃক্ষরোপন এক প্রকার সদাকাহ্ হিসেবে বিবেচিত। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "কোন মুসলিম একটি বৃক্ষরোপন করলে সদাকার প্রতিদান লাভ করবে। এ থেকে যা খাওয়া হয় তা সদাকা যা চুরি যায় তা-ও সদাকা। এ থেকে লাভবান হয় তা বৃক্ষরোপনকারীর জন্য সদাকার প্রতিদান অর্জনের কারণ হয়"। অবহেলা না করে যদিও তা জীবনের সর্বশেষ আমল হয়।

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "যদি শেষ বিচার দিবস তার উচিত সম্ভব হলে পুনরুত্থানের পূর্বেই তা বপন করা"। সুতরাং বোঝা যায়, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের যাবতীয় বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা স্রষ্টার প্রতি মানুষের পবিত্র কর্তব্যাবলির অন্যতম। বর্তমানের বৈষয়িক ও ভোগবাদী সমাজ বিপুল আকারে পরিবেশ দূষণ ও বন্যজন্তুর প্রাকৃতিক আবাস নির্মূলের যে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তা প্রতিরোধের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা অপরিহার্য। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী, এ দায়িত্বে অবহেলা করা অন্যায় এবং তা কার্যকর করা অন্যতম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের সর্বোত্তম

ড. বিলাল ফিলিপস্

সংকলন

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

সম্পাদনা

মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা।

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামের সর্বোত্তম

বিশ্বাসীগণ

১. সুমহান আল্লাহ্ আল-কুরআনে ঘোষণা করেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ .

অর্থাৎ, তোমরাই উত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে, অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। (সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-১১০)

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন–

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ . اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلاَ تَعْجَزْ ، وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ : لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلٰكِنْ قُلْ : قَدْرُ اللّٰهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ .

অর্থাৎ, শক্তিশালী মু'মিন উত্তম এবং আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিনের চেয়ে অধিক প্রিয়[1], যদিও উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যা তোমাকে

---

১. এখানে শক্তিশালী বলতে আত্মিক এবং শারীরিক উভয় প্রকারের শক্তি বুঝানো হয়েছে।

উপকার দান করবে তার প্রতি আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও এবং অপারগতা প্রকাশ করো না। যদি তোমার ওপর কোন বিপদ চাপে তাহলে আমি 'যদি' এরূপ এরূপ করতাম তাহলে এ হতো না, এরূপ বলিও না; বরং বল : আল্লাহ্‌র নির্ধারণ এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন; কেননা 'যদি' শয়তানের কাজের পথকে খুলে দেয়।' (সহীহ্ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১৪০১ নং ৬৪৪১)

৩. আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ বলেন–

خِيَارُكُمْ اَطْوَلُكُمْ اَعْمَارًا، وَاَحْسَنُكُمْ اَخْلاَقًا .

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যারা দীর্ঘজীবী এবং সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। (মুসনাদে আহমাদ)

৪. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন–

خِيَارُكُمْ اَطْوَلُكُمْ اَعْمَارًا، وَاَحْسَنُكُمْ اَعْمَالاً .

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যারা দীর্ঘজীবী এবং সর্বোত্তম আমল বা কাজের অধিকারী। (আহমদ এবং আল হাকীম, তিরমিযী আব্দুল্লাহ ইবন বুসর)

৫. আবু বকর (রা) উল্লেখ করেন, নবী মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন –

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهٗ وَحَسُنَ عَمَلُهٗ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهٗ وَسَاءَ عَمَلُهٗ .

অর্থাৎ, সর্বোত্তম মানুষ ঐ ব্যক্তি যার জীবন দীর্ঘ এবং কাজ ভাল, সর্বনিকৃষ্ট মানুষ ঐ ব্যক্তি যার জীবন দীর্ঘ এবং কাজ খারাপ।

(মুসনাদে আহমদ, আলহাকীম এবং তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ খ-২, পৃ-১০৯৪)

ব্যবসা-বাণিজ্য

৬. মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً .

অর্থাৎ, যখন তোমরা পরিমাপ কর তখন পূর্ণভাবে পরিমাপ কর এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ওজন দাও এবং পরিণামে সেটাই সর্বোত্তম এবং কল্যাণকর।

(সূরা–১৭ বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩৫)

৭. সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আরো বলেন–

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের উদ্দেশ্যে দ্রুত অগ্রসর হও এবং ব্যবসা ও কাজকর্ম বন্ধ কর। তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জান।

(সূরা–৬২ আল-জুমু'আহ : আয়াত-৯)

৮. আবু বুরদাহ ইবনে নিয়ার বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الْكَسْبِ بَيْعٌ مَبْرُوْرٌ ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ .

অর্থাৎ, সর্বোত্তম উপার্জন হলো যা কল্যাণকর ব্যবসা[১] থেকে অর্জিত এবং যা ব্যক্তি তার স্বহস্তে হালাল উপায়ে অর্জন করে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী ফিল কবীর)

৯. আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لَاَنْ يَحْتَطِبَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهٖ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ اَحَدًا فَيُعْطِيَهٗ اَوْ يَمْنَعَهٗ .

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তার নিজ পিঠে করে জ্বালানি কাঠ বহন করা (এবং তা বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করা) অন্য কারো নিকট (সাহায্য)

---

১. হালাল ব্যবসা, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যবসা, যা হালাল পথে উৎপাদিত এবং কোনরূপ প্রতারণা মুক্ত।

প্রার্থনা করার চেয়ে উত্তম, তাতে কেউ দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।'[২] (সহীহ আল-বুখারী, খ-২, পৃ-৩১৯, নং ৫৪৯) (সহীহ মুসলিম, খ-২, পৃ-৪৯৭-৮, নং ২২৬৭) (মুয়াত্তা ইমাম মালিক পৃ-৪২৭ নং ১৮২৩) (মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৩৯০)

১০. ছাওবান (রা) বলেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

اَفْضَلُ الدَّنَانِيْرِ : دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى عِيَالِهٖ ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى دَابَّتِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

অর্থাৎ, মুদ্রাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম মুদ্রা (টাকা) হলো যা ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে, যে মুদ্রা তার আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার প্রাণির জন্য ব্যয় করে এবং যে মুদ্রা সে তার দ্বীনী ভাইদের জন্য ব্যয় করে।
(সহীহ মুসলিম, খ-২, পৃ-৪৭৮ নং ২১৮০) (সুনানে তিরমিজি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ এবং আহমাদ। মিশকাতুল মাসাবীহ খ-১, পৃ-৪১০)

চরিত্র

১১. ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

اَفْضَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا .

অর্থাৎ, সর্বোত্তম মু'মিন হলো তারা যারা চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।

(ইবন মাজাহ ও আল-হাকীম)

---

২. কুবাইসাহ ইবনে মুখারিক বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন যে, ভিক্ষা (প্রার্থনা) শুধু নিম্নলিখিত যেকোন অবস্থায় অনুমোদিত।

ক. যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, এমতাবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ আদায় হওয়া পর্যন্ত।

খ. যার সম্পদ প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়েছে, তার আহারের সংস্থান হওয়া পর্যন্ত।

গ. দারিদ্র্যক্লিষ্ট ব্যক্তি, সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত। তবে শর্ত থাকে যে, তার গোত্র থেকে তিনজন ভদ্র ব্যক্তি তাঁর দারিদ্র্যক্লিষ্টতার সাক্ষ্য দিবে। রাসূল ﷺ বলেন এর বাইরে সাহায্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) হারাম এবং হে কুবাইসাহ তা ভক্ষণ হারাম। (সহীহ মুসলিম খ-২, পৃ-৪৯৮, নং২২৭১, সুনানে আবু দাউদ খ-২, পৃ-৪৩০ নং ১৬৩৬)

১২. ইবন আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

خِيَارُكُمْ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلاَقًا .

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যিনি চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। (সুনানে আহ্মাদ, আত্তায়ালেসী, সহীহ্ আল-বুখারী, খ-৮, পৃ-৩৯ নং-৬১, সহীহ্ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২৪৪, নং ৫৭৪০)

দান

১৩. মহামহিম আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ .

অর্থাৎ, যদি তুমি প্রকাশ্যে দান কর তবে উহা ভাল। আর যদি তুমি এটি গোপন কর এবং দরিদ্রদের দাও তা হবে তোমার জন্য উত্তম, এতে আল্লাহ্ তোমাদের (কিছু) পাপ মোচন করবেন। (সূরা–২ আল-বাকারাহ : আয়াত-২৭১)

১৪. সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ, যদি কোন ঋণগ্রস্তের সমস্যা থাকে (ঋণ পরিশোধে) তাহলে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত সময় দান কর। যদি তুমি তাকে দান কর তাই উত্তম যদি তুমি উপলব্ধি কর।[৩] (সূরা–২ আল-বাকারাহ : আয়াত-২৮০)

---

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কোন এক ব্যক্তি লোকদের ঋণ দিত এবং তার (আদায়কারী) চাকরকে বলত : "ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয় তাহলে তাকে মাফ করে দিও, এতে হয়ত আল্লাহ আমাদের মাফ করে দিবেন, যখন তিনি আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হলেন (মৃত্যুর পর) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (সহীহ বুখারী, খ-৪, পৃ-৪৫৫, নং ৬৮৭)

১৫. আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন -

اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، اَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ, সর্বোত্তম দানগুলো হলো– ক. আল্লাহর রাস্তায় তাঁবুর ছায়া, খ. আল্লাহর রাস্তায় ক্রীতদাস দান করা, গ. আল্লাহর রাস্তায় বয়স্কা উটনী[৪] দান করা। (সুনানে আহমদ, তিরমিযী, আদী ইবন আবু হাতীম থেকেও তিরমিযী বর্ণনা করেন। মিশকাতুল মাসাবীহ খ-১, পৃ-৮১২-৩)[৫]

১৬. হাকীম ইবন হিজাম থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ .

অর্থাৎ, সর্বোত্তম দান হলো তা, যা কেউ অতিরিক্ত অর্থ থেকে দান করে, উপরের হাত (দাতার হাত) নিচের হাত (গ্রহীতার হাত) থেকে উত্তম।[৬] নির্ভরশীলদের থেকে তুমি তোমার দান শুরু কর। (সুনানে নাসায়ী, আহ্মাদ, সহীহ মুসলিম খ-২, পৃ-৪৯৫, নং-২২৫৪, সুনানে আবু দাউদ খ-২, পৃ-৪৪০, নং ১৬৭২, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৪১০, একই বর্ণনা আবু হুরাইরাহ থেকে সহীহ আল-বুখারী, খ-২, পৃ-২৯২, নং ৫০৮)

---

৪. বয়স্কা উটনী (طَرُوْقَةُ) হলো ঐ উটনী যা বাচ্চা জন্মদানের উপযুক্ত হয়েছে। Arabic English Lexicon. V-2, P—1849

৫. 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সৈনিককে অস্ত্রদান করেন, তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার দেখাশুনা করেন তিনি যোদ্ধার সমান।' (সহীহ মুসলিম, খ-৩, পৃ-১০৫০-১, নং ৪৬৬৮)

৬. উপরের হাত হলো দানের হাত এবং নিচের হাত হলো গ্রহীতার হাত। অর্থাৎ উপকারীর হাত উপকৃতের হাত থেকে উত্তম। ইসলামে বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ভিক্ষা করা নিষেধ। রাসূল ﷺ বর্ণনা করেন যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়া ভিক্ষা করে, সে বিচারের দিবসে আল্লাহর সম্মুখে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় গোশ্ত থাকবে না। (সহীহ আল-বুখারী, খ-২, পৃ-৩২১, নং ৫৫৩, সহীহ মুসলিম খ-২, প-৪৭৯, নং ২২৬৫)

১৭. আবু আইয়ুব এবং হাকীম ইবন হিজাম বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلٰى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

অর্থাৎ, সর্বোত্তম দান হলো যা নিঃস্ব আত্মীয়কে দেয়া হয়।'[৭] (মুসনাদে আহমাদ, আত্তাবারানী, আদাবুল মুফরাদ, ইমাম তিরমিজি আবু সাঈদ থেকে এবং হাকীম উম্মে কুলসূম বিনতে উকবা থেকে বর্ণনা করেছেন।)

১৮. আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ .

অর্থাৎ, সর্বোত্তম দান হলো তা যা কষ্টের মধ্যেও কোন নিঃস্ব ব্যক্তিকে দেয়া হয় এবং তুমি তোমার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি থেকে তোমার দানকে শুরু কর। (সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৪৪০ নং ১৬৭৩)

১৯. আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন –

اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ ، تَأْمَلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ ، وَلاَ تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ : لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، اَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ كَذَا .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম দান হলো সুস্থ ও মন ভাল থাকা অবস্থায় দান করা।[৮] যখন সম্পদের আশা ও দারিদ্র্যতার ভয় করা হয়। আত্মা কণ্ঠনালীতে আসা পর্যন্ত (মৃত্যু) অপেক্ষা করো না। অতঃপর বলবে : এগুলো হলো অমুকের, ঐ

---

৭. দান করা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অত্র হাদীসে আল্লাহর কালাম এ বাণীকে ব্যাখ্যা করে: "ভাল কাজ এবং মন্দকাজ সমান নয়, মন্দকে উত্তম দিয়ে প্রতিরোধ কর তাহলে তোমাদের মধ্যকার শত্রুতা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হবে।'

(সূরা–৪১ ফুসসিলাত : আয়াত-৩৪)

৮. বিনয়ের সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক গুণ তখন অর্জিত হয় যখন সে লোভ ত্যাগ করতে পারে।

জিনিসগুলো অমুকের, এটা যখন অমুকের হয়ে গেছে তখন।'[৯] (সহীহ আল-বুখারী, খ-২, পৃ. ২৮৬ নং-৫০০, সহীহ মুসলিম, খ-২ পৃ.-৪৯৪, নং ২২৫০, আবু দাউদ, নাসায়ী এবং আহমদ)

২০. সা'দ ইবন উবাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন -

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ سَقْيُ الْمَاءِ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম দান হলো জনগণকে সুপেয় পানি পান করানো।'[১০] (সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৪৪১ নং ১৬৭৫, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবন হিব্বান এবং আল-হাকীম, আবুল ইয়ালা (রা) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন)।

---

৯. উন্নত মানের গুণ বা কল্যাণ তখন দানের দ্বারা হয় না যখন কেউ মৃত্যুর মুখোমুখি হয় এবং সম্পদ সহজেই অন্যের হাতে চলে যাচ্ছে।

১০. পানির উৎস, যেমন কূপ অথবা ঝর্না, (চাপ কল), যা জনগণের ব্যবহারের জন্য রাখা হয়। ঐ সময় আরবে পানির বড়ই অভাব ছিল, তখন এ ধরনের কাজের খুবই গুরুত্ব ছিল। এমনকি এখনো নদী ও সাগরের দূষণের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পানির অভাবে এর ভূমিকা বিরাট। একজন জাতিসংঘ কর্মী বর্ণনা করেন যে, প্রায় দশ কোটি লোক বর্তমানে বিশুদ্ধ পানির অভাবে ভুগছে (খালিজ টাইম্‌স, শুক্রবার, ১৯৯৮)

এ হাদীসের আরেকটি নির্ভরযোগ্য ভাষ্য সুনানে আবু দাউদে (হাদীস নং ১৬৭৭) সাদ (রা) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! উম্মে সাদ ইন্তিকাল করেছেন। (তার নামে) দানের সর্বোত্তম পদ্ধতি কি?' তিনি উত্তর দিলেন 'পানি'। সুতরাং তিনি একটি কূপ খনন করলেন এবং বললেন : 'এটা উম্মে সা'দ এর জন্য'। এ উক্তি থেকে একথা বুঝা যায় যে, মৃত আত্মীয়-স্বজনের নামে দান করলে তারা এর দ্বারা উপকৃত হয়। বহু হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন– হাজ্জ, সাওম ও দু'আ মুনাজাত ইত্যাদি। প্রশ্ন উঠে এটা কি তাদের শেষ বিচারের দিনে উপকারে আসবে নাকি কবরেও উপকার করবে? যখন কারো পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা হয় (মৃত) নবী ﷺ ইরশাদ করেন : 'এখন তার চামড়া ঠাণ্ডা হয়েছে। (সুনানে আহমদ, আহকামুল জানাইয, পৃ-১৬) রাসূল ﷺ এও বলেছেন : কবর হয়তো জান্নাতের একটি টুকরা অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত। এটা কিছুটা বৈসাদৃশ্য যে, কেউ কবরে জাহান্নামের আগুন ভোগ করছে, অন্যের আমলের দ্বারা জান্নাতের স্বাদ আস্বাদন করবে। তবে এটা সাদৃশ্যপূর্ণ যে, অন্যের সাহায্যের দ্বারা প্রবল শাস্তি লাঘব হয়। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

ইহুদি-খ্রিস্টান

২১. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ .

অর্থাৎ, ‘কিতাবধারী লোকেরা (ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ) যদি বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে তাদের জন্য উত্তম হতো, তাদের মধ্যে কিছু আছে ঈমানদার বেশিরভাগই অপরাধী।’ (সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-১১০)

২২. মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন–

يٰۤاَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلاَ تَقُوْلُوْا ثَلاَثَةٌ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحَانَهٗ .

অর্থাৎ, ‘হে কিতাবধারী (ইহুদি ও খ্রিস্টান) গণ তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না। মসীহ, মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ) আল্লাহর রাসূল এবং তার বাণী (অর্থাৎ তার কালিমা বা যে বাক্যের দ্বারা ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়েছে) যা তিনি মরিয়মের ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তিনি একটি আত্মা যা আল্লাহর সৃষ্ট। সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আন। ‘তিন’ বলো না। এটা পরিত্যাগ করাই তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা আল্লাহই একক মা‘বুদ এবং তিনি পুত্র গ্রহণ করা থেকে অত্যন্ত পবিত্র।’ (সূরা –৪ আন নিসা : আয়াত-১৭১)

পোশাক

২৩. মহান আল্লাহ্ বলেন–

يَا بَنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ـ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ .

অর্থাৎ, 'হে আদম সন্তান, আমরা (আরবিতে সম্মানার্থে আমরা ব্যবহৃত হয়েছে) তোমাদেরকে পোশাক দিয়েছি তোমাদের গুপ্তাঙ্গসমূহ ঢাকার জন্য এবং অলঙ্কার হিসেবে। তবে আল্লাহ্‌ভীতিই সর্বোত্তম পোশাক।'

(সূরা–৭ আল-আরাফ : আয়াত-২৬)

২৪. সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ .

অর্থাৎ, 'যে সব নারীদের ঋতু হয় না অথবা যারা বিয়ের প্রত্যাশা করে না, তারা যদি উপরিভাগের পোশাক কিছুটা হাল্কা করে তাতে কোন সমস্যা নেই, তাদের সৌন্দর্য প্রকাশের ইচ্ছে থাকতে পারবে না। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।' (সূরা–২৪ আন নূর : আয়াত-৬০)

২৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، اَلْبِسُوْهَا اَحْيَاءَكُمْ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম পোশাক হলো সাদা[১১]। তোমরা জীবিতদের এর দ্বারা পোশাক পরাও এবং মৃতদের কাফন পরাবে।' (দারু কুতনী, সুনানে ইবন মাজাহ খ-২, পৃ-৩৮০, নং-১৪৭২, সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১১৩৪ নং ৪০৫০ ইবন আব্বাস (রা) থেকে।

১১. যেহেতু ইসলাম পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দিয়েছে। এজন্য সাদা বেশি পছন্দনীয়। কেননা এটা পরিচ্ছন্ন রাখতে বেশি ধোয়ার প্রয়োজন হয়।

২৬. উম্মে সালামাহ (রা) বলেন-

كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ : اَلْقَمِيْصُ .

অর্থাৎ, 'আল্লাহর রাসূল সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন লম্বা জামা।'[১২]

(সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১১২৬ নং ৪০১৪, খ-২, পৃ-৭৬১, নং ৩৩৯৬)

২৭. কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন -

اَىُّ اللِّبَاسِ كَانَ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَوْ اَعْجَبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ : اَلْحِبَرَةُ .

অর্থাৎ, 'কোন পোশাক আল্লাহর রাসূলের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বা সবচেয়ে পছন্দের ছিল? তিনি উত্তর দিলেন ডোরাকাটা সুতীর কাপড়।'[১৩]

(বুখারী, মুসলিম এবং আবু দাউদ, সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১১৩৩, নং ৪০৪৯)

২৮. আল-বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূল ﷺ কে একটি রেশমী পোশাক দেয়া হয় এবং লোকেরা এর সৌন্দর্য এবং কোমলতায় আশ্চর্য হলে তিনি ইরশাদ করেন-

لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ اَفْضَلُ مِنْ هٰذَا .

অর্থাৎ, 'সা'দ ইবন মু'আয[১৪] (রা)-এর জান্নাতের হাত রুমাল এর চেয়েও উত্তম।' (সহীহ আল-বুখারী, খ-৩, পৃ-৪৭৫ নং ৭৮৫)

---

১২. নবী করীম ﷺ লম্বা জামা বেশি পছন্দ করতেন, যা সারা শরীরকে আবৃত করে। তিনি স্কার্ট-এর মত ইজার পড়তেন যা কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখত।

১৩. حِبَرَةٌ (হিবারাহ) হলো ডোরাকাটা সাজানো এক প্রকার ইয়ামানি কাপড়। যার রং সবুজ হতো। এটি আরবদের কাছে সর্বোত্তম।

১৪. সাদ ইবন মু'আয (রা) মদিনার আওস গোত্রের একজন নেতা। রাসূল ﷺ এর মদিনা আগমনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী ইসলামের পথে ত্যাগ-তিতিক্ষার স্বাক্ষর রাখেন। বদর, ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। খন্দকের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন। বনু কুরাইজার ব্যাপারে সঠিক ফায়সালা দান করার পর শাহাদাতবরণ করেন।

সঙ্গী

২৯. ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ .

অর্থাৎ, 'আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম বন্ধু তারা যারা তাদের বন্ধুদের নিকট সর্বোত্তম এবং সর্বোত্তম প্রতিবেশী তারা যারা তাদের প্রতিবেশীদের নিকট সর্বোত্তম।' (সুনানে আহমদ এবং তিরমিজী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-২, পৃ-১০৩৭)

৩০. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ اٰلاَفٍ، وَلاَ تُهْزَمُ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِّنْ قِلَّةٍ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম সঙ্গী হলো চারজনের দল,[১৫] সর্বোত্তম যুদ্ধের দল হলো চারশত জন,[১৬] সর্বোত্তম সেনাদল হলো চার হাজারের সেনাদল এবং বার হাজারের সেনাদল কখনো কম সংখ্যক হওয়ার কারণে পরাজিত হবে না।'[১৭] (সুনানে আবু দাউদ খ-২, পৃ-৭২২, নং ২৬০৫, সুনানে তিরমিজী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-২, পৃ-৮২৮)

---

১৫. ইমাম গাযালী (র) ব্যাখ্যা করেন যে, ভ্রমণের সময় দুটি মৌলিক জিনিসের প্রয়োজন– ক. নিরাপত্তা, খ. প্রয়োজন পূরণ– যদি দুজনের একটি দল হয় তাহলে একজনের পিছনে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে অন্যজন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে এবং তার প্রয়োজন একাকী পূরণ করতে হয়। তিন জনের দল হলে দু'জন একে অপরকে নিরাপত্তা দিলেও অপরজন একাকী পড়ে তার প্রয়োজন পূরণ করে, অথবা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। চারজন হলে দু'জন প্রয়োজন পূরণের জন্য একত্রে যেতে পারে বাকি দুজন একত্রে অন্য কাজ করতে পারে। পাঁচ জন হলে একজন প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে পড়ে। (আউনুল মাবুদ, খ-৪, পৃ-১৯৩) তবে আমর বিন শু'আইব তার দাদা থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার দ্বারা তিনজনের দলও উত্তম। (সুনানে আবু দাউদ খ-২, পৃ-৪১৪, নং ২২৭১)

১৬. ইবন রাসলান বলেন ৩০০ থেকে ৪০০ সংখ্যাটি উত্তম কারণ বদর যুদ্ধের সৈন্য সংখ্যা এরূপ ছিল।

১৭. রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ এরূপ। যদি তারা পরাজিত হয় তাহলে অন্য কারণ। যেমন, অহঙ্কার, পদশোভা ইত্যাদি।

সৃষ্টি

৩১. সুমহান আল্লাহ্ বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ .

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তারাই হলো সর্বোত্তম সৃষ্টি।' (সূরা– ৯৮ আল বাইয়্যিনাত : আয়াত-৭)

দিবস

৩২. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ اَيَّامِ الدُّنْيَا اَيَّامُ الْعَشْرِ .

অর্থাৎ, 'পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম দিনগুলো হলো রমাদানের (রমজানের) শেষ দশ দিন।'[১৮](আল-বাজ্জার)

৩৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন

اَفْضَلُ الْاَيَّامِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ .

অর্থাৎ, 'আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম দিন হলো শুক্রবার, যা হলো সমবেত হওয়ার দিন।' (বাইহাকী ফী শু'আবিল ঈমান)

৩৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনে কুরত (রা) উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ اَعْظَمَ الْاَيَّامِ عِنْدَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ .

অর্থাৎ, 'মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় দিন হলো কুরবানির[১৯] দিন এরপর হলো বিশ্রামের দিন।'[২০]

(সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৪৬৩ নং ১৭৬২)

---

১৮. কারণ লাইলাতুল কদর এ দশ দিনের মধ্যেই।

১৯. যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ যখন হাজিগণ পশু কুরবানি করেন এবং দরিদ্রদের মধ্যে গোশত বন্টন করেন। হাজিগণ ছাড়া যারা আছেন তাঁরাও। এ দিনটি হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর পরিবর্তে পশু কুরবানির জন্য স্মরণীয়।

২০. يَوْمُ الْقَرِّ ঐ দিনকে বলে যেদিন হাজিগণ কাবা শরীফের চূড়ান্ত তাওয়াফের পর মিনায় বিশ্রাম নেন।

ঋণ

৩৫. আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার ঋণ পরিশোধে সর্বোত্তম।'[২১] (সহীহ আল-বুখারী, খ-৩, পৃ-২৮৪-৫, নং ৫০১, সহীহ মুসলিম, খ-৩, পৃ-৮৪৩, নং ৩৮৯৮)

কাজ

৩৬. সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ বলেন–

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً .

অর্থাৎ, 'সম্পদ এবং সন্তান এ জীবনের অলংকার বা সৌন্দর্য; কিন্তু সুন্দর হলো ঐ জিনিসগুলো যা স্থায়ী,[২২] যার উত্তম পুরস্কার আপনার প্রভুর নিকট রয়েছে এবং যা হলো আশার উত্তম উৎস[২৩]।' (সূরা আল কাহফ– ১৮ ঃ ৪৬)

৩৭. মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন–

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ .

অর্থাৎ, 'যেই স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করে, এটা তার জন্য উত্তম।'

(সূরা–২ আল-বাকারা : আয়াত-১৮৪)

---

২১. ঋণ পরিশোধকে খুব জোর দিয়ে সত্যিকার ঈমান-এর অংশ গণ্য করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : 'মু'মিনের আত্মা সন্দেহের মধ্যে থাকে যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়।'
(সুনানে ইবন মাজাহ, তিরমিজী, আহমদ, ইবন মাজাহ খ-২, পৃ-৫৩ নং ১৯৫৭, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৬২৩-৪)

২২. যে সব ভাল কাজ স্থায়ী নয় তা হলো লোক দেখানো অথবা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থে করা হয়। সেগুলোর ফল আখিরাত পর্যন্ত স্থায়ী হবে না।

২৩. পরবর্তী অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী জিন্দেগীর জন্য ভাল জিনিস আশা করা, যেমন আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ দুনিয়ার আশা করা হলো ভিত্তিহীন।

৩৮. সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আরো বলেন–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا .

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তিই ভাল কাজ করে[২৪], সে এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান লাভ করবে।' (সূরা আন নামল– ২৭ : ৮৯, সূরা আল কাসাস– ২৮ : ৮৪)

৩৯. মায়িজ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بِرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْاَعْمَالِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ اِلٰى مَغْرِبِهَا .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান[২৫]এর পর জিহাদ, এরপর হলো মাকবুল হাজ্জ, যা অন্যান্য সব আমলের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠতর যেমন সূর্যের উদয় ও অস্তস্থলের ব্যবধান।'

(তাবারানী ফিল মু'জামুল কাবীর, সুনানে আহমদ ইবন হিব্বান)

৪০. ছাওবান (রা) হতে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَعْمَالِكُمْ اَلصَّلَاةَ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلَّا مُؤْمِنٌ .

অর্থাৎ, 'সোজা হয়ে চল, যদিও তোমরা সব সময়েই নেককার হিসেবে থাকতে পারবে না। জেনে রাখ তোমার সর্বোত্তম কাজ হলো সালাত, কেবল প্রকৃত মু'মিনগণই অজুর সংরক্ষণ করে।'[২৬]

(সুনানে ইবন মাজাহ, খ-১, পৃ-১৫৯-৬০, নং ২৭৭)

---

২৪. আক্ষরিকভাবে বাগধারা مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ অর্থ ভাল কাজ আনয়ন করা।

২৫. এখানে 'ঈমান'-কে কাজ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যদি পারিভাষিক অর্থে 'ঈমান' এতটা সীমিত নয়, 'ঈমান' অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিতেই হবে। তবে সব আমলই ঈমানের ফলশ্রুতি।

২৬. অজুর সংরক্ষণ কয়েক প্রকারে হয়ে থাকে– ক. ভালভাবে অজু করা, এর দ্বারা ইবাদত সুন্দর হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয়। খ. ভেঙ্গে যাওয়ার পর পুনরায় অজু করা, ঘুমানোর পূর্বে এবং সহবাসের পরেও এর নতুনত্ব সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

৪১. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ .

অর্থাৎ, 'আল্লাহ ঐ সব কাজকে বেশি ভালবাসেন যেগুলো নিয়মিত করা হয়, যদিও তা ক্ষুদ্র।'[২৭] (সুনানে আবূ দাউদ, খ-১, পৃ-৩৫৮নং ১৩৬৩, সহীহ আল-বুখারী, খ-৩, পৃ-১০৮-৯, নং ১৯১, সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ-৩৭৭, নং-১৯১০, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-২৫৯)

৪২. বিশিষ্ট সাহাবী শ্রেষ্ঠ রাবি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

مَنْ عَادَى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَاِنْ سَاَلَنِىْ لَاُعْطِيَنَّهٗ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لَاُعِيْذَنَّهٗ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَىْءٍ اَنَا فَاعِلُهٗ تَرَدُّدِىْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَاَنَا اَكْرَهُ مَسَاءَتَهٗ .

অর্থাৎ, 'আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি যে আমার কোন প্রিয় বান্দা (ওলী)র সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে। সর্বোত্তম পথ যার মাধ্যমে বান্দা আমার নিকটবর্তী হতে পারে তা হলো আমি তার ওপরে যে আমল ফরজ করেছি তা করে। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল

---

২৭. সেগুলো সংখ্যা বা পরিমাণে ক্ষুদ্র। অনিয়মিত বড় কাজের চেয়ে তা ভাল। কেননা নিয়মিত কাজ ব্যক্তির চরিত্রে অধিক প্রভাব পড়ে। একবার এক বেদুঈন রাসূল ﷺ এর নিকট ইসলামের মূল বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তিনি শুধু ফরজ ইবাদতের উল্লেখ করে নফলের বিষয়গুলো এড়িয়ে গেলেন। ঐ লোক এর কম-বেশি না করার দৃঢ় অঙ্গীকার প্রত্যয় সত্ত্বে রাসূল ﷺ তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

করতে পারে এমনকি আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। আমি যদি তাকে ভালবাসি আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি কিছু চায় তাহলে আমি তা দেই। যদি সে আমার নিকট আশ্রয় চায় আমি তাকে আশ্রয় দেই।[২৮] আমি যদি কোন ব্যাপারে ইতস্তত করি তা হলো ঈমানদারের আত্মাকে গ্রহণ করতে। কেননা সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আমি অপছন্দ করি তার অনুপস্থিতি।' (সহীহ আল বুখারী, খ-৮, পৃ-৩৩৬-৭, নং ৫০৯)

অবিশ্বাসী বা কাফির

৪৩. মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ
اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا .

অর্থাৎ, 'কাফিরদের একথা চিন্তা করা উচিত নয় যে, তাদের ওপরে আমার শাস্তি বিলম্বিত হওয়া তাদের জন্য কল্যাণকর, আমি তাদের শাস্তিকে বিলম্বিত করি শুধু তাদের পাপ বৃদ্ধি করার জন্য।'[২৯] (সূরা–৩ আলে-ইমরান : আয়াত-১৭৮)

অপছন্দনীয়

৪৪. সর্ব শক্তিমান আল্লাহ বলেন–

وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا
شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ, 'হয়তো তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ কর অথচ তা তোমার জন্য ভাল এবং কিছুকে পছন্দ কর অথচ তা তোমাদের জন্য খারাপ। আল্লাহ অবগত আছেন এবং তোমরা জান না।' (সূরা–২ আল-বাকারাহ : আয়াত-২১৬)

---

২৮. এর অর্থ হলো বান্দা তাই শোনে যা আল্লাহ চান। তাই ধরে, সেখানে যায় যেখানে আল্লাহ চান।

২৯. আরবি We ব্যবহৃত হয়েছে। যাকে Royal we বলে। এর দ্বারা মূলত একবচনই উদ্দেশ্য। বক্তার বক্তৃতায় প্রায় সব ভাষায়ই এ ধরনের ব্যবহার রয়েছে।

তালাক

৪৫. মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ .

অর্থাৎ, 'যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে নিষ্ঠুরতা অথবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তাহলে তাদের মধ্যে সমঝোতা তৈরি করাতে কোন দোষ নেই এবং সমঝোতাই উত্তম। মানুষের মধ্যে সর্বদাই স্বার্থপরতা বিদ্যমান।'[৩০]

(সূরা–৪ আন নিসা : আয়াত-১২৮)

মাহর (মোহরানা)

৪৬. উকবা বিন আমির থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ الصَّدَاقِ اَيْسَرُهُ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম মাহর হলো যা (আদায়ে) সহজতর।'

(ইবন মাজাহ্ এবং ইবন হাকেম)

রং

৪৭. যায়েদ ইবন আসলাম থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর[৩১] (রা) হলুদ রং দ্বারা তাঁর দাঁড়ি মুবারক রঞ্জিত করতেন। এত রং দিতেন যে, তাঁর সব

---

৩০. ইবনে কাছীর বর্ণনা করেন : যদি কোন স্ত্রীলোক আশঙ্কা করে যে, তার স্বামী তাকে ত্যাগ করবে, তাহলে সে তার ভরণ-পোষণ ও সময় থেকে কিছুটা ছাড় দিতে পারে। স্বামী এ ছাড় গ্রহণ করতেও পারে নাও করতে পারে এতে দোষের কিছু নেই। মহান রব অতঃপর বলেন, 'সমঝোতা ভাল।' অর্থাৎ তালাকের চেয়ে সমঝোতা ভাল। 'স্বার্থপরতা সকলের মধ্যে বিদ্যমান।' অর্থাৎ তালাকের চেয়ে স্বার্থপরতার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা উত্তম। এরূপে যখন সাওদা বিনতে জাম'আকে রাসূল ﷺ তালাক দিতে চাইলেন, তখন তিনি তাঁর সময়কে আয়েশা (রা)-কে প্রত্যর্পণপূর্বক রেখে দেয়ার অনুরোধ জানালে রাসূল ﷺ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখেন। (তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, খ-১, পৃ-৫৭৫)

৩১. صُفْرَةٌ (ছুফরা) এক ধরনের ওষুধ জাতীয় জাফরান, যা প্রচুর সুঘ্রাণযুক্ত হলুদ রং এর।

পরিধেয় বস্ত্রও হলুদ হয়ে যেত।[৩২] যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো কেন তিনি হলুদ রঙে রঞ্জিত হতেন, তিনি উত্তর দিতেন :

إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ.

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে তার (হলুদ রং) দ্বারা রঞ্জিত হতে দেখেছি। এবং এর চেয়ে প্রিয় তাঁর নিকট আর কিছু ছিল না। তিনি প্রায় সময় এ রং দ্বারা তাঁর পোশাক রং করাতেন এমনকি তাঁর পাগড়ীও।[৩৩]

(সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১১৩৪-৫, নং ৪০৫৩)

* **নোট** : অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলো এ নির্দেশ করে যে, লাল রং পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ তাঁকে লাল রঙের 'উসফুর' দ্বারা রঞ্জিত পোশাক পরা অবস্থায় দেখলেন। তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন : তোমার গায়ে এ কি ধরনের পোশাক?' আব্দুল্লাহ্ (রা) উপলব্ধি করলেন যে তিনি এটা অপছন্দ করেছেন। সুতরাং তিনি গৃহে গিয়ে তা পুড়িয়ে ফেললেন। পরের দিন রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে পোশাক কি করলেন। তাঁকে জানানোর পর তিনি বললেন : 'তুমি কেন তা তোমার পরিবারকে দিলে না, সেগুলো মহিলাদের ব্যবহার করতে তো কোন দোষ নেই। (সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১১৩৫, নং-৪০৫৫)

মুসলিম (র) এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তাতে উল্লেখ পাওয়া যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের 'উসফুর'-এর রঞ্জিত পোশাক এজন্য পরিধান করতে নিষেধ করেছেন যেহেতু তা অমুসলিমদের পরিধেয়। এরপর তিনি আব্দুল্লাহকে তা পুড়িয়ে ফেলতে বললেন।

(সহীহ মুসলিম, খ-৩, পৃ-১১৪৬, নং ৫১৭৩, ৭৪ ও ৭৫)

---

৩২. ইহরাম অবস্থায় জাফরান ব্যবহার করা নিষেধ, চর্ম লোশন বা সুগন্ধি হিসেবেও পুরুষের জন্য তা ব্যবহার নিষিদ্ধ। (সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১২৯২-৩, নং-৪৫৮৪)

৩৩. যেহেতু রাসূল ﷺ এর অল্প কিছু চুল সাদা ছিল তাই তাঁর চুলের কলপ লাগানোর প্রয়োজন ছিল না। (সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২৫০-১, নং ৫৭৭৯-৮৯)

বারা ইবন আযিব থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস রয়েছে যে, তিনি আল্লাহর রাসূলকে লাল রঙের একটি অত্যন্ত সুন্দর পোশাক পরা অবস্থায় দেখলেন।

(সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১১৩৬, নং-৪০৬১)

আমির ইবন আমরও বলেন যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূলকে মিনায় একটি লাল পোশাক পরা অবস্থায় দেখেছেন, যখন তিনি একটি খচ্চরের পিঠে আরোহণ করে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। (সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১১৩৬, নং ৪০৬২)

এ সব বৈপরীত্যের সমাধানে যেসব বক্তব্য পণ্ডিতগণ দিয়েছেন তার মধ্যে ইবনুল কাইয়িম-এর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য, তা হলো ইয়েমেনের কাপড়ে লালের সঙ্গে অন্য সুতার মিশ্রণ ছিল এবং নিষিদ্ধ রং হলো যা এককভাবে লাল সুতা দ্বারা তৈরি।

৪৮. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِنَّ اَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هٰذَا الشَّيْبُ، الْحِنَّاءُ ، وَالْكَتَمُ .

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই সাদা দাঁড়ি পরিবর্তন করার সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হলো হেনা এবং বাতাস।'[৩৪] (সুনানে তিরমিজী, আবু দাউদ,খ-৩ পৃ-১১৬৮ এবং ৪১৯৩)

ঈমান

৪৯. আবু যার (রা) নবী করীম ﷺ থেকে উল্লেখ করেন–

اَفْضَلُ الْعَمَلِ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম কাজ হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' (ইবন হিব্বান, সহীহ্ আল-বুখারী, খ-৩, পৃ-৪১৯-২০, নং ৬৯৪) সহীহ মুসলিম খ-১,পৃ-৪৯, নং ২৪৯, মিশকাতুল মাসাবীহ।

৩৪. কাতাম ইয়েমেনের এক ধরনের বৃক্ষের (Mimosa flava) পাতা। এর সঙ্গে হেনা মিশ্রিত করে চুলের মূল রং রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে কালো রং ব্যবহার করা নিষেধ।

৫০. উকবা ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا .

অর্থাৎ, 'ঈমানের দিক দিয়ে সর্বোত্তম[৩৫] ঐ ব্যক্তি যিনি চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।' (আততাবারানী ফিল কবীর, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-১৫ ও ১৬)

৫১. মাকাল ইবন ইয়াসার এবং উমাইর ইবন আল লাইছী আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছেন–

اَفْضَلُ الْاِيْمَانِ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম ঈমান হলো ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা।' (দায়লামী, আল-বুখারী ফিত্ তারীখ আমর ইবন আবাসা থেকে, আহমাদ এবং বায়হাকী থেকেও বর্ণিত।)

৫২. আবু হুরায়রা (রা) আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছেন–

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ .

অর্থাৎ, 'ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে, সর্বোত্তম শাখা হলো এ ঘোষণা দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মা'বুদ নেই, নিম্নতম শাখা হলো, রাস্তা থেকে হাড় সরিয়ে ফেলা,[৩৬] এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।' (সহীহ আল-বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজাহ ও আবু দাউদ (আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১৩১১ নং ৪৬৫৯)

---

৩৫. পূর্ববর্তী ৭নং বর্ণনাটি 'সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারীরা সর্বোত্তম ঈমানদার' বেশি প্রচলিত।

৩৬.এ শব্দগুলো আবু দাউদ এর বেশিরভাগ গ্রন্থে اَذٰى শব্দটি উল্লেখ আছে, যার অর্থ বিরক্তিকর অথবা কষ্টদায়ক জিনিস।

সাওম

৫৩. আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করেন–

أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عَدْلَ لَهُ .

অর্থাৎ, 'কোন কাজ উত্তম?' তিনি উত্তর দিলেন 'রোযা রাখা, কারণ এর সমান কিছুই নেই।' (সহীহ সুনানে নাসায়ী, খ-২, পৃ-৪৭৬ নং ২০৯৯, মিশকাতুল মাসাবীহ খ-১, পৃ-৮১৩-৪)

৫৪. জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন, নবী কারীম ﷺ বলেন–

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، اَلشَّهْرُ الَّذِىْ تَدْعُوْنَهُ الْمُحَرَّمَ .

অর্থাৎ, 'রমযানের পরে সর্বোত্তম রোজা হলো তোমরা যাকে 'মহররম' বল (তার রোযা)।'[৩৭] (সুনানে নাসায়ী, সহীহুল মুসলিম, খ-২, পৃ-৫৬৯ নং ২৬১১, সুনানে আবু দাউদ, খ–২, পৃ–৬৬৮ নং ২৪২৩, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ–১, নং ৪৩৩)

كَانَ أَحَبُّ الشُّهُوْرِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَصُوْمَهُ شَعْبَانُ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .

অর্থাৎ, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ যে মাসকে (নফল) রোযার জন্য সর্বাধিক পছন্দ করতেন তা হলো শাবান, এরপর তিনি তাকে রমযানের সঙ্গে মিলাতেন।'[৩৮]

(সুনানে আবু দাউদ খ-২, পৃ-৬৬৮, নং২৪২৫)

---

৩৭. নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীদের চান্দ্র বছরের প্রথম মাস অর্থাৎ মহররমে বিশেষ করে প্রথম ১০ দিনে রোযা রাখার প্রতি জোর দিয়েছেন। যে ১০ দিনে রোযা মুসলমানদের ওপর মাহে রমাদানের রোযার পূর্বে ফরয ছিল। অবশ্য তিনি ৮ম মাস অর্থাৎ শাবানের রোযাও গুরুত্ব সহকারে রাখতেন। তবে চাপ পড়ার ভয়ে সাহাবীদের উৎসাহ দিতেন না।

৩৮. ইমাম বুখারী (র) আয়েশা (রা) থেকে এ বিষয়ে দুটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। ক. রাসূল ﷺ পূর্ণ রমযানই রোযা রাখতেন, খ. অন্য বর্ণনায় তিনি মাহে রমাদান ছাড়া অন্য কোন মাসে রাসূল ﷺ কে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখেন নি'। ইবন হাজার (র) বলেন যে, প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে কম বিশেষ। (ফতহুল বারী, খ-৫, পৃ-৭৪৪) তিনি বিরতিহীনভাবে শাবান ও রমাদানের পূর্ণ রোযা রাখতেন। এ আমল যেহেতু অন্যদের করতে নিষেধ করেছেন, তাই তা তার জন্য খাস। (দেখুন সহীহ আল বুখারী খ-৩, পৃ-৭৫-৭৬ নং ১৩৮, সহীহ মুসলিম, খ-২, পৃ-৫২৭ নং ২৩৮২)

৫৬. ইবন আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন–

أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِيْ دَاوُدَ، كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম (নফল) রোযা হলো আমার ভাই দাউদ (নবী আ.)-এর রোযা, যিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন এবং তিনি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মুকাবিলায় কখনো পলায়ন করেন নি।' (সুনানে তিরমিজী, সুনানে নাসায়ী, সহীহুল বুখারী, খ-৩, পৃ-১১৩-৪, নং ২০০, সহীহ মুসলিম খ-২, পৃ- ৫৬৫ নং ২৫৯৫, সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৬৭৪, নং-২৪৪২, মিশকাতুল মাসাবীহ খ-১, পৃ-৪৩৫-৬)

ঈদ

৫৭. আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, যখন নবী করীম ﷺ মদিনায় আগমন করেন, জাহেলিয়াতের[৩৯] যুগে মদীনার লোকেরা দুই দিন খেলাধুলা করে কাটাত। তিনি ﷺ তাদের বলেন–

كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحٰى .

অর্থাৎ, 'তোমাদের দুটি দিন ছিল যাতে তোমরা খেলাধুলা করতে, কিন্তু আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম জিনিস দিয়ে সেগুলোকে পরিবর্তন করেছেন। তা হলো–

ক. কুরবানির উৎসব – ঈদুল আজহা,

খ. রোযা শেষের উৎসব– ঈদুল ফিতর।[৪০]

(সুনানে নাসায়ী, খ-৩, পৃ-৪৭৯, নং ৭২৮)

---

৩৯. জাহেলিয়াত শব্দের শাব্দিক অর্থ "অন্ধকার যুগ" রাসূল ﷺ এর আগমনের পূর্বে আরবের সময়কে নির্দেশক।

৪০. এ হাদীস দ্বারা এ দুই ঈদ ছাড়া সব ধরনের বার্ষিক অনুষ্ঠান বাতিল বলে প্রতীয়মান হয়। (যেমন : জন্ম দিবস, জাতীয় দিবস, গোত্রীয় অনুষ্ঠান, নববর্ষ, এপ্রিল ফুল, মাতৃদিবস ইত্যাদি।)

শুক্রবার

৫৮. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ، وَفِيْهِ اُهْبِطَ، وَتِيْبَ عَلَيْهِ، وَفِيْهِ قُبِضَ، وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ، مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيْخَةً، حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، اِلاَّ ابْنَ اٰدَمَ، وَفِيْهِ لاَيُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ يَسْاَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ .

অর্থাৎ, 'যে দিনে সূর্যোদয় হয় তার মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো শুক্রবার, এ দিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, ঐ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, এদিনে তিনি জান্নাত ত্যাগ করেন, এদিনে তাঁকে ক্ষমা করা হয়, এ দিনে তিনি মারা যান, এ দিনেই চূড়ান্ত দিন (কিয়ামত) হবে। পৃথিবীর সব সৃষ্টি, আদম সন্তান ছাড়া শুক্রবারের চূড়ান্ত সূর্যোদয়ের সময় জাগ্রত হবে[৪১] এবং শুক্রবারের একটা সময়[৪২] আছে যখন আল্লাহ মু'মিন বান্দার দু'আ কবুল করেন, যদি মু'মিন বান্দা ঐ সময় নামাযের[৪৩] মধ্যে থাকে। (সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-২৬৯, নং ১০৪১, সহীহ মুসলিম, খ-২, পৃ-৪০৫, নং ১৮৫৬-৭, পৃ-৪০৪ নং ১৮৪৯-৫০, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, নং২৮৫)

---

৪১. চূড়ান্ত সময় শুক্রবারের সূর্যোদয়ের পূর্বে শুরু হবে। ফলে সব সৃষ্টি ভীত-বিহ্বল হয়ে জাগ্রত হবে।

৪২. সহীহ মুসলিমের বর্ণনাসমূহে বুঝা যায় যে, এ সময়টি খুবই সংকীর্ণ এবং অজ্ঞাত যেমন লাইলাতুল কদর এর সময় অজ্ঞাত। বেশিরভাগ আলেম ঐ সময় আছর থেকে মাগরিবের বলে অনুমান করেছেন। (সূর্যাস্ত পর্যন্ত)

৪৩. নবী করীম ﷺ বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রার্থনা হবে শুক্রবারের বিধিবদ্ধ সালাতে। সেই প্রার্থনা সিজদার মধ্যে হতে পারে। যেমন রাসূল (সা) অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন প্রার্থনার সর্বোত্তম সময় হলো সিজদা। যদিও রাসূল ﷺ সর্বাবস্থায় প্রার্থনা করেছেন।

৫৯. সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ اَفْضَلُ .

অর্থাৎ, 'যে জুমু'আর দিনে অজু করে তা তার জন্য উত্তম, আর যে ব্যক্তি গোসল করে তা তার জন্য সর্বোত্তম।' (সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-৯৩ নং ৩৫৪)

বন্ধু

৬০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যে অসুস্থতায় নবী করীম ﷺ ইন্তিকাল করেন, তিনি মাথায় একখানি কাপড় বেঁধে বের হয়ে আসলেন এবং মিম্বরের ওপর বসলেন। এরপর তিনি আল্লাহর গুণকীর্তন ও প্রশংসা করলেন, একথা বলে–

اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اَمَنَّ عَلَىَّ فِىْ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ مِنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيْلاً لاَ تَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ خُلَّةُ الاِسْلاَمِ اَفْضَلُ .

অর্থাৎ, 'বাস্তবে এমন কেউ নেই যিনি তাঁর জান-মাল আবু বকর ইবন কুহাফার চেয়ে আমাকে বেশি দিয়েছেন। যদি আমি কাউকে আমার ব্যক্তিগত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে তিনি হতেন আবু বকর (রা); তবে ইসলামের ভিত্তিতে যে বন্ধুত্ব তাই ভাল।' (সহীহু লিল বুখারী, খ-৫, পৃ-৫, ৬ নং ৬)

মজলিস

৬১. আবু সায়ীদ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ الْمَجَالِسِ اَوْسَعُهَا .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম মজলিশগুলো হলো যেগুলোতে বসার জন্য প্রশস্ত ব্যবস্থা রয়েছে।'[৪৪] (সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১৩৪৭ নং ৪৮০২, সুনানে আহমদ, ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-২, নং ৯৮৭-৮)

প্রজন্ম

৬২. ইমরান ইবন হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন –

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ يَأْتِى مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُوْنَ، وَيُحِبُّوْنَ السِّمَنَ، يُعْطُوْنَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ اَنْ يُسْاَلُوْهَا .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার প্রজন্ম, এরপর হলো পরবর্তী প্রজন্ম, এরপর হলো পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা[৪৫]। এরপর এমন লোকের আগমন হবে যারা হবে লোভী এবং তারা নিজেদের অত্যাধিক ভালবাসবে[৪৬]। তারা সাক্ষ্য চাওয়ার[৪৭] আগেই দিয়ে দিবে।' (সুনানে তিরমিজী, হাকীম, সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১৩০৬, ১৩০৭ নং ৪৬৪০) সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১৩৪৬, নং-৬১৫৪ আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে। আরো দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-২, নং ১৩১৮)

সম্ভাষণ

৬৩. সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন–

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا .

অর্থাৎ, 'যখন তোমাদেরকে সম্বোধন করা হয় তখন তোমরা উত্তমরূপে তার প্রত্যুত্তর দাও, অথবা তার মত সম্ভাষণ কর[৪৮]। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছুর হিসাব গ্রহণ করবেন।' (সূরা–৪ আন নিসা : আয়াত-৮৬)

---

৪৫. এ বর্ণনার দ্বারা এটা বুঝায় না যে, প্রত্যেক প্রজন্মের প্রতিজন ব্যক্তি তার পরবর্তী প্রজন্মের প্রত্যেক ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। বরং গড় মান বলা হয়েছে।

৪৬. খাবার ব্যাপারে অধিক গ্রহণ হলো পাপ, এটা লোভের প্রকাশ। সঠিকভাবে রোযা পালনের মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা সম্ভব। রাসূল ﷺ মধ্যম পরিমাণ খাবার গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

৪৭. অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

৪৮. রাসূল ﷺ وَعَلَيْكُمْ 'তোমাদের প্রতিও' বলার শিক্ষা দিয়েছেন। এর দ্বারা যে যেমনভাবে সম্ভাষণ করবে তাকে সমপরিমাণ দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেমন অনেকে 'ঘাম' বা 'বিষ' শব্দ ব্যবহার করত তার উপযুক্ত জবাব এর মধ্যে রয়েছে।

৬৪. সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ .

অর্থাৎ, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্যের গৃহে তার অনুমতি গ্রহণ ও সম্ভাষণ না দিয়ে প্রবেশ কর না। এটা তোমাদের জন্য উত্তম। আশা করা যায় যে, তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারবে।’[৪৯] (সূরা আন নূর– ২৪ : ২৭)

হজ্জ

৬৫. ইবন উমর, আবু বকর এবং ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ .

অর্থ : ‘সর্বোত্তম হজ্জ (অংশ) হলো কণ্ঠস্বর উচ্চ করা (তালবিয়া পাঠ করার সময়) এবং তার পরবর্তী কাজ (কুরবানিকৃত পশুর রক্ত প্রবাহিত করা)[৫০]।’

(সুনানে তিরমিজী, ইবন মাজাহ এবং আবু ইয়ালা)

৬৬. ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শোনা গেছে–

كَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلاَ يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ فَاِذَا قَدِمُوْا مَكَّةَ سَاَلُوا النَّاسَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى . وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى .

অর্থাৎ, ‘ইয়েমেনের লোকেরা হজ্জ করতে আসার সময় তাদের পাথেয় সঙ্গে আনত না। তারা বলত আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করছি। ফলে তারা মক্কায় পৌঁছানোর পর লোকদের নিকট ভিক্ষা করত। এরপর মহান আল্লাহ

---

৪৯. মানুষের গোপনীয়তার অধিকার সম্পর্কে।

৫০. (সূরা আলহাজ্জ– ২২ : ৩৭) আল্লাহ বলেন– ... لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ ... অর্থ : ‘তাদের গোশ্‌ত বা রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না বরং তোমাদের আল্লাহ ভীতিই পৌঁছায়।

নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন (ভাবার্থ) তোমরা তোমাদের সঙ্গে পাথেয় গ্রহণ কর, যদিও সর্বোত্তম পাথেয় হলো আল্লাহ্র ভয়।'[৫১] (সহীহ্ আল-বুখারী, খ-২, পৃ-৩৪৮, ৩৪৯ নং ৫৯৮, সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৪৫৪নং ১৭২৬)

হিজরত

৬৭. ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الْمُهَاجِرِيْنَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ، وَاَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِى ذَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম মুহাজির (ত্যাগী) হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কার্যাবলি ত্যাগ করেছে, সর্বোত্তম জিহাদ (সংগ্রাম) হলো যে ব্যক্তি মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্র জন্য নিজ প্রবৃত্তি ও চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।' (আত্তাবারানী আল-কাবীর, এর এক অংশ বুখারীতে রয়েছে। সহীহ্ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-১৮ নং ৯, সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৬৮৫, ৬৮৬, নং ২৪৭৫, দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-১৫, ১৬ এবং খ-১, পৃ-৮১৩, ৮১৪)

কৃপণতা

৬৮. মহান আল্লাহ্ আরো বলেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

অর্থাৎ, 'ঐ সব কৃপণ লোক যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে এবং তা আঁকড়ে ধরে আছে একে তারা যেন নিজেদের জন্য উত্তম মনে না করে বরং এটা হলো তাদের জন্য খারাপ। কেননা তাদের এ কৃপণতার সম্পদ কিয়ামতের দিন তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে উঠানো হবে।'

(সূরা আলে -ইমরান– ৩ ঃ ১৮০)

---

৫১. সূরা আল-বাকারা (২ : ১৯৭) এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে তারপর আল্লাহ্র ওপর ভরসা করতে হবে।

উত্তরাধিকার

৬৯. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الْاِنْسَانُ بَعْدَهُ ثَلَاثٌ : وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِىْ يَبْلُغُهُ اَجْرُهُ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ .

অর্থাৎ, 'মানুষ সর্বোত্তম হিসেবে যে সব জিনিস তার (মৃত্যুর পর) পিছনে রেখে যায়, সেগুলো হলো– ক. সৎ সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে। খ. সদকায়ে জারিয়া যার প্রতিদান সে পেতে থাকে। গ. ঐ জ্ঞান যার দ্বারা তার পরবর্তী লোকেরা উপকার পেতে থাকে (এর মধ্যে ভাল বই ক্রয় করা, লেখা ও প্রকাশ অথবা বিক্রি করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।)

(সুনানে ইবনে মাজাহ, খ-১, পৃ-১৩৭ নং ২৪১, ইবনে হিব্বান ৩০২৬ প্রায় এ ধরনের শব্দ দ্বারা সহীহ মুসলিম। সহীহ মুসলিম, খ-৩, পৃ ৮৬৭ নং ৪০০৫, সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৮১২ নং ২৮৭৫, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৫০)

দাওয়াত

৭০. মহান রব বলেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ .

অর্থাৎ, 'ডাক তোমার প্রভুর পথে প্রজ্ঞার সাথে এবং উত্তম যুক্তি দিয়ে[৫২] তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর উত্তম বিষয় দিয়ে।'[৫৩] (সূরা আন নাহল –১৬ : ১২৫)

৭১. সাহল ইবন সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন–

وَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِىَ اللّٰهُ بِهُدَاكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ .

---

৫২. ও ৫৩. হিকমাত্ বলতে কুরআন উদ্দেশ্য, অর্থাৎ কুরআনের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং উত্তম যুক্তি দিতে হবে। অসংলগ্ন কথা, অসভ্য আচরণ এবং কোন অশ্লীল কথা বা ভাষা ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

অর্থাৎ, 'আল্লাহর কসম, কোন ব্যক্তি তোমার নির্দেশনায় যদি আল্লাহর হেদায়াত লাভ করে তাহলে তা তোমার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের চেয়েও বেশি মূল্যবান।'[৫৪] (সহীহ আল-বুখারী, খ-৪, পৃ-১২২, ১২৩, নং ১৯২) সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২৮৫, ৮৬, নং ৫৯১৮, সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১০৩৮, ৩৯ নং ৩৬৫৩, আরো দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-২, পৃ-১৩৪০)

ইসলাম

৭২. ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِسْلاَمًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম ঈমানদার[৫৫] হলো ইসলামের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি যার জিহবা এবং হাত থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।' (আততাবারানী ফিল কাবীর, সহীহ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-১৮ নং৯, সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ-২৯ নং ৬৪, সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৬৮৫, ৬৮৬, নং-২৪৭৫, আরো দেখুন মিশ্কাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৮১৩, ৮১৪)

৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) উল্লেখ করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الْاِسْلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةُ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম ইসলাম হলো সহজ পথ, যে কোন ধরনের কাঠিন্য মুক্ত।' (তাবারানী, আল-মু'জামুল আওমাত)

৭৪. আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلاَمِ اِذَا فَقِهُوْا .

---

৫৪. হুমুরুন নিয়াম–আরবের সবচেয়ে মূল্যবান উট্নী। এর দ্বারা সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বুঝানো উদ্দেশ্য।

৫৫. মু'মিনদের মধ্যে সর্বোত্তম। কখনো একবচনও ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য একই।

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলিয়াতের (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) সময় উত্তম ছিল তারা ইসলাম গ্রহণের পরেও উত্তম যদি তারা দ্বীনের বুঝ সঠিকভাবে গ্রহণ করে।' (সহীহ আল-বুখারী, খ-৪, পৃ. ৩৮৮ নং ৫৯৩, সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ. ১২৬৭ নং ৫৮৬২)

৭৫. আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন যে, একজন লোক আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন–

اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتُقْرِأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرِفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

অর্থাৎ, 'ইসলামের কোন বিষয়টি উত্তম? রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন : (মানুষকে) খাদ্য খাওয়াবে[৫৬], তুমি যাকে চিন আর না চিন তাকে সালাম দিবে।' (মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১৪৩৪ নং ৫১৭৫)

জিহাদ[৫৭]

৭৬. মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ .

---

৫৬. খাদ্য খাওয়ানোর অর্থ হলো খাবারের সঙ্গে অন্যকে শরিক করা। দরিদ্রদের খাদ্যদানকে কুরআনে উৎসাহিত করা হয়েছে (৬৯ : ৩৪, ৭৬ : ৮-৯) এবং একে ঈমানের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। প্রতিবেশীর সঙ্গে খাদ্য ভাগ করে খাওয়ার ব্যাপারেও নবী করীম ﷺ অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : 'যে ব্যক্তি পেট পুরে আহার করে অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়।' তাবারানী এবং আল-হাকীম (মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-২, পৃ-১০৩৮)

৫৭. 'জিহাদ' মৌলিকভাবে মুসলিম রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য অথবা বাধাহীনভাবে ইসলামকে প্রচার করার জন্য সামরিক সংগ্রাম বা প্রচেষ্টা যেহেতু এ শব্দের শাব্দিক অর্থ চেষ্টা প্রচেষ্টা চালান সেহেতু এটা যেকোন ধরনের শয়তানী কাজকর্মের বিরুদ্ধে শক্তি ব্যয় বা খাটানো অর্থেও ব্যবহৃত হয় যদিও তা কোন একক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় হোক না কেন। বলার জন্য বিশেষ ধরনের সাহস প্রয়োজন। কেননা এমতাবস্থায় ব্যক্তি সাধারণত নিরস্ত্র

অর্থাৎ, 'যদি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণ কর অথবা মারা যাও তাহলে অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর যে ক্ষমা ও দয়া তা তাদের সঞ্চিত পার্থিব সম্পদের চেয়ে অনেক ভাল।' (সূরা-৩ আলে ইমরান : আয়াত-১৫৭)

৭৭. আনাস ইবনে মালেক এবং ইবন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম কাজ হলো সময়মত সালাত আদায় করা (অর্থাৎ প্রথম সময়ে) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' (সহীহ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-৩০০, ৩০১ নং ৫০৫, সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ-৪৯, ৫০, নং-১৫২)

৭৮. আবু সায়ীদ, আবু উমামাহ এবং তারিক ইবন শিহাব সকলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন–

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।' (ইবনে মাজাহ্, সুনানে আহমাদ ও নাসায়ী, সুনানে আবু দাউদ খ-৩, পৃ-২০৯, নং ৪৩৩০, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৭৮৭)

৭৯. ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

থাকে। অথচ শাসক তখন সশস্ত্র প্রহরায় থাকে এবং তার চাটুকাররা বক্তাকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য জনগণকে বুঝানোর চেষ্টা করে। সামরিক যুদ্ধে একজন (বাদশাহ) সশস্ত্র থাকে এবং সশস্ত্র সঙ্গীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। সুতরাং সে সময় অবশ্যই মানসিক সমর্থনের বিষয়াদি থাকে। এমতাবস্থায় সত্য কথা বলা আর নিজেকে শাহাদাতের জন্য পেশ করা সমার্থক বটে। এজন্যই একে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে।)

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম জিহাদ হলো সুমহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কোন ব্যক্তি তার নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।'

(আত্তাবারানী ফিল কাবীর, দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ.-১৫ ও ১৬)

৮০. আবু যর (রা) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন–

اَفْضَلُ الْجِهَادِ اَنْ يُّجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهٗ وَهَوَاهُ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম জিহাদ হলো, কোন ব্যক্তি তার নিজ সত্তা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিহাদ করা।' (আদ্ দায়লামী, আবু নায়ীম, ইবন নাজ্জার)

৮১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرَى الْجِهَادَ اَفْضَلَ الْعَمَلِ اَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ :
لاَ لَكِنَّ اَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম কাজ মনে করি, আমরা কি জিহাদ করব না? তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, 'না'। (মহিলাদের) সর্বোত্তম জিহাদ হলো حَجٌّ مَبْرُوْرٌ (হাজ্জে মাবরূর) বা কবুল হজ্জ।[৫৮]

(সহীহ আল-বুখারী, খ-২, পৃ-৩৪৭, নং ৫৯৫)

---

৫৮. 'কবুল হজ্জ' অর্থাৎ যে হজ্জ আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয় হয়েছে, যে হজ্জে খেলাফ ও হারাম কোন কাজ করা হয় নি। এ ধরনের হজ্জ দ্বারা পাপ মোচন হয়। আবু হুরায়রাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তিই আল্লাহর ঘরের হজ্জ করবে স্ত্রী সহবাস বা কোনরূপ পাপ কাজ ছাড়াই, সে এমনভাবে হজ্জ থেকে নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে যেন তার মাতা তাকে এ মাত্র জন্ম দান করেছেন।' সহীহ্ আল-বুখারী, খ-৩, পৃ-২৭, ন ং ৪৫ এবং ৪৬) হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার পর এবং রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম।

রাসূল ﷺ কিছু নারীকে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এর বেশিরভাগই আহত সৈন্যদের সেবা শুশ্রূষা করতেন, যেমন খায়বারের যুদ্ধে গিফারী গোত্রের মহিলারা করেছেন। কিছু কিছু মহিলা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, উদাহরণস্বরূপ উম্মে উমারা, নুসাইবা বিনতে কাব, রাসূল ﷺ-এর প্রতিরক্ষায় ওহুদ যুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছেন। উম্মে সুলাইমান বিনতে মিলহান ওহুদ এবং হুনায়ন যুদ্ধে সশস্ত্র অবস্থায় অংশগ্রহণ করেন। আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইয়ারমুকের যুদ্ধে নয় জন আরব নেতাকে হত্যা করেছিলেন।

ভ্রমণ

৮২. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِيْ هٰذَا وَالْبَيْتُ الْعَتِيْقُ.

অর্থাৎ, "আরোহণ করার সর্বোত্তম স্থান হলো আমার এ মসজিদ এবং প্রাচীন ঘর।"[৫৯]

নেতৃবৃন্দ

৮৩. আওফ ইবনে মালিক বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ، وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ.

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নেতাগণ হলেন তারা যাদের তোমরা ভালবাস, তারাও তোমাদের ভালবাসেন, তোমরা তাদের জন্য দু'আ কর তারা তোমাদের জন্য দু'আ করেন। তোমাদের মধ্যে খারাপ নেতাগণ হলো তারা যাদের প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট, তারাও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, তোমরা তাদের অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়।'
(সহীহ মুসলিম, খ-৩, পৃ-১০৩৩, নং ৪৫৭৩, দেখুন, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৭৮১, ৭৮২)

---

৫৯. অর্থাৎ কা'বা শরীফ। ইবরাহীম এবং তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আ) কর্তৃক ইবাদতের জন্য তৈরি প্রথম ঘর। রাসূল ﷺ তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সফর করতে নিষেধ করেছেন। সেগুলো হলো– ১. মসজিদে হারাম, মক্কার মসজিদ, ২. মসজিদে রাসূল, নবীর মসজিদ মদিনায়, ৩. মসজিদুল আকসা, জেরুজালেমের মসজিদ। (সহীহ আল-বুখারী, খ-২, পৃ-১৫৭ নং ২৮১)

জীবিকা

৮৪. যায়েদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন -

خَيْرُ الرِّزْقِ الْكَفَافُ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম জীবিকা হলো অল্পে তুষ্টি।'[৬০] (সুনানে আহমদ)

বিবাহ

৮৫. উকবা ইবনে আমির বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

خَيْرُ النِّكَاحِ اَيْسَرُهُ .

অর্থাৎ, সর্বোত্তম বিবাহ, সবচেয়ে সহজ বিবাহ।[৬১]

(সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ. ৫৬৭, নং ২১১২)

শহীদ

৮৬. নু'আইম হ্যামার থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

اَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَلاَ يَلْتَفِتُوْنَ وُجُوْهَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلُوْا اُولٰئِكَ يَتَلَبَّطُوْنَ فِى الْغُرَفِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ، يَضْحَكُ اِلَيْهِمْ رَبُّكَ فَاِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ اِلٰى عَبْدٍ فِىْ مَوْطِنٍ فَلاَحِسَابَ عَلَيْهِ .

---

৬০. নবী করীম ﷺ তাঁর অনুসারীদের এ পৃথিবীতে একজন পথিক বা ভ্রমণকারী হিসেবে কাটানোর জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। (সহীহ আল বুখারী, খ-৮, পৃ-২৮৪, নং-৪২৫)। নবী করীম ﷺ এর দৃষ্টিতে অধিক সম্পদ সঞ্চয় করা উত্তম নয়, কেননা যার বেশি আছে, তাকে বেশি দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয়। তার লোভ ও ঝক্কি-ঝামেলাও বেশি। অতএব যার সম্পদ ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করে সেই ভাল।

৬১. এ বর্ণনা হয়েছিল, এরপরে নবী করীম ﷺ একটি বিয়ে দিয়েছিলেন। পুরুষ এবং মহিলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তারা পরস্পরকে বিয়ে করতে চায় কিনা, মাহর বা যৌতুক সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। যদিও মাহর স্ত্রীর এক বৈবাহিক চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম শহীদ হলেন তারা যারা প্রথম কাতারে জিহাদ করেন এবং তারা একবারও পিছনের দিকে তাকান না, এমনকি এভাবে তারা শাহাদাতবরণ করেন। তাঁরা জান্নাতের সর্বোচ্চ কক্ষে পরিভ্রমণ করতে থাকবেন এবং আপনার প্রভু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং আপনার প্রভু যে দাসের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন তার কোন হিসাব নেয়া হবে না।'

(মুসনাদে আহমাদ এবং আত্তাবারানী)

৮৭. আবু উমামাহ বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ مَنْ سُفِكَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম শহীদ হলো ঐ ব্যক্তি যার রক্ত প্রবাহিত হয়েছে এবং যার ঘোড়া আহত হয়েছে।' (সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-৩৮০ নং ১৪৪৪) আরো দেখুন : মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-১৫, ১৬)

আহার

৮৮. শু'আইব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُكُمْ مَنْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَرَدَّ السَّلاَمَ .

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে ব্যক্তি মানুষকে খানা খাওয়ায় এবং সালামের জবাব দেয়।' (সুনানে আহমাদ এবং আল-হাকীম)

৮৯. জাবির (রা) উল্লেখ করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَحَبُّ الطَّعَامِ اِلَى اللّٰهِ مَا كَثُرَتْ فِيْهِ الْاَيْدِىْ .

অর্থাৎ, 'আল্লাহর নিকট ঐ খাবার সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় যে খাবারে অনেক হাত অংশগ্রহণ করে।' (বাইহাকী ফী শু'আবিল ঈমান, আল হাকীম।)

ওষুধ

৯০. উসামা ইবন শারেক বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বেদুঈনগণ নবী করীম ﷺ-এর নিকট তাদের যেকোন ধরনের সমস্যায় অভিযোগ করতেন এবং রাসূল ﷺ উত্তর দিতেন 'হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ তোমাদের গুনাহগুলো এর দ্বারা ক্ষমা করেন, তবে কেউ তার ভাইকে আঘাত করলে তা মাফ করা হবে না। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করলেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ اَنْ لاَ نَتَدَاوَى؟ قَالَ : (تَدَاوُوْا عِبَادَ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلاَّ وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً اِلاَّ الْهَرَمَ .

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি চিকিৎসা গ্রহণ না করি তাতে কি কোন দোষ হবে? তিনি উত্তরে বললেন : হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের রোগের চিকিৎসা গ্রহণ কর; মহান আল্লাহ এমন কোন রোগ দেন নি যার জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন নি, তবে বার্ধক্য ছাড়া (এর কোন চিকিৎসা নেই)।' (সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, খ-২, পৃ-২৫২, নং ২৭৭২)

৯১. সামুরা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ .

অর্থাৎ, 'অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো– শিঙ্গা লাগানো।'[৬১] (সুনানে আহমাদ, আল হাকীম, আততাবারানী)

৯২. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ مِنْ اَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِى شَرْبَةِ عَسَلٍ اَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ اَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ وَمَا اُحِبُّ اَنْ اَكْتَوِىَ .

অর্থাৎ, 'যদি তোমাদের ঔষুধের মধ্যে কোন উপকারিতা থেকে থাকে তা হলে মধু পানের মধ্যে, শিঙ্গা এবং হাল্কা আগুনের তাপের মধ্যে রয়েছে। অবশ্য আমি আগুনের তাপ গ্রহণ পছন্দ করি না।'[৬৩]

(সহীহ আল-বুখারী, খ-৭, পৃ-৩৯৭, নং ৫৮৭)

---

৬২. হিজামাহ (حِجَامَةٌ) শিঙ্গা হলো আরবের এক প্রকারের রক্ত প্রবাহ সৃষ্টি করা। চামড়া ছিদ্র করা বা কাটা হয় সুঁচ অথবা কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা। অতঃপর চিরে ফেলানো স্থানে শিঙ্গা লাগানো হয়। এরপর শিঙ্গার ছিদ্র দিয়ে শুষে বাতাস টানা হয়, এ শূন্যস্থান পূরণের জন্য রক্ত সংবহন ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

৬৩. কোন বিশেষ স্থানে সেঁক বা তাপ দেয়া (যেমন উত্তপ্ত লোহা অথবা সুঁচ দ্বারা) এর দ্বারা বড় ধরনের ফোস্কা পড়ে না।

স্বামী

৯৩. সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন–

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكُمْ .

অর্থাৎ, 'পৌত্তলিকদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা সত্যিকার মু'মিন হয়, একজন বিশ্বাসী মুমিন ক্রীতদাস একজন স্বাধীন পৌত্তলিকের চেয়ে উত্তম, যদিও এটা তোমাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করে।' (সূরা–২ আল-বাকারা : আয়াত-২২১)

৯৪. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ .

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।'

(তিরমিজী, আদদারিমী, ইবন মাজাহ্, ইবন আব্বাস (রা) হতে। সহীহ্ সুনানে তিরমিজী খ-৩, পৃ-২৪৫, নং-৩০৫৭)

৯৫. আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ .

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম।' (সুনানে আহমদ ও তিরমিযী)

মসজিদ

৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ الْبُقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَشَرُّ الْبُقَاعِ الْأَسْوَاقُ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদ এবং সর্ব নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার।'[৬৪]

(সুনানে আহমদ, আল-হাকীম, আত তাবারানী)

---

৬৪. বাজারগুলোকে সর্বনিকৃষ্ট স্থান বলার মূল কারণ হলো বাজারে প্রায়ই মিথ্যা কথা বলা ও প্রতারণা চলে।

৯৭. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اَحَبُّ الْبِلاَدِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلاَدِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا .

অর্থাৎ, 'দেশের মধ্যেকার আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদগুলো এবং এর মধ্যেকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার।'

(সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ-৩২৬, নং ১৪১৬)

৯৮. আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَاُ بِالسَّلاَمِ .

অর্থাৎ, 'কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক কথা-বার্তা বন্ধ রাখা বৈধ নয়, যাতে একে অপরের সাক্ষাৎ ঘটলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে আগে সালাম দেয়।'

(সহীহ সুনানে তিরমিজী, খ–২, পৃ–১৮১, নং ১৫৭৬)

৯৯. একজন বৃদ্ধ সাহাবী, রাসূল ﷺ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন–

اَلْمُسْلِمُ اِذَا كَانَ مُخَالِطًا النَّاسِ وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِىْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ .

অর্থাৎ, 'যে মুসলমান জনগণের সাথে মিশে এবং ধৈর্যের সাথে তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে, সে ঐ মুসলমানের চেয়ে ভাল যে জনগণের সাথে মিশে না এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে না।' (সুনানে তিরমিজী ও ইবন মাজাহ, সহীহ সুনানে তিরমিজী খ–২, পৃ–৩০৬, ৩০৭, নং ২০৩৫)

নামসমূহ

تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ .

অর্থাৎ, 'তোমরা নবীদের নামে তোমাদের নাম রাখ, আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান। সবচেয়ে সত্য নাম হলো হারিস[৬৫] এবং হামাম[৬৬] সবচেয়ে খারাপ নাম হলো হারব[৬৭]এবং মুররাহ।[৬৮]
(সুনানে আবু দাউদ, খ–৩, পৃ–১৩৭৭, নং ৪৯৩২)

রাত

১০১. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন– لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

অর্থাৎ, 'মহিমান্বিত রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।' (সূরা–৯৭ আল-কদর : আয়াত-৩)

১০২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ . لِلّٰهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ .

অর্থাৎ, 'তোমাদের কাছে রমযান এসেছে। একটি বরকতময় মাস, আল্লাহ তা'আলা তার সাওম (রোযা)-কে তোমাদের জন্য ফরয বা আবশ্যক

---

৬৫. চাষী, এদিক দিয়ে সত্য যে প্রত্যেকে এ দুনিয়ায় যা চাষ করবে আখিরাতে তার ফসল লাভ করবে।

৬৬. অর্থাৎ শক্তিমান বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এটাও সত্য।

৬৭. অর্থ– যুদ্ধ।

৬৮. অর্থ–তিক্ত।

করেছেন। এ মাসে বেহেশতের দরজাগুলো খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ রাখা হয় এবং (মাসব্যাপী) বড় শয়তানগুলোকে শিকল দিয়ে আটকিয়ে রাখা হয়। এ মাসে আল্লাহর এমন একটা রাত রয়েছে যা এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল, সে সত্যিকার অর্থে বঞ্চিত হলো।'[৬৯] (সুনানে নাসায়ী, সহীহ সুনানে নাসায়ী, খ-২, পৃ-৪৫৫, ৪৫৬, নং ১৯৯২, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, প-৪১৮)

অলঙ্কার

১০৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর হাতে দুটি স্বর্ণের চুড়ি দেখলেন এবং বললেন-

اَلاَ اُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا لَوْ نَزَعْتِ هٰذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ .

অর্থাৎ, 'আমি কি তোমাকে এর চেয়ে ভাল জিনিসের খবর জানাব না? সেগুলোকে খুলে ফেল এবং সেগুলোর স্থানে রৌপ্যের চুড়ি পর আশা করা যায় সেগুলোকে হলুদ রঙ-এর জাফরান রঙে রঞ্জিত করা হবে।'[৭০]

(সুনানে নাসায়ী, খ-৩, পৃ-১০৫১, নং ৪৭৪৯)

জান্নাত

১০৪. মহান আল্লাহ বলেন-

اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلاً .

৬৯.

এ বর্ণনা পরিষ্কার করে সে সব বর্ণনা যা বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনায় পাওয়া যায়, যেখানে কোনরূপ শ্রেণীবিভক্তি ছাড়াই শয়তানদের শিকলাবদ্ধ করার কথা পাওয়া যায়, এটাও উল্লেখ করার বিষয় যে, এ মাসে মানব শয়তানদের শিকল লাগানো হয় না। এ কারণে তারা এ মাসেও শয়তানী কাজ-কর্ম চালিয়ে যায়।

৭০. এ হাদীস তাদের দলিল যারা মনে করেন মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহার মাকরূহ। ইবনে আসাকীর বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইবন সীরিন, আবু হুরায়রা, যিনি নবী করীম ﷺ এর

অর্থাৎ, ‘ঐ দিন (কিয়ামতের দিন) জান্নাতের অধিবাসীরা পাবে সর্বোত্তম ঠিকানা এবং বিশ্রাম নেয়ার জন্য পাবে সর্বোত্তম স্থান।’

(সূরা–২৫ আল-ফুরকান : আয়াত-২৪)

১০৫. মহান আল্লাহ্ আরো বলেন–

وَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ .

অর্থাৎ, ‘এবং পরকাল জীবনের ঘর তাদের জন্য উত্তম যারা প্রভুকে ভয় করে, তোমরা কি বুঝ না?’ (সূরা–৭ আল-আ’রাফ : আয়াত-১৬৯)

১০৬. মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ .

অর্থাৎ, ‘নিশ্চয়ই পরকাল দিবসের প্রতিদান তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে ভয় করে।’

(সূরা–১২ ইউসুফ : আয়াত-৫৭)

পিতামাতা

১০৭. আনাস ইবনে মালেক এবং ইবনে মাসউদ (রা) উভয়ে নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন–

اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ, ‘সর্বোত্তম কাজ হলো নির্ধারিত সময়ের শুরুতে সালাত আদায় করা, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।’

(সহীহ্ আল-বুখারী, খ–১, পৃ–৩০০-৩০১, নং ৫০৫), সহীহ্ মুসলিম, খ–১, পৃ–৪৯-৫০ নং ১৫২)

১০৮. শু'আইব (রা) নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন-

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا أَزِيْدُكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوْا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلٰى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ . ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ . لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ .

অর্থাৎ, 'জান্নাতের অধিবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলবেন, তোমরা কি চাও আমি তোমাদের জন্য আরো বাড়তি কিছু দিব? তারা জবাবে বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারাকে উজ্জ্বল করেন নি? আপনি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করান নি এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করেন নি? এরপর মহান রব তাঁর চেহারার পর্দা উন্মুক্ত করবেন এবং তাদের নিকট এর চেয়ে প্রিয়তম জিনিস আর নেই যে, তাঁরা তাদের পরাক্রমশালী মহান রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এরপর রাসূল ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করেন- 'যারা ভাল কাজ করেছে তারা পুরস্কার পাবে এবং তার চেয়েও ভাল জিনিস পাবে।'[৭১]

(সহীহ মুসলিম, খ-২, পৃ-১১৪, নং ৩৪৭-৩৪৮)

ধৈর্য

১০৯. মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَأَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

অর্থাৎ, 'তোমাদের জন্য এটা উত্তম যে তোমরা ধৈর্যশীল হবে, কেননা আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়াবান।' (সূরা-৪ আন-নিসা : আয়াত-২৫)

---

৭১. সূরা ইউনুস (১০ ঃ ২৬)

১১০. কা'ব ইবনে মালিক (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বলতে শুনেছেন, তিনি ইরশাদ করেন :

اَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيْمَيْنِ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম মানুষ যে ব্যক্তি পিতামাতার মাঝ থেকে মু'মিন হয়।[৭২]

(সুনানে আহমাদ, আত্তাবারানী)

১১১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো-

اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ؟ قَالَ : (كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ) قَالُوْا : صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهٗ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ؟ قَالَ : (هُوَ التَّقِىُّ لاَ اِثْمَ فِيْهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম মানুষ কে?' তিনি উত্তর দিলেন : প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার অধিকারে রয়েছে একটি পরিমিত হৃদয় এবং সত্যবাদী জিহ্বা।' তারা বললেন- আমরা বুঝি সত্যবাদী জিহ্বা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, পরিমিত হৃদয় দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন : ঐ ব্যক্তি যিনি ধার্মিক, খাঁটি, নিষ্পাপ, ন্যায়বিচারক, কোনরূপ বাড়াবাড়ি ও ঈর্ষামুক্ত।"

(ইবন মাজাহ, খ-২, পৃ- ৪৪ নং ৩৩৯৭)

১১২. আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

اَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ، ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِىْ شِعَبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهٖ .

৭২. কারীমাইন : দু'সম্মানিত ব্যক্তি। এর দ্বারা ঈমানদার মাতা এবং পিতাকে বুঝানো হয়েছে। দেখুন : আন নিহায়া লিগারীবিল হাদীস লি ইবনিল আছীর।

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম মানুষ হলো ঐ ব্যক্তি যে জান এবং মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, এরপরে ঐ ব্যক্তি, যে কোন উপত্যকায় বসবাস করে এবং নিজেকে মানব সমাজ থেকে সরিয়ে রাখে যাতে তার ক্ষতি থেকে সমাজ রক্ষা পায়।'[৭৩] (আত তিরমিজী, সুনানে নাসায়ী, ইবন মাজাহ, আহমাদ এবং দারু কুতনী। আরো রয়েছে– সহীহ আল-বুখারী, খ–৪, পৃ–৩৭ নং ৪৫ এবং সহীহ মুসলিম, খ–৩, পৃ–১০৪৮ নং ৪৬৫২), (আততাবারানী এবং দারু কুতনী)

১১৩. জাবির (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ .

অর্থাৎ, ভাল মানুষ সে, মানুষের উপকারী যে।

সুগন্ধি

১১৪. আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَطْيَبُ طِيْبِكُمُ الْمِسْكُ .

অর্থাৎ, 'তোমাদের সর্বোত্তম সুগন্ধি হলো মিসক।'[৭৪]

(সুনানে আবু দাউদ, খ–২, পৃ–৮৯৭ নং ৩১৫২)

১১৫. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اِنَّ خَيْرَ طِيْبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِىَ لَوْنُهُ وَخَيْرَ طِيْبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِىَ رِيْحُهُ . وَنَهٰى عَنْ مِيْثَرَةِ الْاَرْجُوَانِ .

---

৭৩. যিনি তাঁর দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত এবং এর ক্ষতি থেকে লোকদের রক্ষার জন্য দূরে থাকেন।

৭৪, আবু দাউদ (র) এ হাদীসকে 'মিসক মৃতদেহের সুগন্ধি' অধ্যায়ে এনেছেন। নবী করীম ﷺ-এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে 'মিসক' মৃতদেহের জন্য উত্তম সুগন্ধি।

অর্থাৎ, 'পুরুষের জন্য সর্বোত্তম সুগন্ধি হলো যার সুগন্ধি তীব্র, রং হাল্কা, পক্ষান্তরে নারীর জন্য সর্বোত্তম সুগন্ধি হলো যার সুগন্ধি হাল্কা এবং রং তীব্র। রাসূল ﷺ গভীর লাল রং এর বিছানার চাদর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।' (সহীহ্ সুনানে তিরমিজী, খ-২, পৃ-৩৬৩ নং ২২৩৯)

কবিতা

১১৬. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا .

অর্থাৎ, 'তোমার ভেতরটা (অশ্লীল) কবিতা দিয়ে পূর্ণ করার চেয়ে ক্ষয়কর পুঁজ দিয়ে পূর্ণ করা অনেক ভাল।'[৭৫] (সহীহ্ আল-বুখারী, খ-৮, পৃ-১১৩, নং ১৭৫, সহীহ্ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২২০-২১, নং ৫৬০৯-১০)

সালাত

১১৭. উম্মে ফারওয়াহ্ এবং ইবনে মাসউদ (রা) উভয়ে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন-

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম কাজ হলো নির্দিষ্ট সময়ে শুরুতে সালাত আদায় করা।' (বাইহাকী ফী শু'আবিল ঈমান, সহীহ্ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-৩০০-৩০১, নং ৫০৫, সহীহ্ মুসলিম, খ-১, পৃ- ৪৯, ৫০ নং ১৫২ এবং সুনানে আবু দাউদ খ-১, পৃ-১১১, নং ৪২৬, আরো দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, নং ১২৪)

---

৭৫. এ হলো সে সকল কবিতার কথা যা ঈমান থেকে উৎসারিত নয়। যেমন বাদ্য, সঙ্গীত, এটা হৃদয়কে দখল করে এবং বিদ্রোহের দিকে নিয়ে যায়। মূর্খরা এর মধ্যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে পার্থিব মোহে মোহিত হয়। এছাড়াও বাদ্যযন্ত্রযুক্ত সঙ্গীত ও কলা এর অন্তর্ভুক্ত। কবিতা যদি ঈমানী স্পিরিটে হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য। আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, 'একজন আরবের দ্বারা সর্ব সত্য যে কবিতাটি নবী কর্তৃক বলা হয়েছে তা হলো- أَنْظُرْ مَا سِوَى اللّٰهَ بَاطِلٌ 'দেখ! আল্লাহ ছাড়া যা আছে সব বাতিল।' (সহীহ্ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২২০, নং ৫৬০৪) নবী করীম ﷺ তাঁর এক সাহাবী হাসসান বিন সাবিতকে ইসলামের পক্ষে কবিতা রচনার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

১১৮. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللّٰهِ صَلاَةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ جَمَاعَةٍ .

অর্থাৎ, 'আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সালাত হলো জুম'আর দিনের ফজর সালাত যা জামা'আত সহকারে আদায় করা হয়।' (বাইহাকী ফী শু'আবিল ঈমান, আবু নু'আইম ফিল হিলইয়াল আউলিয়া, সুনানে ইবন মাজাহ, খ-২, পৃ-১৫০-১৫১, নং ৪২১)

১১৯. যায়েদ ইবনে ছাবিত বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ صَلاَتِكُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ .

অর্থাৎ, 'তোমাদের সর্বোত্তম সালাত হলো যেগুলো ঘরে আদায় করা হয়, তবে ফরজ সালাত ছাড়া।'[৭৬] (সুনানে তিরমিযী, সহীহ আল-বুখারী, খ–১, পৃ–৩৯১-৯২, নং ৬৯৮, সহীহ মুসলিম, খ–১, পৃ–৩৭৭, নং ১৭০৮, সুনানে আবু দাউদ, খ–১, পৃ–৩৭৯ নং ১৪৪২)

১২০. আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ الصَّلاَةُ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ، وَاَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ .

অর্থাৎ, 'ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হলো মধ্যরাতের সালাত, রমযানের সাওম, এরপর সর্বোত্তম সাওম হলো মুহাররম মাসের সাওম।' (সহীহ মুসলিম, খ–২, পৃ–৫৬৯ নং ২৬১১, সুনানে আরবায়াতে, সুনানে আবু দাউদ, উল্লেখ করেছেন। আরো দেখুন ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ। খ–১, নং ৪৩৩)

---

৭৬. অন্য বর্ণনায় যায়েদ (রা) রাসূল ﷺ-এর এ উক্তি উল্লেখ করেছেন : কোন ব্যক্তি তার ঘরে যে সালাত আদায় করে তা আমার মসজিদে আদায় করা সালাতের চেয়ে উত্তম, তবে ফরয সালাত ব্যতীত। (সুনানে আবু দাউদ, খ–১, প–২৬৮, নং–১০৩৯। এ সব হাদীসে নফল সালাত ঘরে পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে।) কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, তাঁর মসজিদে সালাত আদায় করা অন্য স্থানের চেয়ে ১০০০ গুণ সওয়াব বেশি।

১২১. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম সালাত হলো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো সালাত।'[৭৭] (সহীহ্ মুসলিম খ–১, পৃ–৩৬৪, নং–১৬৫০, তিরিমিযী, ইবন মাজাহ্, খ–২, পৃ–১৫০-৫১ নং ৪২১, মুসনাদে আহমাদ, আবু মূসা, আমর ইবন আবামা এবং উমাইর ইবনে কাতাদাহ্ থেকে তাবারানী কবীরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এরূপ হাদীস সুনানে আবু দাউদ, খ–১, পৃ–৩৪৮ নং ১৩২০ -এ রয়েছে।)

১২২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلاَةِ .

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে' তারাই সর্বোত্তম, যাদের কাঁধ সালাতের মধ্যে নরম থাকে।'[৭৮] (সুনানে আবু দাউদ খ–১, পৃ–১৭৪, নং ৬৭২)

১২৩. ইবনে ওমর (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন–

لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ .

অর্থাৎ, 'তোমাদের নারীদের মসজিদে গমন থেকে বাধা দিও না,[৭৯] তবে ঘরই তাদের জন্য উত্তম।'[৮০] (সুনানে আবু দাউদ, খ–১, পৃ–১৪৯, নং ৫৬৭)

---

৭৭. এ বর্ণনার ভিত্তিতে, পণ্ডিতগণ এ মত পোষণ করেন, নফল কম রাক'আতে বেশি তিলাওয়াত বেশি রাক'আতে কম তিলাওয়াতের চেয়ে উত্তম। (যদিও সালাতে মনোযোগ ও আন্তরিকতাই মূল বিবেচ্য বিষয়।)

৭৮. আরবি প্রবাদ 'নরম কাঁধ' অর্থ তারা তাদের দেহকে শক্ত করে না, এমনভাবে যাতে অন্যদের কষ্ট হয় অর্থাৎ তাদের পাশে যারা সালাত আদায় করে এবং তাদের কেউ নাড়াতে চাইলে সহজে নড়ে, কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে।

৭৯. এ ধরনের হাদীস বুখারী এবং মুসলিম শরীফেও পাওয়া যায়। এটাও উল্লেখ্য যে, রাসূল ﷺ এ শর্ত দিয়েছেন যে, তারা সুগন্ধি ব্যবহার করে যেন মসজিদে না যায়। (সুনানে আবু দাউদ খ–১, পৃ–১৪৯ নং ৫৬৫)

৮০. নারীদের ক্ষেত্রে, এ হাদীসের ভিত্তিতে এবং এরূপ অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে, মসজিদে সালাত আদায়ে কোন বাড়তি ছাওয়াব নেই।

১২৪. উম্মে সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীমﷺইরশাদ করেন–

خَيْرُ صَلاَةِ النِّسَاءِ فِيْ قَعْرِ بُيُوْتِهِنَّ .

অর্থাৎ, 'মহিলাদের সর্বোত্তম সালাত হলো তাদের ঘরের অভ্যন্তরের কক্ষের সালাত।' (মুসনাদে আহমাদ, আততাবারানী, অনুরূপ হাদীস সুনানে আবু দাউদ, খ–১, পৃ–১৫০, নং ৫৭০)

১২৫. আব্দুল্লাহ ইবন বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত যে, ইমরান ইবনে হুসাইন নবী করীমﷺ-কে কোন ব্যক্তির বসে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তর দিলেন–

صَلاَتُهُ قَائِمًا اَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا وَصَلاَتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَائِمًا، وَصَلاَتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا .

অর্থাৎ, 'দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা বসে সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর বসে আদায় করা সালাতের ছাওয়াব দাঁড়িয়ে আদায় করা সালাতের অর্ধেক, শয়ন করে আদায় করা সালাতের সাওয়াব বসে আদায় করা সালাতের অর্ধেক।[৮১] (সহীহ আল-বুখারী, খ–২, পৃ–১২০, নং ২১৬, সুনানে আবু দাউদ, খ–১, পৃ–২৪৩, নং ৯৫১)

১২৬. ইবনে আমর বর্ণনা করেন, নবী করীমﷺইরশাদ করেছেন–

اَحَبُّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ .

---

৮১. এ হাদীসে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, কিছু সুন্নত সালাত বসে আদায় করা অযৌক্তিক, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। নবী করীমﷺ-এর থেকে এ ধরনের আমল প্রমাণিত নেই, তবে তিনি পীড়িত অবস্থায় কখনো কখনো এরূপ করেছেন এবং তাঁর জীবনের শেষ সময়গুলোতে যখন ওজন কমে তিনি বৃদ্ধ বয়স অনুভব করতে পারছিলেন। এ সব আমল দ্বারা অসুস্থ ও দুর্বল লোকেরা দলিল গ্রহণ করতে পারেন। অন্যথায় স্বাভাবিক অবস্থায় এরূপ করা শুধু তার পক্ষেই সম্ভব, যিনি স্বেচ্ছায় আধা ব্যবসায় পূর্ণ পুঁজি খাটাতে চান।

অর্থাৎ, 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সালাত (নফল) সর্বাধিক পছন্দ করেন তা হলো দাউদ (আ)-এর সালাত। তিনি রাতের অর্ধেক ঘুমাতেন, তিন ভাগের এক ভাগ জাগতেন এবং অবশিষ্ট ছয় ভাগের এক ভাগ পুনরায় ঘুমাতেন।' (সুনানে আহমাদ, আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৬৭৪, নং ২৪৪২, সুনানে নাসায়ী ইবনে মাজাহ। সহীহ আল-বুখারী, খ-২, পৃ-১২৯ নং ২৩১, সহীহ মুসলিম, খ-২, পৃ-৬৫৫ নং ২৫৯৫)

১২৭. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءً .

অর্থাৎ, 'জামা'আতে সালাত আদায় করা একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে পঁচিশ গুণ সাওয়াব বেশি। (সহীহ মুসলিম খ-১, পৃ-৩১৪, নং ১৩৬০, সহীহ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-৩৫১, নং ৬১৯, আবু সাঈদ খুদরী থেকে।)

১২৮. ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

অর্থাৎ, 'জামা'আতে সালাত আদায় করা একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ[৮২] সাওয়াব বেশি।' (সহীহ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-৩৫১ নং ৬১৮, সহীহ মুসলিম খ-১, পৃ-৩১৫, নং ১৩৬৫)

১২৯. আবু জুহাইম তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলতে শুনেছেন যিনি সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন-

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لاَ أَدْرِيْ قَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً .

---

৮২. ইবনে হাজার এর মতে, উচ্চৈ:স্বরে আদায়কৃত সালাতে ২৭ গুণ সওয়াব এবং নিম্নস্বরে আদায়কৃত সালাতের (জোহর-আছর) সাওয়াব ২৫ গুণ (ফতহুল বারী)।

অর্থাৎ, 'সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি যদি তার কি পরিমাণ পাপ হয় এ প্রসঙ্গে জানত, তাহলে সে সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ [......] পর্যন্ত অপেক্ষা করত। বর্ণনাকারী আবুন নদর বলেন : আমি নিশ্চিত নই তিনি চল্লিশ দিন, মাস বা বছর বলেছেন।'
(সহীহ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-২৯০-২৯৯, নং ৪৮৯, সহীহ মুসলিম খ-১, পৃ-২৬১ নং ১০২৭)

সম্পদ

১৩০. আবু উমামা আল্লাহর রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْاَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا) . فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ : (ذَاكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِنَا) . ثُمَّ قَالَ : (اَلْعَوَرُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِىٌّ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ .

অর্থাৎ, 'মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক অধিকারীকে তার পূর্ণ অধিকার অর্পণ করেছেন। সুতরাং কোন উত্তরাধিকারীর জন্য অসিয়ত (আরো সম্পদ প্রদানের নির্দেশ) দেয়া যাবে না।[৮৩] কোন মহিলার জন্য তাঁর স্বামীর সম্পদ থেকে তাঁর 'অনুমতি ব্যতীত[৮৪] ব্যয় করা উচিত নয়। তাঁকে জিজ্ঞেস

---

৮৩. উত্তরাধিকার বণ্টন নীতিমালা কুরআন-হাদীসে বিধৃত হয়েছে। উত্তরাধিকারীদের সম্পদের (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দান করা জায়েয, তাদের জন্য যারা কুরআন-হাদীসের বিধানানুপাতে উত্তরাধিকার নয়। এ হাদীস অনুযায়ী কোন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করা হয় এমন অসিয়ত অবৈধ। বাতিল।

৮৪. যদি স্বামী তার পরিবারের জন্য ব্যয় করার যথেষ্ট সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা করতে অস্বীকার করে, ইসলামি বিধান তার স্ত্রীকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে ও অজ্ঞাতসারে কিছু অর্থ খরচ করার অনুমতি দান করে। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হিন্দা বিনত উতবা (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী) রাসূল ﷺ এর নিকট আসলেন এবং বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, অবশ্যই আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, সে আমাকে ও আমার সন্তানকে যথেষ্ট দেয় না, তবে আমি তার সম্পদ থেকে তার অজ্ঞাতসারে যা নেই, আমি কি ভুল করছি? নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন : তুমি অত্র সম্পদ থেকে তোমার এবং তোমার পুত্রের প্রয়োজন মত গ্রহণ কর। (সহীহ আল-বুখারী, খ-৭, পৃ-২০৮ নং ২৭২)

করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল খাদ্য শস্যও কি? উত্তরে তিনি বললেন : উহাই আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ,[৮৫] অতঃপর তিনি আরো বলেন : ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে, উটনী যা দুগ্ধ পানের জন্য ধার করা[৮৬] হয়েছে তাও ফেরত দিতে হবে, ধার অবশ্যই ফেরত দিতে হবে, জামিনদার অবশ্যই দায়ী থাকবে।' (সুনানে আবু দাউদ খ-২, পৃ-১০১০-১০১১, নং ৩৫৫৮)

১৩১. আমর ইবন শু'আইব[৮৭]এর প্রপিতামহ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন-

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ مَالاً وَوَلَدًا وَاِنَّ وَالِدِىْ يَحْتَاجُ مَالِىْ قَالَ : (اَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ . اِنَّ اَوْلاَدَكُمْ مِنْ اَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ كَسَبِ اَوْلاَدِكُمْ) .

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদ এবং সন্তান রয়েছে এবং আমার পিতার জন্য আমার কিছু সম্পদের প্রয়োজন। তিনি জবাব দিলেন 'তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। বস্তুত তোমাদের সন্তানরা তোমাদের

---

৮৫. এখানে দান করার ক্ষেত্রে অপচয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। আয়েশা (রা) রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : যখন কোন মহিলা তার স্বামীর খাদ্যশস্য দান করে, কোনরূপ ক্ষতি বা অপচয় না করে তাহলে এখানে সেই মহিলা তার দানের সাওয়াব পাবে এবং পুরুষ তার সম্পদ অর্জনের সাওয়াব পাবে। এরূপভাবে যেকোন আমানতদার। (সহীহ মুসলিম, খ-২, পৃ-৪৯০ নং ২২৩২-২২৩৩)

৮৬. মূল আরবিতে مِنْحَةٌ শব্দটি এসেছে, যার দ্বারা উটনী অথবা অন্য কোন মাদী প্রাণী দুধ খাবার জন্য ধার আনা বুঝায়। এটা নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য। অন্য অর্থেও তা ব্যবহৃত হতে পারে। (যেমন : গাছ ফলের জন্য, জমি ফসলের জন্য। এগুলো ব্যবহারের পর ফেরত দিতে হবে।)

৮৭. আমর (র)-এর প্রপিতামহ ছিলেন প্রিয়নবী ﷺ-এর বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস।'

সর্বোত্তম অর্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের অর্জন থেকে গ্রহণ করতে পারো।'[৮৮] (সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-১০০২ নং ৩৫২৩)

১৩২. ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ .

অর্থাৎ, 'যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির দুঃসংবাদ দান কর।'

(সূরা তাওবাহ : আয়াত-৩৪)

যখন আমরা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এবং কোন কোন সাহাবী বলেন, 'এ আয়াত তো স্বর্ণ-রৌপ্য সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা যদি জানতাম কোন সম্পদ উত্তম, তাহলে আমরা তা অর্জন করতাম।' নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

اَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تَعِيْنُهُ عَلٰى اِيْمَانِهِ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম সম্পদগুলো হলো : আল্লাহকে স্মরণকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ হৃদয় এবং ঈমানদার স্ত্রী যে তাঁর স্বামীর ঈমান বৃদ্ধির জন্য সর্বদা চেষ্টা করে।'[৮৯] (সুনানে তিরমিযী, খ-৩, পৃ-৫৫, ৫৬ নং ২৪৭০)

---

৮৮. এ সুন্নাহর কোন কোন ভাষ্যে বর্ণনাকারী বলেন, 'আমার পিতা আমার সম্পদ ভোগ করছেন।' উভয় ভাষ্যে একথা প্রমাণিত যে, পিতা-মাতার প্রয়োজন হলে সন্তানের দায়িত্ব হলো তাদের ভরণ-পোষণ প্রদান করা। এ হাদীসকে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা যাবে না। অন্যথা, পিতা-মাতা সন্তানকে বিক্রি করতে পারতেন, যা কিনা সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই নিষিদ্ধ। এ হাদীস দ্বারা হাম্বলী মাজহাবের লোকরা দলিল প্রদান করেন যে, পিতা তার কন্যার মাহরানার একটা অংশ গ্রহণ করতে পারেন। (দেখুন : আল মুগনী, খ-১০, পৃ-১১৮-১২০০ যদিও এটা কোন মানদণ্ড নয়। তবে তিনি যদি আর্থিকভাবে দুর্বল হন তাহলে সে কথা আলাদা।

৮৯. আবু হুরায়রাহ (রা) হতে আরো বর্ণিত, নবী করীম (স) ইরশাদ করেন ঃ সত্যিকার সম্পদ অর্থের দ্বারা নয় বরং সন্তুষ্টির দ্বারা পরিমাপযোগ্য। (সহীহ আল বুখারী, খ-৮, পৃ- ৩০৪ নং ৪৫৩, স্ত্রীকে সম্পদ বলা উপমা স্বরূপ।

১৩৩. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ .

অর্থাৎ, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে প্রিয়তম না হব।'

(সহীহ আল-বুখারী, খ–১, পৃ–২০ নং ১৪)

১৩৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) আরো বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ .

অর্থাৎ, 'যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে–

ক. আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূল এতদুভয় ব্যতীত সকলের চেয়ে প্রিয়তম।

খ. যেকোন ব্যক্তিকে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালবাসে অন্য কোন কারণে নয়।

গ. সে কুফরীতে ফিরে যেতে তেমন অপছন্দ করে, আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে যেমন অপছন্দ করে। (সহীহ আল-বুখারী, খ–১, পৃ–২৩-২৪, নং ২০, সুনানে আবু দাউদ, খ–১, পৃ–১৭৫ নং ৬৭৮)

নবীর মসজিদ

১৩৫. আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

অর্থাৎ, 'আমার মসজিদে এক রাক্'আত সালাত আদায় করা[৯০] এ ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে সালাত আদায় করার চেয়ে এক হাজার গুণ বেশি সাওয়াব, তবে মসজিদে হারাম ছাড়া।' (সহীহ মুসলিম, খ-২, পৃ-৬৯৭ নং ৩২০৯)

১৩৬. আনাস (রা) হতে বর্ণিত নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الْقُرْاٰنِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

অর্থাৎ, 'কুরআনের সর্বোত্তম অংশ হলো, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) (হাকীম, আল বাইহাকী ফী শু'আবিল ঈমান)

১৩৭. সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ .

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, আহমদ, দারেমী এবং সহীহ আল-বুখারী, খ-৬, পৃ-৫০১-২, নং ৫৪৫ এবং সুনানে তিরমিজী আলী এবং সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-৩৮০ নং ১৪৪৭; আরো দেখুন : মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, নং ৪৪৬)

১৩৮. আবু সাঈদ ইবন আল মুয়াল্লা থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

(لَأُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَوْ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ) قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَوْلَكَ؟ قَالَ

---

৯০. নবী করীম ﷺ-এর মসজিদে সালাতের অধিক ছওয়াব হবার মূল কারণ মসজিদের মর্যাদা। যদিও তিনি যখন এ হাদীসের বাণী শুনাচ্ছিলেন তখন তার কবর হয় নি। ইন্তিকালের পরও তার কবর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বরং তার কবর ছিল আয়েশা (রা)-এর ঘরের মধ্যে। পরবর্তীতে মসজিদ বর্ধনের ফলে কবর মুবারক মসজিদের মধ্যে পড়েছে। কবরের স্থানে সালাত আদায় করা নিষেধ। জুনদব ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের পাঁচদিন পূর্বে তিনি তাঁর নিকট থেকে বলতে শুনেছেন : পূর্ববর্তী নবীর উম্মতগণ তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছিল, তোমরা কবরকে ইবাদতখানা বানিও না, আমি কঠিনভাবে এরূপ করতে নিষেধ করছি। (সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ-২৬৯ নং ১০৮৩)

:(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) وَهِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِى الَّتِىْ أُوْتِيْتُ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيمُ .

অর্থাৎ, 'আমি অবশ্যই তোমাকে কুরআনের একটি মহান সূরা এ মসজিদ ত্যাগ করার পূর্বে শিক্ষা দিব। (আমরা মসজিদ ত্যাগ করতে করতে) আমি বললাম : 'আপনার কথাটি কি? তিনি বললেন : উহা হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি গোটা বিশ্ব জাহানের প্রভু। এ হলো সাতটি বারবার আবৃত্তিকৃত আয়াত এবং মহান কুরআন।[৯১]
(সহীহ আল-বুখারী, খ–৬, পৃ–৪৮৯-৯০, নং ৫২৮ সুনানে আবু দাউদ খ–১, পৃ–৩৮২, নং ১৪৫৩)

১৩৯. উবাই ইবনে কা'ব (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

(اَبَا الْمُنْذِرِ، اَىُّ اٰيَةٍ مَعَكَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَعْظَمُ؟) قَالَ : قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، قَالَ : (اَبَا الْمُنْذِرِ، اَىُّ اٰيَةٍ مَعَكَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَعْظَمُ؟) قَالَ : قُلْتُ : (اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ) . قَالَ : فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ : لِيَهْنَ لَكَ اَبَا الْمُنْذِرِ الْعِلْمُ .

অর্থাৎ, 'হে আবুল মুনজির (উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর প্রচলিত নাম) আল্লাহর কুরআনের সবচেয়ে মহান আয়াত কোনটি? আমি উত্তর দিলাম, আল্লাহ এবং রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি পুনরায় বললেন, হে আবুল

---

৯১. সুরা আল–হিজর থেকে উদ্ধৃত (১৫ : ৮৭)

মুনজির! আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে মহান আয়াত কোনটি[৯২]? আমি উত্তরে বললাম–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ .

অর্থাৎ, 'আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।' (সূরা আল বাকারা–২৫৫, সহীহ্ মুসলিম, খ–২, পৃ–৩৮৭, নং ১৭৬৮, সুনানে আবু দাউদ, খ–১, পৃ–৩৮২, ৩৮৩, নং ১৪৫৫)

১৪০. উকবাহ্ ইবনে আমির (রা) বর্ণনা করেন যে, যখন তিনি রাসূল ﷺ এর উটনী চরাচ্ছিলেন, তিনি তাকে বললেন–

(يَا عُقْبَةُ اَلاَ اُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا؟) فَعَلَّمَنِىْ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) قَالَ : فَلَمْ يَرَنِىْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا ، فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلاَةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الصَّلاَةِ اِلْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ : يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَاَيْتَ؟

অর্থাৎ, 'হে উকবাহ্! আমি কি তোমাকে এ যাবতকালের তিলাওয়াতকৃত সর্বোত্তম দুটি সূরা শিক্ষা দিব না? অতঃপর তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন : قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ অর্থ : "বলুন! আমি ভোরের প্রভুর কাছে আশ্রয় চাই এবং বলুন ঃ আমি মানুষের প্রভুর নিকট আশ্রয় চাই।' তিনি এ ব্যাপারে আমাকে খুব খুশি পেলেন না। যখন

---

৯২. এখানে রাসূল ﷺ যে বড়ত্বের কথা বলছেন তা হলো এগুলো তিলাওয়াতের মাধ্যমে অধিক সাওয়াব লাভ করা। অন্যথায় কুরআনের এক অংশের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার দ্বারা অন্য অংশের ঘাটতি দেখা যায় যা আল্লাহর কালামের ব্যাপারে খাটে না। (শারহ নব্বী, খ–৩, পৃ–৩৫৪)

তিনি সালাতুল ফজর আদায়ের জন্য উট থেকে নামলেন এবং এ দুটি সূরা দিয়ে সালাত আদায় এবং ইমামতি করলেন। সালাত সমাপ্ত করার পর আল্লাহর রাসূল আমার দিকে ফিরলেন এবং বললেন : 'হে উকবা তুমি এ সম্পর্কে কি মনে কর?' (সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-৩৮৩, নং ১৪৫৭)

সন্ধি

১৪১. আবুদ্ দারদা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

(أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟) قَالُوْا : بَلٰى . قَالَ : صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ .

অর্থাৎ, 'আমি কি তোমাদের সিয়াম, সালাত এবং সদকার চেয়েও মর্যাদার (ও সাওয়াব) দিক দিয়ে উত্তম এমন কিছুর সন্ধান দিব না? তারা বললেন : 'অবশ্যই।' তিনি তখন বললেন ঃ মানুষের মধ্যে মিলমিশের (সন্ধি) ব্যবস্থা করা। কেননা দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করা ধ্বংসের মূল।'

(সুনানে তিরমিজী, আবু দাউদ, খ-১, পৃ-১৩৭০, নং ৪৯০১, সুনানে তিরমিজী খ-২, পৃ-৩০৭, নং ২০৩৭)

দ্বীন

১৪২. মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً .

অর্থাৎ, 'দ্বীনের দিক দিয়ে তার চেয়ে আর কে উত্তম হতে পারে যে ব্যক্তি নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করছে, এবং সে সৎকর্মশীল, আর ইবরাহীমের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সঠিকভাবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন

ইবরাহীম[৯৩] (আ)-কে তার প্রিয়তম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

(সূরা-৪ নিসা : আয়াত-১২৫)

১৪৩. সাদ (রা) বর্ণনা করে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ دِيْنِكُمْ الْوَرَعُ .

অর্থাৎ, 'তোমাদের দ্বীনের সর্বোত্তম অংশ হলো সচেতনতা (আল্লাহর ভয় এবং অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সজাগ থাকা।) (হাকীম ও দায়লামী)

১৪৪. মিহজান ইবন আল আদরা থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ دِيْنِكُمْ اَيْسَرُهٗ .

অর্থাৎ, 'তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হলো সহজ পথ।'[৯৪]

(সুনানে আহমদ, আত্-তাবারানী)

১৪৫. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ তাকে দেখলেন একজন মহিলা তার সঙ্গে (আসাদ গোত্রের মহিলা বলে সহীহ মুসলিম-এর খ–১, পৃ–৩৭৭, নং ১৯১০ এ উল্লেখ পাওয়া যায়)।

---

৯৩. নবী ইবরাহীম (আ)–এর দ্বীন হলো ইসলাম যেমন আল–কুরআনের ঘোষণা–

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلاَ نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

অর্থাৎ, 'ইবরাহীম ইহুদি খ্রিস্টান ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলিম। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (৩ : ৬৭)

৯৪. আল্লাহ তা'আলা আল–কুরআনে বলেন– وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ . (২২ ঃ ৭৮) - তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে কোন জিনিসকে কঠিন করেন নি এবং নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, দ্বীন হলো সহজ, এবং যে–ই দ্বীনের ব্যাপারে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে নেয়, সেই পরাজিত হয়। (সহীহ আল–বুখারী, খ–১, পৃ–৩৪ নং ৩৮) নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন : যখনই নবী করীম ﷺ কে দুটি বিষয়ের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তিনি সহজতর পথটি বেছে নিয়েছেন। (সহীহ আল-বুখারী, খ–৪, পৃ–৪৯১, নং ৭৬০, সহীহ মুসলিম খ–৪, পৃ–১২৪৬, নং ২৫২, সুনানে আবু দাউদ, খ–৩, পৃ–১৩৪১, নং ৪৭৬৭)

রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন তার পরিচয় কি? আয়েশা (রা) বললেন : তিনি অমুক অমুক এবং তাঁর দীর্ঘ সালাতের বিষয়ও উল্লেখ করলেন। তিনি অসম্মতভাবে উত্তর দিলেন–

مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لاَ يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَكَانَ اَحَبَّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهٗ .

অর্থাৎ, 'এমন কাজ কর যার বোঝা বহন করার ক্ষমতা তুমি রাখ। তোমরা ভাল কাজ করতে গিয়ে ক্লান্ত হলেও আল্লাহ তার প্রতিদান দিতে ক্লান্ত হন না। আল্লাহর নিকট দ্বীনের ঐ অংশ বেশি প্রিয় যে অংশ নিয়মিত করা হয়।'

(সহীহ আল-বুখারী, খ–১, পৃ–৩৭, ৩৬, নং ৪১)

আল্লাহর যিকির

১৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ الْعَمَلِ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম আমল হলো এমনভাবে দুনিয়া ত্যাগ করা যে, তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহর যিকিরের দ্বারা তরতাজা থাকে।'

(আবু নু'আইম ফিল হিলইয়া, দেখুন ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ খ–১, পৃ– ৪৭৯)

১৪৭. জাবির (রা) উল্লেখ করেন যে, নবী মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الذِّكْرِ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম যিকির হলো– لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই।' (সুনানে তিরমিজী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, হাকীম)

১৪৮. আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো–

اَىُّ الْكَلاَمِ اَفْضَلُ؟ قَالَ : مَا اصْطَفَى اللّٰهُ لِمَلاَئِكَتِهٖ اَوْ لِعِبَادِهٖ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম বাক্য কোনগুলো? তিনি উত্তর দিলেন, যে বাক্যগুলো আল্লাহ তাঁর বান্দা এবং ফেরেশতাদের জন্য বাছাই করেছেন, সেগুলো হলো سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ , পবিত্রতা মহান আল্লাহর এবং প্রশংসা তাঁরই।'

(সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১৪২৯, নং ৬৫৮৬)

১৪৯. আইদার উম্মুল হাকাম অথবা দুবায়াহ, জুবাইর ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এর কন্যা বর্ণনা করেন-

اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْيًا فَذَهَبْتُ اَنَا وَاُخْتِىْ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَسَاَلْنَاهُ اَنْ يَّاْمُرَ لَنَا بِشَىْءٍ مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : (سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ ، لَكِنْ سَاَدُلُّكُنَّ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذٰلِكَ ، تُكَبِّرْنَ اللّٰهَ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ تَكْبِيْرَةً وَّثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) .

অর্থাৎ, 'আল্লাহর রাসূলের কন্যা ফাতিমা, আমি এবং আমার বোন আমরা এ তিনজন রাসূল ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং আমাদের অবস্থা তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। আমরা তাঁর নিকট কিছু নির্দেশনা চাইলাম যাতে আমরা ক্রীতদাস হিসেবে কিছু যুদ্ধবন্দী পেতে পারি। আল্লাহর রাসূল বললেন বদর যুদ্ধের শহীদানদের এতিমগণ এসেছিলেন তোমাদের পূর্বে (এবং তারা যুদ্ধবন্দী চেয়েছিলেন।[৯৫] তবে আমি তোমাদের এর চেয়ে ভাল জিনিসের সন্ধান দেব। প্রত্যেক সালাতের পরে আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, সুবহানাল্লাহ

৯৫. নবী করীম ﷺ কিছু যুদ্ধবন্দীদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে বদর যুদ্ধের শহীদানদের এতিমদের দিয়েছিলেন।

(আল্লাহ পবিত্র) ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর) ৩৩ বার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর (আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক তাঁর কোন শরিক নেই, রাজত্ব তাঁর, প্রশংসা সবই তাঁর এবং তিনি সবার ওপর ক্ষমতাবান।)' একবার পড়বে। (সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৮৪৬, নং ২৯৮১)

১৫০. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, মদিনায় হিজরত করে আসা দরিদ্র লোকেরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন−

ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ ۔ فَقَالَ : (وَمَا ذَاكَ؟) قَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُوْنَ وَلاَ نُعْتِقُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : (اَفَلاَ اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهٖ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهٖ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَكُوْنُ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟) قَالُوْا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ : (تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ مَرَّةً) .

অর্থাৎ, 'সম্পদশালী লোকেরা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে প্রবেশ করল এবং অসীম আনন্দ লাভ করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা কিভাবে তা করল?'' তারা উত্তর দিলেন, 'তারা আমাদের মতই সালাত আদায় করেন এবং আমাদের মতোই সিয়াম পালন করেন, তদুপরি তারা যাকাত প্রদান করেন অথচ আমরা তা পারি না। তাঁরা দাস মুক্ত করেন অথচ আমরা তা পারি না। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিক্ষা দিব না, যার মাধ্যমে তোমরা তাদের ধরতে পারবে যারা তোমাদের অতিক্রম করছে? এবং তোমাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদেরও অতিক্রম

করছে এবং কেউই তোমাদেরকে অতিক্রম করতে পারবে না শুধু তারা ছাড়া যারা এ আমল করবে?' তারা বললেন : অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন : প্রত্যেক সালাতের পরে তোমরা আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) ৩৩ বার, সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পূত-পবিত্র) ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ (সব প্রশংসা আল্লাহর) ৩৩ বার পড়বে।" (সহীহ আল-বুখারী, খ-৮, পৃ-৯৯২, ২৩০, নং ৩৪১)

১৫১. শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ (اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ، خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ) . قَالَ : (وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِىَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

'ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম বিনয়ের ভাষা হলো– اَللّٰهُمَّ اَنْتَ .. اِلاَّ اَنْتَ

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ আপনি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার অঙ্গীকার ও ওয়াদায় আবদ্ধ। আমি আমার কৃত খারাপ কাজ থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আপনার সমীপে আমি আপনার প্রদত্ত করুণাসমূহের স্বীকৃতি দেই এবং আমি আপনার নিকট কৃত আমার গুনাহসমূহের স্বীকৃতি দেই। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। এরপর রাসূল ﷺ আরো বলেন : যেকোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে সকাল বেলা এ দু'আ পড়বে এবং দিনের মধ্যে মারা যাবে, অথবা সন্ধ্যার

সময় পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে পড়বে এবং পরবর্তী সকালের পূর্বে মারা যাবে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সহীহ আল-বুখারী, খ-৮, পৃ-২১২-২১৩, নং ৩১৮, সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১৪০৭, নং ৫০৫২) তিরমিজী।

১৫২. আনাস ইবনে মালিক (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

كُلُّ ابْنِ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ : اَلتَّوَّابُوْنَ .

অর্থাৎ, 'প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলপ্রবণ, তবে তাদের মধ্যে উত্তম হলো যারা সর্বদা অনুতপ্ত হয় (তওবা করে)।'

(সুনানে ইবনে মাজাহ, তিরমিজী, খ-২, পৃ-৩০৫, নং ২০২৯)

পুরস্কার

১৫৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

اَلْاَبْعَدُ فَالْاَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَعْظَمُ اَجْرًا .

অর্থাৎ, "মসজিদ থেকে বেশি দূরবর্তী ব্যক্তি, সওয়াবের দিক দিয়ে বেশী।"[৯৬]

(সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-১৪৬, নং ৫৫৬)

কাতার

১৫৪. আবু হুরায়রা (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا ، وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا .

---

৯৬. অন্য হাদীসে রয়েছে যে ব্যক্তি জামা'আতে শরিক হওয়ার জন্য মসজিদের দিকে হাটে তার প্রতি পদক্ষেপে নেকী হয়। অতএব, মূলনীতি অনুযায়ী কাজের কষ্ট অনুযায়ী তার নেকী হয়, মসজিদের দূরত্ব যত হয় তার নেকীও তত। এতে অবশ্য এটা করা যাবে না যে, দুটি মসজিদের মধ্যে দূরেরটা বেছে নেয়া। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত দুটি বৈধ কাজের মধ্যে রাসূল ﷺ সহজতরটি বেছে নিতেন। (সহীহ আল বুখারী, খ-৪, পৃ-৪৯১, নং ৭৬০, সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২৪৬, নং ৫৭৫২, সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১৩৪১, নং ৪৭৬৭)

অর্থাৎ, 'পুরুষের জন্য সালাতের সর্বোত্তম কাতার হলো ১ম কাতার এবং কম উত্তম হলো শেষ কাতার এবং মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হলো শেষ কাতার এবং কম উত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার।' (সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ. ২৩৯, নং ৮৮, সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-১৭৫ নং ৬৭৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, খ-২, পৃ-১০২, নং-১০০০, ১০০১ এবং মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-২২৪)।

উপহাস

১৫৫. মহান আল্লাহ বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ .

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একদল অন্য দলকে উপহাস করো না, প্রথম দল দ্বিতীয় দলের চেয়ে উত্তমও হতে পারে।'

(সূরা-৪৯ আল-হুজুরাত : আয়াত-১১)

মুচকি হাসি

১৫৬. আবু হুরায়রা এবং ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

اَفْضَلُ الاَعْمَالِ اَنْ تُدْخِلَ عَلٰى اَخِيْكَ الْمُؤْمِنِ سُرُوْرًا ، اَوْ تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنًا ، اَوْتُطْعِمَهُ خُبْزًا .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম কাজ হলো তোমার মুসলিম ভায়ের অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করিয়ে দেয়া, অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়া, অথবা তাকে রুটি খাইয়ে দেয়া।' (ইবন আবুদ দুনইয়া ফীল কাযাউল হাওয়ায়িজ, আল বাইহাকী ফী শুয়াবিল ঈমান, ইবন আদী ফিল কামিল)

দু'আ

১৫৭. আবু উমামাহ থেকে বর্ণিত যে, কেউ আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন :

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ؟ قَالَ : جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ .

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহর রাসূল! কোন দু'আ কবুল হওয়ার জন্য সর্বোত্তম? তিনি উত্তর দিলেন ঃ 'ঐ দু'আ যেগুলো রাতের মধ্যভাগে (সাধারণত তাহাজ্জুদের পর) এবং ফরজ সালাতের পরে করা হয়।' (সুনানে তিরমিজী, খ-৩, পৃ-১৬৭-১৬৮, নং ২৭৮২, দেখুন ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১ম পৃ-২৫৭)

১৫৮. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ইরশাদ করেন-

اَفْضَلُ الدُّعَاءِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম দু'আ হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সব প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য।' (সুনানে তিরমিজী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, হাকীম)

১৫৯. তালহা ইবনে উবাইদ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

اَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَاَفْضَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ : لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম দু'আ হলো আরাফার দিনের দু'আ এবং সর্বোত্তম দু'আ হলো যা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ বলেছেন তা হলো-

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ ـ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরিক নেই।'

(ইমাম মালিক, দেখুন : মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৫৫৭)

ইসতিখারার দোয়া

১৬০. জাবির (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ তাদেরকে প্রায়ই সব কাজে ইস্তিখারা (ভাল বাছাই করার সালাত ও দু'আ) করার শিক্ষা দিতেন যেমনভাবে কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। (তিনি বলতেন) যদি তোমাদের কেউ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চায় সে যেন দু'রাক'আত সালাত আদায় করে, অতঃপর বলবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ .

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি আমার জন্য যা ভাল হবে তার জন্য তোমার নিকট তোমার (অশেষ) জ্ঞান থেকে নির্দেশনা চাই, আমি তোমার (অশেষ) ক্ষমা থেকে সাহায্য চাই, আমি তোমার (অশেষ) রহমত থেকে তোমার রহমত চাই।'

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ .

অর্থাৎ, 'কেননা তুমি সক্ষম, আমি অক্ষম, তুমি জান, আমি জানি না, এবং তুমিই একমাত্র অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞানী।'

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ ـ اَوْ قَالَ : فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَآجِلِهِ .

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! যদি আপনি এ কাজ আমার দ্বীন এবং জীবিকার জন্য এবং আমার ভবিষ্যতের জন্য ভাল মনে করেন।' (স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী)

فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ .

অর্থাৎ, 'তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন এবং আমার জন্য তাকে সহজ করে দিন এবং এতে আমার ওপরে আপনার করুণা বর্ষণ করুন।'

وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الاَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ ومَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ ـ اَوْ قَالَ : فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَآجِلِهِ .

অর্থাৎ, 'তবে যদি তুমি এটা আমার দ্বীন এবং জীবিকার জন্য এবং আমার ভবিষ্যতের জন্য (তা স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী হোক) ক্ষতিকর মনে হয়।'

فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ .

অর্থাৎ, 'তাহলে তাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিন এবং আমাকেও তা থেকে দূরে সরিয়ে নিন এবং আমার জন্য তাই নির্ধারণ করুন যা আমার জন্য ভাল, যেখানেই তা থাকুক এবং তা নিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দান করুন।' (সহীহ আল-বুখারী, খ-৮, পৃ- ২৫৯-৬০ নং ৩৯১, সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ)

বক্তৃতা

১৬১. সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

অর্থাৎ, "তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে (মানুষকে) আহ্বান করে, স্বয়ং সৎ কাজ করে এবং বলে 'আমি একজন মুসলিম।'

(সূরা ফুসসিলাত- ৪১ ঃ ৩৩)

১৬২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেন –

خَيْرُ الْكَلاَمِ اَرْبَعٌ ، لاَ يَضُرُّكَ بِاَيِّهِنَّ بَدَاْتَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ .

অর্থাৎ, নিচের চারটি হলো সর্বোত্তম কালাম। এর যে কোন একটির দ্বারা শুরু করাতে কোন দোষ নেই।

সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র), ওয়ালহামদু লিল্লাহ, (সকল প্রশংসা আল্লাহর), ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মা'বুদ নেই।) ওয়াল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান)।

(সহীহ মুসলিম, খ–৩, পৃ–১১৭০ নং ৫৩২৯) সুনানে আহমাদ, দেখুন : মিশকাতুল মাসাবীহ খ–১, পৃ–৪৮৬)

১৬৩. মুসাওয়ার ইবনে মাখরামাহ এবং মারওয়ান বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ .

অর্থাৎ, 'আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কথা হলো তা যা সবচেয়ে সত্য।'

(সহীহ আল-বুখারী, খ–৩, পৃ–২৮৫-২৮৬, নং ৫০৩ এবং সুনানে আহমদ)

অশ্রু

১৬৪. আবু উমামা বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَيْسَ شَىْءٌ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَاَثَرَيْنِ قَطْرَةُ مِنْ دُمُوْعٍ فِىْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَمَّا الْاَثَرُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَثَرٌ فِىْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ, 'আল্লাহর নিকট দুটি ফোটা এবং দুটি চিহ্নের চেয়ে প্রিয়তম আর বস্তু নেই। ক. একটি অশ্রুর ফোটা যা আল্লাহর ভয়ে পতিত হয়, খ. একটি রক্তের ফোটা যা আল্লাহর রাস্তায় ঝরে।

দু'টি চিহ্ন ক–একটি চিহ্ন যা আল্লাহর রাস্তায় অর্জিত হয়[৯৭]। খ. আরেকটি চিহ্ন যা আল্লাহর নির্ধারিত ফরয পালনের দ্বারা অর্জিত হয়।[৯৮] (সুনানে তিরমিজী, খ–২, পৃ–১৩৩, নং ১৩৬৩, দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ, খ–১, পৃ–৮১৪-৮১৫)

সাক্ষ্য

১৬৫. যায়েদ ইবনে খালিদ উল্লেখ করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ الشَّهَادَةِ مَا شَهِدَ بِهِ صَاحِبُهُ قَبْلَ اَنْ يُسْاَلَ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম সাক্ষ্য হলো ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য যাকে চাওয়ার পূর্বেই সাক্ষ্য দেয়।'[৯৯] (সহীহ মুসলিম, খ–৩, পৃ–৯৩১, নং ৪২৬৮, সুনানে আবু দাউদ, খ–৩, পৃ–১০২০-১০২১ নং ৩৫৮৯, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, পৃ–৩১৩ নং ১৩৯৫, আরো দেখুন ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ, খ–১, পৃ–৮০)

..لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ.

৯৭. আল্লাহর রাস্তায় আহত বা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে চিহ্নিত হওয়া।

৯৮. যেমন সিজদা অথবা পায়ের ওপর ভর করে সালাতের মধ্যে বসার কারণে কপালের চামড়া কাল হয় বা কাল দাগ হয়। অনেকের পায়েও হয়।

৯৯. এ সাক্ষ্য হলো ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে চাওয়ার পূর্বে যে সাক্ষ্য দেয়া হয় ব্যক্তির নিকট চাওয়ার পূর্বেই। এটা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় এ সাক্ষ্য দেয়া পূর্ববর্তী ৬২ নং হাদীসের সাক্ষ্য দেয়ার বিপরীত। তা ছিল মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। উলামায়ে কেরাম অন্য ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। দেখুন : ফতহুল বারী, খ–৭, পৃ–১০৪, ১০৫)

সময়

১৬৬. আমর ইবনে আবাসাহ রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন এভাবে–

اَفْضَلُ السَّاعَاتِ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاَخِيْرِ .

অর্থাৎ, "সর্বোত্তম সময় হলো (নফল সালাতের) রাতের শেষ ভাগ।"[১০০]

(তাবারানী ফিল কবীর, দেখুন : মিশকাতুল মাসাবীহ খ–১, পৃ–১৫-১৬)

১৬৭. জাবির (রা) নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছেন–

اِنَّ اَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اَوَّلَ اللَّيْلِ .

অর্থাৎ, 'কোন সফর থেকে কোন ব্যক্তির, তার নিজ পরিবারের নিকট ফিরে আসার সর্বোত্তম সময় হলো রাতের শুরুতে।'[১০১] (সহীহ আল-বুখারী, মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, খ–২, পৃ–৭৭৯, নং ২৭৭২)

বিশ্বাস

১৬৮. ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন –

خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً .

---

১০০. আবশ্যিক ভোরের সালাত, সালাতুল ফজর খুবই কষ্টকর কারণ তাকে শক্তিশালী প্রাকৃতিক চাহিদা ঘুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। আর রাতের শেষভাগে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য জাগরিত হওয়া আরো কঠিন কাজ। আর বেশি কঠিন বলেই এ সময়ের গুরুত্ব সর্বাধিক। এ সময়ে জাগরিত হয়ে ইবাদত করা, মাগফিরাত কামনা করা, আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রুপাত করা আল্লাহর প্রিয় হওয়ার সর্বোত্তম পথ।

১০১. নবী করীম ﷺ স্বামীদের অনেক রাত্রে তাদের বাড়িতে ফেরার অনুমতি দান করেন নি যাতে তারা তাদের স্ত্রীদের অপ্রস্তুত অবস্থায় না পায় (সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং–২৭৭০ এবং ২৭৭২) পুরুষদের সঠিক সময়ে সকাল অথবা সন্ধ্যায় ফিরে আসার জন্য বিলম্ব করা উচিত। নারীদের উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে তারা তাদের স্বামীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে পারে যাতে তাদের মধ্যে রোমান্টিক অনুভূতি জীবন্ত থাকে। এ হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পুরুষদের সফর থেকে ঘরে ফেরার উপযুক্ত সময় সূর্যাস্তের পরপর যখন মহিলারা ঘুমানোর পূর্বে বিশ্রামে থাকে, তারা স্বামীদের স্বাগতম জানাতে পারে।

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম লোক হলো তারা যারা বিশ্বাস রক্ষা করে।'
(সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ আল-বুখারী, খ-৩, পৃ-২৮৪-২৮৫ নং ৫০, সহীহ মুসলিম খ-৩, পৃ-৮৪৩ নং ৩৮৯৮)

প্রজ্ঞা

১৬৯. মহান আল্লাহ বলেন-

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا .

অর্থাৎ, 'তিনি যাকে খুশী তাকে প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকেই প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়।' (সূরা-২ আল-বাক্বারা : আয়াত-২৬৯)

সাক্ষ্যদান

১৭০. যায়েদ ইবনে খালিদ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন

خَيْرُ الشُّهُوْدِ مَنْ أَدَّ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا .

অর্থাৎ, সর্বোত্তম সাক্ষ্যদাতা যে, চাওয়ার আগে সাক্ষ্য দেয়।

বিতর

১৭১. জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ أٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ أٰخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ أٰخِرَ اللَّيْلَ فَانَّ صَلاَةَ أٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذٰلِكَ أَفْضَلُ .

অর্থাৎ, "যে ভয় পায় যে, সে রাতের শেষ ভাগে জাগ্রত হতে পারবে না, সে যেন রাতের প্রথম ভাগেই বিতর পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষভাগে জাগ্রত হওয়ার আশা করে, সে যেন রাতের শেষ ভাগে বিতর আদায় করে, কেননা শেষ রাতের সালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা হয় এবং তা উত্তম।"

(সহীহ মুসলিম , খ-১, পৃ-৩৬৪, নং ১৬৫০)

নারী

১৭২. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ .

অর্থাৎ, 'মুশরিক নারীদের বিয়ে করোনা যতক্ষণ না তারা ঈমানদার হয়। বস্তুত একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী নারী মুশরিক (স্বাধীন) নারীর চেয়েও উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে চমৎকৃত করে।'

(সূরা–২ আল-বাকারা : আয়াত-২২১)

১৭৩. মহান আল্লাহ আরো বলেন–

وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ .

অর্থাৎ, 'নারীদের অপর নারীদের উপহাস করা উচিত নয়, কেননা উপহাস কারীদের চেয়ে উপহাসকৃতরা উত্তমও হতে পারে।'

(সূরা–৪৯ আল-হুজুরাত : আয়াত-১১)

১৭৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ ، امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ .

অর্থাৎ, 'জান্নাতের সর্বোত্তম নারীগণ হলেন খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ[১০২], ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ[১০৩] মারইয়াম বিনতে ইমরান[১০৪] আসিয়া বিনতে মুজাহিম– ফির'আউনের স্ত্রী[১০৫]। (সুনানে আহমাদ, হাকীম, আত্‌তাবারানী ফিল কবীর, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ–২, নং ১৩৬১)

---

১০২. নবী করীম ﷺ–এর প্রথমা স্ত্রী। তিনি মক্কার একজন ধনাঢ্য মহিলা ও সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ছিলেন। রাসূল ﷺ–এর বিশ্বস্ততার খ্যাতি শুনে তিনি তাঁকে তাঁর ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বার্পণ করেন। তাঁর আর্থিক বিষয়াদি পরিচালনায় রাসূল ﷺ–এর সততা পর্যবেক্ষণের পর তিনি তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। মুহাম্মদ ﷺ ঐ সময়ে ২৫ বছর বয়সের যুবক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চেয়ে ১৫ বছরের বেশি বয়স্কা বিধবা মহিলার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এর ১৫ বছর পর যখন তিনি অহী লাভ করেন তখন খাদীজা (রা) প্রথমে তাঁকে বিশ্বাস করেন (ঈমান আনেন) এবং তাঁকে সমর্থন করেন। কুরাইশ কর্তৃক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কটের সংকটময় সময়ে তিনি পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মক্কায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর ঔরসে রাসূল ﷺ–এর দু'সন্তান আল-কাসিম এবং আত্‌তাইয়িব জন্ম নেন এবং শিশুকালেই ইন্তিকাল করেন। এ ছাড়াও চার কন্যা জয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতিমা (রা) তাঁর সন্তান যাঁরা রাসূল ﷺ-এর বংশপরিচয় বহন করেছেন।

১০৩. নবী করীম ﷺ–এর কন্যাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। রাসূল ﷺ-এর চাচাত ভাই আলী ইবনে আবু তালিব (রা)–এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর পিতা-মাতা এবং দাদা মারা যাবার পর রাসূল ﷺ তাঁকে লালন-পালন করেন। তিনি ৬৩৩ খ্রি. রাসূল ﷺ -এর ইন্তিকালের মাত্র কয়েক মাস পরে মদিনায় ইন্তিকাল করেন। তিনি দু'পুত্র হাসান এবং হুসাইন এবং দু'কন্যা জয়নাব এবং উম্মে কুলসুমদের রেখে যান।

১০৪. ঈসা (আ)-এর মাতা। তাঁকে ইমরানের কন্যা বলে উল্লেখ করা হয়। আল-কুরআনে ৬৬ : ১২, এবং ১৯ : ২৮ এ হারুন এর বোন। এবং তাঁর মাকে ইমরানের স্ত্রী বলে ৩ : ৩৫ সম্বোধন করা হয়েছে। ইমরানের ঘরে মূসা এবং হারুন নামে দু'জন নবী যার পিতা ছিলেন ইমরান (বাইবেলের Amran) হারুনের পরবর্তী বংশধর ছিলেন ইসরাঈলের পাদরী সম্প্রদায়। এভাবে রঞ্জিত যোহন, যাদের পিতা–মাতা একই বংশের। এভাবে মারইয়ামকে ইমরানের কন্যা উল্লেখ করা শাব্দিক দিকে নয় বরং রূপান্তরিক। অতীত কালে কোন ব্যক্তিকে তার পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির সাথে জুড়ে উল্লেখ করা হত।

১০৫. যে ফির'আউনের নিকট ঈসা (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন এবং যার সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন তাঁর স্ত্রী। আল–কুরআনে তাঁকে অত্যুচ্চ মানে ঈমানদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (৬৬ : ১১) তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈমান আনার অপরাধে ফির'আউন তাঁকে শাস্তি দিয়ে হত্যা করে। (তাফসীরে ইবন কাছীর, খ–৪, পৃ–৪২০)

১৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَىْءٌ اَفْضَلَ مِنَ الْمَرْاَةِ الصَّالِحَةِ .

অর্থাৎ, 'দুনিয়া (সন্তুষ্টির) সম্পদ, এবং সর্বোত্তম সম্পদ হলো দ্বীনদার স্ত্রী।"[১০৬] (সহীহ মুসলিম, খ–২, পৃ ৭৫২ নং ৩৪৬৫) ইবনে মাজাহ)

১৭৬. সালমান ইবন ইয়ামার (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَلُوْدُ الْوَدُوْدُ

অর্থাৎ, "তোমাদের সর্বোত্তম স্ত্রীগণ হলেন যারা অধিক সন্তানদাত্রী এবং ভালবাসায় অগ্রগামী।"[১০৭] (ইবনুস সাকান, আল–বাগাভী, আন নাসায়ী মাকাল ইবনে ইয়াসার থেকে।)

---

১০৬. রাসূল আরো বলেন : নারীদের ৪টি গুণের কারণে বিয়ে করা হয় : তাদের সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং দ্বীনদারী। তুমি ধার্মিক দেখে বিয়ে কর তাহলে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারবে। (সহীহ আল-বুখারী, খ–৭, পৃ– ১৮-১৯ নং ২৭, সহীহ মুসলিম, খ–২, পৃ–৭৪৯ নং ৩৪৫৭, সুনানে আবু দাউদ খ–২, পৃ–৫৪৪–৫৪৫ নং ২০৪২)

১০৭. বিয়ের পাত্র/পাত্রী নির্বাচনে নারী–পুরুষকে বেশি সন্তান দানে সক্ষম উর্বর দেখার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এভাবে তার পরিবারের উভয় দিক চিনে নিতে বলা হয়েছে। যেমন কোন নারীর অধিক সন্তান হলে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, তার সন্তানও অনুরূপ অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম হবে। বিয়ের পর যদি এরূপ নারী সন্তান দানে সক্ষম না হয় তাহলে এটা হলো তাকদীর যা স্বামীকে মেনে নিতে হবে। যদি চিকিৎসা অথবা অন্য কোনভাবেও সে স্ত্রী সন্তান গ্রহণে সক্ষম না হয় তাহলে ঐ স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে যেমন নবী ইবরাহীম (আ) করেছিলেন, যদি তিনি আর্থিকভাবে একাধিক ঘর দেবার সামর্থ্য রাখেন। নারীর ক্ষেত্রে হয়তো তিনি কারো সন্তান লালন–পালন করতে পারেন অথবা স্বামীকে তালাক দিতে পারেন যদি তিনি তার মাতৃত্বকে দমন করতে সক্ষম না হন।

দ্বিতীয় গুণ যা হলো স্নেহ–ভালবাসা, এটা শিশু লালন–পালনের জন্য খুবই জরুরি। স্নেহশীল মা তার শিশুকে যথাযথ বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে যে যত্ন দেয়া প্রয়োজন তা দিতে কখনো পিছপা হন না। তার মর্যাদাবোধ এবং কোমলতা শিশুদের ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব ফেলবে। ফলে পুরুষদের শিশুদের জন্য উপযুক্ত মা খুঁজতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এটা শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং তা বাস্তব এবং মনস্তাত্ত্বিকও বটে।

১৭৭. আবু হুরায়রা (রা) রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন–

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلٰى وَلَدٍ فِيْ صِغَرِهٖ وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهٖ .

অর্থাৎ, 'সর্বোত্তম নারী হলো কুরাইশ বংশের দ্বীনদার মহিলা যারা উটনীতে আরোহণ করতে পারে।[১০৮] তারা শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল এবং তাদের স্বামীদের সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট হিফাযতকারী।'[১০৯]

(সহীহ আল-বুখারী, খ–৭, পৃ–১২, ১৩ নং ১৯)

১৭৮. আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল–

قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : اَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ : (الَّتِىْ تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرَ، وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِىْ نَفْسِهَا وَلاَ مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ .

অর্থাৎ, 'নারীদের মধ্যে কারা সর্বোত্তম?' তিনি উত্তর দিলেন যে নারীর দিকে তাকালে তার স্বামী আনন্দিত হয়[১১০], যখন তাকে কোন আদেশ করা হয় তখন তা পালন করে[১১১] এবং তার স্বামীর অসন্তুষ্টির ভয়ে তার নিজের সত্তা ও সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর বিরোধিতা করে না।' (সুনানে নাসায়ী, বায়হাকী ফী শু'আবিল ঈমান, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ–২, পৃ– ৯৭২, নং ৩২৭২)

---

১০৮. মক্কার মূল বংশের অন্তর্গত কুরাইশ বংশ, নবী মুহাম্মাদ ﷺ এ বংশের হাশেমী শাখার ছিলেন।

১০৯. এ বর্ণনায় মুসলিম নারীর দুটি ভাল গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়, বিয়ের ক্ষেত্রে যা বিবেচনা করা উচিত। ক. শিশুদের প্রতি দয়া। খ. স্বামীদের সম্পদের প্রতি দায়িত্ববোধ।

এ গুণগুলো বিয়েপূর্ব আলোচনা অথবা পারিবারিক অবস্থার খোঁজ-খবর এর মধ্যে জেনে নিতে হবে।

১১০. সে সর্বদা স্বামীর সামনে হাসিমুখ থাকে, বিশেষ করে যখন কাজ অথবা সফর থেকে বাড়ি ফিরে আসে তখন।

কথা

১৭৯. মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذًى .

অর্থাৎ, 'সুন্দর কথা এবং ত্রুটি মার্জনা করা, দান করে কষ্ট দেয়ার চেয়ে ভাল।' (সূরা–২ আল বাকারা : আয়াত-২৬৩)

ইবাদত

১৮০. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আন নু'মান ইবন বাশীর (রা) সকলে উল্লেখ করেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ .

অর্থাৎ, "সর্বোত্তম ইবাদত হলো দু'আ।"[১১২] (আলহাকীম, ইবন আদী ফীল কামীল, ইবন সা'দ)

---

১১১. তবে সে যদি হারাম কাজের আদেশ দেয় তা পালন করবে না। কেননা–

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ .

অর্থ : 'স্রষ্টার বিরোধিতা হয় এমন কোন ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।' চাই সে স্বামী, সন্তান, পিতা–মাতা যে–ই হোক না কেন। এছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ স্বামী হালাল কাজের নির্দেশ দিবে, তাকে তা পালন করতে হবে, যদিও তার ব্যক্তিগত অপছন্দের বিষয় হোক না কেন। এটা অগ্রাধিকার যোগ্য যে, স্বামী-স্ত্রী তাদের পারস্পরিক পছন্দ অপছন্দের বিষয়গুলো জানিয়ে রাখবেন যাতে যেকোন ধরনের অসহিষ্ণু অবস্থা এড়িয়ে চলা যায়।

১১২. রাসূল ﷺ–এর এ বর্ণনা এ নির্দেশনা দেয় যে, দু'আ এক ধরনের মুনাজাত প্রকারের ইবাদত। ফলে যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দু'আ করে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে শিরক করে। আর শিরক প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ .

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার সঙ্গে শরিক করা হলে তা ক্ষমা করেন না এবং এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।'

কুরআন–হাদীস থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, শিরক হলো সবচেয়ে বড় গুনাহ।

ইবাদতকারী

১৮১. জাবির (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى أَنْفَعُهُمْ لِعَيَالِهِ .

অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ তা'আলার সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা হলো তারা যারা তাঁর পরিবার [অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিকুলের] এর প্রতি বেশি উপকারী।' (ইমাম আহমদ ফি কিতাবুয্ যুহদ,[১১৩] আত্তাবারানী ফী রওদাতুন নাদীর।)

---

১১৩. এ বর্ণনা মূলত زَوَائِدُ الزُّهْدِ (যাওয়িদুয্ যুহদ) কিতাবে পাওয়া যায়। যাতে ঐ বিষয়ের ওপর ইমাম আহমদের পুত্র আব্দুল্লাহর সংগ্রহ রয়েছে। যাতে তাঁর পিতার সংগ্রহ كِتَابُ الزُّهْدِ (কিতাবুয্ যুহদ) অন্তর্ভুক্ত নয়।

১১৪. একটি ঝর্না। যা অলৌকিকভাবে মক্কার মরুভূমির সমতল ভূমিতে উদয় হয়েছে, যেখানে ইবরাহীম (আ) তদীয় স্ত্রী বিবি হাজেরাকে তার শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ)সহ আল্লাহর নির্দেশে রেখে আসেন। زَمْزَمَة (যমযমাহ) আরবি শব্দ যার অর্থ 'প্রচুর পানি'। পানির কারণে আরবীয় জুরহুম গোত্র সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং এর পাশে একটি কূপ খনন করেন। এরপরে ইবরাহীম (আ) সেখানে আসেন এবং ইবাদতের প্রথম গৃহ কা'বা শরীফ যমযমের পাশে তৈরি করেন। পরবর্তীতে যুরহম গোত্রের লোকেরা কূপটি ভরাট করে ফেলে এবং বহু শতবর্ষ পরে রাসূল ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখেন তাকে বলা হচ্ছে যমযম কূপ খনন কর। এভাবে একাধিকবার স্বপ্ন দেখার পর তিনি প্রশ্ন করলেন : 'কোথায়?' উত্তর আসলো : 'রক্ত এবং গোবরের মাঝখানে।' সকাল বেলা তিনি তার পুত্রদের নিয়ে যমযম কূপ খননের প্রচেষ্টায় লেগে গেলেন, অথচ জায়গাটি নির্ণয় করা সম্ভব হলো না। ইতোমধ্যে পার্শ্ববর্তী এক স্থান থেকে আধা জবাইকৃত আহত একটি উট এসে সেখানে পড়ল। পিছনে ছুটে আসা লোকেরা ওখানেই উটটিকে জবাই করল। ফলে রক্ত ঝরল এবং উটের পায়খানাও হলো এর দ্বারা যমযম কূপের স্থান নির্ধারিত হয়ে গেল এবং রক্ত ও গোবরের মাঝখানে যমযম পুনঃ খনন হলো।

খননকার্য শেষ হবার পর পানির অধিকার নিয়ে পুনরায় বেঁধে গেল বচসা। এ বচসা যখন একটা চরম রূপ ধারণ করতে লাগল তখন প্রস্তাব পেশ করা হলো যে, কোন গণকের নিকট থেকে এ বিষয়ে ফায়সালা নিয়ে আসা হোক। এ বিষয়ে একমত হবার পর বিখ্যাত এক মহিলা গণকের নিকট যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশাল মরুভূমি পাড়ি দেবার সময় আব্দুল মুত্তালিবের নিজেদের লোকদের পানির প্রচণ্ড অভাব দেখা দিল। অন্যদের নিকট পানি চাওয়া হলে সংকটের আশঙ্কায় তারা পানি দিতে অস্বীকার

জমজম

১৮২. ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন –

خَيْرُ مَاءٍ وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، فِيْهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِّنَ السُّقْمِ .

অর্থাৎ, 'পৃথিবীর উপরিভাগের সর্বোত্তম পানি হলো জমজম[১১৪] কূপের পানি, এর মধ্যে খাদ্যের গুণাবলি এবং রোগের চিকিৎসা বিদ্যমান।'

(ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ এবং তায়ালেসী)

BIBLIOGRAPHY

Al baanee, Muhammad Naasirud, Deen, al-Saheeh al-Jaami as Sagheer, (Beirut, Lebanon; al-Maktab al-Islaamee, 3rd, ed. 1990)

Page 110

Page 111

Page 112

Tahabee, Muhammad ibn Ahmad, ath-Siyar A'Laam an Nubalaa, Beirut, Mu'assasah ar-Risaalah, 8th ed., 1992

করলেন এমতাবস্থায় আব্দুল মুত্তালিব সকলকে নিজ নিজ কবর খোড়ার নির্দেশ দিলেন, তিনি বললেন যিনি মারা যাবেন তাকে কবরে শুইয়ে দেয়া হবে এবং সর্বশেষ মাত্র একজন হয়তো ওপরে পড়ে থাকবে বাকিদের লাশ বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। কবর খোড়া শেষ হলে আব্দুল মুত্তালিব এভাবে বসে বসে মৃত্যুর প্রহর গোনার চেয়ে সচেষ্ট হওয়ার জন্য কাফেলাকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। যাত্রা শুরু হলেই নেতার উটের পায়ের নিচ থেকে পানির ফোয়ারা বের হতে দেখা গেল। কাফেলার সবাই 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করে উঠলেন। এ ধ্বনি শুনে ফিরে যাওয়া লোকেরা এদিকে মনোযোগ দিলেন। তখন আব্দুল মুত্তালিব তাদেরকে ডেকে বললেন : আল্লাহ আমাদের পানি দিয়েছেন তোমরা এ থেকে পানি নিয়ে নাও। তাঁরা ফিরে এসে পানি নিয়ে নিলেন এবং আব্দুল মুত্তালিবকে বললেন– হে আব্দুল মুত্তালিব আমাদের ফায়সালা হয়ে গেছে, আমাদের আর গণকের নিকট যাবার প্রয়োজন নেই, চলুন আমরা ফিরে যাই। আপনি এ মুহূর্তে যেমন আমাদের পানি দিয়েছেন, সেরূপভাবে যমযমের পানি আমাদের দিবেন এটা স্বাভাবিক। এ কঠিন বিপদে আব্দুল মুত্তালিব তাঁর একটি ছেলে কুরবানি দেবার মান্নত করেছিলেন। (সীরাতে ইবন হিশাম সংক্ষেপিত।)

তাওহীদের মূল সূত্রাবলী

ড. বিলাল ফিলিপস্

সংকলন

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

সম্পাদনা

পিস সম্পাদনা পর্ষদ

চতুর্থ অধ্যায়

তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদের শাব্দিক অর্থ একীকরণ (কোনো কিছু এক করা) অথবা দৃঢ়ভাবে এককত্ব ঘোষণা করা। তাওহীদ শব্দটি আরবি (وَحْدَةٌ) 'ওয়াহ্দাতুন' শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ এক করা, ঐক্যবদ্ধ করা অথবা সংহত হওয়া। কিন্তু যখন তাওহীদ শব্দটি মহান (تَوْحِيْدُ اللّٰه) আল্লাহর একত্ববাদ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ মানুষের সকল কর্মকাণ্ড, যা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত, তাঁর এককত্ব উপলব্ধি করা এবং অক্ষুণ্ন রাখা বুঝায়।

আল্লাহ্ এক, তাঁর আধিপত্যে এবং তাঁর কর্মকাণ্ডে (رُبُوْبِيَّةٌ) কোনো অংশীদার নেই। এটাই বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ একক, তাঁর রাজত্বে এবং কর্মে কোনো অংশীদার নেই। তিনি তাঁর মৌলিকত্বে ও গুণাবলিতে অতুলনীয় الأَسْمَاءُ الصِّفَاتُ এবং উপাস্যরূপে চির অপ্রতিদ্বন্দ্বী الأُلُوْهِيَّةُ وَالْعِبَادَةُ। এ তিনটি বিষয়কে ভিত্তি করে তাওহীদ বিজ্ঞানের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। এ শ্রেণী তিনটি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একটির সঙ্গে অপরটি এতই সম্পর্কযুক্ত যে, কেউ যদি একটি বিষয় বাদ দেন তাহলে তিনি তাওহীদের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হবেন। উপরিউল্লিখিত তাওহীদের যে কোনো একটি বিষয় বাদ দেয়াকে 'শিরক' (অংশীদারী) বলে; আল্লাহকে অংশীদারদের সাথে মিলানো, যা ইসলামি অর্থে মূলত: পৌত্তলিকতা।

সাধারণত তাওহীদের তিন শ্রেণীকে নিম্নোক্ত শিরোনামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

১. তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহ (পালনকর্তার এককত্ব অক্ষুণ্ন রাখা)।

২. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখা)।

৩. তাওহীদ আল ইবাদাহ (আল্লাহর ইবাদতের এককত্ব বজায় রাখা)।

নবী করীম ﷺ এর সময় তাওহীদের মূল তত্ত্বগুলো এরূপে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দরকার ছিল না বিধায় নবী করীম ﷺ অথবা তাঁর সাহাবাগণ কর্তৃক তাওহীদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও কুরআন কারীমের আয়াত এবং নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মাধ্যমে তাওহীদের প্রকারগুলোর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে যখন প্রত্যেকটি শ্রেণী বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে তখন পাঠকগণের নিকট এ বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

মিশর, বাইজেন্টাইন, পারস্য এবং ভারতে যখন ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এবং এ সব এলাকার সংস্কৃতি আত্মস্থ করে তখন তাওহীদের তত্ত্বগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এটা আশা করা স্বাভাবিক যে, যখন এ সব এলাকার লোকজন ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেছে তখন তারা তাদের পূর্ব বিশ্বাসের কিছু অংশ তাদের সাথে বহন করেছে।

এ সব নতুন ধর্মান্তরিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে কতিপয় ব্যক্তি যখন তাদের লেখায় এবং আলাপ-আলোচনায় স্রষ্টা প্রসঙ্গে নিজস্ব দার্শনিক ধ্যান ধারণা প্রকাশ করতে আরম্ভ করে তখনই বিভ্রান্তি শুরু হয় এবং ইসলামের সহজ সরল বিশুদ্ধ এককত্বের বিশ্বাস হুমকির মুখোমুখী হয়। এছাড়াও কিছু সংখ্যক লোক বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে গোপনে ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে মাশগুল হয়; যেহেতু তারা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ইসলামের প্রসারকে বাধা দিতে পারে নি। এ গোষ্ঠী ঈমানের প্রথম ভিত্তিতে এবং তার সাথে ইসলামকেই ছিন্ন করে ফেলার জন্য গোপনে মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রসঙ্গে বিকৃত চিন্তাভাবনা ছড়াতে থাকে।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে, সাওসান নামে খ্রিস্টান ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত একজন ইরাকী ব্যক্তিই প্রথম মুসলমান যিনি মানুষের স্বাধীন-ইচ্ছা শক্তি এবং ভাগ্যের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে মতামত প্রকাশ করেন।

পরবর্তীতে সাওসান খ্রিস্টান ধর্মে ফিরে যায়। কিন্তু তার পূর্বেই সাওসান তার শক্তিমান ছাত্র মা'বাদ ইবনে খালিদ আল-যুহানীকে (বসরা নগরীর) প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়। মা'বাদ তার শিক্ষকের বিকৃত মতবাদ প্রচার করতে থাকে। কিন্তু ৭০০ খ্রিস্টাব্দ উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান (৬৮৫-৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে) মা'বাদকে বন্দী করেন এবং মৃত্যুদণ্ড দেন। যুবক সাহাবায়ে কেরাম (নবী করীম ﷺ এর সহচরগণ) যেমন– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (মৃত্যু ৬৯৪ খ্রি:) এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা (মৃত্যু ৭০৫ খ্রিঃ) যারা ঐ সময় জীবিত ছিলেন, তাঁরা মুসলমানদেরকে ভাগ্য অস্বীকারকারীদের সালাম দেয়া এবং তাদের জানাযা সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেন।

অর্থাৎ তাঁরা ঐ সব মানুষদের কাফের বলে ঘোষণা করেন। তথাপি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয় খ্রিস্টীয় দার্শনিক যুক্তি নতুন সমর্থক পেতে থাকে। খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজের (৭১৭-৭২০ খ্রি:) সামনে উপস্থিত করানোর পূর্ব পর্যন্ত মা'বাদের ছাত্র (দামেস্ক শহরের) গাইলান ইবনে মুসলিম স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিষয় সমর্থন করে যাচ্ছিল। সে তার মতামত ছেড়েছে বলে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেও খলিফার মৃত্যুর পর পুনরায় স্বাধীন-ইচ্ছাশক্তি প্রসঙ্গে শিক্ষকতা আরম্ভ করে।

পরবর্তী খলিফা হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক (৭২৪-৭৪৩ খ্রিঃ) তাকে বন্দী করে বিচারের পর মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। এ বিতর্কে আর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলো আল যা'দ ইবনে দিরহাম, সে স্বাধীন-ইচ্ছাশক্তি প্রসঙ্গিত দর্শন শুধু সমর্থনই করেনি বরং নব্য নিষ্কাম প্রেমের দর্শনের (Neo-platonic philosophy) আলোকে মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্বলিত কুরআনের আয়াতগুলোর পুন:ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। সে উমাইয়াদ যুবরাজ মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদের (যিনি পরবর্তীতে চতুর্দশ খলিফা (৭৪৪-৭৫০ খ্রিঃ) হয়েছিলেন) গৃহশিক্ষকও ছিল।

যতদিন না উমাইয়া গভর্নর তাকে বহিষ্কার করেন ততদিন দামেস্কে আলোচনার সময় আল-যা'দ আল্লাহর কিছু সংখ্যক গুণাবলীকে (যেমন দেখা, শোনা ইত্যাদি) প্রকাশ্যে অস্বীকার করতে থাকে। আল যা'দ এরপর কুফা নগরীতে পলায়ন করে এবং সেখানে তার নাস্তিক মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার

করতে থাকে এবং সমর্থক জড়ো করতে থাকে। কিন্তু উমাইয়া গভর্নর খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ ৭৩৬ খ্রিঃ প্রকাশ্যে আল যা'দের মৃত্যুদণ্ড দেন। যাহোক, তাঁর প্রধান ছাত্র (যাহম ইবনে ছাফফা'ন) তিরমিজ এবং বলখের দার্শনিক মহলে তাঁর ওস্তাদের মতবাদ সমর্থন করতে থাকে। তাঁর নব্যতন্ত্রের প্রচার প্রসারিত হলে ৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া গভর্নর নাছের ইবনে ছাইইয়ার তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

প্রথম দিকে খলিফাগণ ও তাঁদের গভর্নরগণ ইসলামি মতাদর্শের কাছাকাছি ছিলেন এবং নবী করীম ﷺ-এর সাহাবিগণ ও তাঁদের ছাত্রদের উপস্থিতির জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বেশি ছিল। এ কারণে প্রত্যক্ষ নাস্তিকদের নির্মূল করার দাবি প্রসঙ্গে শাসকদের নিকট থেকে তাৎক্ষণিক সাড়া পাওয়া যেত। কিন্তু পরবর্তীকালের উমাইয়া খলিফাগণ অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন বিধায় এ জাতীয় ধর্মীয় বিষয়াদি প্রসঙ্গে খুব কমই পরোয়া করতেন।

জনগণও ইসলামিভাবে কম সচেতন ছিল এবং এ জন্য তারা ভিন্ন বিকৃত মতবাদ প্রসঙ্গে অধিকতর সংবেদনশীল ছিল। যতই অধিক সংখ্যক মানুষ ইসলামে প্রবেশ করল এবং যতই অধিক সংখ্যক পরাজিত জাতিসমূহের শিক্ষাদীক্ষা আত্মীভূত হলো, ভিন্নমতাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধির স্রোত প্রতিহত করতে স্ব-ধর্মত্যাগীদের আর প্রাণদণ্ড দেয়া হত না। ভিন্ন এবং বিকৃত মতের জনগণের বৃদ্ধি প্রতিহত করার দায়িত্ব তখন ঐ সময়কার মুসলমান পণ্ডিত অথবা আলেমদের ওপর পড়ে-যারা তাদের ধীশক্তি এবং জ্ঞান দিয়ে এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবিলায় প্রস্তুত হলেন। তাঁরা পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন বিজাতীয় দর্শন ও মতবাদের বিরোধিতা করেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ প্রণীত বিধি-বিধানের মাধ্যমে পাল্টা জবাব দেন।

এ জাতীয় আত্মরক্ষার মাধ্যমেই বিভিন্ন শ্রেণী ও অংশসহ তাওহীদ বিজ্ঞানের আত্ম প্রকাশ হয়। বিশেষজ্ঞতা অর্জনের এ প্রক্রিয়া একই সাথে ইসলামি জ্ঞানের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেও হয়েছিল যেভাবে সমকালীন ধর্ম নিরপেক্ষতা বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। অতএব তাওহীদের প্রকারভেদ যখন পৃথকভাবে এবং আরও গভীরভাবে পড়া হয় তখন ভুলে গেলে চলবে না যে এগুলো সেই অঙ্গের অংশ যা নিজেই একটি বৃহত্তর সমষ্টি-স্বয়ং ইসলামের ভিত্তি।

১. তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহ تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ (পালনকর্তার এককত্ব অক্ষুণ্ন রাখা)

প্রথম প্রকার দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে যে, যখন কিছুই ছিল না তখন আল্লাহ তা'আলা একাই সকল সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দেন; সৃষ্টি থেকে অথবা সৃষ্টির জন্য কোনো অভাব পূরণের কারণ ব্যতিরেকেই আল্লাহ সৃষ্ট জগৎ প্রতিপালন করেন। তিনি গোটা বিশ্ব ও এর অধিবাসীদের একমাত্র রব এবং তাঁর সার্বভৌমত্বের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আরবি ভাষায় رُبُوْبِيَّةُ 'রুবুবিয়াহ' শব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে 'রব' পালনকর্তা যা একই সাথে সৃষ্টি ক্ষমতা এবং প্রতিপালন উভয় গুণের পরিচয় বহন করে।

এ প্রকারভেদ অনুযায়ী আল্লাহই একমাত্র সত্যিকার শক্তি, তিনিই সকল বস্তুর চলাফেরা ও পরিবর্তনের ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি যে পরিমাণ ঘটনা ঘটতে দেন সেটুকু ছাড়া দুনিয়ায় কিছুই ঘটে না। এ বাস্তবতার স্বীকৃতিস্বরূপ নবী করীম মুহাম্মদ ﷺ প্রায়ই 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো বিচলন ও ক্ষমতা নেই) বলে বিস্ময়সূচক উক্তি করতেন।

আল কুরআনের অনেক আয়াতে রুবুবিয়াহ আকীদার ভিত্তি পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ বলেছেন–

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ -

"আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সব কিছুর নিয়ন্তা।"

(সূরা–৩৯ আয-যুমার : আয়াত-৬২)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ -

"মূলত: আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তাও।"

(সূরা–৩৭ আছ ছাফফাত : আয়াত-৯৬)

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। (সূরা–৮ আল-আনফাল : আয়াত-১৭)

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না।"

(সূরা–৬৪ আত তাগাবুন : আয়াত-১১)

নবী করীম ﷺ এ ধারণার আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বলেন, "সাবধান, যদি গোটা মানব জাতি তোমাকে সাহায্য করার জন্য কিছু করতে চায়, তারা শুধু এতটুকুই করতে সক্ষম হবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য পূর্বেই লিখে রেখেছেন। অনুরূপ, যদি গোটা মানব জাতি ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, তারা 'শুধু ততটুকুই ক্ষতি করতে সক্ষম হবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য পূর্বেই লিখে রেখেছেন।"

সুতরাং, মানুষ যা সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য বলে ধারণা করে তা শুধুমাত্র এ জীবনের পূর্ব নির্ধারিত পরীক্ষার অংশ। আল্লাহ যেভাবে নির্ধারণ করে রেখেছেন সে ভাবেই ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়। আল্লাহ বলেন–

يَـٰٓا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে তোমাদের (কিছু) শত্রু রয়েছে; অতএব তাদের প্রসঙ্গে তোমরা সতর্ক থেকো।"

(সূরা–৬৪ আত তাগাবুন : আয়াত-১৪)

অর্থাৎ মানুষের জীবনের উত্তম জিনিসের মধ্যেও আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের কঠিন পরীক্ষা নিহিত আছে। অনুরূপভাবে, জীবনের কঠিন ও ভয়াবহ ঘটনাবলিতেও পরীক্ষা নিহিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَالاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ـ

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসলের বিনষ্টের দ্বারা পরীক্ষা করব। তুমি ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও।" (সূরা–২ আল বাকারা : আয়াত-১৫৫)

কোন কোন সময় জীবনের ঘটনাগুলো উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করা সহজ যখন কার্যকারণ অনুযায়ী ফলাফল ঘটে। আবার কোন কোন সময় উপলব্ধি করা কঠিন যখন আপাত দৃষ্টিতে মন্দ কাজের সুফল অথবা ভাল কাজ থেকে মন্দ ফল আসে। আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, সীমিত জ্ঞানের জন্যে এ ধরনের আপত: অনিয়মের পেছনে কি বিজ্ঞতা রয়েছে তা মানুষের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাইরে।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.

"কিন্তু তোমরা যা ভালবাস না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং যা ভালবাস সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অমঙ্গলজনক।"

(সূরা–২ আল বাকরা : আয়াত-২১৬)

মানব জীবনে আপত: অমঙ্গলজনক ঘটনা কখনো শেষ পর্যন্ত মঙ্গলজনক বলে প্রমাণিত হয় এবং আপত: মঙ্গলজনক জিনিস যা মানুষ ভালবাসে তা শেষ পর্যন্ত অমঙ্গলজনক হয়। জীবনে যে সব সুযোগ আসে তা থেকে পছন্দ করে জীবন গড়ার মধ্যেই মানুষের প্রভাব সীমাবদ্ধ। সুযোগের প্রকৃত ফলাফলের ওপর মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই।

অন্য কথায় "মানুষ প্রস্তাব করে, স্রষ্টা নিষ্পত্তি করে।" সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য সবই আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এবং বিভিন্ন তাবিজ কবচ ও কুসংস্কার (যেমন– খরগোশের পা, এক বোঁটায় চার পাতাবিশিষ্ট ছোট গাছ, ইচ্ছা পূরণ করার হাড়, ভাগ্যবান সংখ্যা, রাশিচক্র ইত্যাদি) অথবা অশুভ সংকেত (যেমন তের তারিখের শুক্রবার, আয়না ভাঙ্গা, কালো বিড়াল) দ্বারা এসব সংঘটিত হতে পারে না।

মূলত: যাদু এবং শুভ-অশুভ সংকেতে বিশ্বাস করা শিরক (তাওহীদ আররুবুবিয়াতের পরিপন্থী) এবং একটি মস্তবড় পাপ। উকাবাহ (রা) নামে নবী করীম ﷺ-এর একজন সাহাবী বলেন যে, একদিন একদল লোক

আনুগত্য প্রকাশের জন্য আল্লাহর নবীর নিকট আগমন করলে তিনি একজন বাদে অপর নয়জনের শপথ গ্রহণ করলেন। যখন তারা জিজ্ঞেস করল কেন তিনি তাদের সঙ্গীর শপথ গ্রহণ করলেন না, জাবাবে তিনি বললেন, যথার্থই, সে মন্ত্রপূত কবচ (এক জাতীয় তাবিজ) পরে আছে। যে লোকটি মন্ত্রপূত কবচ পরে ছিল সে তার আলখাল্লার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কবচটি বের করে ভেঙ্গে ফেলল এবং তারপর শপথ পড়ল। নবী করীম ﷺ তখন বললেন—

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ ـ

অর্থাৎ, যে কেউ মন্ত্রপূত কবচ পরবে সে শিরক করবে।

কুরআনে কারীমকে মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা অথবা শয়তানকে সরিয়ে রাখার জন্য অথবা সৌভাগ্য আনার জন্য তাবিজ হিসাবে কুরআনের আয়াত গলার হারে ঝুলানো অথবা থলির মধ্যে রাখার প্রথা এবং পৌত্তলিক প্রথার মধ্যে খুব কমই পার্থক্য বিদ্যমান। নবী করীম ﷺ কিংবা তাঁর সাহাবাগণ কুরআনকে এভাবে ব্যবহার করেননি এবং নবী করীম ﷺ বলেছেন—

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِ نَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ

অর্থাৎ, সে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয় যে ইসলামে নতুন কিছু প্রচলন করবে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

এটা সত্যি যে কুরআনের আন-নাস এবং আল-ফালাক সূরা দুটি সুনির্দিষ্টভাবে যাদুর প্রভাব দূর (অর্থাৎ মন্দ যাদুমন্ত্র দূর) করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু সঠিক কি পদ্ধতিতে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে তা নবী করীম ﷺ দেখিয়ে গেছেন। একদা নবী করীম ﷺ-এর ওপর বান মারা হলে তিনি আলী ইবনে আবু তালিবকে এ দুটি সূরার প্রতিটি আয়াত তিলাওয়াত করতে বলেছিলেন এবং তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে নিজের ওপর সেগুলো নিজে তিলাওয়াত করতেন। তিনি সূরাগুলো লিখে তাঁর গলায় ঝুলাননি, হাতে অথবা কোমরে বাঁধেননি অথবা তিনি অন্য কাউকে এসব করতে বলেননি।

২. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাত تَوْحِيْدُ الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

(আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখা)

এ প্রকার তাওহীদের পাঁচটি প্রধান রূপ আছে–

১. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখার প্রথম শর্ত হলো, কুরআন এবং হাদীসে আল্লাহ এবং তাঁর নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার যেরূপ বর্ণনা দিয়েছেন সেরূপ ব্যতীত আর কোনোভাবে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া যাবে না। তিনি বলেন—

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ـ

অর্থাৎ, এবং মুনাফিক নর ও নারী এবং মুশরিক নর ও নারী যারা আল্লাহ প্রসঙ্গে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন। তাদের চারিদিকে অমঙ্গল চক্র, আল্লাহ তাদের প্রতি রাগ করেছেন, তাদেরকে লা'নত করেছিলেন এবং তাদের জন্য অকল্যাণের পরিণতি প্রস্তুত রেখেছেন।

(সূরা–৪৮ আল-ফাতাহ : আয়াত-৬)

সুতরাং ক্রোধ আল্লাহর গুণাবলীর একটি। এটা বলা ভুল হবে যে, যেহেতু ক্রোধ মানুষের মধ্যে একটি দুর্বলতার চিহ্ন যা আল্লাহর জন্য শোভন নয় সেহেতু আল্লাহর ক্রোধ অবশ্যই তাঁর শাস্তি বুঝায়। কুরআন কারীমে আল্লাহ বলেছেন–

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ـ

"কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।" (সূরা–৪২ আশ শূরা : আয়াত-১১)

মহান আল্লাহর এ ঘোষণার ভিত্তিতে মহান আল্লাহর ক্রোধ যে মানুষের ক্রোধের মত নয় তা গ্রহণ করতে হবে। তথাকথিত 'বিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (Rational Interpretation) অনুযায়ী যখন যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় তখন তা নাস্তিকতার জন্ম দেয়। (অনুবাদকের মতামত :

'Rational Interpretation' খুব সম্ভব লেখক আবু আমিনাহ্ এটাই উদ্দেশ্য করেছেন যে যেহেতু;

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ـ

'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়' (সূরা-৪২ শূরা : আয়াত-১১)

অতএব আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মত নয় এবং যেহেতু মানুষের প্রাণ রয়েছে তাই আল্লাহ্র প্রাণ থাকতে পারে না। এ যুক্তির ফলেই একজন নাস্তিকতায় উপনীত হয়। কিন্তু এটা শুধু শব্দের মারপ্যাঁচের মাধ্যমে সত্যের অপব্যাখ্যা। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে জীবন্ত বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই যুক্তিবাদী বিচার অনুযায়ী স্রষ্টা নিষ্প্রাণ এবং অস্তিত্বহীন নয়। আসল কথা হলো আল্লাহ্র গুণাবলীর সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য কেবলমাত্র নামে, মাত্রায় নয়। যখন স্রষ্টাকে উদ্দেশ্য করে গুণাবলি ব্যবহৃত হয় তখন সেগুলো সার্বভৌম অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে সেগুলো মানব সুলভ অসম্পূর্ণতা মুক্ত।

২. তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত এর দ্বিতীয় শর্ত হলো আল্লাহ্র ওপর কোন নতুন নাম ও গুণাবলি আরোপ না করে তিনি নিজেকে যেভাবে উল্লেখ করেছেন সে ভাবেই তাঁকে উল্লেখ করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদিও তিনি বলেছেন যে তিনি রাগ করেন তবুও তাঁর নাম আল গাদিব (রাগী জন) দেয়া যাবে না; কারণ আল্লাহ্ বা তাঁর নবী করীম ﷺ কেউ এ নাম ব্যবহার করেননি। এটা একটি ক্ষুদ্র বিষয় মনে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্র অসত্য বা ভুল বিবরণ রোধ করার জন্য তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাত অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ সসীম মানুষের পক্ষে কখনই অসীম স্রষ্টার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

৩. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাত এর তৃতীয় শর্ত অনুযায়ী মহান আল্লাহ্কে কখনোই তাঁর সৃষ্টির গুণাবলি দেয়া যাবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাইবেল ও তাওরাতে দাবি করা হয় যে, আল্লাহ্ ছয় দিনে গোটা বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং তারপর সপ্তম দিনে নিদ্রা যান। এ কারণে ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানগণ হয় শনিবার নতুবা রবিবারকে বিশ্রামের দিন নির্দিষ্ট করে নেয় এবং ঐ দিন কাজ করাকে অপরাধ বলে গণ্য করে।

এ জাতীয় দাবি স্রষ্টার ওপর তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী আরোপ করে। মানুষই দিনভার কাজের পর ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং সবলতা পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের ঘুমের দরকার হয়। বাইবেলে ও তাওরাতের অন্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ যেমন তার ভুল উপলব্ধি করে অনুতপ্ত হয় তেমনি স্রষ্টাও তাঁর খারাপ চিন্তার জন্য অনুতপ্ত হন। (নাউযুবিল্লাহ) অনুরূপভাবে স্রষ্টা একটি আত্মা অথবা তাঁর একটি আত্মা আছে বলে দাবি করা তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাতকে পরিপূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের কোনো স্থানে নিজেকে আত্মা বলে উল্লেখ করেননি অথবা তাঁর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে এ জাতীয় কোনো বক্তব্য দেননি। মূলত: আল্লাহ্ আত্মাকে তাঁর সৃষ্টির একটি অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহর গুণাবলী উল্লেখ করতে কুরআনের আয়াতকে মৌলিক দলিল হিসেবে অনুসরণ করতে হবে–

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

(সূরা–৪২ আস শূরা : আয়াত-১১)

কোন কিছু শ্রবণ করা ও দেখা মানুষের গুণাবলি। কিন্তু যখন তা স্রষ্টার ওপর আরোপিত করা হয় তখন সেগুলো তুলনাবিহীন এবং ক্রটিমুক্ত। যাহোক এ গুণাবলি মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চোখ ও কান আবশ্যক, যা স্রষ্টার জন্য প্রযোজ্য নয়। স্রষ্টা প্রসঙ্গে মানুষ কেবলমাত্র ততটুকুই জ্ঞাত যতটুকু তিনি তাঁর পয়গম্বরদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কাজেই মানুষ এ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করতে বাধ্য। মানুষ যদি স্রষ্টার বর্ণনা দিতে লাগামহীন বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাহলে আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির গুণাবলির সাথে মিলানোর মত ভুলের সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে।

কল্পিত চিত্রের প্রতি আসক্তির কারণে খ্রিস্টানরা মানুষ সদৃশ অসংখ্য চিত্র অঙ্কন, খোদাই এবং ঢালাই করে সেগুলোকে স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি নাম দিয়েছে। এগুলো জনগণের মধ্যে যিশুখ্রিস্টের দেবত্বের স্বীকৃতি আদায় করতে সাহায্য করছে। স্রষ্টা মানুষের মত, একবার এ কল্পনা গ্রহণযোগ্য হলে, যিশুখ্রিস্টকে স্রষ্টা হিসেবে গ্রহণ করতে বাস্তবেই কোনো সমস্যা দেখা দেয় না।

৪. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাতের চতুর্থ শর্তের জন্য দরকার মানুষের ওপর আল্লাহর গুণাবলি আরোপ না করা। যেমন, বাইবেলের নতুন সংস্করণে (New Testament) পলকে (Paul) তাওরাতে (Genesis ১৪ : ১৮-২০) বর্ণিত সালেমের রাজা মেলচিজদেকের রূপে দেখান হয়েছে এবং তাকে ও যিশুখ্রিস্টের কোনো আদি বা অন্ত নেই বলে স্বর্গীয় গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে–

১. স্রষ্টার প্রধান পুরোহিত, সালেমের রাজা মেলচিজদেক রাজাদের বধ করার পর প্রত্যাগত ইব্রাহীমের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তাকে আশীর্বাদ করলেন।

২. এবং ইব্রাহীম তাকে সব কিছুর এক দশমাংশ বন্টন করে দিলেন। তাঁর নামের অর্থ হিসেবে তিনিই প্রথম ন্যায়নিষ্ঠ রাজা এবং সালেমেরও রাজা, অর্থাৎ শান্তির রাজা।

৩. তিনি পিতা অথবা মাতা অথবা বংশবৃত্তান্ত এবং আদি অন্ত বিহীন।

৪. কিন্তু স্রষ্টার সন্তানের ন্যায় চিরদিন পুরোহিত হিসেবে বহাল থাকবেন।

৫. সুতরাং যিশুখ্রিস্ট নিজেকে প্রধান পুরোহিত পদে পদোন্নতি দেননি কিন্তু তাঁর দ্বারা নিয়োজিত হয়েছিলেন যিনি তাঁকে বললেন, "তুমি আমার পুত্র আজ আমি তোমাকে জন্মদান করলাম।"

৬. যেমন তিনি অন্যত্রও বলেন, "মেলচিজদেকের পরে তুমি চিরদিনের জন্য পুরোহিত"।

অধিকাংশ শিয়া সম্প্রদায় (ইয়েমেনের যাইদাইদরা ছাড়া) তাদের ইমামগণকে সম্পূর্ণভাবে ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে (মাসুম), অতীত, ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্য প্রসঙ্গে জ্ঞানী, ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম এবং সৃষ্টির অণু-পরমাণু নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে স্বর্গীয় গুণে গুণান্বিত করেছে। এটা করতে গিয়ে তারা সে সব প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করেছে যারা স্রষ্টার অদ্বিতীয় গুণাবলীর অংশীদার এবং আল্লাহর সমসাময়িক।

৫. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাতের পঞ্চম শর্ত হলো যদি নামের পূর্বে আবদ (অর্থ ভৃত্য অথবা বান্দা) সংযোজিত না করা হয় তাহলে তার সৃষ্টিকে মহান আল্লাহর কোনো নামে নামকরণ করা যাবে না। কিন্তু 'রাউফ' এবং

রাহিম এর মত বহু স্বর্গীয় নাম মানুষের নাম হিসেবে অনুমোদিত; কারণ নবী করীম ﷺ-কে উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ এ ধরনের কিছু নাম ব্যবহার করেছেন–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۔

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, ঈমানদারদের প্রতি সে দরদী (রাউফ) ও পরম দয়ালু (রাহিম)।" (সূরা–৯ আত তাওবা : আয়াত-১২৮)

কিন্তু 'আর রাউফ (যিনি সবচেয়ে সমবেদনায় পরিপূর্ণ) এবং 'আর-রাহিম' (সবচেয়ে ক্ষমাশীল) মানুষের বিষয়ে তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন নামের পূর্বে 'আবদ' ব্যবহার করা হবে, যেমন– আব্দুর রাউফ অথবা আব্দুর রাহিম। আর রাউফ এবং আর রাহিম এমন এক পূর্ণতার প্রতিনিধিত্ব করে যা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। তেমনিভাবে, আব্দুর রাসূল (বার্তাবাহকের গোলাম), আব্দুন নবী (নবীর গোলাম), আব্দুল হুসাইন (হুসাইনের গোলাম) ইত্যাদি নামগুলো নিষিদ্ধ; কারণ এখানে মানুষ নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের গোলাম হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ মতবাদের ভিত্তিতে, নবী করীম ﷺ মুসলমানদের তাদের অধীনস্থদের "আবদী" (আমার গোলাম) অথবা "আমাতী" (আমার বাঁদী) বলে উল্লেখ করতে নিষেধ করেছেন।

৩. তাওহীদ আল-ইবাদাহ (আল্লাহর ইবাদতের এককত্ব বজায় রাখা)

প্রথম দুই প্রকারের তাওহীদের ব্যাপক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা থাকলেও কেবলমাত্র সেগুলোর ওপর দৃঢ় বিশ্বাসই তাওহীদের ইসলামি প্রয়োজনীয়তা পূরণে যথেষ্ট নয়। ইসলামি মতে তাওহীদকে পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য তাওহীদ আর রুবুবিয়াহ এবং আল আসমা ওয়াস সিফাত অবশ্যই এদের পরিপূরক তাওহীদ আল-ইবাদাহর সাথে সম্পন্ন হতে হবে। এ বিষয়টি যে ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত তাহলো আল্লাহ স্বয়ং পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে রাসূলের সময়কার মুশরিকগণ (পৌত্তলিকগণ) তাওহীদের প্রথম দুই প্রকারের কতিপয়

বিষয় সত্য বলে স্বীকার করেছিল। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ কে পৌত্তলিকদের বলতে বলেছেন–

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۔

অর্থাৎ, "বল, কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত থেকে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত থেকে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে? তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ'।"

(সূরা–১০ ইউনূছ : আয়াত-৩১)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۔

অর্থাৎ, "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'।" (সূরা–৪৩ আয যুখরুফ : আয়াত-৮৭)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ ۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۔

অর্থাৎ, "যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, ভূমি মৃত হওয়ার পর আকাশ থেকে বৃষ্টি (পানি) বর্ষণ করে কে তাকে সঞ্জীবিত করে? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'।" (সূরা–২৯ আল আনকাবূত : আয়াত-৬৩)

মক্কার পৌত্তলিকগোষ্ঠী জানতো এবং মানতো যে আল্লাহ হলো তাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, তাদের প্রভু এবং মালিক; তবুও আল্লাহর নিকট ঐ জ্ঞান তাদের মুসলমান বানাতে পারেনি। মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۔

অর্থাৎ, "তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁকে শরীক করে।" (সূরা–১২ ইউসূফ : আয়াত-১০৬)

আলোচ্য আয়াতের ওপর মুফাসসির মুজাহিদের ভাষ্য হলো : আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের প্রতিপালন করেন এবং আমাদের জীবন নেন এ বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণা তাদেরকে আল্লাহর পাশাপাশি অন্যান্য দেব-দেবতার উপাসনা থেকে বিরত করে নি। পূর্বে বর্ণিত আয়াতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাফেররা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রাজত্ব ও ক্ষমতা প্রসঙ্গে জ্ঞাত ছিল। মূলত: ভীষণ প্রয়োজন এবং দুর্যোগের সময় তারা বিশ্বস্ততার সাথে হজ্জ, দান, পশু বলি, মানত এমনকি উপাসনাও করতো। এমনকি তারা ইব্রাহীমের ধর্ম অনুসরণ করছে বলেও দাবি করতো। এ জাতীয় দাবির কারণে আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াত নাযিল করলেন–

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلاَ نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

অর্থাৎ, "ইব্রাহিম ইয়াহুদীও ছিল না, খ্রিস্টানও ছিল না, সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিল না।"

(সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-৬৭)

কিছু সংখ্যক পৌত্তলিক মক্কাবাসী পুনরুত্থান, শেষ বিচার এবং পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য বিশ্বাস করতো। প্রাক-ইসলামী কবিতায় তাদের এ বিশ্বাসের বহু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, কবি যুহাইর (Zuhayr) বলেছিলেন–

"হয় ইহা স্থগিত করা হয়েছিল, একটি পুস্তকে রক্ষিত হয়েছিল এবং শেষ বিচার দিনের জন্য রক্ষা করা হয়েছিল নতুবা ত্বরান্বিত করা হয়েছিল এবং প্রতিশোধ লওয়া হয়েছিল।"

কবি আন্তারা (Antarah) বলেছেন বলে উদ্ধৃত আছে–

"ওহে শয়তান মৃত্যু হইতে তুমি কোথায় পালাইয়া যাইবে, যদি আসমানস্থিত আমার স্রষ্টা তোমার ভাগ্যে তা লিখিয়া থাকেন?"

মক্কাবাসীদের তাওহীদ প্রসঙ্গে স্বীকারোক্তি এবং আল্লাহ প্রসঙ্গে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি তারা অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করার কারণে মহান আল্লাহ তাদেরকে নাস্তিক (কাফের) এবং পৌত্তলিক (মুশরিক) হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

কাজেই তাওহীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাওহীদ আল ইবাদাহ অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে এককত্ব বজায় রাখা। যেহেতু একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত প্রাপ্য এবং মানুষের ইবাদতের ফল হিসেবে একমাত্র তিনিই কল্যাণ কবুল করতে পারেন, সেজন্য সব ধরনের ইবাদত একমাত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করেই করতে হবে। অধিকন্তু মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে যে কোনো ধরনের মধ্যস্থতাকারী অথবা যোগাযোগকারীর দরকার নেই। আল্লাহ একমাত্র তাঁকে উদ্দেশ্য করেই ইবাদতের গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এটাই সকল নবী রাসূল কর্তৃক প্রচারিত সংবাদের সারাংশ। আল্লাহ বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ .

অর্থাৎ, "আমি জ্বিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।" (সূরা–৫১ আয-যারিয়াত : আয়াত-৫৬)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ .

অর্থাৎ, "আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগূতকে (মিথ্যা দেব-দেবীকে) বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি।" (সূরা–১৬ আন নাহল : আয়াত-৩৬)

সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ উপলব্ধি করা মানুষের সহজাত ক্ষমতার উর্ধ্বে। মানুষ একটি সসীম সৃষ্টিকর্ম এবং তার নিকট থেকে অসীম স্রষ্টার ক্রিয়াকাণ্ড সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতভাবে উপলব্ধি করা আশা করা যায় না। এ কারণে স্রষ্টা তাঁকে ইবাদত করা মানুষের স্বভাবের একটি অংশ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে পরিষ্কার করে বুঝানোর জন্য তিনি নবী রাসূলদের এবং মানসিক ক্ষমতার বোধগম্য গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলেন।

স্রষ্টার ইবাদত (ইবাদাহ) করাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং নবী রাসূলদের প্রধান সংবাদ ছিল একমাত্র স্রষ্টাকে ইবাদত করা, তাওহীদ আল-ইবাদাহ। এর কারণে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অথবা আল্লাহসহ অন্যকে ইবাদত করা জঘন্য গুনাহ, শিরক। যে সূরা আল-ফাতিহা মুসলমান নর-নারীদের সালাতে প্রতিদিন কমপক্ষে সতেরবার তিলাওয়াত করতে হয়, সেই সূরার চতুর্থ

আয়াত উল্লেখ করে, **"আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার কাছেই আমরা সাহায্য চাই।"** এ বিবরণ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, যাবতীয় ইবাদত আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে করতে হবে যিনি সাড়া দিতে পারেন।

নবী করীম ﷺ ইবাদতে এককত্বের দর্শন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে বলেছেন : "তুমি যদি ইবাদতে কিছু চাও তাহলে শুধু আল্লাহর নিকট চাও এবং তুমি যদি সাহায্য চাও তাহলে শুধু আল্লাহর নিকট চাও।" কোনো মধ্যস্থতাকারীর অপ্রয়োজনীয়তা এবং আল্লাহর নিকটবর্তীতা আরও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পায় কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে। উদাহরণস্বরূপ–

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ـ

অর্থাৎ, "আমার বান্দাগণ যখন আমার প্রসঙ্গে আপনাকে প্রশ্ন করে, আমিতো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই। অতএব তারাও আমার আহ্বানে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।"

(সূরা–২ আল বাকারা : আয়াত-১৮৬)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ـ

অর্থাৎ, "আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।"

(সূরা–৫০ আল ক্বাফ : আয়াত-১৬)

তাওহীদ আল-ইবাদাহ এর স্বীকৃতি, বিপরীতভাবে সব ধরনের মধ্যস্থতাকারী অথবা আল্লাহর সাথে অংশীদারের সম্পৃক্ততার অস্বীকৃতি আবশ্যক করে তোলে। যদি কেউ জীবিত ব্যক্তিদের জীবনের ওপর অথবা যারা মারা গেছে তাদের মৃত্যুবরণ করেছে প্রভাব বিস্তারের জন্য মাইয়্যেতের নিকট প্রার্থনা করে, তারা আল্লাহর সাথে একজন অংশীদার যুক্ত করে। এ জাতীয় প্রার্থনা

আল্লাহর পাশাপাশি অন্যের উপাসনা করার মত। নবী করীম ﷺ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "প্রার্থনাই ইবাদত।" সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেন–

اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلاَ يَضُرُّكُمْ -

অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত কর না যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না।"

(সূরা–২১ আল আম্বিয়া : আয়াত-৬৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ -

অর্থাৎ, "আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তো তোমাদের মতই বান্দা।" (সূরা–৭ আল-আরাফ : আয়াত-১৯৪)

যদি কেউ নবী করীম ﷺ অথবা তথাকথিত আউলিয়া, জ্বিন অথবা ফেরেশতাগণের নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে অথবা প্রার্থনাকারীর পক্ষ হয়ে এদেরকে আল্লাহর নিকট সাহায্য করতে অনুরোধ করে তাহলে তারাও শিরক করে। মূর্খ ব্যক্তিবর্গ যখন আব্দুল কাদের জিলানীকে "গাওছী-আজম" উপাধি ভূষিত করে তখন তাওহীদের এ নিয়মে শিরক করে। উপাধীটির আক্ষরিক অর্থ, "মুক্তি প্রাপ্তির প্রধান উৎস; এমন একজন যিনি বিপদ থেকে রক্ষা করার সবচেয়ে উপযুক্ত" অথচ এ জাতীয় বিবরণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। দুর্ঘটনা ঘটলে কেউ কেউ আবদুল কাদিরকে এ উপাধিতে আহ্বান করে তাঁর সাহায্য এবং আত্মরক্ষা কামনা করে, যদিও আল্লাহ পূর্বেই বলেছেন–

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَكَاشِفَ لَهٗ اِلاَّ هُوَ -

অর্থাৎ, "আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ করলে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই।" (সূরা–৬ আল আন'আম : আয়াত-১৭)

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, যখন মক্কাবাসীদের তাদের মূর্তিপূজার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলো তারা জবাব দিল–

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى -

অর্থাৎ, "আমরা তাদের ইবাদত করি যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছায়।" (সূরা–৩৯ আয যুমার : ৩)

মূর্তিগুলোকে কেবলমাত্র মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহার করলেও আল্লাহ তাদের আচার-অনুষ্ঠানের কারণে তাদেরকে পৌত্তলিক বলেছেন। মুসলমানদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করার প্রতি জোর দেয় তারা উত্তমরূপে এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখতে পারেন।

তারসাস নগরীর সলের (পরবর্তীকালে যাকে পল বলা হতো) শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হয়ে খ্রিস্টানগণ পয়গম্বর যিশুখ্রিস্টের ওপর দেবত্ব আরোপ করেছিল এবং তারা যিশুখ্রিষ্ট ও তার মাতাকে উপাসনা করতো। খ্রিস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিকদের (Catholics) প্রতিটি উপলক্ষের জন্য কিছু সংখ্যক সাধু (Saint) আছে। ক্যাথোলিকরা সাধুদের নিকট সে বিশ্বাসের ভিত্তিতেই প্রার্থনা করে যে এসব সাধুরা জাগতিক ঘটনাবলিতে সরাসরিভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

ক্যাথলিকরা তাদের পুরোহিতদের আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাদের নিজেদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও ব্যবহার করে। তারা বিশ্বাস করে যে এসব পুরোহিতদের কৌমার্য ও ধর্মানুরাগের কারণে আল্লাহ্ কর্তৃক তাদের কথা শ্রবণ করার সম্ভাবনা অধিক। মধ্যস্থতাকারী প্রসঙ্গে বিকৃত বিশ্বাসের কারণে শিয়া সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ সপ্তাহের কয়েকটি দিন এবং দিনের কয়েক ঘণ্টা আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন এর প্রতি প্রার্থনার জন্য নির্ধারিত রেখেছে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ইবাদতে শুধু সিয়াম সাধনা, যাকাত প্রদান, হজ্ব এবং পশু কুরবানী করা ব্যতীত আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে ভালবাসা, বিশ্বাস এবং ভয়ের মত আবেগ অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে এবং যা শুধুমাত্র স্রষ্টার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হতে হবে। আল্লাহ্ এ আবেগের বাড়াবাড়ি প্রসঙ্গে সাবধান করে দিয়ে উল্লেখ করেছেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ـ

অর্থাৎ, "তথাপি কে কে আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম।"

(সূরা–২ আল বাকারা : আয়াত-১৬৫)

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

অর্থাৎ, "তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই করবে না, যারা নিজেদের ওয়াদা ভঙ্গ করেছে ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য ইচ্ছা করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? ঈমানদার হলে আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে সমীচীন।"

(সূরা–৯ আত তাওবা : আয়াত-১৩)

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ.

অর্থাৎ, "আর তোমরা ঈমানদার হলে আল্লাহর ওপরেই নির্ভর কর।"

(সূরা আল-মায়িদা, ৫ : ২৩)

ইবাদত শব্দের অর্থ হলো সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা এবং আল্লাহকে চূড়ান্ত আইনপ্রণেতা হিসেবে গণ্য করা। সুতরাং স্বর্গীয় আইনের (শরীয়াহ) ওপর ভিত্তি না করে ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) আইনবিধান বাস্তবায়ন স্বর্গীয় আইনের প্রতি অবিশ্বাস এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার পর্যায়ে পড়ে। এ জাতীয় বিশ্বাস আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনা করার নামান্তর (শিরক)। আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন–

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

অর্থাৎ, "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফির।" (সূরা–৫ আল মায়েদা : আয়াত-৪৪)

সাহাবী আদি ইবনে হাতিম, যিনি খ্রিস্টান ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন নবী করীম ﷺ-কে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেন–

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ.

"তারা আল্লাহ ছাড়া তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার-ত্যাগীগণকে (Rabbis & Monasticism) তাদের পালনকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

(সূরা–৯ আত-তওবা : আয়াত-৩১)

তিনি নবী করীম ﷺ-কে বললেন, "নিশ্চয়ই আমরা তাদের উপাসনা করি না"। নবী করীম ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বলেন : "আল্লাহ্ যা কিছু হালাল করেছেন তারা কি তা হারাম ঘোষণা করে নি এবং তোমরা সকলে তা হারাম কর নি এবং আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা কি তারা হালাল করে নি এবং তোমরা তা হালাল কর নি"? জবাবে তিনি বলেন "নিশ্চয়ই আমরা তা করেছি"। নবী করীম ﷺ তখন জবাব দিলেন "ঐ ভাবেই তোমরা তাদের উপাসনা করছিলে।"

অতএব, তাওহীদ আল-ইবাদাহ্ এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো শরীয়াহ্ বাস্তবায়ন। বিশেষ করে যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা মুসলমান, বহু তথাকথিত মুসলমান দেশ, যেখানে সরকার আমদানিকৃত ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত এবং যেখানে স্বর্গীয় আইন পরিপূর্ণ বিলুপ্ত অথবা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্রে নামিয়ে দেয়া হয়েছে, সেখানে ইসলামি আইন চালু করতে হবে।

অনুরূপভাবে, মুসলমান দেশসমূহ, যেখানে ইসলামি বিধি-বিধান কেবল পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ধর্মনিরপেক্ষ আইনকানুন চালু রয়েছে, সেখানেও শরীয়াহ্ বিধি-বিধান প্রবর্তন করতে হবে; কারণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ বিধি-বিধান সম্পর্কযুক্ত। মুসলিম দেশে শরীয়াহ্ আইনের পরিবর্তে অনৈসলামিক বিধি-বিধানের স্বীকৃতি হলো শিরক এবং এটা একটি কুফরী কাজ।

যাদের ক্ষমতা আছে তাদের অবশ্যই এ অনৈসলামিক বিধি-বিধান পরিবর্তন করা আবশ্যক। যাদের সে ক্ষমতা নেই তাদের অবশ্যই কুফর এর বিরুদ্ধে এবং শরি'আহ্ আইন বাস্তবায়নের জন্য সোচ্চার হওয়া অপরিহার্য। যদি এটাও সম্ভব না হয়, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাওহীদ সমুন্নত রাখার জন্য অনৈসলামিক সরকারকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

শিরক এর প্রকারভেদ

তাওহীদের চর্চা পরিপূর্ণ হবে না, যদি এর বিপরীত শিরক সতর্কভাবে এবং গভীরভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা না হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শিরক প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাওহীদ কীভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে তা বোঝানোর জন্য শিরক এর কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। যাহোক, আলোচ্য অধ্যায়ে শিরক-কে একটি পৃথক আলোচনার বিষয়বস্তু গণ্য করা হবে, আল্লাহ্ তা'আলা যার গুরুতর প্রয়োজনীয়তা কুরআনে সাক্ষ্য দিয়েছেন–

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۔

“আল্লাহ্ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।” (সূরা–৪ আন নিসা : আয়াত-৪৮)

কারণ, শিরক-এর অপরাধ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করে, এটা আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে গুরুতর ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আক্ষরিক অর্থে শিরক মানে অংশীদারিত্ব, ভাগাভাগি অথবা সম্পৃক্ত করা। কিন্তু ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে যে কোনো প্রকারে হোক আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সম্পৃক্ত করাকে বুঝায়। তিন ভাগে বিভক্ত তাওহীদ অনুসারে শিরক প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। সুতরাং প্রথমে আমরা রুবুবিয়াহ্-এর ক্ষেত্রে এবং তার আসমা ওয়াস-সিফাত “ঐশ্বরিক নাম ও গুণাবলি” এবং সব শেষে ইবাদাহ্-এর (ইবাদত) ক্ষেত্রে কীভাবে শিরক সংঘটিত হয় সে প্রসঙ্গে আলোকপাত করব।

রুবুবিয়াহ্-তে শিরক

এ প্রকারের শিরক দ্বারা বেঝায়–

১. অন্যেরাও আল্লাহর সমকক্ষ অথবা সমকক্ষের কাছাকাছি এবং তাঁর সৃষ্টির কর্তৃত্বের অংশীদার। ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্মীয় মতবাদ রুবুবিয়াহ্-তে শিরক এর এ প্রকারের অন্তর্গত।

২. স্রষ্টার আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই। কিছু সংখ্যক দার্শনিকের দর্শন চর্চায় এ জাতীয় নাস্তিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ক. সম্পৃক্ততার বা অংশীদারিত্বের দ্বারা শিরক

যে সব বিশ্বাস এ উপশ্রেণীর শামিল তাহলো সৃষ্টিজগৎ এর ওপর যে একজন প্রধান স্রষ্টা অথবা সর্বোচ্চ সত্তা বিদ্যমান তা স্বীকৃত, কিন্তু অন্যান্য ক্ষুদ্রতম দেব-দেবতা, মানুষ, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অথবা দুনিয়াবী সামগ্রীও তাঁর রাজত্বের সাথে অংশীদারিত্ব করে। এ জাতীয় বিশ্বাসকে ধর্ম তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ এবং দার্শনিকগণ সাধারণভাবে এককত্বের দর্শন (এক স্রষ্টার অস্তিত্ব) অথবা বহু ঈশ্বরবাদে (একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্বে) বিশ্বাসী বলে উল্লেখ করে থাকেন। ইসলামি মতে, এ জাতীয় সব বিশ্বাসই বহু-ঈশ্বরবাদ।

এ জাতীয় বিকৃত বিশ্বাসের কতিপয় স্বর্গীয়ভাবে প্রেরিত ধর্ম পদ্ধতির বিভিন্ন মাত্রায় অধঃপতনের প্রতিনিধিত্ব করে, অথচ শুরুতে এ সব বিশ্বাস তাওহীদ ভিত্তিক ছিল। হিন্দু ধর্মের সর্বোচ্চ সত্তা ব্রহ্মাকে অন্তর্যামী, সর্ব-পরিব্যাপক, অপরিবর্তনীয় এবং চিরন্তন, নৈর্ব্যক্তিক অসীমের নির্যাস হিসেবে কল্পনা করা হয় যার মধ্য থেকে সব কিছুর সূত্রপাত এবং সমাপ্তি। ব্রহ্মা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা যিনি সংরক্ষক দেবতা বিষ্ণু এবং ধ্বংসের দেবতা শিবকে নিয়ে ত্রিত্ব (Trinity) গঠন করে। এভাবে হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার গঠনমূলক, ধ্বংসাত্মক ও সংরক্ষণ ক্ষমতা অন্যান্য দেব-দেবতার ওপর অর্পণ করে রুবুবিয়াতে শিরক প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

খ্রিস্টীয় ধর্ম মতে পিতা, পুত্র (যিশুখ্রিস্ট) এবং পবিত্র আত্মা এ তিন জনের মাধ্যমে স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করে। তথাপি এ তিনকে একই বস্তুর অংশীদার হিসেবে একক বলে ধরা হয়। পয়গম্বর যিশুকে দেবত্বে উন্নীত করা হয়েছে যিনি স্রষ্টার ডান হাতে বসেন এবং দুনিয়ার বিচারকার্য পরিচালনা করেন।

হিব্রু বাইবেলে স্রষ্টা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর সৃজনশীল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং খ্রিস্টীয় মতবাদ হিসেবে তিনি দেবত্বের অংশ।

পল (Paul) পবিত্র আত্মাকে (Holy Spirit) খ্রিস্টের অভিন্ন আত্মা, বন্ধু, পথপ্রদর্শক, খ্রিস্টানদের সাহায্যকারী হিসেবে ঘোষণা করে এবং পেনিকস্ট (Penecost)-এর দিনে এ পবিত্র আত্মা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই যিশু এবং পবিত্র আত্মা স্রষ্টার সকল আধিপত্যের অংশীদার, যিশু একাই বিশ্বের ওপর রায় ঘোষণা করেন এবং খ্রিস্টানগণ পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত এবং পথপ্রদর্শিত হয়। এ সব খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে রুবুবিয়াতে শিরক সংঘটিত হয়।

পারস্য অগ্নিপূজারীরা (Zoroastrians) তাদের স্রষ্টা "আহুরা মাজদা" (Ahura Mazda) প্রসঙ্গে এ ধারণা পোষণ করে যে, তিনি যা কিছু উত্তম তারই নির্মাতা এবং তিনি একমাত্র প্রকৃত উপাসনার যোগ্য। আহুরা মাজদার সাতটি সৃষ্টির মধ্যে অগ্নি একটি যাকে তার পুত্র অথবা প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়। "আংগ্রা মাইনু" (Angra Mainyu) নামে অপর একজন দেবতা, অন্ধকার যার প্রতীক তার দ্বারা শয়তানী, হিংস্রতা এবং মৃত্যু সৃষ্টি হয়েছে। এ জাতীয় কল্পনার বশবর্তী হয়ে তারা রুবুবিয়াতে শিরক করে।

অতএব, মন্দ গুণাবলি স্রষ্টার ওপর আরোপ করার মানবিক ইচ্ছার কারণে অপরাধী আত্মাকে একজন বিরোধী উপাস্যের পর্যায়ে উন্নীত করে সকল সৃষ্টির ওপর স্রষ্টার সার্বভৌম ক্ষমতার (অর্থাৎ তাঁর রুবুবিয়াহ্-র) অংশীদার করা হয়।

পশ্চিম আফ্রিকায় (প্রধানত: নাইজেরিয়া) ইয়োরুবা (Yoruba) ধর্মের অনুসারী এক কোটিরও অধিক ব্যক্তিবর্গের বিশ্বাস ওলোরিয়াস (Olorius অর্থাৎ স্বর্গের অধিপতি) অথবা ওলোডুমেয়ার (Olodumare) নামে একজন সর্ব প্রধান স্রষ্টা আছে। তা সত্ত্বেও, অসংখ্য ওরিশা (Orisha) উপাসনা দ্বারা আধুনিক ইয়োরুবা ধর্ম চিহ্নিত করা হয়, যার ফলে ইয়োরুবা ধর্ম কট্টর বহু ঈশ্বরবাদ বলে ধারণা করা হয়। কাজেই ছোটখাট দেবতা এবং আত্মাদের ওপর স্রষ্টার সকল দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে ইয়োরুবা ধর্ম অনুসারীগণ রুবুবিয়াহ্-তে শিরক করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু সম্প্রদায় এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী, যার নাম "আনকুলুনকুলু" (Unkulunkulu) অর্থ– প্রাচীন, সর্ব-প্রথম এবং সবচেয়ে সম্মানিত। স্রষ্টার সুনির্দিষ্ট মুখ্য উপাধিগুলো হলো এনকোসী ইয়াপজুলু (Nkosi yaphezulu অর্থ আকাশের স্রষ্টা) এবং এমভেলিংকানকী (Mvelingqanqi অর্থ- সর্বপ্রথম আবির্ভূত)। তাদের সর্ব প্রধান স্রষ্টাকে একজন পুরুষ হিসেবে ধরা হয়, যিনি দুনিয়াবী নারীর সাহায্যে মনুষ্যজগৎ সৃষ্টি করে। জুলু ধর্ম মতে বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমকানো স্রষ্টা প্রদত্ত; পক্ষান্তরে, অসুস্থতা এবং জীবনের অন্যান্য বিপদ আপদ ইডলোজী (Idlozi) অথবা আবাপহানসি (Abaphansi অর্থ যেগুলো মাটির নিচে) নামের পূর্ব পুরুষ কর্তৃক সংঘটিত হয়।

এ সব পূর্ব পুরুষগণ জীবিতদের নিরাপত্তা বিধান করে, খাবারের জন্য প্রার্থনা করে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও বলিদানে সন্তুষ্ট হয়, অমনোযোগীদের শাস্তি প্রদান করে এবং জ্যোতিষীদের (In-yanga) আয়ত্বে রাখে। এভাবে, শুধুমাত্র মনুষ্য জগৎ সৃষ্টি প্রসঙ্গে তাদের মতবাদের জন্যই নয়, মানুষের জীবনে ভাল মন্দ ঘটা তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মার কাজ বলে আরোপিত করার কারণেই জুলু ধর্মে রুবুবিয়াহতে শিরক সংঘটিত হয়।

কিছু সংখ্যক মুসলমানের মধ্যে রুবাবিয়াহতে শিরক এ জাতীয় বিশ্বাসে প্রকাশিত হয় যে, ওলি আউলিয়া এবং অন্যান্য বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গের আত্মা, এমনকি তাদের মৃত্যুর পরও জাগতিক ঘটনাবলিতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, এসব আত্মা একজনের চাহিদা পূরণ করতে, বিপর্যয় দূর করতে এবং যারাই তাদের স্মরণ করবে তাদেরই সাহায্য করতে সক্ষম। তাই কবর পূজারীগণ এ জীবনের ঘটনাবলি সংঘটিত হবার জন্য মানুষের আত্মার ওপর স্বর্গীয় ক্ষমতার উপস্থিতি দর্শায় যা মূলত: একমাত্র আল্লাহই ঘটাতে পারেন।

বহু সূফীদের (মরমীবাদী মুসলমান) মধ্যে সাধারণভাবে এ বিশ্বাস প্রচলিত যে "রিজাল আল গাইব" দেবদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি 'কুতুব' নামক স্তরে সমাসীন এবং তাঁর দ্বারা এ বিশ্বের যাবতীয় বিষয়াদি নিয়ন্ত্রিত হয়।

খ. অস্বীকার দ্বারা শিরক

বিভিন্ন দর্শন এবং ভাবাদর্শ যেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে অথবা ইঙ্গিতে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এ উপশ্রেণীতে তারই আলোচনা হবে। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক ক্ষেত্রে স্রষ্টার অনস্তিত্বের (নাস্তিকতা বা Atheism) ঘোষণা দেয়া হয়।

পক্ষান্তরে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর অস্তিত্বের দাবি করা হলেও যে ভাবে তাঁকে কল্পনা করা হয় তাতে প্রকৃতপক্ষে তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় (হতাশাবাদ বা Patheism)।

কতিপয় প্রাচীন ধর্মীয় তন্ত্র রয়েছে যার মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই। এদের মধ্যে অন্যতম হলো গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত আরোপিত তন্ত্র। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, বর্ণ প্রথার বিরোধিতাকারী একটি সংস্কারমূলক আন্দোলন হিসেবে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একই সময়ে জৈন ধর্মেরও প্রচলন আরম্ভ হয়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে চালু হয়। অবশেষে এটা হিন্দু ধর্ম কর্তৃক অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং বুদ্ধকে অবতারদের (স্রষ্টার প্রতিমূর্তি) মধ্যে একজন গণ্য করা হয়।

ভারতে এ ধর্মের প্রভাব কমে আসলেও চীন এবং অন্যান্য পূর্বের দেশগুলোতে প্রভাবশালী হয়ে পড়ে। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মের দুধরনের ব্যাখ্যার উৎপত্তি হয়। ঐ দুশ্রেণির ব্যাখ্যার মধ্যে প্রাচীনতর হিনায়ানা (Hinayana) বৌদ্ধ ধর্ম (৪০০-২৫০ খ্রিঃ পূ.) পরিষ্কার করে দেয় যে, স্রষ্টা বলে কেউ নেই; সেজন্য ব্যক্তি বিশেষের মুক্তি লাভের দায়িত্ব তার নিজের ওপর বর্তায়। এভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন ধারাকে রুবুবিয়াহর শিরক এর দৃষ্টান্ত হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা যায় যেখানে স্রষ্টার অস্তিত্ব সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে জৈন ধর্মের শিক্ষক ভারধামানা (Vardhamana) প্রচার করে যে, স্রষ্টা বলে কিছু নেই, তবে মুক্ত আত্মা অমরত্ব এবং অসীম জ্ঞানের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার পদমর্যাদার কিছু অংশ অর্জন করে। ধর্মীয় সমাজ এমনভাবে এসব তথাকথিত মুক্ত আত্মাদের সাথে আচরণ করে যেন তারা দেবতা সুলভ, তাদের জন্য মন্দির নির্মাণ করে এবং তাদের মূর্তি পূজা করে।

আরেকটি প্রাচীন দৃষ্টান্ত হলো মূসা (আ)-এর সময়কার ফেরাউন। আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, ফেরাউন আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিল এবং মূসা ও মিশরের জনগণের নিকট দাবি করেছিল যে, সে সকল সৃষ্টির একমাত্র সত্যিকার রব। সে মূসাকে বলেছিল বলে আল্লাহ উল্লেখ করেন–

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ـ

অর্থাৎ, "তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব।" (সূরা–২৬ শু'আরা : আয়াত-২৯)

এবং জনগণকে বলেছিল–

فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى

অর্থাৎ, "আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ পালনকর্তা।" (সূরা আন নাযি'আত ৭৯ : ২৪)

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে কতিপয় ইউরোপীয় দার্শনিক স্রষ্টার অস্তিত্বহীনতা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যা "স্রষ্টা মৃত্যুর দর্শন (Death of God philosophy)" নামে পরিচিতি লাভ করে। জার্মান দার্শনিক ফিলিপ মেইনল্যান্ডার (Philipp Mainlander 1841-1876) তাঁর The Philosophy of Redemption, ১৮৭৬ (প্রায়শ্চিত্ব করার দর্শন) শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু বিশ্বের একাধিকত্বে স্রষ্টার এককত্বতার মূল উপাদান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে এবং পরমানন্দের তত্ত্বকে শাস্তি ভোগতত্ত্ব (যা বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান) দিয়ে অস্বীকার করা হয়েছে, সেহেতু স্রষ্টার মৃত্যুর পর বিশ্বের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে।

প্রুশিয়ার ফ্রেড্রিক নিযশে (Friedrich Nietzsche, 1844-1900) 'স্রষ্টার মৃত্যু' মতবাদ সমর্থন করে পেশ করেছিলেন যে, স্রষ্টা মানুষের অস্বস্তিকর বিবেকের অভিক্ষেপ (Projection) ব্যতীত আর কিছুই ছিল না এবং মানুষ অতি মানবের (Superman) সঙ্গে সেতুবন্ধন ছিল। বিংশ শতাব্দীর জীন পল সাত্রে (Jean Paul Sarte) নামে একজন ফরাসী দার্শনিকও 'স্রষ্টার মৃত্যু' চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি করেন। তিনি দাবি করেন যে, স্রষ্টা বিদ্যমান থাকতে পারে না কারণ তিনি পরস্পর বিরোধী শব্দ সম্বলিত একটি উক্তি। তার নিকট স্রষ্টা কেবল মানুষের কল্পনার তৈরি নিজস্ব অভিক্ষেপ (Projection)।

মানুষ মহিমান্বিত বানর ব্যতীত কিছুই নয়- ডারুউইনের (মৃ: ১৮৮২) এ প্রস্তাব সমাজবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। কারণ এ তত্ত্ব স্রষ্টার অস্তিত্বহীনতার 'বৈজ্ঞানিক' ভিত্তি রচনা করে। তাদের মতে, সর্বপ্রাণবাদ (Animism) হতে একেশ্বরবাদ ধর্মের সূচনা, স্বতন্ত্র ব্যক্তি থেকে মানুষের সামাজিক বিবর্তন এবং বানর থেকে শারীরিক বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের উৎপত্তি।

কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না এবং অস্তিত্বহীনতা (বা শূন্যতা) থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়- এ অমূলক দাবির মাধ্যমেই তারা সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী এড়ানোর চেষ্টা করে। এভাবেই তারা আল্লাহর আদি এবং অন্তহীনতা মানুষের ওপর আরোপ করে। আধুনিক কালে এ মতবাদের বিশ্বাসীগণ কার্ল মার্কসের (karl Marx) অনুসারী সাম্যবাদী ও বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিকগণ। এরা দাবি করে গতিশীল পদার্থই বিদ্যমান যাবতীয় বস্তুর উৎস। তারা আরও দাবি করে যে, নির্যাতিত জনগোষ্ঠি যে বাস্তবতার মধ্যে বাস করে তার থেকে তাদের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে নেয়ার জন্য শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক মানুষের কল্পনায় স্রষ্টাকে আবিষ্কার করা হয়েছে।

কিছু সংখ্যক মুসলমানের মধ্যে এ জাতীয় শিরক-এর একটা দৃষ্টান্ত হলো ইবনে আরাবীর মত বহু সুফী, যারা দাবি করে যে, একমাত্র আল্লাহই অস্তিত্বমান (সবই আল্লাহ এবং আল্লাহই সব)। তারা আল্লাহর আলাদা অস্তিত্ব অস্বীকার করে প্রকৃতপক্ষে তাঁর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ ইয়াহুদি দার্শনিক বারুচ স্পিনোজা (Baruch Spinoza) এ জাতীয় মতবাদ প্রকাশ করেছিল। তার মতে মানুষসহ বিশ্বের সকল অংশের সমষ্টিই হলো স্রষ্টা।

আল-আসমা ওয়াস সিফাত এ শিরক

এ প্রকার শিরক এ আল্লাহর ওপর তাঁর সৃষ্টির গুণাবলি আরোপ করার সাধারণ পৌত্তলিক প্রথা ও পাশাপাশি সৃষ্টিকৃত বস্তুর ওপর আল্লাহর নাম ও গুণাবলি আরোপ করা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

ক. মানবিকরণ দ্বারা শিরক

আল-আসমা ওয়াস সিফাত জাতীয় এ শিরক এর রূপ হলো আল্লাহকে মানুষ ও জন্তুর আকার ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা। পশুর ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের

কারণে মূর্তি উপাসনা করা সাধারণভাবে সৃষ্টিতে প্রতীক ব্যবহার করতে মানুষের আকার ব্যবহার করে। ফলে প্রায়ই তারা যাদের উপাসনা করে তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট মানুষের আকারে স্রষ্টার প্রতিকৃতি অংকন করে, ছাঁচ এবং নকশা করে নির্মাণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হিন্দু ও বৌদ্ধরা এশিয়ার লোক সদৃশ অগণিত মূর্তি পূজা করে এবং এ সব মূর্তিকে সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার প্রকাশ হিসেবে গণ্য করে।

আধুনিক খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে, পয়গম্বর যিশু মূর্তিমান স্রষ্টা ছিলেন। স্রষ্টা যে তাঁর নিজের সৃষ্টি এটা সে জাতীয় শিরক-এর উদাহরণ। তথাকথিত অসংখ্য প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান চিত্রকরদের মধ্যে মাইকেল এ্যানজেলো বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন (Michaelangelo, মৃ: ১৫৬৫)। তিনি ভ্যাটিক্যানে অবস্থিত সিসটিন গির্জার (Sistine Shapel) ছাদে স্রষ্টাকে এঁকেছিলেন দীর্ঘ ঝুলে পড়া চুল দাড়ি বিশিষ্ট একজন উলঙ্গ ইউরোপীয় বৃদ্ধ হিসাবে। কালক্রমে এ সব চিত্র খ্রিস্টান জগতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার বস্তু বলে বিবেচিত হয়।

খ. দেবত্ব আরোপের দ্বারা শিরক

আল আসমা ওয়াস সিফাত এর এ জাতীয় শিরক এমন বিষয় সম্পর্কিত যেখানে সৃষ্টিকৃত জীবন্ত প্রাণী অথবা বস্তুকে আল্লাহর নাম অথবা তাঁর গুণাবলী আরোপ করা হয়। যেমন, যেসব মূর্তির নাম মহান আল্লাহর নাম থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল সে সব মূর্তি পূজা করা প্রাচীন আরবদের রীতি ছিল। তাদের প্রধান তিন মূর্তি হলো মহান আল্লাহর নাম আল ইলাহ থেকে নেয়া আল লাত ও আল আযিয থেকে নেয়া আল উজ্জাহ এবং আল মান্নান থেকে নেয়া আল মানাত। রাসূল ﷺ-এর যুগে ইমামাহ এলাকায় একজন মিথ্যা নবীও ছিল, যে 'রাহমান' নাম গ্রহণ করেছিল, যে নাম শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য।

সিরিয়ার শিয়াদের মধ্যে নুসাইরিয়াহ (Nusayreeyah) নামের সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ এর চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী ইবনে আবু তালিবের মধ্যে আল্লাহর প্রকাশ ছিল এবং তারা তাঁর ওপর আল্লাহর অনেক গুণ আরোপিত করেছিল। এদের মধ্যে ইসমাঈলীরা যারা আগাখানি বলেও পরিচিত, তারা তাদের নেতা আগাখানকে স্রষ্টার প্রকাশ বলে মনে করে। লেবাননের দ্রুজরাও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যারা বিশ্বাস করে যে

ফাতেমীয় (Faatimid Caliph) খলিফা আল হাকিম ইবনে আমরিল্লাহ মনুষ্য জাতির মধ্যে আল্লাহর শেষ প্রকাশ।

আল-হাল্লাজের মত সুফীদের (মরমীবাদী মুসলমান) দাবি যে, তারা স্রষ্টার সাথে একীভূত হয়ে গেছে। অতএব স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে তারা স্রষ্টার প্রকাশ হিসেবে বিরাজ করছে, তাদের এ দাবিও আল আসমা ওয়াস সিফাত এর শ্রেণীভুক্ত শিরক এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বর্তমান আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসীগণ যেমন শার্লী ম্যাকলিন (Shirley Maclaine) জে, যে, নাইট (J.Z Knight) প্রায়শই নিজেদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ওপর দেবত্ব দাবি করে।

বহুল পঠিত আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব ($E = mc^2$, শক্তি সমান ভর গুণন আলোর গতির বর্গফল) মূলত: আল আসমা ওয়াস সিফাত অন্তর্ভুক্ত শিরক-এর অভিব্যক্তি। এ তত্ত্ব মতে শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস কোনটাই করা যায় না। কেবলমাত্র শক্তি পদার্থে রূপান্তরিত হয় অথবা পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যাহোক, পদার্থ এবং শক্তি উভয়ই সৃষ্টিকৃত অস্তিত্ব এবং উভয়কেই ধ্বংস করা হবে বলে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ.

অর্থাৎ, "আল্লাহ সমস্ত কিছুরই স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুরই বিধায়ক।"

(সূরা–৩৯ আয-যুমার : আয়াত-৬২)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ.

অর্থাৎ, "ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংস হয়ে যাবে .....।"

(সূরা–৫৫ আর রহমান : আয়াত-২৬)

এ তত্ত্বের আরও অর্থ এই যে, পদার্থ এবং শক্তি চিরন্তন যার কোনো শুরু অথবা শেষ নেই, যেহেতু এ দুটির জন্ম নেই এবং একটি থেকে অন্যটি রূপান্তরিত হয় বলে ধরা হয়। যাহোক, এ স্বাভাবিক গুণ শুধু আল্লাহর এবং তিনি একমাত্র যাঁর শুরু অথবা শেষ নেই।

ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বও স্রষ্টার হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রাণহীন পদার্থ থেকে প্রাণ এবং এর আকারের বিবর্তন প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার একটি প্রচেষ্টা। এ শতাব্দীর একজন শীর্ষ ডারউইনতাত্ত্বিক, স্যার আলডাস হাক্সলি (Aldous Huxley) তাঁর চিন্তা ধারা প্রকাশ করেছেন এভাবে–

"ডারউইনতত্ত্ব, প্রাণী সত্তার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্রষ্টার ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় আলোচনার পরিমণ্ডল থেকে দূর করে দিয়েছে।" (অন্য অর্থে, ডারউইনতত্ত্ব স্রষ্টার অস্তিত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে।)

আল ইবাদাহ্-তে শিরক

এ জাতীয় শিরক এ ইবাদতের অনুষ্ঠানাদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য করা হয় এবং ইবাদতের পুরস্কার স্রষ্টার নিকট না চেয়ে সৃষ্টির নিকট চাওয়া হয়। পূর্বে বর্ণিত প্রকারগুলোর মত আল ইবাদাহ্ এর শিরক এর প্রধান দুটি রূপ রয়েছে।

ক. আশ শিরক আল আকবর (বৃহৎ শিরক)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করা হলে এ জাতীয় শিরক সংঘটিত হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজা (বা ব্যক্তিপূজা) যার থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ্ বিশেষ করে নবীদের প্রেরণ করেছিলেন। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর বক্তব্য থেকে এ মতবাদ সমর্থিত হয়েছে–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে (মিথ্যা দেবদেবতা) পরিহার করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি।" (সূরা–১৬ আন নাহল : আয়াত-৩৬)

তাগূতের মূল অর্থ হলো আল্লাহর পাশাপাশি অথবা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কিছুর ইবাদত করা। যথা, ভালবাসা এক জাতীয় ইবাদত যার উৎকর্ষতা শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে পরিচালনা করা আবশ্যক। ইসলামে আল্লাহকে ভালবাসার বহি:প্রকাশ হবে তখনই যখন আল্লাহ্ প্রদত্ত যাবতীয় বিধি-বিধান

পালন করা হবে। এটা এ জাতীয় ভালবাসা নয় যা মানুষ স্বাভাবিকভাবে পিতামাতা, সন্তানসন্ততি, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির প্রতি অনুভব করে। স্রষ্টার প্রতি ঐ প্রকারের ভালবাসা পরিচালনা করা মানে তাঁকে তাঁর সৃষ্টিকর্তার পর্যায়ে নামিয়ে আনা যা "আল আসমা ওয়াস সিফাত এর শিরক"। যে ভালবাসা ইবাদত তা হলো স্রষ্টার প্রতি একজনের ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

এজন্যে, আল্লাহ্ নবী করীম ﷺ-কে বিশ্বাসীগণদের বলতে বলেছেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, "বল তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" (সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-৩১)

নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে আরও বলেছিলেন, "তোমরা কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের সন্তান, পিতামাতা ও গোটা মানবজাতি থেকে আমাকে অধিক ভাল না বাসবে।" নবী করীম ﷺ-কে ভালোবাসার ভিত্তি তাঁর মানবিক গুণাবলী নয়, বরং তাঁর বার্তার আসমানী উৎপত্তি। এভাবে, আল্লাহ্কে ভালবাসাও প্রকাশিত হয় তাঁর বিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। আল্লাহ্ বলেছেন–

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ

অর্থাৎ, "কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করল।"
(সূরা–৪ আন নিসা : আয়াত-৮০)

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ـ

অর্থাৎ, "বল, আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও।"
(সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-৩২)

যদি কেউ কোনো কিছুর অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা, তার এবং আল্লাহ্র মধ্যে আসতে দেয়, তাহলে সে ঐ বস্তু অথবা ব্যক্তিরই উপাসনা করলো। এভাবে, ধনদৌলত অথবা এমন কি একজনের কামনা বাসনাও তার দেবতা হয়ে যেতে পারে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, "দিরহামের পূজারীরা সব সময়ই দুর্দশাগ্রস্ত থাকবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ .

অর্থাৎ, "তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে?" (সূরা–২৫ আল ফুরকান : আয়াত-৪৩)

ইবাদাহর (উপাসনা) শিরক-এর পাপ প্রসঙ্গে অনেক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে; কারণ এটা সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের বিরোধীতা করে। যেমন মহান আল্লাহর বর্ণনায় প্রকাশ পায়–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ .

অর্থাৎ, "আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এ জন্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।" (সূরা–৫১ আয যারিয়াত : আয়াত-৫৬)

শিরক বিশ্বের পালনকর্তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহের কাজ এবং সেই জন্য শিরক-কে চূড়ান্ত অপরাধজনিত কাজ বলে গণ্য করা হয়। এটা এত বড় পাপ যে মূলত: একজন যতই ভাল কাজ করুক না কেন তা আল্লাহর নিকট বাতিল হয়ে যায় এবং পাপী ব্যক্তির জাহান্নামে চিরস্থায়ী নরক দণ্ড নিশ্চিত হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, মিথ্যা ধর্ম প্রধানত এ জাতীয় শিরক এর ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট সকল ধর্ম বা প্রথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের অনুসারীদের সৃষ্টির পূজা করার আহ্বান জানায়।

খ্রিস্টানদেরকে যিশু নামে একজন মানুষকে উপাসনা করার আহ্বান জানানো হয়, যিনি আসলে স্রষ্টারই পক্ষ থেকে এক নবী; অথচ তাকে স্রষ্টার দেহদারী বলে দাবি করা হয়। খ্রিস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিকরা (Catholics) মেরীকে (মরিয়মকে) স্রষ্টার মা উপাধি দিয়ে তার নিকট প্রার্থনা করে। তদুপরি তারা মাইকেল (মিকাইল আ) নামের ফেরেশতার উপাধি দিয়েছে সেইন্ট মাইকেলকে (St. Michael)। সেইন্ট মাইকেলকে বিশেষভাবে সম্মান দেয়ার জন্য তারা মে মাসের ৮ এবং সেপ্টেম্বর মাসের ২৯ তারিখ মাইকেলমাস দিবস (Michaelmas Day) হিসেবে ঘোষণা করেছে। এছাড়াও ক্যাথলিকরা প্রায়ই বাস্তব অথবা কল্পিত সাধুদের কাছেও প্রার্থনা করে।

যে সব মুসলমান নবী করীম ﷺ-এর নিকট প্রার্থনা করে অথবা সূফীদের বিভিন্ন আউলিয়া এবং সাধকদের নিকট প্রার্থনা করে এ বিশ্বাসে যে, এরা তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে পারেন, সেই সব মুসলমান এ জাতীয় শিরক আল আকবর করে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন–

قُلْ اَرَاَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

অর্থাৎ, "বল, তোমরা ভেবে দেখ যে, আল্লাহ্র শাস্তি তোমাদের ওপর আরোপিত হলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত হাজির হলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাকে আহ্বান করবে? (জবাব দাও) যদি তোমরা সত্যবাদী হও?" (সূরা–৬ আল আন'আম : আয়াত-৪০)

খ. আশ শিরক আল-আসগর (ছোট শিরক)

মাহমুদ ইবনে লুবাইদ বলেছেন "আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বলেন "আমি তোমাদের জন্য যা সর্বাধিক ভয় করি তা হলো আশ শিরক আল আসগর (ছোট শিরক)।" সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন 'হে আল্লাহ্র রাসূল! ছোট শিরক কি?" জবাবে তিনি বললেন, "আর রিয়া" (লোক দেখানো বা জাহির করা), কারণ নিশ্চয়ই শেষ বিচারের দিনে মানুষ তার পুরস্কার গ্রহণের সময় আল্লাহ বলবেন, "বস্তু জগতে যাদের নিকট তুমি নিজেকে প্রকাশ করেছিলে তাদের নিকট গমন কর এবং দেখ তাদের নিকট থেকে কোনো পুরস্কার পাও কি না।"

মাহমুদ ইবনে লুবাইদ আরও বর্ণনা দেন নবী করীম ﷺ বের হয়ে এলেন এবং ঘোষণা দিলেন, "ওহে জনগণ, গুপ্ত শিরক থেকে সাবধান।" লোকেরা জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহ্র নবী করীম গুপ্ত শিরক কি?" তিনি উত্তর দিলেন "যখন কেউ সালাত আদায় করতে উঠে সালাত সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করে এ ভেবে যে লোক তার প্রতি চেয়ে আছে, সেটাই গুপ্ত শিরক।"

আর রিয়া

নানা প্রকারের ইবাদতের মধ্যে অন্যকে দেখানোর এবং প্রশংসিত হবার জন্য যে ধরনের ইবাদতের চর্চা করা হয় সে ধরনের ইবাদত হলো রিয়া। এ পাপ

সকল ন্যায়নিষ্ঠ কাজের সুফল ধ্বংস করে ফেলে এবং যে এ পাপ সংঘটিত করে তার ওপর ভয়ানক শাস্তি নেমে আসে। এটা বিশেষ করে ভয়ংকর; কারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে তার সঙ্গীদের নিকট থেকে প্রশংসা আশা করে এবং উপভোগ করে।

অতএব মানুষের মনে দাগ কাটার জন্য অথবা তাদের প্রশংসা পাবার জন্যে ধর্মকর্ম করা এমন একটা খারাপ কাজ যা থেকে সর্বাধিক সতর্ক থাকতে হবে। যে সব বিশ্বাসীদের লক্ষ্য তাদের জীবনের সকল ধর্মীয় কর্মকাণ্ড স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত করা তাদের জন্য এ বিপদ সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ। মূলত: অভিজ্ঞ সত্যিকার বিশ্বাসীগণ কর্তৃক আশ শিরক আল আকবর (বৃহৎ শিরক) সংঘটিত করার সম্ভাবনা কম। কারণ এর অপকারিতা স্পষ্ট প্রতীয়মান।

কিন্তু অন্যান্যদের মতে সত্যিকার বিশ্বাসীগণ কর্তৃক রিয়া করার সম্ভাবনা বেশি; কারণ এটা খুব প্রচ্ছন্ন। এটা শুধু একজনের নিয়্যত পরিবর্তনের মতই সহজ কাজ। এর পিছনে প্রেরণা শক্তিও অত্যন্ত প্রবল; কারণ এটা মানুষের অন্তরের স্বভাব প্রসূত। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এ বাস্তবতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেছিলেন "চন্দ্রবিহীন রাত্রে একটা কালো পাথর বেড়ে উঠা একটা কালো পিঁপড়ার চেয়েও গোপন হলো শিরক।"

কাজেই একজনের নিয়্যত সর্বদা খাঁটি রাখতে হবে এমনকি কোনো ন্যায় কাজ করার সময়ও খাঁটি রাখার নিশ্চয়তার জন্য অতি যত্নবান হতে হবে। এর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ইসলামের সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে আল্লাহর নাম নেয়ার আদেশ করা হয়েছে।

নবী করীম ﷺ খাওয়া, পান করা, ঘুমানো, যৌনকর্ম, এমনকি শৌচাগারে গমনের পূর্বে ও পরে অনেকগুলো ধারাবাহিক দু'আ (অনানুষ্ঠানিক প্রার্থনা) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাতে এ জাতীয় প্রাত্যহিক অভ্যাসগুলো ইবাদতের কাজে পরিণত হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ্ প্রসঙ্গে গভীর সচেতনতা প্রকাশ প্রায়। এ সচেতনতা হচ্ছে "তাক্বওয়া" যা নিয়্যতকে পরিশুদ্ধ থাকতে নিশ্চিত করে। নবী করীম ﷺ অবশ্যম্ভাবী শিরক থেকে নিরাপত্তা বিধানের কতিপয় নির্দিষ্ট দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। সেসব দু'আ যে কোনো সময় পড়া যেতে পারে।

আবু মূসা বর্ণনা করেন : একদিন নবী করীম ﷺ খুতবা দেবার সময় বললেন, “ওহে মানব সকল, শিরক-কে ভয় কর, কারণ এটা একটা পিঁপড়ার চুপিসারে চলার চেয়েও গুপ্ত।” কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! যখন চুপিসারে চলা পিঁপড়া থেকেও গোপন তখন কীভাবে আমরা তা এড়িয়ে চলবো?” তিনি বললেন, “বল,

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نُّشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهٗ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ.

অর্থাৎ, “হে আল্লাহ, আমরা জেনে শুনে তোমার সাথে শিরক করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং যে বিষয়ে আমরা অবগত নহি তা থেকে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি।”

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তাওহীদের তিনটি শ্রেণীতে শিরক প্রসঙ্গে আরও বিশদ আলোচনা করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আদমের নিকট আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

বারযাখ

হিন্দু বিশ্বাস মতে শারীরিক মৃত্যুর পর আত্মার নতুন দেহধারণ অথবা পুনর্জন্মের মতবাদ, ইসলাম সমর্থন করে না। এদের মধ্যে কতিপয় মানুষ যারা এ মতবাদ গ্রহণ করেছে তারা "কর্ম" (Karma) নামের এক তত্ত্ব বিশ্বাস করে। এ তত্ত্ব মতে একজনের পুনর্জন্ম কি অবস্থায় হবে তা এ জীবনের কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করে। তার অতীত যদি খারাপ থাকে তাহলে তার পুনর্জন্ম হবে সমাজের নিম্নস্তরের নারীর গর্ভে এবং তাকে উঁচুস্তরে পুনর্জন্ম পেতে হলে উত্তম কাজ করতে হবে।

অপরপক্ষে, সে যদি ভাল কাজ করে থাকে, তাহলে ধার্মিক অথবা পুণ্যবান মানুষ হিসেবে সে একজন উচ্চতর জাতের নারীর গর্ভে জন্মলাভ করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ব্রাহ্মণ জাতের একজন সদস্য হিসেবে জন্ম লাভ করে ততক্ষণ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে উচ্চতর ও আরো অধিক ধার্মিক এবং পুণ্যবান নারীদের গর্ভে তার পুনর্জন্ম হতে থাকবে। যখন সে ত্রুটিমুক্ত হবে তখন "নির্বাণ" (Nirvana) নামের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার আত্মা বিশ্ব আত্মা, 'ব্রাহ্মণের' সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়ে পুনর্জন্ম চক্রের ইতি টানবে।

ইসলাম এবং আল্লাহ প্রদত্ত সকল ধর্ম অনুসারে কেউ পৃথিবী থেকে মৃত্যুবরণ করার পর পুনরুত্থান দিবসের পূর্বে পুনর্জন্ম লাভ করবে না। দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবার পর, একমাত্র উপাসনার যোগ্য স্রষ্টা এবং বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ কর্তৃক বিচারের জন্য মানবজাতি মৃত অবস্থা থেকে জাগ্রত হবে। একজনের মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়কে আরবি ভাষায় "বারযাখ" বলা হয়।

এটা বিস্ময়কর বলে মনে করা ঠিক হবে না যে, হাজার হাজার বৎসর পূর্বে যার মৃত্যু হয়েছে, পুনরুত্থান পর্যন্ত তাকে হয়তো হাজার হাজার বৎসর ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে, কারণ নবী করীম (স) বলেছেন যে, প্রত্যেকের মৃত্যু তার পুনরুত্থানের শুরু। যারা দুনিয়ায় বেঁচে আছে সময় শুধু তাদের জন্য প্রযোজ্য। একবার একজনের মৃত্যু হলে সে দুনিয়ার সময়-বলয় ত্যাগ করে এবং হাজার বছর তার নিকট চোখের এক পলকের সমান হয়ে যায়।

একটি গল্পের মাধ্যমে এ বাস্তবতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সূরা আল বাকারায় আল্লাহ একটি ব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। এ ব্যক্তি একটি গ্রামের ধ্বংসের পর গ্রামের পুনরুত্থান প্রসঙ্গে আল্লাহর ক্ষমতার ওপর সন্দেহ পোষণ করেছিল। এ কারণে আল্লাহ তাকে একশ বৎসরের জন্য মৃত করেন এবং তারপর পুনরুত্থান করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কত বৎসর সে "ঘুমিয়ে" ছিল। সে জবাব দিয়েছিল–

لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ -

অর্থাৎ, "একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ"

(সূরা–২ আল বাকারা : আয়াত-২৫৯)

এরূপে একজন দীর্ঘ সময় ধরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকার পর জাগ্রত হয়ে অনেক সময় ধারণা করে যে, সে অল্প সময়ের জন্য ঐ অবস্থায় ছিল অথবা কোনো সময়ই অতিবাহিত হয়নি। প্রায়ই একজন কয়েক ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে অনুভব করে যে, সে একটু চোখ বুঝেছিল মাত্র। কাজেই বারযাখ অবস্থায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা কল্পনা করার চেষ্টা করে লাভ নেই; কারণ ঐ অবস্থায় সময়ের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই।

প্রাকসৃষ্টি (Pre-Creation)

ইসলাম যদিও আত্মার লাগাতার পুনর্জন্মের ধারণা বাতিল করে দেয় তবুও এ বিষয় সমর্থন করে যে, প্রতিটি শিশুর দুনিয়ায় জন্মের পূর্বে তার আত্মার অস্তিত্ব ছিল।

নবী করীম ﷺ বর্ণনা দেন যে, 'যখন আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলেন, তিনি আরাফার দিনে না'মান (Na'maan) নামক স্থানে তার নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নিলেন। তারপর তিনি আদমের সকল বংশধর, যারা দুনিয়ার শেষ

সময় পর্যন্ত জন্ম গ্রহণ করবে, তাদের সকলকে তার থেকে বের করলেন এবং তাদের নিকট থেকেও স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তার সম্মুখে ছড়িয়ে দিলেন।

তিনি তাদের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?" এবং তারা জবাব দিল "হ্যাঁ, আমরা এতে সাক্ষ্য দিলাম তারপর তিনি যে তাদের সৃষ্টিকর্তা এবং উপাসনা পাবার যোগ্য একমাত্র সত্যিকার রব, এ বিষয়ে গোটা মানব জাতিকে কেন সাক্ষী রাখলেন তার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, "এটা এ জন্য যে যদি তোমরা (মানব জাতি) শেষ বিচার দিবসে বল নিশ্চয়ই আমরা এ বিষয়ে জ্ঞাত ছিলাম না।

আমাদের কোন ধারণা ছিল না যে, তুমি আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা ছিলে। আমাদেরকে কেউ বলেনি যে, আমাদের একমাত্র তোমাকেই উপাসন করতে হবে।" আল্লাহ্ আরও বলেন যে, তোমরা যদি বল, "আমাদের পূর্ব পুরুষরা শিরক করেছিল এবং আমরা শুধু তাদের বংশধর; তবে কি ঐ সব গোমরাহীরা যা করেছে তার জন্য আমাদের ধ্বংস করবে?"

(সূরা-৭ আল আরাফ ৭ : আয়াত-১৭২ -১৭৩)

এ ছিল নবী করীম ﷺ-এর ব্যাখ্যা যা আল্লাহ্ কুরআনের আয়াতে বলেন-

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ اَوْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ .

অর্থাৎ, "স্মরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা আদম সন্তানের কোমরের পশ্চাদ্ভাগ থেকে তার বংশধরদের বের করেন এবং তাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, "আমি কি তোমাদের রব নই? "তারা বলে, "নিশ্চয়ই; আমরা সাক্ষী রইলাম।" এ স্বীকৃতি গ্রহণ এজন্য যে,

তোমরা যেন শেষ বিচার দিবসে না বল, "আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম।" কিংবা তোমরা যেন না বল, "আমাদের পূর্ব-পুরুষগণই আমাদের পূর্বে শিরক করে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর, তবে কি গোমরাহদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?"

(সূরা–৭ আল আরাফ : আয়াত-১৭২-১৭৩)

আলোচ্য আয়াত এবং ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ ব্যাখ্যা এ বিষয় নিশ্চয়তা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেকে আল্লাহর ওপর আস্থা স্থাপন করার জন্য দায়ী এবং শেষ বিচার দিবসে কোনো অজুহাত গ্রহণ করা হবে না। প্রত্যেক মানুষের আত্মায় আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের ছাপ দেয়া আছে। আল্লাহ প্রত্যেক মূর্তিপূজারীকে তার জীবদ্দশায় নিদর্শন দেখান যে, তার মূর্তি খোদা নয়। কাজেই প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মানুষের আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে বিশ্বাস করা প্রয়োজন, সৃষ্টির মধ্যে নয়।

অত:পর নবী করীম ﷺ বলেন, "তারপর আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষকে তার ঈমান দেখানোর জন্য দুই চোখের মাঝখানে একটি আলোর ঝলক স্থাপন করে আদমকে সব দেখালেন। আদম অসংখ্য মানুষের চোখের মাঝখানে আলোর ঝলক দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আমার রব, ওরা কারা?" আল্লাহ্ বললেন যে ওরা সকলে তাঁর (আদমের) বংশধর। আদম তখন একজনের নিকটবর্তী হয়ে তাকিয়ে তার আলোর ঝলক দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি কে? আল্লাহ্ বললেন, ঐ ব্যক্তির নাম দাউদ, যিনি তোমার বংশধরদের নিয়ে গঠিত শেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত একজন। আদম যখন জিজ্ঞেস করলেন তার বয়স কত? আল্লাহ্ তাকে জানালেন যে তার বয়স ষাট।

আদম বললেন, "হে আমার রব, আমার থেকে চল্লিশ বৎসর নিয়ে তাঁর বয়স বাড়িয়ে দিন। কিন্তু যখন আদমের জীবনকাল শেষ প্রান্তে পৌঁছাল এবং মৃত্যুর ফেরেশতা আগমন করলেন তখন আদম জিজ্ঞেস করলেন, "এখনও কি আমার জীবনের চল্লিশ বৎসর বাকী নেই?" ফেরেশতা জবাব দিলেন, "তুমি কি বৎসরগুলো তোমার বংশধর দাউদকে দাওনি?" আদম স্বীকার করলেন যে তিনি দিয়েছেন এবং তার বংশধরগণ পরবর্তীতে আল্লাহর নিকট প্রদত্ত চুক্তি ভুলে গেল এবং সবাই ভুলের মধ্যে পড়লো।

আল্লাহর নিকট প্রদত্ত ওয়াদা ভুলে যাওয়া এবং শয়তানের প্রতারণাপূর্ণ খোঁচার কারণে আদম নিষিদ্ধ গাছ থেকে ভক্ষণ করেন এবং অধিকাংশ মানুষ স্রষ্টায় বিশ্বাস স্থাপন এবং একমাত্র তাঁকেই ইবাদত করার দায়িত্ব উপেক্ষা করেছে এবং সৃষ্টির ইবাদতে নিমগ্ন হয়েছে।

তারপর নবী করীম বললেন, "আল্লাহ্ তারপর আদম ও তাঁর সন্তানদের কয়েকজন বংশধরদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং বললেন, আমি এসব লোকদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারা জান্নাতে বসবাসকারী মানুষের মত কাজ করবে। তারপর তিনি বাকী মানুষের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, আমি এসব লোকদের জাহান্নামের আগুনের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারা জাহান্নামীদের মত কাজ করবে।"

যখন নবী করীম ঐ কথা বললেন তখন এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে উত্তম কাজ করে লাভ কি?" নবী করীম জবাব দিলেন : "যথার্থই, যদি আল্লাহ্ তার এক বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে তিনি তাকে আমৃত্যু জান্নাতীদের মত উত্তম কাজ করতে সাহায্য করেন। তারপর তিনি তাকে এ কারণে জান্নাতে স্থান দেন।

কিন্তু যদি একজনকে জাহান্নামের আগুনের জন্য সৃষ্টি করেন তাহলে তিনি তাকে আমৃত্যু তাদের মত কাজ করতে সাহায্য করেন, তারপর তিনি তাকে এ কারণে জাহান্নামে স্থান দেন।" নবী করীম-এর বক্তব্যের অর্থ এ নয় যে, মানুষের কোন স্বাধীন ইচ্ছা অথবা ভালমন্দের পছন্দ থাকবে না। যদি তাই হতো তাহলে বিচার, পুরস্কার এবং শাস্তি সবই অর্থহীন হতো। জান্নাতের জন্য একজনকে সৃষ্টি করার অর্থ হলো সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ সম্পূর্ণভাবে জানতেন যে, সে ব্যক্তি অবিশ্বাসের পরিবর্তে বিশ্বাসকে এবং মন্দের ওপর উত্তমকে পছন্দের কারণে জান্নাতের অধিবাসীদের একজন হবে।

যদি কেউ আন্তরিকভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করার চেষ্টা করে, তাহলে আল্লাহ্ তার বিশ্বাসের উৎকর্ষ সাধনের অনেক সুযোগ দেবেন এবং তার সৎকর্মগুলো বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহ্ কখনও আন্তরিক বিশ্বাস বৃথা যেতে দেবেন না। যদি বিশ্বাসী ভুল পথেও চলে যায়, তিনি তাকে প্রত্যাবর্তন করতে সাহায্য করবেন। সঠিক রাস্তা থেকে সরে গেলেও তাকে তার ভুল স্মরণ করে দিতে এবং ভুল শোধরানোর জন্য উদ্দীপ্ত করতে আল্লাহ্ তাকে এ জীবনে শাস্তি দিতে পারেন।

মূলত: আল্লাহ্ এতই দয়াবান যে, বিশ্বাসী যখন উত্তম কাজ করতে থাকবে তখন তার জীবন নেবেন, যাতে ঐ বিশ্বাসী ব্যক্তি ভাগ্যবান জান্নাতীদের একজন হতে পারে তা নিশ্চিত হয়। অপরপক্ষে যদি কেউ আল্লাহকে অবিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম পরিহার করে, তাহলে আল্লাহ্ তার জন্য দুষ্কর্ম সহজ করে দেন। যখন সে খারাপ কাজ করে আল্লাহ্ তাকে কৃতকার্যতা দেন। এতে সে আরও মন্দ কাজ করতে উৎসাহিত হয়, যে পর্যন্ত না সে পাপী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং চির জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

ফিতরাত

যেহেতু আদম সৃষ্টি করার সময় মানবজাতিকে আল্লাহ্ তাঁর প্রতিপালকত্বের শপথ করিয়েছিলেন, গর্ভাবস্থায় ভ্রুণের পঞ্চম মাসের পূর্বেই এ কসম তার আত্মার ওপর ছাপ মারা হয়ে যায়। কাজেই একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই আল্লাহর ওপর তার সহজাত বিশ্বাস থাকে। আরবি ভাষায় এ সহজাত বিশ্বাসকে 'ফিতরাত' বলা হয়। যদি শিশুটিকে একাকী ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে আল্লাহ্র এককত্বের বিশ্বাস নিয়ে বড় হবে। কিন্তু সকল শিশু প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তার পরিবেশের চাপে প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

নবী করীম ﷺ বর্ণনা দেন যে আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি আমার বান্দাদের সঠিক ধর্মে সৃষ্টি করেছিলাম কিন্তু শয়তান তাদের গোমরাহ্ করেছে। নবী করীম ﷺ বলেন' প্রত্যেক শিশু 'ফিতরাত' নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী অথবা খ্রিস্টান বানায়। এটা একটা প্রাণীর একটা স্বাভাবিক বাচ্চা জন্মদানের মত।

তোমাদের দ্বারা অঙ্গহানি হবার পূর্বে তোমরা কি অসম্পূর্ণ অবস্থায় কোনো (অল্পবয়স্ক প্রাণীর) জন্ম দেখেছ? সুতরাং যখন একটি শিশুর দেহ আল্লাহ্ কর্তৃক স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মের নিকট আত্মসমর্পণ করে, এর আত্মাও স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্ যে তার রব এবং স্রষ্টা এ সত্যের ওপর আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রার প্রণালী অনুসরণ করাবার চেষ্টা করে।

শিশুটির জীবনের শুরুর দিকে তার পিতামাতার বিরোধিতা করা অথবা বাধা দেবার মত শক্তি থাকে না। এ বয়সে শিশুটি যে ধর্ম অনুসরণ করে তা হলো অভ্যাস ও লালনপালনের ধর্ম এবং এ ধর্মের জন্য আল্লাহ্ তার হিসাব গ্রহণ অথবা শাস্তি প্রদান করবেন না। শিশুটি যখন যৌবনের পরিপক্বতা প্রাপ্ত হয়

এবং তার নিকট মিথ্যার পরিষ্কার প্রমাণ আনা হয় তখন তার সাবালক হিসেবে অবশ্যই জ্ঞান ও যুক্তির ধর্ম অনুসরণ করা উচিত।

এ সময় সাবালকটি যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকতে অথবা আরও বিপথে যেতে শয়তান তাকে সাধ্যমত উৎসাহ প্রদান করে। খারাপ কার্যাদি তার কাছে সুখদায়ক করে তোলা হয়। সঠিক পন্থা পাবার জন্য তখন তাকে অবশ্যই তার ফিতরার এবং কামনা বাসনার দ্বন্দ্বের মধ্যে বাস করতে হয়। সে যদি ফিতরাত বেছে নেয়, আল্লাহ্ তাকে কামনা বাসনা জয় করতে সাহায্য করবেন, এমনকি যদি এর থেকে মুক্তি পেতে তার সারা জীবনও লাগে। কারণ অনেক লোক তাদের বহু বয়সে ইসলামে দাখিল হয় যদিও অধিকাংশরই তা আগেই গ্রহণ করার প্রবণতা থাকে।

যেহেতু এসব বলিষ্ঠ শক্তি ফিতরাতের বিরুদ্ধে যুক্ত করছে, আল্লাহ্ কিছু নীতিবান ব্যক্তি বাছাই করে নেন এবং তাদের নিকট জীবনের সঠিক পন্থা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেন। এসব লোক যাদের আমরা নবী বলি, তাদেরকে আমাদের 'ফিতরাতের' শত্রুদের পরাজিত করতে সাহায্য করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।

পৃথিবীর চারদিকে বর্তমান সমাজে বিদ্যমান সকল সততা ও সদাচার তাঁদের শিক্ষা থেকে এসেছিল এবং তাঁদের শিক্ষা ব্যতীত দুনিয়ায় আদৌ কোনো শান্তি ও নিরাপত্তা থাকতো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অধিকাংশ পশ্চিমা দেশগুলোর আইনকানুন পয়গম্বর মূসার 'দশটি বিধান' (Ten Commandments) এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন, "তুমি চুরি করবে না," এবং "তুমি হত্যা করবে না" ইত্যাদি যদিও তারা ও তাদের সরকার 'ধর্মনিরপেক্ষ' (Secular) বলে দাবি করে।

অতএব, মানুষের উচিত নবীদের পথ অনুসরণ করা। যেহেতু এটাই একমাত্র পথ যা প্রকৃতির সঙ্গে সত্যিকারভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। শুধুমাত্র তার পিতামাতা ও তাদের পূর্বপুরুষ করেছিল বলেই এমন কোনো কাজ তার করা উচিত না যা সে ভুল বলে জানে। সে যদি সত্যের অনুসরণ না করে, তবে সে ঐ সব বিপথগামীদের মত হবে যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا
عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ, "যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর, তারা বলে, না বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ করব। এমন কি তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও।"

(সূরা–২ আল বাকারা : ১৭০)

যদি আমাদের পিতামাতা কামনা করেন যে আমরা পয়গম্বরগণের পথের বিপরীতে কিছু করি তাহলে আল্লাহ্ তাদের বিধান পালন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি কুরআনে বলেছেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَّاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا -

অর্থাৎ, "আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে; তবে তারা যদি তোমার ওপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছুর শরীক করতে যার প্রসঙ্গে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের আনুগত্য করো না।" (সূরা–২৯ আল আনকাবুত : আয়াত-৮)

জন্মগতভাবে মুসলমান

যারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় ভাগ্যবান তারা অবশ্যই জানে যে, এ ধরনের মুসলিমদের নিজে নিজেই জান্নাত পাবার নিশ্চয়তা নেই। কারণ নবী করীম ﷺ সাবধান করেছেন যে, মুসলিম জাতির একটি বৃহদাংশ এত ঘনিষ্ঠভাবে ইহুদী এবং খ্রিস্টানের অনুসরণ করবে যে, তারা যদি একটি সরিসৃপের গর্তে প্রবেশ করে মুসলিমরাও তাদের পিছন পিছন প্রবেশ করবে।

তিনি আরও বলেন যে শেষ বিচার দিবসের পূর্বে কিছু মুসলিম সত্যি সত্যিই মূর্তি পূজা করবে। ঐ সব লোকদের মুসলিম নাম থাকবে এবং তারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করবে কিন্তু শেষ বিচার দিবসে এগুলো কোনো কাজে আসবে না। বর্তমান পৃথিবীর চারদিকে এমন সব মুসলিম রয়েছে যারা মৃত ব্যক্তির পূজা করছে, কবরের উপর স্মৃতিসৌধ এবং মসজিদ নির্মাণ করছে এবং এমনকি এসব ঘিরে পূজার অনুষ্ঠানাদি পালন করছে। এমনও কিছু লোক আছে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে এবং

আলীকে আল্লাহ্ হিসাবে পূজা করে। কিছু লোক কুরআনকে সৌভাগ্যের যাদুমন্ত্রে পরিণত করে কণ্ঠহার হিসেবে গলায়, তাদের গাড়ীতে অথবা চাবির চেইনে ঝুলায়।

অতএব, যারা এ জাতীয় মুসলিম জগতে জন্মগ্রহণ করে তাদের পিতামাতা যা করেছিল বা বিশ্বাস করেছিল তা অন্ধভাবে অনুসরণ করে তাদের এটা করতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে তারা কি শুধু ঘটনাচক্রে মুসলিম নাকি পছন্দের দ্বারা মুসলিম? ইসলাম কি তাই তা তাদের পিতামাতা, গোষ্ঠী, দেশ অথবা জাতি যা যা করেছিল? না কি ইসলাম তাই যা কুরআন শিক্ষা দেয় এবং নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ যা করেছিলেন?

প্রতিশ্রুতি

প্রাক সৃষ্টিকালে প্রতিটি মানুষ আল্লাহর নিকট ওয়াদা করেছিল যে, সে আল্লাহকে তার প্রভু হিসেবে স্বীকৃতি দেবে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারোর উপাসনা করবে না। এটাই শাহাদাত এর (বিশ্বাসের ঘোষণা) অপরিহার্য অর্থ, যা পুরাদস্তুর মুসলিম হবার জন্য প্রত্যেকেরই করা আবশ্যক; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া) যা কালিমা আত তাওহীদ, আল্লাহর এককত্বের বর্ণনা করে। আত্মা অতীতে যে ঘোষণা দিয়েছিল তার একমাত্র বাস্তবায়ন হলো এ জীবনে আল্লাহর এককত্বের সাক্ষ্য দেয়া। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে, প্রতিশ্রুতিটি কীভাবে প্রতিপালন করা যায়?

আন্তরিকভাবে তাওহীদ বিশ্বাস করে এবং প্রাত্যহিক জীবনে ঐ বিশ্বাস ব্যস্তবায়ন করে ওয়াদা পালন করা যায়। সব ধরনের শিরক (স্রষ্টার সঙ্গে শরীক করা) বর্জন করে এবং শেষ রাসূল ﷺ যাঁকে আল্লাহ্ তাওহীদ তত্ত্বের ওপর বাস্তব ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে তাওহীদ অনুশীলন করা যায়। যেহেতু মানুষ ঘোষণা দিয়েছিল যে আল্লাহ্ তাদের রব, তাই তাকে অবশ্যই ঐ সব কার্যাদি ন্যায়নিষ্ঠ বলে গণ্য করতে হবে, যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক ন্যায়নিষ্ঠ বলে নিরূপিত হয়েছিল। পাপ কার্যাদিও অনুরূপভাবে বিবেচিত হবে।

এটা করতে তাওহীদের নীতিনিয়ম মানসিকভাবে চর্চা করতে হবে। এ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটি কাজ আপাত:দৃষ্টিতে উত্তম বলে প্রতীয়মান

হলেও বাস্তবে তা পাপ কাজ। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, যদি কোনো গরীব লোক তার নিজের জন্য রাজাকে কিছু বলতে চায় তাহলে গরীব লোকটার পক্ষ হয়ে বলার জন্য কোনো রাজকুমার অথবা রাজার ঘনিষ্ঠ একজনকে পেলে ভাল হয়। এর ওপর ভিত্তি করে আরও বলা হয় যে, যদি কেউ সত্যিকারভাবে চায় যে, আল্লাহ তার প্রার্থনায় সাড়া দিক, তাহলে তার পয়গম্বর অথবা পীরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত, কারণ সে নিজে সর্বদা পাপ কাজে লিপ্ত।

এটা যৌক্তিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ মানুষকে কোনো মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। একজন বলতে পারে যে চুরি করলে কারোর হাত কেটে ফেলা বর্বরতা অথবা মদ পানের জন্য কাউকে বেত্রাঘাত করা অমানুষিক কাজ। আর কেউ ধারণা করতে পারে যে এ ধরনের শাস্তি খুব কঠোর এবং কল্যাণকর নয়। তথাপি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এ সব শাস্তির বিধান করেছেন যেগুলো উত্তম ফলাফল এর প্রয়োগের যথার্থতা প্রমাণ করে।

অতএব আপন পছন্দের ভিত্তিতে যে ইসলামকে বেছে নিয়েছে তার পক্ষেই শুধু আল্লাহর নিকট প্রদত্ত ওয়াদা পালন করা সম্ভব– তার পিতামাতা মুসলমান হোক বা না হোক সেটা কোনো বিবেচনায় আসে না। ইসলামের বিধি-বিধান বাস্তবায়নই মূলত: প্রতিশ্রুতির প্রয়োগ। মানুষের 'ফিতরাত' ইসলামের ভিত্তি। কাজেই সে যখন সার্বিকভাবে ইসলাম চর্চা করে তার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ তার ফিতরাতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়।

যখন এটা ঘটে, মানুষ তার অন্তরাত্মার সাথে বাইরের সত্তাকে একীভূত করে যা তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাওহীদের এ রূপের ফলাফল হলো আদমের ছাঁচে সত্যিকার ধার্মিক মানুষের সৃষ্টি, যার প্রতি আল্লাহ্ ফেরেশতাদের সিজদা করান এবং যাকে আল্লাহ্ পৃথিবী শাসন করার জন্য বাছাই করেছিলেন। কারণ, যে মানুষ তাওহীদের ওপর থাকে একমাত্র সেই সত্যিকার ন্যায়ভাবে পৃথিবী শাসন এবং বিচার করতে সক্ষম।

সপ্তম অধ্যায়

যাদু এবং শুভ-অশুভ সংকেত

তাওহীদের প্রথম অধ্যায়ে আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর সাথে মানুষের সকল সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বের স্রষ্টা ও সংরক্ষক এ উপলব্ধিকে তাওহীদ আর রুবুবিয়াহ্ (পালনকর্তার এককত্ব) বলা হয়েছিল। আল্লাহ্র আদেশে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি, সংরক্ষণ এবং সর্বশেষ ধ্বংস হবে। আল্লাহ্ই ভাল ভাগ্য ও মন্দ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। তথাপি, সর্বকালে মানুষ জিজ্ঞাসা করেছে, "ভাল সময় বা মন্দ সময় আসার পূর্বে কি কোনোভাবে জানার পন্থা আছে?" কারণ, যদি সময় আসার পূর্বেই জানার রাস্তা থাকতো, তাহলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হতো এবং সফলতা নিশ্চিত করা যেতো।

অতি প্রাচীনকাল থেকে এ গুপ্ত জ্ঞানের মধ্যে প্রবেশাধিকার রয়েছে বলে কিছু ব্যক্তি বিশেষ মিথ্যা দাবি করে আসছে এবং মানবকূলের মূর্খ জনগোষ্ঠী অঢেল অর্থ ব্যয় করে এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অংশ বিশেষ জানার জন্য তাদের চারদিকে ভিড় করছে। দুর্ঘটনা এড়ানোর কতিপয় কৌশল সাধারণ জ্ঞান হিসেবে পরিণত হয়েছে এবং সে জন্য ভাল ভাগ্যের তাবিজ কবজ ও জাদুমন্ত্রের প্রাচুর্য প্রায় সব সমাজেই পরিলক্ষিত হয়। একজনের ভাগ্য জানার জন্য কিছু কথিত গোপন পদ্ধতিও সাধারণ জ্ঞানে পরিণত হয়েছে এবং সেজন্য নানা ধরনের শুভ-অশুভ সংকেত এবং তাদের ব্যাখ্যা সকল সভ্যতায় পাওয়া যায়। অবশ্য এ জ্ঞানের কিছু গোপন অংশ ভাগ্য গণনা ও যাদুমন্ত্রের নানা ধরনের গুপ্তবিদ্যা হিসেবে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়েছে।

এ সব চর্চা সমাজে ব্যাপকভাবে সংঘটিত হবার কারণে এগুলোর বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ইসলামী ধারণা প্রকাশ করা অতীব জরুরী। সম্ভবত, আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে ঐ সব চর্চা প্রসঙ্গে ইসলামী আদেশ নিষেধ পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে একজন মুসলমান অতি সহজেই বড়

ধরনের শিরক-এর গুনাহর মধ্যে পড়তে পারে, যা এ সব চর্চার মূলে নিহিত। যে সব বিষয় আল্লাহর অদ্বিতীয় গুণাবলির (সিফাত) বিরোধিতা করে এবং সৃষ্টির উপাসনার (ইবাদত) উৎকর্ষ সাধন করে, সে সব বিষয়ে ইসলামী অবস্থান আরও বিস্তারিতভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হবে। কুরআন এবং রাসূলﷺ-এর সুন্নাহর অনুযায়ী প্রতিটি দাবি বিশ্লেষণ করা হবে এবং যারা আন্তরিকভাবে তাওহীদের বাস্তবতা খুঁজছেন তাদের জন্য প্রত্যেকটির ওপর ইসলামী নীতি প্রসঙ্গে নির্দেশাবলি পেশ করা হবে।

যাদুমন্ত্র

নবী করীমﷺ-এর সময় আরবদের মধ্যে শয়তান তাড়ানো এবং উত্তম ভাগ্য আনার জন্য বালা, চুড়ি, পুতির কণ্ঠহার, ঝিনুক ইত্যাদি কবচ হিসেবে ব্যবহারের প্রথা ছিল। বিশ্বের সকল অঞ্চলে নানা ধরনের তাবিজ ও মন্ত্রপূত কবচও দেখা যেতো। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর বর্ণনা অনুযায়ী যাদু, মন্ত্রপূত কবচ এবং তাবিজের মত সৃষ্টিকৃত বস্তুর ওপর শয়তান তাড়ানো এবং উত্তম ভাগ্য আনার ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর রুবুবিয়াহর (প্রতিপালকত্ব) ওপর বিশ্বাসের বিরোধিতা করে। ইসলাম এ জাতীয় বিশ্বাস প্রদর্শনের বিরোধিতা করে যা আরব দেশে শেষ নবীর সময় প্রচলিত ছিল।

এ বিরোধিতার ভিত্তি এমনভাবে স্থাপিত যে পরবর্তী সময়ে অনুরূপ বিশ্বাস ও প্রথা যখনই আবির্ভূত হবে তখনই তা বাতিল বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যাবে। এ জাতীয় বিশ্বাস মূলত: অধিকাংশই পৌত্তলিক সমাজে মূর্তিপূজার ভিত্তি প্রদান করে এবং যাদুমন্ত্র নিজেই মূর্তিপূজার একটি শাখার প্রতিনিধিত্ব করে। এ বিশ্বাস খ্রিস্টান ধর্মের ক্যাথলিক শাখায় সহজেই পরিলক্ষিত হয় যেখানে পয়গম্বর যিশুকে দেবত্ব প্রদান করা হয়েছে, তাঁর মা মেরী এবং দরবেশদের উপাসনা করা হয় এবং সৌভাগ্যের জন্য তাদের কথিত ছবি, মূর্তি এবং পদক রাখা ও পরা হয়।

নবী করীমﷺ-এর সময় যখন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করল তখনও তারা প্রায়ই যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস করতো, যা আরবি ভাষায় সমষ্টিগতভাবে 'তামাইম' (তামীমাহ্ একবচনে) বলে পরিচিত। ফলে, নবী করীমﷺ-এর বহু হাদীস রয়েছে যেখানে এ জাতীয় আচার শক্তভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিচে কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো–

ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তির বাহুতে দস্তার বালা দেখে তাকে বললেন, "দুর্ভাগ্য তোমার ওপর। এটা কী?" লোকটি জবাব দিল যে এটি দুর্বলতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য। নবী করীম ﷺ তখন বললেন, "এটা ফেলে দাও, কারণ এটা শুধু তোমার রোগই বাড়াবে ও বৃদ্ধি করবে এবং যদি তুমি এটা পরা অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর, তুমি কখনও সফলকাম হবে না।"

এভাবে রোগ এড়ানো যায় অথবা সারানো যায় এ বিশ্বাসে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বা স্বাস্থ্যবানদের তামা, দস্তা বা লোহার চুড়ি, বালা এবং আংটি পরা কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হারাম (নিষিদ্ধ) সামগ্রীর মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা ইসলামে নিষেধ; যে বিষয়ে নবী করীম ﷺ বলেছিলেন, "এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির রোগের চিকিৎসা কর, কিন্তু নিষিদ্ধ সামগ্রী দিয়ে রোগের চিকিৎসা করো না।"

আবু ওয়াকীদ আল-লেইথিও বর্ণনা দিয়েছেন যে, আল্লাহর নবী করীম ﷺ হুনাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ধাতু আনওয়াত নামে একটি গাছ পার হয়ে গেলেন। মূর্তিপূজারীরা সৌভাগ্যের জন্য এ গাছের ডালে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। ইসলামে নব দীক্ষিত কিছুসংখ্যক সাহাবা নবী করীমকে ﷺ-কে অনুরূপ একটি গাছ মনোনীত করে দিতে বললেন। নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন, "সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ প্রশংসিত হউক); এটা ঠিক সেই রকম হল যখন মূসার লোকেরা মূসাকে বলেছিল–

قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۔

অর্থাৎ, তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও একজন দেবতা বানিয়ে দাও'।

(সূরা–৭ আল আরাফ : আয়াত-১৩৮)

যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর নামে শপথ, তোমরা সবাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করবে।"

আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ সৌভাগ্যের প্রতীক স্বরূপ কোনো বস্তুর বিশ্বাস ও ব্যবহারই শুধু বাতিল করেননি, তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে, মুসলমানরা খ্রিস্টান ও ইহুদীদের অভ্যাসগুলো অনুসরণ করবে। মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হাদীস বহির্ভূত যিকির তাসবিহ ক্যাথলিকদের

জপমালার অনুকরণ। মিলাদ (রাসূলের জন্ম দিবস উদযাপন) যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসব পালনের অনুকরণ এবং অনেক মুসলমানের মধ্যে পীর ও সাধক এবং তাদের মধ্যস্থতায় বিশ্বাস, খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রথা থেকে আলাদা নয়। ইতিমধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে।

যারা মন্ত্রপূত কবচ পরে নবী করীম ﷺ তাদের ওপর আল্লাহর লা'নতের বিষয়টি আরো গুরুত্ব সহকারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। উকবা ইবনে আমির বর্ণনা দিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ একবার বলেছিলেন "আল্লাহ তাদের ওপর ব্যর্থতা এবং অশান্তি ঘটাক যারা নিজেরা মন্ত্রপূত কবচ পরে অথবা অন্যকে পরায়।" (আহমদ এবং আল-হাকিম কর্তৃক সংগৃহীত)

নবী করীম ﷺ-এর সাহাবাগণ যাদুমন্ত্র এবং মন্ত্রপূত কবচ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ-এর আদেশ কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন। ফলস্বরূপ, লিখিত অনেক ঘটনা দেখা যায়, যেখানে তাঁরা সমাজে এবং তাঁদের পরিবারের মধ্যে এগুলোর প্রচলন খোলাখুলিভাবে বিরোধিতা করেছেন। উরওয়াহ বর্ণনা দিয়েছেন যে, যখন সাহাবী হুযাইফা এক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যান তখন তিনি লোকটির বাহুতে একটি বালা বাঁধা দেখতে পান। তিনি ওটা টেনে ভেঙ্গে ফেললেন। তারপর হুযাইফা নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ -

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা শিরক করে।

(সূরা–১২ ইউসুফ : আয়াত-১০৬)

অন্য আর এক সময়, তিনি এক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বাহু স্পর্শ করে বাহুর চারদিকে একটি খিয়াত (দড়ি দিয়ে বাঁধা বালা) দেখতে পেলেন। যখন তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কী, লোকটি উত্তর দিল, "আমার জন্য বিশেষভাবে মন্ত্র পড়া একটি জিনিস।" হুযাইফা লোকটার বাহু থেকে তা ছিঁড়ে ফেলে বললেন, "তুমি যদি এটা বাহুতে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে, আমি তোমার জানাযা পড়াতাম না।"

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নাব বর্ণনা দেন যে, একদিন যখন ইবনে মাসউদ তার গলায় একটি রশির হার দেখে জিজ্ঞেস করলেন এটা কী, তখন

তিনি উত্তর দিলেন, "এটা আমাকে সাহায্য করার জন্য মন্ত্র পড়া একটা রশি।" তিনি তার গলা থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ্‌র পরিবারে শিরক-এর দরকার নেই।

আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই মন্ত্র, তাবিজ কবজ এবং যাদুমন্ত্র শিরক।" যয়নাব উত্তর দিলেন, "আপনি একথা কেন বলছেন? আমার চোখ স্পন্দিত হতো বলে অমুক ইহুদীর নিকট গমন করলে সে এর ওপর একটা মন্ত্র পড়ল এবং এতে স্পন্দন থেমে গেল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই এটা শুধু একটা শয়তানের হাতের খোঁচা, কাজেই তুমি যখন তাকে মন্ত্র দিয়ে বশ করেছ তখন সে ছেড়ে গেছে। নবী করীম ﷺ যেমন পাঠ করতেন এটা পড়াই তোমার জন্য যথেষ্ট হতো।

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا .

অর্থাৎ, হে মানবকুলের পালনকর্তা, দুর্ভোগ দূর কর এবং আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দাও যেহেতু তুমি প্রকৃত উপশমকারী। তোমার চিকিৎসা ব্যতীত অন্য কোনো চিকিৎসা নেই; যে চিকিৎসার পর রোগ হয় না।

যাদুর ওপর অভিমত

এ নিষেধাজ্ঞা পূর্বে উল্লেখিত আরব দেশীয় পদ্ধতির মন্ত্র পড়া, তাবিজ কবচ এবং যাদুমন্ত্র নবী করীম ﷺ যার বিরোধিতা করেছিলেন তার মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। যেখানেই কোনো সামগ্রী একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সেখানেই এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য। প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধিলাভ সত্ত্বেও বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে নানা প্রকারের যাদুমন্ত্র ব্যবহার অনেক বিস্তৃত। বহু তাবিজ কবচ প্রাত্যহিক জীবনে এমনভাবে গেঁথে গেছে যে, খুব স্বল্প সংখ্যক লোকই এ বিষয়ে চিন্তা করার জন্য একটু সময় ব্যয় করে। তথাপি যখন তাবিজ কবচের উৎস জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়, তখন এদের মূলে যে শিরক তা খুব পরিষ্কার হয়ে যায়। পশ্চিমা সমাজের দু'টি জনপ্রিয় তাবিজ কবচের দৃষ্টান্ত নিম্নে পেশ করা হলো।

খরগোশের পা

পাশ্চাত্যের কতিপয় লোক খরগোশের পিছনের থাবা অথবা সোনা এবং রূপার নকল থাবা সৌভাগ্যের কবচ হিসেবে গলার হারে এবং বালায় পরে। খরগোশের পিছনের পা দিয়ে মাটির উপর আঘাত করার অভ্যাস থেকে এ বিশ্বাসের উৎপত্তি। প্রাচীন কালের মানুষের মতে, খরগোশরা মাটি আঘাত করার সময় ভূ-গর্ভস্থ আত্মাদের সাথে কথা বলতো। এ কারণে আত্মাদের নিকট কারোর বাসনা জানানো এবং সাধারণভাবে সৌভাগ্য বহনের মাধ্যম হিসেবে খরগোশের পিছনের থাবা সংরক্ষণ করা হতো।

ঘোড়ার খুরের নাল

আমেরিকার অধিকাংশ ঘরের দরজায় ঘোড়ার খুরের নাল তারকাটা দিয়ে ঝুলানো রয়েছে। এছাড়াও খুরের নালার প্রতিকৃতি বালা, চাবির চেইন অথবা কণ্ঠহারে পরা হয় এ বিশ্বাসে যে, এরা কল্যাণ বয়ে আনবে। প্রাচীন গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে এ বিশ্বাসের উৎপত্তি পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসে ঘোড়াকে পবিত্র প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হতো। যদি কোনো ঘরের দরজায় ঘোড়ার খুরের নাল ঝুলিয়ে দেয়া হতো তাহলে এটা কল্যাণ বয়ে আনবে বলে মনে করা হতো। নালের খোলা দিক উপরের দিক করে রাখা হতো, যাতে ওটা কল্যাণকে আটকে রাখতে পারে। তারা বিশ্বাস করতো যে, যদি নালার খোলা দিক নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হয় তাহলে কল্যাণ বাইরে ঝরে পড়বে।

যারা যাদুমন্ত্র বিশ্বাস করে তারা সৃষ্টিকৃত বস্তুর ওপর দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্য যাদুমন্ত্রের ওপর স্বর্গীয় শক্তি প্রয়োগ করে। এভাবে যারা এ জাতীয় বিশ্বাস পোষণ করে তারা যুক্তি দেখায় যে, আল্লাহর সৃষ্টিজগতের মধ্যেই তাঁর রুবুবিয়াহ (প্রতিপালকত্ব) সীমিত। মূলত: তারা যাদুমন্ত্রকে আল্লাহর চেয়েও শক্তিশালী মনে করে। কারণ যে দুর্ভাগ্য আল্লাহ ভাগ্যে রেখেছিলেন তা যাদুমন্ত্র দ্বারা রোধ করা সম্ভব বলে তারা মনে করে। কাজেই যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস সুস্পষ্ট শিরক। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ পূর্বে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করেছেন। এ অভিমত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা আরও মজবুত হয়।

উশাবা ইবনে আমির বর্ণনা দেন যে, দশজন লোকের একটি দল নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি মাত্র নয়জনের আনুগত্যের শপথ (বায়াত)

গ্রহণ করলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর নবী! কেন আপনি শুধু আমাদের নয়জনের বাই'আত গ্রহণ করলেন এবং এ ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করলেন?" নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই তার নিকট মন্ত্র পড়া তাবিজ আছে? লোকটি তখন তার আলখিল্লার ভিতর হাত ঢুকিয়ে তাবিজটি বের করল এবং ভেঙ্গে ফেলল। যখন নবী করীম ﷺ তার বাই'আত গ্রহণ শেষ করলেন, তিনি মুখ ফিরালেন এবং বললেন, "যে কেউ তাবিজ পরে সে শিরক করে।"

কুরআনীয় তাবিজ কবচ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস এবং হুযাইফাহ এর মত সাহাবীগণ সকলেই কুরআন পড়া তাবিজ কবচ পরার বিরোধী ছিলেন। তাবেয়ীনদের (রাসূল ﷺ-এর সাহাবাদের ছাত্রগণ) মধ্যে কিছুসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি এ জাতীয় তাবিজের অনুমোদন দিয়েছেন কিন্তু অধিকাংশই এর বিপক্ষে। অথচ পূর্বোক্ত হাদীসের মূল পাঠ্যাংশে কুরআনীয় তাবিজ বা সাধারণ তাবিজের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি এবং নবী করীম ﷺ কুরআনের আয়াত নিজের দেহে রেখেছেন বা অন্যকে রাখার অনুমতি দিয়েছেন বলে আমাদের নিকটও কোনো দলিল নেই।

কুরআনীয় তাবিজ কবচ দেহে রাখা এবং নবী করীম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত শয়তান এড়ানো এবং বান ও যাদু ভেঙ্গে ফেলার পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী। সুন্নাহ হলো শয়তান নিকটবর্তী হলে কুরআনের কিছু সংখ্যক সূরা (১১৩ তম এবং ১১৪ তম সূরা ফালাক ও নাস) এবং আয়াত (যথা– আয়াতুল কুরসী সূরা–২ বাক্বারা : আয়াত-২২৫) তিলাওয়াত করা। কুরআন থেকে কল্যাণ হাসিলের একমাত্র নির্দেশিত পন্থা হলো কুরআন তিলাওয়াত করা এবং বাস্তবায়ন করা। নবী করীম ﷺ বলেন, "যে কেউ আল্লাহর কিতাব থেকে একটি অক্ষর পাঠ করবে সে একটি নেকী অর্জন করবে এবং প্রত্যেকটি নেকীর মূল্য তার দশ গুণ হবে। আমি বলছি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর।"

তাবিজের মধ্যে কুরআন পুরে দেহে রাখা, একটি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে একজন ডাক্তার কর্তৃক প্রেসক্রিপশন (ব্যবস্থাপত্র) দেয়ার মত। প্রেসক্রিপশন পড়ে এবং এর থেকে ওষুধ প্রাপ্তির পরিবর্তে, সে এটাকে একটা বলের মত

গোল করে একটি থলিতে ভর্তি করে এবং তার গলায় ঝুলায় এ বিশ্বাসে যে, এটা তাকে সুস্থ রাখবে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন কুরআন পড়া তাবিজ কবচ পরে এ বিশ্বাসে যে, এতে ভূতপ্রেত এড়ান যাবে এবং কল্যাণ আসবে ততক্ষণ সে আল্লাহ্ যা ইতিমধ্যে পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছেন তা বাতিল করার জন্য সৃষ্টির কিছু অংশকে ক্ষমতা প্রদান করে। ফলশ্রুতিতে, সে আল্লাহ্র পরিবর্তে এ তাবিজ কবচের ওপর নির্ভর করে। এটাই হলো মন্ত্রপূত তাবিজ কবচ থেকে উদ্ভূত শিরক এর সারাংশ যা নিচের বর্ণনা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

ঈসা ইবনে হামজা বলেন "আমি একদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে উকাইমের সাথে দেখা করতে এসে তার সাথে হামজাকে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি তামীমাহ (তাবিজ) পর না?" সে উত্তর দিল "আল্লাহ্ আমাদের ঐসব থেকে আশ্রয় দিন। তুমি কি জান, না আল্লাহ্র নবী ﷺ বলেছেন, "যে কেউ কণ্ঠহার বা বালা পরে, সে তার ওপর নির্ভর করে।"

লকেটের মধ্যে ভরে পরার জন্য খালি চোখে পড়া যায় না এমন ক্ষুদ্রাকার কুরআন প্রকাশ শিরককে ডেকে আনে। একইভাবে, অতি ক্ষুদ্র, কার্যত দুষ্পাঠ্য, ছাপার অক্ষর দিয়ে লেখা আয়াতুল কুরসী গহনা হিসেবে পরাও শিরক উৎসাহিত করে। যারা শুধু শোভাবর্ধনের জন্য এ জাতীয় গহনা পরে তারা শিরক করে না। কিন্তু অধিকাংশই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য পরে এবং এ কারণে এ সব কাজ তাওহীদের ইসলামি মূল তত্ত্বের পরিপন্থী শিরক বিষয়ের শামিল হয়ে যায়।

কুরআনকে কল্যাণকর যাদুমন্ত্র হিসেবে মুসলমানকে ব্যবহার করা থেকে সতর্কতার সাথে পাশ কেটে যেতে হবে। বিধর্মীরা যেভাবে নানা রকমের তাবিজ কবচ এবং মন্ত্রপূত বালা ব্যবহার করে ঐভাবে গাড়িতে, চাবির চেইনে, বালার কণ্ঠহারে এ সব ঝুলিয়ে রেখে তারা শিরক-এর দরজা খুলে দেয়। সুতরাং, যে সব বিশ্বাসের কারণে তাওহীদের বিশুদ্ধ ধারণা হরণ হয়ে যায়, ঐ জাতীয় বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ করতে সচেতন প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

শুভ-অশুভ সংকেত

প্রাক-ইসলামি আরব দেশের লোকেরা পাখি ও প্রাণীর চলাচলের গতিপথকে আশু সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের সংকেত বলে ধারণা করতো। এ জাতীয়

সংকেতের ওপর নির্ভর করে তারা তাদের জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতো। পাখি ও প্রাণীদের গতিবিধির ওপর শুভ অথবা অশুভ সংকেত নির্ণয়ের প্রথাকে আরবি ভাষায় 'তিয়ারা' বলা হতো যা 'তারা' ক্রিয়াপদ থেকে গৃহীত এবং যার অর্থ "উড়াল দেয়া"। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তির যাত্রা আরম্ভের সময় একটি পাখি তার ওপর দিয়ে উড়ে বাম দিকে চলে যেত, তাহলে সে এটাকে আশু দুর্ভাগ্যের সংকেত ধারণা করে ঘরে ফিরে যেতো। ইসলাম এ প্রথাগুলো বাতিল করেছে। কারণ এগুলো তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাত এর মূলকে ক্ষয় করে ফেলে। কারণ এ প্রথাগুলো–

১. ইবাদতের প্রক্রিয়া যাকে নির্ভরশীলতা (তাওয়াক্কুল) বলা হয় তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য দিকে পরিচালিত করে এবং

২. ভাল ও মন্দ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়তি এড়ানোর ক্ষমতা মানুষের অথবা সৃষ্ট জিনিসের ওপর অর্পণ করে।

যে ভিত্তির ওপর তিয়ারার নিষিদ্ধকরণ প্রতিষ্ঠিত তাহলো নবী করীম ﷺ-এর নাতি হুসাইন বর্ণিত একটি হাদীস; যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যে কেউ তিয়ারা করে অথবা তার নিজের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছে অথবা কাউকে সম্মোহিত করেছে, সে আমাদের একজন নয়।" এখানে 'আমাদের' বলতে মুসলিম সমাজকে বুঝানো হয়েছে। অতএব তিয়ারা এমন একটি কাজ যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন একজনকে ইসলামের বহির্ভূত করে দেয়। মু'আবিয়াহ ইবনে আল হাকিম থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদিসে নবী করীম ﷺ তিয়ারার ফলাফল বাতিল করে দিয়েছেন। মু'আবিয়াহ নবী করীম ﷺ বললেন "আমাদের মধ্যে কতিপয় লোক আছে যারা পাখির শুভ অশুভ সংকেত মেনে চলে।"

নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন "এটা তোমরা নিজেরাই তৈরি করেছ। সুতরাং এটা যেন তোমাদেরকে থামিয়ে না দেয়।" অর্থাৎ তুমি যা করতে চাও এটা যেন তোমাকে তা করতে বাধা না দেয়। কারণ এ সব সংকেত মানুষের কল্পনা প্রসূত বানানো কাহিনী যার কোন বাস্তবতা নেই। এতদানুসারে, আল্লাহর নবী ﷺ সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করেছেন যে, মহিমাময় আল্লাহ্ পাখিদের উড়ার গতিপথকে কোনো কিছুর সংকেত হিসেবে ঘোষণা দেননি। তাদের গতিবিধির কারণে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় এ প্রাক-ইসলামী ধারণার সাথে

কোনো ঘটনার মিল পাওয়া গেলেও কোনো সফলতা অথবা দুর্ঘটনা তাদের উড্ডয়নের গতিপথের কারণে হয় না।

সাহাবাগণ (নবী করীম ﷺ-এর সহচরবৃন্দ) নিজেদের এবং ছাত্রদের মধ্যে যখনই কেউ পাখির সংকেতের ওপর বিশ্বাস প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন তখনই তা শক্তভাবে বাতিল করে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইকরিমাহ বলেন, "একদিন আমরা কয়েকজন ইবনে আব্বাসের সাথে বসেছিলাম। এমন সময় একটি পাখি আমাদের ওপর দিয়ে উড়ে গেল এবং কর্কশ তীক্ষ্ণ শব্দ করল। দলের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে বলে উঠল, 'শুভ, শুভ'। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁকে কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন এ বলে, "এর মধ্যে কোনো ভাল বা মন্দ নেই।" অনুরূপভাবে, তাবেয়ীগণ (সাহাবাদের ছাত্ররা) তাদের নিজস্ব ছাত্রগণ কর্তৃক প্রকাশিত শুভ-অশুভ সংকেত প্রসঙ্গে যাবতীয় বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাউজ তাঁর এক বন্ধুর সাথে যখন যাত্রাপথে ছিলেন, একটি কাক কর্কশ তীক্ষ্ণ শব্দ করে ওঠে এবং তার সহযাত্রী বলেন, 'শুভ'। তাউজ জবাব দিলেন, "ওতে শুভ কি আছে? তুমি আর আমার সাথে যেয়োনা।"

সহীহ আল-বুখারী শরীফের হাদীসে অবশ্য রাসূল ﷺ-এর নাম করে একটি বর্ণনা দেয়া হয়েছে যার মানে পারতপক্ষে সন্দেহপূর্ণ; "তিনটি জিনিসের মধ্যে শুভ অশুভ সংকেত আছে : নারী, পিঠে চড়া যায় এমন প্রাণী এবং ঘরবাড়ি।" আয়েশা এ বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন এ বলে, " যিনি আবুল কাশেমের ওপর ফোরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন তাঁর কসম, যে ব্যক্তি এ বর্ণনা দিয়েছে সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, যে মূর্খ ব্যক্তিবর্গ বলতো, "নিশ্চয়ই নারী, ঘরবাড়ি এবং বোঝা বহনকারী প্রাণীদের মধ্যে তিয়ারা (অশুভ সংকেত) রয়েছে।" তারপর তিনি (আয়েশা রা) কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন–

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ـ

অর্থাৎ, যমীনে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপদ আসে আমি উহা সংঘটিত করার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে।

(সূরা–৫৭ আল হাদীদ : আয়াত-২২)

হাদীসটি নির্ভরযোগ্য কিন্তু অন্য আর একটি বর্ণনা থেকে এর আরও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া যায়– যদি অশুভ সংকেত বলে কিছু থাকতো, তাহলে সেগুলো ঘোড়া, নারী এবং বাস করার স্থানে থাকতো। অতএব নবী করীম ﷺ অশুভ সংকেতের অস্তিত্ব সমর্থন ও অনুমোদন করেননি। বাস্তবে যদি কিছু থাকতো তাহলে যে সব ক্ষেত্রে এটা ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকতো, তিনি শুধু তারই উল্লেখ করতেন।

ঐ সময় মানুষের জীবনে ঐ তিনটি বস্তু বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিধায় ঐ তিনটি নামের সাথে বারবার দুর্ঘটনা ঘটার সম্পৃক্ততা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে তাদের মালিকানা গ্রহণ অথবা তাদের মধ্যে প্রবেশ করার সময় নবী করীম ﷺ বিশেষ ধরনের আশ্রয় গ্রহণের সালাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ একজন নারীকে বিবাহ কর অথবা একটি চাকরের সেবা ক্রয় কর তা হলে তা চূর্ণকুন্তল (মাথার সামনের চুল) ধর, সর্ব মহিমান্বিত আল্লাহর নাম উল্লেখ কর, আশীর্বাদ প্রার্থনা কর, তারপর পড়–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট থেকে তার সর্বোত্তম অংশ চাই যা তুমি তার স্বভাব ধর্মের অংশ হিসেবে তৈরি করেছো। আমি তোমার নিকট তার অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করি, যে অনিষ্ট তার স্বভাব ধর্মের অংশ হিসেবে দিয়েছ।

যদি সে একটি উট কিনে তাহলে তাকে উটের কুঁজের সর্বোচ্চ অংশ ধরে এবং অনুরূপভাবে বলতে বল’। এরও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, “যদি কেউ ঘরে প্রবেশ করে তবে তার পড়া উচিত–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ.

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নিখুঁত বাণীর আশ্রয় চাচ্ছি, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন উহার অনিষ্ট থেকে।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যেখানে আপাত দৃষ্টিতে শুভ-অশুভ সংকেতকে সমর্থন করা হয়েছে বলে মনে হয়। আনাস ইবনে মালিক ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, "একদিন এক নারী আল্লাহর রাসূলﷺ-এর নিকট আসল এবং বলল, 'হে আল্লাহর নবী করীম ﷺ! একটি বাড়ী ছিল যাতে অনেক অধিবাসী ছিল এবং তাদের অঢেল ধনসম্পদ ছিল। তারপর তাদের সংখ্যা কমতে থাকে এবং ধনসম্পদ অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা কি এটাকে পরিত্যাগ করতে পারি?" নবী করীমﷺ উত্তর দিলেন "পরিত্যাগ কর, কারণ এর ওপর আল্লাহর লা'নত রয়েছে।

নবী করীমﷺ তাদের জানালেন যে বাড়িটি ছেড়ে দেয়াটা কোন ধরনের তিয়ারা নয়; কারণ দুর্ঘটনা এবং নিশ্চয়তার কারণে মানসিকভাবে তাদের নিকট বাড়িটি একটি বোঝা হয়ে গিয়েছিল। এটি একটি স্বভাবগত অনুভূতি যা আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে দিয়েছেন। যখনই মানুষ কোনো বস্তু থেকে দুর্ঘটনা অথবা দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন বস্তুটি বাস্তবে কোনো দুর্ভাগ্য না ঘটালেও ঐ লোকটির বস্তুটি অপছন্দ করার প্রবণতা হয় এবং এর যতদূরে সরে যাওয়া সম্ভব ততদূরে চলে যেতে চায়।

এটা আরও খেয়াল রাখতে হবে যে, এ অনুরোধটি করা হয়েছিল তাদের ওপর দুর্ঘটনা সংঘটিত হবার পূর্বে নয়, পরে। দুর্ঘটনা সংঘটিত হবার কারণে কোনো একটি স্থান অথবা লোকদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পতিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা সঠিক হবে। লা'নত বর্ষিত হবার অর্থ এই যে, তারা যে সব অপরাধে লিপ্ত ছিল তার জন্য তারা আল্লাহ্ কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল। অনুরূপভাবে, যা কিছু দ্বারা সৌভাগ্য এবং সফলতা অর্জন করা হয় মানুষের ঐ সব কিছুকে ভালবাসার এবং তাদের কাছাকাছি হবার প্রবণতা দেখা দেয়।

এ অনুভূতি স্বয়ং তিয়ারা নয়, যদিও এটা অপাত্রে রাখা হয় তবুও তিয়ারা এবং শিরক ঘটাতে পারে। যখন কোনো ব্যক্তি বিশেষ অন্যদের জন্য দূর্ঘটনার কারণ হয়েছিল এমন স্থান এবং বস্তু আড়াল করার চেষ্টা করে অথবা যখন অন্যরা যেগুলোর মধ্যে কল্যাণ পেয়েছিল সেগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করে তখন তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে (সে শিরকের দিকে ধাবিত হয়)। সে ঐ স্থান এবং বস্তুগুলোকে কল্যাণ এবং দুর্ভাগ্যের প্রতীক হিসেবে নেয় এবং এমনকি এক পর্যায়ে সে সেখানে কিছু উপাসনার কাজও সমাধা করতে পারে।

ফা'আল (শুভ সংকেত)

আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা দেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "সংক্রমণ অথবা তিয়ারা বলে কিছু নেই, কিন্তু আমি ফা'আল পছন্দ করি।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে ফা'আলা কি?" উত্তরে তিনি বললেন, "একটি ভাল শুভ শব্দ।" বস্তুর মধ্যে অশুভ সংকেতের স্বীকৃতি আল্লাহ্ প্রসঙ্গে খারাপ ধারণা পোষণ এবং শিরক সম্পর্কিত ধারণার উপস্থিতি প্রকাশ করে।

যদিও শুভ সংকেত বিশ্বাসের মধ্যে আল্লাহর দিকে ঝোঁকার প্রবণতা বিদ্যমান তবুও সৃষ্ট বস্তুর ওপর স্বর্গীয় ক্ষমতা আরোপের কারণে শিরক ঘটে। এ কারণে নবী করীম ﷺ ফা'আল, একটি শুভ সংকেত, পছন্দ করার কথা প্রকাশ করায় সাহাবাগণ অবাক হয়েছিলেন। যা হোক, নবী করীম ﷺ তাদের জন্য ইসলামীভাবে গ্রহণীয় ফা'আলের সীমিত রূপ নির্দেশ করেছেন। এটা হল আশাবাদী শব্দের ব্যবহার। যে রকম রোগ হলে একজনকে 'সালিম' (ভাল থাকা) অথবা কিছু হারিয়ে গেলে একজনেক 'ওয়াজিদ' (যে খুঁজে বেড়ায়) নামে আহ্বান করা। এগুলো এবং অনুরূপ শব্দাবলি হতভাগ্যদের মধ্যে প্রত্যাশা এবং আশা পুনরুদ্ধার করে এবং শুভ অনুভূতি সৃষ্টি করে। বিশ্বাসীদের সকল সময় আশাবাদী হওয়া আবশ্যক।

শুভ-অশুভ সংকেত প্রসঙ্গে ইসলামের অভিমত

পূর্ববর্তী হাদীস থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে, তিয়ারা হচ্ছে শুভ-অশুভ সংকেতের ওপর সাধারণ বিশ্বাস স্থাপন। পাখীর গতিবিধি থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করার বিধান রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ্ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। প্রাচীনকালে আরব দেশের লোকেরা পাখী থেকে সংকেত গ্রহণ করেছে এবং অন্যান্য জাতি অন্যত্র থেকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে নীতিনিয়ম একই। যখন এ সব সংকেতের উৎস চিহ্নিত করা যায়, তখন প্রায়ই তাদের মধ্যে শিরক-এর উপস্থিতি খুব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বর্তমানে পশ্চিমা সমাজে প্রচলিত অসংখ্য শুভ-অশুভ সংকেতের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

কাঠে টোকা দেয়া

যখন কেউ কোন কিছুর জন্য কৃতজ্ঞ হয় এবং আশা করে যে তার ভাগ্য পরিবর্তন করা হবে না তখন সে বলে "কাঠে টোকা দাও" এবং টোকা দেবার উদ্দেশ্যে চারদিকে এক টুকরা কাঠের জন্য তাকায়। এ বিশ্বাসের

ভিত্তি হচ্ছে অতীতে ইউরোপের মানুষ ধারণা পোষণ করতো যে, দেবতারা বৃক্ষের ভিতর বাস করে। গাছ দেবতার নিকট থেকে অনুগ্রহ হাসিলের জন্য তারা গাছ স্পর্শ করতো। তাদের ইচ্ছা পূরণ হলে দেবতাদের ধন্যবাদ জানাবার জন্য তারা পুনরায় গাছ স্পর্শ করতো।

লবণ উল্টো পড়া

অনেকে বিশ্বাস করে যে লবণ উল্টে পড়লে অচিরেই দুর্ঘটনা আসবে। সে কারণে এটাকে প্রতিহত করার জন্য সে বাম কাঁধের উপর দিয়ে লবণ ছুঁড়ে দেয়। এ সংকেতের উৎস হলো লবণের জিনিস তাজা রাখার ক্ষমতা। এর যাদুকরী শক্তির কারণে প্রাচীন কালের মানুষ এ বিশ্বাস করতো। এভাবে, উল্টে পড়া লবণ অশুভ ঘটনার জন্য সতর্ক সংকেত হয়ে যায়। যেহেতু অশুভ আত্মা একজনের বাম দিকে বাস করে বলে মনে করা হতো, উল্টে পড়া লবণ বাম কাঁধের উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়াটা অশুভ আত্মাকে সন্তুষ্টি করার প্রতীক।

আয়না ভাঙ্গা

অনেকে বিশ্বাস করে যে, আকস্মিকভাবে একটি আয়না ভেঙ্গে টুকরা হওয়া সাত বৎসরের জন্য দুর্ভাগ্য আগমনের লক্ষণ। প্রাচীনকালের মানুষ ধারণা করতো যে পানির উপরে প্রতিবিম্ব তাদের আত্মার। কাজেই তাদের প্রতিবিম্ব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলে (যেমন, পানিতে কেউ ঢিল ছুঁড়লে) তাদের আত্মাও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আয়না উদ্ভাবিত হবার পর এ বিশ্বাস আয়নার ওপর আরোপিত হয়।

কালো বিড়াল

অনেকের ধারণা একটি কালো বিড়াল একজনের সামনে দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছে তার ওপর দুর্ভাগ্য আসার সংকেত। এ বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে মধ্যযুগে যখন মানুষ বিশ্বাস করতো যে কালো বিড়াল ডাইনীদের পোষা প্রাণী। ডাইনীরা কালো বিড়ালের মগজের সাথে ব্যাঙ, সাপ এবং পোকামাকড়ের দেহের অংশ মিশিয়ে মোহিনী (যাদুর) চোলাই শরবত প্রস্তুত করতো বলে মনে করা হতো। চোলাই শরবত এড়িয়ে কোনো বিড়াল সাত বৎসর জীবিত থাকলে বিড়ালটি ডাইনী হয়ে যেত বলে ধারণা করা হতো।

তের নম্বর সংখ্যা

আমেরিকায় সংখ্যা ১৩ অকল্যাণকর বলে গণ্য করা হয়। এজন্য বহু দালানের ১৩তম তলাকে ১৪তম তলা বলা হয়। ১৩ তারিখের 'শুক্রবারকে বিশেষ করে অকল্যাণকর বলে মনে করা হয়। অধিকাংশ মানুষ এ দিনে ভ্রমণ করা অথবা বিশেষ কোনো দেখা সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলে। ঐ দিন তাদের ক্ষতিকর কিছু হলে তৎক্ষণাৎ ঐ দিনকে দায়ী করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭০ সালের এ্যাপোলো চন্দ্র অভিযান, যা প্রায় দুর্ঘটনার কাছাকাছি পৌঁছে ছিল, তার ফ্লাইট কমান্ডার প্রত্যাবর্তন করার পর ব্যাখ্যা দেন যে কিছু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে তা তার জানা দরকার ছিল। তাঁকে যখন কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি উত্তর দিলেন যে ১৩ তারিখ শুক্রবার ১৩.০০ ঘটিকার (অর্থাৎ একটার সময়) উড্ডয়ন সংঘটিত হয় এবং ফ্লাইট নম্বর ছিল এ্যাপোলো ১৩।

এ বিশ্বাসের উৎপত্তি হচ্ছে বাইবেলে বর্ণিত যীশুর শেষ নৈশ ভোজের ঘটনা থেকে। যিশুখ্রিস্টের শেষ নৈশভোজে ১৩ জন হাজির ছিলেন। ১৩ জনের মধ্যে একজন হলো জুডাস, যে লোক যিশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বলে মনে করা হয়। অন্ততঃপক্ষে দুটি কারণে ১৩ তারিখ শুক্রবারকে বিশ্বাস করে অকল্যাণকর মনে করা হয়। প্রথম, শুক্রবার যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার কথা ছিল, এবং মধ্যযুগীয় বিশ্বাস হিসেবে শুক্রবার হলো ঐ দিন যে দিন ডাইনীরা তাদের সভায় একত্রিত হতো।

এসব বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহর ভাল এবং মন্দ ঘটাবার ক্ষমতা তাঁর সৃষ্টির সাথে ভাগাভাগি করা হয়। দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং সৌভাগ্য প্রাপ্তির আশা, যা শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর আরোপ করা উচিত, তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুতে আরোপ করা হয়। ভবিষ্যৎ এবং অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানও দাবি করা হয় অথচ এ বৈশিষ্ট্যমূলক গুণাবলি শুধু আল্লাহর। আল্লাহ তা'আলা তাঁর গুণাবলির মধ্যে স্পষ্টভাবে নিজেকে "আলিম আল গাইব, (অজানা প্রসঙ্গে জ্ঞান সম্পন্ন) বলে উল্লেখ করেছেন। এমনকি আল্লাহ কুরআনে কারীমে রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে ঘোষণা দিলেন–

وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ـ

অর্থাৎ, অদৃশ্য গায়েব প্রসঙ্গে জানলে আমি সকল দুর্ঘটনা এড়িয়ে যেতে পারতাম। (সূরা–৭ আরাফ : আয়াত-১৮৮)

অতএব তাওহীদের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শুভ-অশুভ সংকেতে বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে শিরক-এর শ্রেণীভুক্ত করা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আরও একটি হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণ করা যায় যেখানে আল্লাহর নবী করীম ﷺ বলেছেন, "তিয়ারা শিরক, তিয়ারা শিরক, তিয়ারা শিরক।" আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আসও বর্ণনা দিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যে কেউ তিয়ারার কারণে কিছু করা থেকে বিরত হলো, সে শিরক করল।" সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "এর প্রায়শ্চিত্ত কি?" তিনি উত্তর দিলেন, বল–

اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ اِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

"অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তুমি প্রদত্ত কল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো কল্যাণ নেই এবং তুমি প্রদত্ত পাখী ছাড়া পাখী নেই এবং তুমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নাই।"

পূর্ব বর্ণিত হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট দেখা যায় যে, তিয়ারা কোনোভাবেই শুধু পাখীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সকল ধরনের শুভ-অশুভ সংকেতে অন্তর্ভুক্ত। স্থান থেকে স্থানে, সময় থেকে সময়ে এ বিশ্বাসগুলোর রূপ পরিবর্তিত হলেও এ সব শিরক এর ভিত্তি এক।

অতএব মুসলমানরা এ সকল বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত সকল অনুভূতি সযত্নে এড়িয়ে যেতে নীতিগতভাবে বাধ্য। যদি তারা দেখে যে, এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা অচেতনভাবে কোনো কাজ করছে, তাহলে তাদের আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত এবং পূর্বে বর্ণিত দু'আ (প্রার্থনা) পড়া উচিত। এ বিষয়ে এত বাড়াবাড়ি করা তাৎপর্যহীন মনে হতে পারে।

অবশ্য ইসলাম এসব বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ এ জাতীয় ছোট শিরক-এর বীজ থেকেই বড় শিরক জন্ম নেয়। প্রতিমা, মানুষ, নক্ষত্র ইত্যাদি পূজা একই সময়ে আসে নি। এ জাতীয় পৌত্তলিকতা দীর্ঘদিন যাবত ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়েছে। যখন গুরুত্বপূর্ণ শিরক-এর শিকড় গজিয়ে ওঠে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন মানুষের মধ্যে আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাস ধারাবাহিকভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে। এভাবে, শয়তানের বীজ শিকড় গজানোর এবং মুসলমানদের বিশ্বাসের ভিত্তি ধ্বংস করার পূর্বেই উপড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করার লক্ষ্যে ইসলাম মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়।

অষ্টম অধ্যায়

ভাগ্য গণনা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, মানবজাতির মধ্যে অনেকে আছে যারা অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করে। তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন, গণক, পূর্বাভাষদাতা, ভবিষ্যৎ বক্তা, দৈববাণী প্রকাশক, পূর্ব-পরিজ্ঞেয়ক, দৈবজ্ঞ, যাদুকর, জ্যোতিষী, হস্তরেখা বিশারদ ইত্যাদি। গণকরা নানা পদ্ধতি এবং মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্যাদি বের করে আনার দাবি করে। যার মধ্যে রয়েছে : চায়ের পাতা পড়া, রেখা অংকন, সংখ্যা লেখা, স্ফটিক বলের প্রতি দৃষ্টিপাত হস্তরেখা-পড়া, রাশিচক্র পরীক্ষা করা, হাড়গোড় ছড়ি ছোড়া (লাঠি চালনা) ইত্যাদি। আলোচ্য অধ্যায়ে ভাগ্য গণনার বিভিন্ন কৌশল আলোচিত হবে।

গুপ্তবিদ্যা পেশাজীবীগণ যারা অদৃশ্য প্রকাশ করতে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম বলে দাবি করে তাদের প্রধানত : দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

১. যাদের সত্যিকার কোনো জ্ঞান বা গুপ্ত বিষয় জানা নেই। কিন্তু সাধারণ ঘটনাবলি যা প্রায় অধিকাংশ লোকেরই ঘটে তাই তাদের খরিদ্দারদের বলে। তারা প্রায়ই নানা রকম অর্থহীন আচারানুষ্ঠান করে খরিদ্দারদের ধোঁকা দেয় এবং তারপর তারা পরিকল্পিতভাবে সাধারণ অনুমানগুলোই বলে। আবার কতিপয় লোকের গুটিকয়েক ভবিষ্যদ্বাণী যা সত্য হয় সেগুলো স্মরণ রাখার প্রবণতা দেখা যায় এবং যেগুলো সত্য হয় না তার অধিকাংশই তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

   এসব ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলোই মানুষের অবচেতন মনে হারিয়ে যায় এবং শুধুমাত্র কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সেগুলো মনে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উত্তর আমেরিকাতে প্রতি বৎসরের শুরুর দিকে প্রসিদ্ধ ভবিষ্যৎ বক্তাদের নানা ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করা একটি সাধারণ অভ্যাসে

পরিণত হয়েছে। ১৯৮০ সালের কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর এক জরিপে দেখা গেছে যে, ঐ সবের মধ্য সবচেয়ে নির্ভুল ভবিষ্যৎ বক্তার মাত্র ২৪ শতাংশ ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়েছিল।

২. দ্বিতীয় দলভুক্ত তারা যাদের জ্বীনের সাথে যোগাযোগ রয়েছে। এ দলটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এর সাথে সাধারণত শিরক এর মত গুরুতর গুনাহ্ জড়িত। যারা এ কাজে জড়িত তাদের তথ্যাদি অতি নির্ভুল হয় এবং এভাবে মুসলমান এবং বিধর্মী উভয়ের মধ্যে একইভাবে সত্যিকার ফিতনা (প্রলোভন) সৃষ্টি হয়।

জ্বীনের জগৎ

কতিপয় মানুষ জ্বীন এর বাস্তবতা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। জ্বীন প্রসঙ্গে কুরআনের একটি সম্পূর্ণ সূরা, সূরা আল জ্বীন (৭২ নং সূরা) নাযিল হয়েছে ক্রিয়াপদ জান্না, ইয়াজুন্নু : যে গুলোর অর্থ অন্তরালে রাখা, আত্মগোপন করা অথবা ছদ্মবেশ পরানো ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত জ্বীন শব্দে আক্ষরিক অর্থের ওপর নির্ভর করে তারা দাবি করে যে জ্বীন হচ্ছে আসলে "চতুর বিদেশী"। অন্যেরা এমন দাবি করে যে, যাদের মগজে কোনো মন নেই এবং স্বভাবে অগ্নি প্রকৃতির তারাই জ্বীন। মূলত: জ্বীন আল্লাহর অপর একটি সৃষ্টি যারা এ দুনিয়ায় মানুষের সাথে অবস্থান করে। আল্লাহ্ মানবজাতি সৃষ্টির পূর্বে জ্বীন সৃষ্টি করেন এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির উপাদান থেকে ভিন্নতর উপাদানের সমষ্টি দিয়ে জ্বীন সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۔
وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ۔

অর্থাৎ, আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে। এবং এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জ্বীন অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ থেকে।

(সূরা–১৫ আল হিজর : আয়াত-২৬,২৭)

তাদের জ্বীন নামকরণ করা হয়েছে, কারণ তারা মানব জাতির চোখের অন্তরালে রয়েছে। ইবলিশ (শয়তান) জ্বীন জগতের, যদিও আল্লাহ্ যখন আদমকে সিজদা করার আদেশ করেছিলেন তখন সে ফেরেশতাদের মধ্যে

বসবাস করছিল। যখন সে সিজদাহ্ করতে নারাজ হলো এবং তাকে তার অবাধ্যতার কারণ জিজ্ঞেস করা হলো, সে বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন–

قَالَ اَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ -

অর্থাৎ, সে বলল আমি উহা থেকে শ্রেষ্ঠ। আপনি (আল্লাহ্) আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং উহাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।

(সূরা–৩৮ সোয়াদ : আয়াত-৭৬)

আয়েশা (রা) বলেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "ফেরেশতাদের আলো থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং জ্বীনদের ধূম্রবিহীন অগ্নি থেকে।

আল্লাহ্ আরও বলেন–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ -

অর্থাৎ, এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম আদমের প্রতি সিজদা কর, তখন সকলেই সিজদা করল ইবলিস ছাড়া, সে ছিল জ্বীনদের একজন। (সূরা–১৮ আল কাহফ : আয়াত-৫০)

অতএব তাকে প্রত্যাখ্যাত ফেরেশতা (Fallen Angel) অথবা ফেরেশতাদের একজন ধারণা করা ভুল হবে।

জ্বীনদের অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণত: তাদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। নবী করীম ﷺ বলেন,

"তিন প্রকার জ্বীন আছে : এক প্রকার যারা সারাক্ষণ আকাশে উড়ে, অন্য আর এক প্রকার যারা সাপ এবং কুকুর হিসেবে বিদ্যমান এবং পৃথিবীর ওপর বসবাসকারী আর এক প্রকার যারা এক স্থানে বাস করে অথবা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।"

বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে জ্বীনদের আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় : মুসলমান (বিশ্বাসীগণ) এবং কাফির (অবিশ্বাসীগণ)। আল্লাহ্ সূরা আল-জিন এ বিশ্বাসী জ্বীনদের প্রসঙ্গে বলেন–

ফর্মা–১৭; লেকচার সমগ্র

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ـ يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ـ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلاَ وَلَدًا ـ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ـ

অর্থাৎ, বল, আমার প্রতি প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বীনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে এবং বলেছে, আমরাতো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার কোনো শরীক স্থির করব না এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের পালনকর্তার মর্যাদা, তিনি গ্রহণ করেন নাই কোনো পত্নী এবং না কোনো সন্তান। এবং আরো এই যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ্ প্রসঙ্গে অতি অবাস্তব উক্তি করতো।" (সূরা–৭২ আল জ্বীন : আয়াত-১-৪)

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقَاسِطُوْنَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَـٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ـ وَأَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ـ

অর্থাৎ, আমাদের কিছু সংখ্যক আত্মসমর্পণকারী এবং কিছু সংখ্যক সীমা লংঘনকারী; যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নেয়। অপরপক্ষে সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।

(সূরা–৭২ আল জিন : আয়াত-১৪-১৫)

জ্বীনদের মধ্যে অবিশ্বাসীদের নানা নামে উল্লেখ করা হয় : ইফরিত, শয়তান, ক্বারিন, অপদেবতা, অশুভ আত্মা, আত্মা, ভূতপ্রেত ইত্যাদি। তারা নানা উপায়ে মানুষকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করে। যারাই তাদের কথা শ্রবণ করে এবং তাদের জন্য কাজ করে তাদেরকেই মানব শয়তান বলে উল্লেখ করা হয়। আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ـ

অর্থাৎ, এরূপে মানব ও জ্বীনের মধ্যে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি। (সূরা–৬ আল আন'আম : আয়াত-১১২)

প্রত্যেক মানুষের সাথে স্বতন্ত্র একজন করে জ্বীন রয়েছে যাকে ক্বারিন (সঙ্গী) বলা হয়। এটা মানুষের এ জীবনের পরীক্ষার অংশ বিশেষ। জ্বীনটি তাকে সর্বদা অবমাননাকর কামনা বাসনায় উৎসাহিত করে এবং সার্বক্ষণিকভাবে তাকে ন্যায়নিষ্ঠা থেকে অন্য দিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে। নবী করীম ﷺ এ সম্পর্ককে এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, "তোমাদের প্রত্যেককে জ্বীনদের মধ্য থেকে একজন সাথী দেয়া হয়েছে।" "সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "এমন কি আপনাকেও হে আল্লাহর রাসূল?" এবং নবী করীম ﷺ জবাব দিলেন, "এমন কি আমাকেও। তবে আল্লাহ্ আমাকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন এবং সে আত্মসমর্পণ করেছে। এখন সে আমাকে শুধু উত্তম কাজ করতে বলে।

নবুওয়াতের চিহ্ন হিসেবে নবী সুলায়মানকে (সলোমান) জ্বীনদের নিয়ন্ত্রণ করার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। আল্লাহ্ ঘোষণা করেন–

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ -

অর্থাৎ, সুলায়মানের সামনে একত্রিত করা হলো তার বাহিনীকে-জ্বীন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে।

(সূরা–২৭ আন নামল : আয়াত-১৭)

কিন্তু অন্য কাউকে এ ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। অন্য কাউকে জ্বীন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়নি এবং কেউ পারেও না। নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যথার্থই গত রাতে জ্বীনদের মধ্য থেকে একজন 'ইফরিত' আমার সালাত ভেঙ্গে দেবার জন্য থু থু নিক্ষেপ করেছিল। যাহোক আল্লাহ্ তাকে পরাভূত করতে আমাকে সাহায্য করেন এবং যাতে তোমরা সকালে তাকে দেখতে পার সে জন্য তাকে আমি মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলাম। অতঃপর আমার ভ্রাতা সুলাইমানের দোয়া মনে পড়ল : "হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ব্যতীত কেউ না হয়।"

মানুষ জ্বীনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম নয়; কারণ এ বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা শুধু নবী সুলায়মানকে দেয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, আছর অথবা

ঘটনাক্রমে ছাড়া জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ হওয়া অধিকাংশ সময়ই নিষিদ্ধ বা ধর্মদ্রোহী কাজের মাধ্যমেই হয়। এভাবে তলব করে আনা দুষ্ট জ্বীন তাদের সাথীদের গুনাহ্ করতে এবং স্রষ্টাকে অবিশ্বাস করতে সাহায্য করতে পারে। তাদের লক্ষ্য হলো স্রষ্টা ব্যতীত অথবা স্রষ্টার পাশাপাশি অন্যকে উপাসনা করার মত গুরুতর গুনাহ্ করতে যত বেশি জনকে পারা যায় তত জনকে আকৃষ্ট করা। একবার গণকদের সাথে যোগাযোগ এবং চুক্তি হয়ে গেলে, জ্বীন ভবিষ্যতের সামান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জানাতে পারে। নবী করীম ﷺ বর্ণনা দিয়েছেন "জ্বীনরা কীভাবে ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে সংবাদ সংগ্রহ করে।

তিনি বর্ণনা দেন যে, জ্বীনরা প্রথম আসমানের উপরে অংশ পর্যন্ত ভ্রমণ করতো এবং ভবিষ্যতের ওপর কিছু তথ্যাদি যা ফিরিশতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো তা শ্রবণ করতে পারতো। তারপর তারা দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে তাদের পরিচিত মানুষের নিকট ঐ তথ্যগুলো পেশ করতো। মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এ জাতীয় বহু ঘটনা সংঘটিত হতো এবং গণকরা তাদের তথ্য প্রদানে অত্যন্ত নির্ভুল ছিল। তারা রাজকীয় আদালতে আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এমনকি জগতের কতক অঞ্চলে তাদের পূজাও করা হতো।

নবী করীম ﷺ কর্তৃক ধর্ম প্রচার আরম্ভ করার পর থেকে অবস্থার পরিবর্তন হয়। আল্লাহ্ ফিরিশতাদের দিয়ে আসমানের নিচের এলাকা সতর্কতার সাথে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর থেকে অধিকাংশ জ্বীনদের উল্কা এবং ধাবমান নক্ষত্ররাজি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হতো। আল্লাহ্ এ বিস্ময়কর ঘটনা কুরআনের ভাষায় বর্ণনা দিয়েছেন–

وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاۤءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا . وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا .

অর্থাৎ, এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য জোগাড় করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কা পিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ; আর পূর্বে

আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণ করার জন্য বসতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত উল্কা পিণ্ডের সম্মুখীন হয়। (সূরা–৭২ আল জ্বীন : আয়াত-৮,৯)

আল্লাহ্ আরও ইরশাদ করেন–

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ . اِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ .

অর্থাৎ, প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি উহাকে রক্ষা করে থাকি; আর কেউ চুরি করে সংবাদ শ্রবণ করতে চাইলেও উহার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা। (সূরা–১৫ আল-হিজর : আয়াত-১৭,১৮)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "যখন নবী করীম (সা) এবং তাঁর একদল সাহাবা উকাজ বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন শয়তানদের ঐশী সংবাদ শ্রবণে বাধা দেওয়া হলো। উল্কাপিণ্ড তাদের উপর ছেড়ে দেয়া হলো। ফলে তারা তাদের লোকদের নিকট ফিরে এল। যখন তাদের লোকেরা জিজ্ঞেস করল কি হয়েছিল, তারা তাদের জানালো। কেউ কেউ পরামর্শ দিল যে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে, কাজেই তারা কারণ খুঁজে বের করার জন্য পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

তাদের কতিপয় নবী করীম ﷺ এবং তাঁরা সাহাবাগণ সালাতরত অবস্থায় দেখতে পেল এবং তারা তাদের কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করলো। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে, নিশ্চয় এটাই তাদের শোনায় বাধা প্রদান করেছিল। যখন তারা তাদের লোকদের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করল তখন তারা বলল–

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ يَّهْدِيْۤ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا .

অর্থাৎ, আমরাতো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। যা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার কোনো শরীক স্থির করব না। (সূরা–৭২ আল জিন : আয়াত-১-২)

এভাবে নবী করীম ﷺ কর্তৃক ধর্ম প্রচারের পূর্বে জ্বীনরা যেভাবে সহজে ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে সংবাদ জোগাড় করতো তা আর পারেনি। ঐ কারণে তারা এখন তাদের সংবাদের সাথে অনেক মিথ্যা মিশ্রিত করে। নবী করীম ﷺ বলেন, "যাদুকর অথবা গণকের মুখে না পৌঁছান পর্যন্ত তারা (জ্বীনরা) খবরাখবর নিচে ফেরত পাঠাতে থাকবে। কখনও কখনও তারা খবর চালান করার পূর্বেই একটি উল্কাপিন্ড তাদের আঘাত করবে। আঘাত প্রাপ্ত হবার পূর্বে পাঠাতে পারলে এর সাথে তারা একশটা মিথ্যা যোগ করবে।" আয়েশা (রা) বর্ণনা দেন যে তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর নিকট গণকদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন যে, "ওরা কিছু না।"

আয়েশা (রা) তখন উল্লেখ করলেন যে কোন কোন সময় গণকরা যা বলে তা সত্য হয়। নবী করীম ﷺ বললেন, " ওতে সত্যতার কিছু অংশ যা জ্বীনরা চুরি করে এবং তার বন্ধুর নিকট বলে; কিন্তু সে এর সঙ্গে একশটি মিথ্যা যোগ করে।"

একদিন উমর ইবনে খাত্তাব কোন এক স্থানে বসাবস্থায় একটি সুদর্শন লোক তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলে তিনি বললেন, "আমার যদি ভুল না হয়, এ লোকটি এখনও প্রাক-ইসলামি ধর্ম অনুসরণ করছে অথবা মনে হয় সে তাদের একজন গণক।" তিনি লোকটিকে তাঁর সামনে আনতে আদেশ করলেন এবং তিনি তাকে তার অনুমান প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি উত্তর দিল, "আমি আজকের মত আর কোন দিন দেখিনি যেদিন একজন মুসলমান এ জাতীয় অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছে। উমর (রা) বললেন, "অবশ্যই আমাকে তোমার অবহিত করা উচিত।"

লোকটি তখন বলল, "অজ্ঞতার যুগে আমি তাদের গণক ছিলাম।" ঐকথা শ্রবণ করে উমর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মহিলা জ্বীন তোমাকে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক কি বলেছে।" লোকটি তখন বলল, "একদিন, আমি যখন বাজারে ছিলাম, সে উদ্বিগ্ন হয়ে আমার নিকট এসেছিল এবং বলেছিল, "মর্যাদাহানি হবার পর তুমি কি জ্বীনদের হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখনি? তুমি কি দেখনি তাদেরকে (জ্বীনদেরকে) মাদি উট ও তাদের আরোহণকারীদের অনুসরণ করতে?" উমর বাধাদানপূর্বক বললেন, "এটা সত্য।

জ্বীনরা তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী মানুষকে আপাত: ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে জানাতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ একজন গণকের নিকট আসে, সে আসার পূর্বে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তা গণকের জ্বীন আগত লোকটির ক্বারিনের (প্রত্যেক মানুষের সাথে নিয়োজিত জ্বীন) কাছে থেকে জেনে নেয়। অতএব গণক লোকটিকে বলতে সক্ষম হয় যে, সে এটা করবে ওটা করবে অথবা অমুক অমুক স্থানে যাবে।

এ প্রক্রিয়ায় একজন সত্যিকার গণক অপরিচিত মানুষের অতীতও পরিপূর্ণভাবে জানতে সক্ষম হয়। সে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির পিতামাতার নাম, কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল এবং তার ছেলেবেলায় আচরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলতে সক্ষম হয়। অতীত প্রসঙ্গে পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা দেবার ক্ষমতা জ্বীন এর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এমন একজন খাঁটি গণকের একটি চিহ্ন। কারণ জ্বীন ক্ষণিকের মধ্যে অনেক দূর গমন করতে এবং গোপন বিষয়, হারানো জিনিস, অদেখা ঘটনাবলি প্রসঙ্গে বহু তথ্যাদি জোগাড় করতেও সক্ষম।

কুরআনে বর্ণিত নবী সুলায়মান এবং সাবার রাণী বিলকিসের গল্পের মধ্যে এ ক্ষমতার সত্যতা পাওয়া যায়। যখন রাণী বিলকিস তাঁকে দেখতে এলেন, তিনি একটি জ্বীনকে রাণীর দেশ থেকে সিংহাসন নিয়ে আসতে আদেশ করলেন–

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَاْ اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ـ

অর্থাৎ, এক শক্তিশালী জ্বীন বলল, "আপনি আপনার স্থান থেকে উঠবার পূর্বে আমি উহা এনে দেব এবং এ বিষয়ে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।

(সূরা–২৭ আল-নামল : আয়াত-৩৯)

ভাগ্য গণনা প্রসঙ্গে ইসলামের অভিমত

প্রচলিত ধর্ম মতের বিরুদ্ধে অপবিত্র বিশ্বাস জড়িত থাকার কারণে ইসলাম ভাগ্য গণনার প্রতি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। যারা ভাগ্য গণনায় মাশগুল তাদের এ নিষিদ্ধ প্রথা পরিত্যাগ করার উপদেশ প্রদান ছাড়া তাদের সাথে যে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা ইসলাম বিরোধিতা করে।

গণক বা জ্যোতিষীর নিকট গমন করা

যে কোনো ধরনের গণক দর্শন প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ পরিষ্কারভাবে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হাফসা (রাসূলের স্ত্রী) থেকে সাফিয়্যা বর্ণনা দেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যদি কেউ গণকের নিকট যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে তাহলে চল্লিশ দিন ও রাত্রি পর্যন্ত তার সালাত গৃহীত হবে না। আলোচ্য হাদিসে বর্ণিত শাস্তি শুধুমাত্র গণকের নিকট গমন করার এবং তাকে কৌতুহল বশত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কারণেই। মু'আবিয়াহ্ ইবনে আল হাকাম আস-সালামীর দ্বারা এ নিষিদ্ধকরণ আরও সমর্থিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "হে আল্লাহর নবী করীম ﷺ নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার নিকট গমন করে।" নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন, "তাদের কাছে যাবে না।"

শুধুমাত্র গণকের নিকট গমন করার জন্য এ জাতীয় কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে কারণ এটা ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করার প্রথম পদক্ষেপ। এর বাস্তবতা প্রসঙ্গে সন্দিহান অবস্থায় কেউ যদি সেখানে যায় এবং গণকের কোনো ভবিষ্যবাণী সত্য হয়ে যায় তাহলে সে নিশ্চিতভাবে গণকের ভক্ত এবং ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি উৎসাহী বিশ্বাসী ব্যক্তি হয়ে যাবে। কোনো ব্যক্তি গণকের শরণাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও চল্লিশ দিন সময়কালের বাধ্যতামূলক সালাত আদায় করতে নীতিগতভাবে বাধ্য। যদিও সে তার এ সালাতের জন্য কোনো প্রতিদান পাবে না।

যদি সে সব সালাত ছেড়ে দেয় তাহলে সে আরও একটি গুরুতর অপরাধ করল। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামি আইনবিদদের মতে, এটা চুরি করে অর্জনকৃত বিষয় সম্পত্তির ওপরে অথবা ভিতরে সালাত পড়া প্রসঙ্গে প্রদত্ত ইসলামী মতামতের অনুরূপ। তাঁরা ধারণা পোষণ করেন যে বাধ্যতামূলক সালাত আদায় করলে স্বাভাবিক অবস্থায় তা দুই প্রকারের ফলাফল দেয় :

১. ব্যক্তি বিশেষের জন্য ঐ সালাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা দূর হয়ে যায়।
২ এটা তার জন্য প্রতিদান অর্জন করে।

যদি চুরি করে অর্জনকৃত বিষয়-সম্পত্তির উপরে (অথবা ভিতরে) সালাত আদায় করা হয় তাহলে সালাত আদায়ের বাধ্যবাধ্যকতা দূর হবে, কিন্তু এটা প্রতিদান বিহীন হবে। ফলে, নবী করীম ﷺ ফরজ সালাত দু'বার আদায় করা নিষিদ্ধ করেছেন।

গণকের প্রতি বিশ্বাস

গণক অদৃশ্য এবং ভবিষ্যতের সংবাদ বলতে পারে এ বিশ্বাস নিয়ে যে কেউ গণকের নিকট গমন করে সে কুফর (অবিশ্বাস) করে। আবু হুরায়রা এবং আল- হাসান উভয়ে বর্ণনা দিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যে গণকের নিকট গমন করে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদের ﷺ ওপর যা নাযিল হয়েছিল তা অবিশ্বাস করলো।" এ জাতীয় বিশ্বাস আল্লাহ্র অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ক জ্ঞানকে সৃষ্টির ওপর আরোপ করে। ফলে, এটি তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাতকে ধ্বংস করে এবং তাওহীদের এ ক্ষেত্রে এক জাতীয় শিরক এর নমুনা।

গণকদের লেখা জিনিস (বই ইত্যাদি) পাঠ করা এবং তাদের কথা রেডিওতে শ্রবণ করা অথবা টেলিভিশনে দেখা সাদৃশ্যতার (কিয়াস) কারণে কুফরীর অন্তর্ভুক্ত হয়। বিংশ শতাব্দীতে এ মাধ্যমগুলোর ব্যবহার গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারের সবচেয়ে প্রচলিত ও সহজ উপায়। আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ অদৃশ্য প্রসঙ্গে জানেন না, এমন কি নবী নবী করীম ﷺ ও না।

আল্লাহ্ ঘোষণা করেন−

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ.

অর্থাৎ, অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জ্ঞাত নয়। (সূরা−৬ আল আন'আম : আয়াত-৫৯)

তারপর তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলেন−

قُلْ لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ.

অর্থাৎ, বল, আমার নিজস্ব ভালমন্দের ওপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের সংবাদ জানতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই হাসিল করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না।

(সূরা−৭ আরাফ : আয়াত-১৮৮)

এবং তিনি আরও বলেন–

قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ .

অর্থাৎ, বল আল্লাহ ছাড়া আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। (সূরা–২৭ আন নামল : আয়াত-৬৫)

অতএব বিশ্বের চারদিকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, গণক এবং অনুরূপ ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবহৃত নানা পদ্ধতি মুসলমানদের মধ্যে নিষিদ্ধ। হস্তরেখা গণনা, আই চিং (I Ching), ভাগ্য বিস্কুট (Fortune Cookie), চা পাতা, এমন কি রাশিচক্র ও বাইও রিদম প্রোগাম (Bio-rhythm Computer Programs) যারা বিশ্বাস করে তারা দাবি করে যে এগুলো তাদের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে খবর দিতে সক্ষম। যদিও, আল্লাহ স্পষ্টভাবে এবং কঠোরভাবে বলেছেন যে একমাত্র তিনিই অদৃশ্য প্রসঙ্গে অবহিত–

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই শেষ বিচার দিবসের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। (সূরা–৩১ লুকমান : আয়াত-৩৪)

অতএব পুস্তক, পত্রিকা, সংবাদপত্র এমন কি ব্যক্তিবিশেষ যেগুলো কোনো না কোনো ভাবে দাবি করে যে, তাদের ভবিষ্যৎ অথবা অদৃশ্য প্রসঙ্গে জ্ঞান আছে, তাদের সাথে আচার ব্যবহার এবং যোগাযোগে মুসলমানদের অবশ্যই অতি সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। যেমন, একজন মুসলমান আবহাওয়াবিদ কর্তৃক আগামীকালের বৃষ্টি, তুষারপাত অথবা আবহাওয়ার অন্য কোনো অবস্থা প্রচার করার সময় 'ইনশাআল্লাহ' (যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন) শব্দসমষ্টি যোগ করা আবশ্যক।

এভাবে যখন কোনো মুসলমান মহিলা ডাক্তার তার রোগীকে জানায় যে সে নয় মাসের মধ্যে অথবা অমুক দিনে একটি সন্তান প্রসব করবে তখন ডাক্তারের 'ইনশাআল্লাহ' শব্দসমষ্টি ব্যবহার করার বিষয় খেয়াল রাখা আবশ্যক। যেহেতু এ জাতীয় বক্তব্য পরিসংখ্যান ভিত্তিক অনুমান মাত্র।

নবম অধ্যায়

জ্যোতিষশাস্ত্র

প্রাচীন কালের মুসলমান পণ্ডিতগণ নক্ষত্র এবং গ্রহ সংক্রান্ত গণনার বিষয়াদি সমষ্টিগতভাবে 'তানযীম" বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং শ্রেণীবিন্যাস করার লক্ষ্যে একে প্রধান তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১. প্রথম প্রকার এ বিশ্বাস প্রকাশ করে যে, দুনিয়াবী সত্তাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং এদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি পূর্বেই বলা সম্ভব। এ বিশ্বাস যা জ্যোতিষশাস্ত্র নামে পরিচিত, জানা মতে যিশুখ্রিষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বে মেসোপটেমিয়ায় সূচনা হয় এবং গ্রীস সভ্যতার বলয়ে পূর্ণতা লাভ করে। একটি পুরাতন মেসোপটেমিয় পদ্ধতি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারত এবং চীন দেশে পৌঁছে যায়, যদিও চীনে শুধু নক্ষত্র দ্বারা ভবিষ্যৎ গণনার পদ্ধতি রপ্ত করা হয়।

মেসোপটেমিয়াতে জ্যোতিষশাস্ত্র একটি রাজকীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হতো যার দ্বারা আকাশে দৃশ্যমান প্রতীক চিত্রের মাধ্যমে রাজা এবং তার রাজ্যের কল্যাণ বিষয়ক শুভ-অশুভ সংকেত বের করা হতো। মেসোপটেমিয়ার এ বিশ্বাসের মূলে ছিল যে, জ্যোতিষমণ্ডলী হলো ক্ষমতাবান দেবতাসমূহ। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যখন এসব নক্ষত্র দেবতারা গ্রীসে পরিচিত হলো তখন তারা গ্রীক দেশীয় গ্রহ বিষয়ক বিদ্যার উৎস হয়ে যায়। গ্রীক দেশে ভবিষ্যৎ জানার বিজ্ঞান হিসেবে জ্যোতিষশাস্ত্র রাজকীয় পরিষদের বাইরেও ধনী-সামর্থ্যবানদের ভিতর প্রবেশ করেছিল।

দুই হাজার বৎসরের অধিক সময় ধরে জ্যোতিষশাস্ত্র ধর্ম, দর্শন এবং তৎকালীন খ্রিস্টীয় ইউরোপের পৌত্তলিক বিজ্ঞানে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। তের শতাব্দীর ইউরোপের দান্তে এবং সেন্ট থমাস আকুইনাস

উভয়ে তাদের নিজস্ব দর্শনে জ্যোতিষতত্ত্ব-বিষয়ক হেতুবাদ (Astrological causation) গ্রহণ করেছিল। সার্বিয়ানরা, যাদের নিকট নবী ইব্রাহিম (আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তারাও এ বিশ্বাস পোষণ করতো। সার্বিয়ানরা সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজির ওপর দেবত্ব আরোপ করে তাদের সামনে সেজদায় নত হতো। তারা প্রার্থনা করার জন্য বিশিষ্ট স্থান তৈরি করেছিল যেখানে জ্যোতিষমণ্ডলীর প্রতীক হিসেবে মূর্তি এবং ছবি রাখা হতো। তাদের বিশ্বাস ছিল যে জ্যোতিষমণ্ডলীর আত্মারা মূর্তিদের মধ্যে নেমে আসতো, তাদের সাথে যোগাযোগ করতো এবং জনগণের চাহিদা পূরণ করতো।

এ জাতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র কুফর (অবিশ্বাস) বলে গণ্য করা হয়; কারণ এটা "তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাতকে" (আল্লাহর নাম ও গুণাবলির এককত্ব) ধ্বংস করে দেয়। এ জাতীয় বিশ্বাস গ্রহ, নক্ষত্র এবং ছায়াপথের ওপর আল্লাহর কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলি আরোপ করে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভাগ্য। যারা জ্যোতিষশাস্ত্র গবেষণা করে তারাও কুফর করে। কারণ তারা দাবি করে যে ভবিষ্যৎ বলার জ্ঞান তাদের রয়েছে– যা কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন এবং যা প্রকাশ্যই শিরক।

তারা নিজেদের ওপর আল্লাহর কতিপয় স্বর্গীয় জ্ঞানের গুণাবলি আরোপ করে এবং আল্লাহ কর্তৃক পূর্বে নির্ধারিত ভাগ্যের ভাল মন্দ পরিবর্তনের মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসের ওপর ভিত্তি করে জ্যোতিষ বিদ্যাকে হারাম করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন "যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে কোনো শাখার জ্ঞান অর্জন করল, সে যাদুবিদ্যার একটি শাখার জ্ঞান হাসিল করল। সে জ্ঞান যতই বাড়ালো, তার গুনাহ, ততই বাড়ল।"

২. দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত তারা যারা দাবি করে যে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি এবং আপেক্ষিক অবস্থান দুনিয়াবী ঘটনাবলি সংঘটনের নির্দেশ দেবে বলে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। যে সব মুসলমান জ্যোতিষবিদ ব্যাবেলনীয় বিজ্ঞানের জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং চর্চা করতো, তারা এ মতবাদে বিশ্বাস করতো। উমাইয়া বংশের শেষের দিকের এবং আব্বাসীয় বংশের প্রথম দিকের খলিফাদের দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্র রাজ দরবারে চালু করা হয়।

দরবারে প্রত্যেক খলিফার পাশে একজন জ্যোতিষবিদ থাকতো, যে খলিফাকে দৈনন্দিন কাজকর্মে পরামর্শ দেওয়া হত এবং আশু বিপদ থেকে সতর্ক করে দিতো। যেহেতু মুসলমান জনগণের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্রের মৌলিক আকার কুফর হিসেবে গণ্য হতো, যে সব মুসলমান এর চর্চা করতে চাইতো তারা ইসলামিভাবে এটি গ্রহণীয় বলে দেখানোর জন্য একটা আপোষ-মিমাংসা করল। ফলে জ্যোতিষতত্ত্ব বিষয়ক পূর্বাভাস আল্লাহর ইচ্ছাশক্তির ওপর ন্যস্ত করা হলো। তবে এ আকারেও জ্যোতিষশাস্ত্রে হারাম (নিষিদ্ধ) এবং এর চর্চাকারীকে কাফির (অবিশ্বাসী) বলে গণ্য করা উচিত। কারণ, এ বিশ্বাস এবং পৌত্তলিকদের বিশ্বাসের মধ্যে বাস্তবে কোনো পার্থক্য নেই।

জ্যোতিষীকে আল্লাহর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং যারা তাদের আপেক্ষিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারে বলে দাবি করে, তারা ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করে– যা একমাত্র আল্লাহর দ্বারাই সম্ভব। যা হোক, পরবর্তী সময়ের কিছু সংখ্যক পণ্ডিত স্বর্গীয় আইন প্রয়োগে শিথিল হয়ে পড়েন এবং যেহেতু এটা বহু মুসলমানদের মধ্যে বহুল প্রচলিত গ্রহণীয় বিশ্বাসে পরিণত হয় তারা এ আকারের জ্যোতিষশাস্ত্র অনুমোদন করা শুরু করেন।

৩. তৃতীয় এবং শেষ প্রকার হলো নক্ষত্রের বিন্যাস ব্যবহার করে নাবিক অথবা মরুভূমির পথিক কর্তৃক তাদের দিক নির্ণয় অথবা কৃষক কর্তৃক বীজ বপনের মৌসুম আগমনের সময় নির্ধারণ, ইত্যাদি। এগুলো এবং অনুরূপ বাস্তব ব্যবহার জ্যোতির্বিদ্যার একমাত্র বিষয় যা কুরআন এবং সুন্নাহ মতে মুসলমানদের জন্য হালাল। নিম্নে বর্ণিত আল কুরআনের আয়াত হলো এ ব্যতিক্রমের ভিত্তি–

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

অর্থাৎ, তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যেন তদ্দারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও। (সূরা–৬ আল আন'আম : আয়াত-৯৭)

সহীহ আল-বুখারী শরীফে বর্ণিত কাতাদাহ এর বক্তব্য থেকে নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ নক্ষত্র রাজি সৃষ্টি করেছেন দিকদর্শন করা এবং

শয়তানকে পাথর মারার জন্য। কাজেই যারা নক্ষত্ররাজির নিকট থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু চায়, তারা লাগামহীন অনুমান করে। সে তার ভাগ্য হারায়, কল্যাণময় জীবনের অংশ হারায় এবং যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই তা তার নিজের ওপর আরোপ করে। যারা তা করে তারাই আল্লাহ্র আদেশ প্রসঙ্গে অজ্ঞ। তারা নক্ষত্র দিয়ে সুচতুর অনুমান উদ্ভাবন করে দাবি করে যে অমুক অমুক নক্ষত্রের সময়কালে বিবাহ্ করলে এটা বা ওটা ঘটবে, অমুক অমুক নক্ষত্রের সময়কালে ভ্রমণ করলে এটা বা ওটা দেখবে।

আমার জীবনকালে প্রত্যেক নক্ষত্রের নীচে লাল, কাল, লম্বা, বেঁটে, কুৎসিত এবং সুদর্শন প্রাণী জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু নক্ষত্র, প্রাণী অথবা পাখীদের কেউই অদৃশ্য প্রসঙ্গে জানে না। যদি কাউকে শিক্ষা দিতে হতো তাহলে আল্লাহ্ আদম (আ)-কে শিখিয়ে দিতেন। তিনি তাঁর নিজের হাতে তাকে সৃষ্টি করেছেন, ফেরেশতাদের দিয়ে সিজদা করিয়েছেন এবং সকল বস্তুর নাম শিখিয়েছেন।”

কাতাদাহ্ সূরা আল আন'আমের ৯৭ নম্বর আয়াতের ওপর নির্ভর করে নক্ষত্র ব্যবহারের যে সীমাবদ্ধতা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ সীমাবদ্ধতা নিম্নের আয়াতের ওপর নির্ভর করেও করা হয়েছে–

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ -

অর্থাৎ, আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং উহাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ।

(সূরা–৬৭ আল মূলক : আয়াত-৫)

নবী করীম ﷺ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন যে, জ্বীনরা অনেক সময় নিচের আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ করে বিশ্বে সংঘটিত হবে এমন সব ঘটনা নিয়ে আলোচনারত ফেরেশতাদের আলাপ আলোচনা আড়ি পেতে শ্রবণ করে। জ্বীনরা পরে দুনিয়ায় ফিরে আসে এবং যারা অদৃশ্য প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করার সঙ্গে জড়িত তাদের অবহিত করে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ কদাচিৎ দ্রষ্ট উপলক্ষ্য ব্যতীত অধিকাংশ জ্বীনদের আড়িপাতা বন্ধ করার জন্য কক্ষচ্যুত নক্ষত্র (উল্কাসমূহ)

ব্যবহার করেন। ফলে, নবী করীম ﷺ বলেন, ঐ গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র কয়েকটি সত্যের সাথে শত শত মিথ্যার সংমিশ্রণ। সুতরাং মুসলমানগণ আল্লাহ কর্তৃক স্পষ্টভাবে নিরূপিত সংজ্ঞা অথবা যেগুলো এ সব সংজ্ঞার সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো ছাড়া অন্য কিছুর জন্য নক্ষত্রের ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে নৈতিকভাবে বাধ্য।

মুসলমান জ্যোতিষীর যুক্তি প্রদর্শন

জ্যোতিষবিদ্যার সঙ্গে জড়িত মুসলমানগণ তাদের চর্চাকে সমর্থন ও ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার জন্য কুরআনের কিছু আয়াত ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। যেমন, সাম্প্রতিক সময়ে সূরা আল বুরুজ ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে "রাশিচক্র প্রতীকের অধ্যায় হিসেবে" এবং প্রথম আয়াতকে অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে যে আল্লাহ শপথ করেছেন "রাশিচক্র প্রতীকের নামে"। এটা অবশ্যই 'বুরুজ' শব্দের ভ্রান্ত অনুবাদ। শব্দের সত্যিকার অর্থ নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থান, এবং 'রাশিচক্র' প্রতীক নয়।

রাশিচক্র সংক্রান্ত প্রতীক কেবলমাত্র জীবজন্তুর প্রতিরূপ যা প্রাচীন ব্যাবেলনিয় এবং গ্রীকবাসীগণ নক্ষত্র সম্পর্কীয় আপেক্ষিক অবস্থানের ব্যাপারে ব্যবহার করেছিল। সুতরাং নক্ষত্র পূজার ধর্মশূন্য আচার অনুষ্ঠানকে সমর্থন দেবার জন্য এ সূরাকে কোনোভাবেই ব্যবহার করা যেতে পারে না। কথিত চিত্রের সঙ্গে নক্ষত্র-সম্পর্কীয় আপেক্ষিক অবস্থানের কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু তাই নয়, যতই দিন যাবে মহাশূন্যে নক্ষত্ররাজির বিচরণের জন্য তাদের আপেক্ষিক অবস্থানের আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

আদিকালে খলিফাদের দরবারে জ্যোতিষশাস্ত্র সমর্থন করার জন্য সূরা আন-নাহল এর নিম্নলিখিত আয়াত ব্যবহার করা হতো–

وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ـ

অর্থাৎ, এবং পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহ আর নক্ষত্রের সাহায্যে তারা সঠিক পথে চলতে। (সূরা–১৬ আন নাহল : আয়াত-১৬)

"মুসলমান জ্যোতিষবিদগণ দাবি করেন যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো নক্ষত্রসমূহ অদৃশ্য উদঘাটন করার প্রতীক এবং এ জ্ঞান অর্জন করে জনগণকে ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।

তবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, যাঁকে নবী করীম ﷺ তরজুমানে আল কুরআন (কুরআনের অর্থের অনুবাদক) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি আয়াতে উল্লেখিত "প্রতীক চিহ্নকে দিনের বেলার 'পথ-চিহ্ন' অথবা 'স্থলোপরি চিহ্ন' (landmark) বলে অর্থ করেছেন। ঐগুলো কখনই নক্ষত্র বিষয়ক নয়। তিনি আরও বলেন যে, "নক্ষত্রের সাহায্যে তারা সঠিক রাস্তায় চলতো" অর্থ হলো তারা রাতে সমুদ্র এবং ভূমির উপর ভ্রমণকালে নক্ষত্রাদি দ্বারা পথ নির্দেশিত হয়। অন্য অর্থে, আলোচ্য আয়াতের মানে সূরা আল আন'আম এর ৯৭ নম্বর আয়াতের অনুরূপ।

যা হোক, এ আয়াত বা কুরআনের অন্যান্য আয়াত ব্যবহার করে জ্যোতিষবিদ্যা বিষয়ক অপ্রকৃত বিজ্ঞান অধ্যায়ন এবং এর প্রয়োগ সমর্থন করা সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর। এটা কুরআনের অন্যান্য বিভিন্ন আয়াতে স্বীকৃত একমাত্র আল্লাহই যে ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে জ্ঞাত তা অস্বীকার করে এবং সুস্পষ্টভাবে বিরোধিতা করে অনেক হাদীসকে যেখানে জ্যোতিষবিদ্যা বিষয়ক অপ্রকৃত বিজ্ঞান শিখতে এবং বিশ্বাস করতে নিষেধ করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, নবী করীম ﷺ এর সাহাবী ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন "যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটি শাখা নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করল, সে যাদুবিদ্যার একটি শাখার শিক্ষা গ্রহণ করল। আবু মাহযামও উল্লেখ করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "আমার সময়ের পর আমার জাতির জন্য আমি যা সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো তাদের নেতাদের অবিচার, নক্ষত্রে বিশ্বাস এবং স্বর্গীয় নিয়তিকে অস্বীকার।"

অতএব, ইসলামে জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস করা এবং গবেষণা করার কোনো ভিত্তি নেই। যারাই তাদের নিজস্ব অসাধু আকাঙ্ক্ষা নিজের উপযোগী করার জন্য ধর্মীয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিকৃত করে তারা মূলত: ইহুদীদেরই অনুকরণ করে। ইহুদীরা প্রাসঙ্গিকতার বাইরে তাওরাতের আয়াতের অর্থ সজ্ঞানে পরিবর্তন করেছিল।

রাশিচক্র প্রসঙ্গে ইসলামের অভিমত

পূর্বেও বলা হয়েছে যে, জ্যোতিশাস্ত্র গবেষণা কেবল হারামই নয় একজন জ্যোতির্বিদের নিকট গমন করা এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করা, জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর বই পুস্তক কেনা অথবা একজনের ভাগ্য যাচাইও নিষেধ। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্যবহৃত হয়,

যারা এ বিদ্যা চর্চা করে তাদের জ্যোতিষী বা গণক বলে গণ্য করা হয়। ফলস্বরূপ, যে তার রাশিচক্র খোঁজে সে নবী করীম ﷺ প্রদত্ত বিবৃতির অভিমতের অধীনে পড়ে : "যে গণকের নিকট গমন করে এবং কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে তার চল্লিশ দিন ও রাত্রির সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না।"

এমনকি জ্যোতিষের বক্তব্যের সত্যতায় সন্দিহান হওয়া সত্ত্বেও একজনের শুধু তার নিকট গমন করা এবং প্রশ্ন করার শাস্তি আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যদি কেউ জ্যোতিষ-বিষয়ক তথ্যাদির সত্য মিথ্যায় সন্দিহান হয়, তবে সে আল্লাহর পাশাপাশি অন্যরাও হয়তো অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে জানে বলে সন্দেহ পোষণ করে। এটা এক প্রকারের শিরক। কারণ আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন–

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ اِلاَّ هُوَ .

অর্থাৎ, অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ছাড়া কেউ জানে না। (সূরা–৬ আল-আন'আম : আয়াত-৫৯)

قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ .

অর্থাৎ, বল আল্লাহ ব্যতীত আকাশ মণ্ডলী ও যমীনে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। (সূরা–২৭ আন-নামল : আয়াত-৬৫)

জ্যোতিষ যতই বলুক অথবা যা কিছুই জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থে থাকুক, কেউ তার রাশিচক্রে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করলে সে সরাসরি কুফরি (অবিশ্বাস) করে। কারণ নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যে একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা অথবা গণকের নিকট গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, মুহাম্মাদের নিকট যা নাযিল হয়েছিল সে তা অবিশ্বাস করল।"

পূর্বে বর্ণিত হাদীসের মত আলোচ্য হাদীসে শাব্দিকভাবে গণকের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হলেও জ্যোতির্বিদদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। উভয়ই ভবিষ্যতের জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করে। জ্যোতির্বিদদের দাবি সাধারণ গণকদের তাওহীদের বিরোধিতা করার মতো। সে দাবি করে যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব নক্ষত্র দ্বারা নিরূপিত এবং তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম এবং তাদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী নক্ষত্রে লেখা আছে। সাধারণ গণক দাবি করে যে, একটি কাপের তলায় চায়ের পাতার গঠন অথবা হাতের তালুর

রেখা একই বিষয় বলে। উভয় ক্ষেত্রে তারা সৃষ্ট বস্তুর প্রকৃত বিন্যাসের মধ্যে অদৃশ্যের জ্ঞানের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দাবি করে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস এবং রাশিচক্র পরীক্ষা করা পরিষ্কারভাবে ইসলামের শিক্ষা এবং বিশ্বাসের বিপক্ষে। সেটাই বাস্তবিক শূন্য ও নিঃস্ব আত্মা যা খাঁটি ঈমানের (বিশ্বাসের) স্বাদ গ্রহণ করেনি এবং এ সব পথ খুঁজে বেড়ায়। আবশ্যকীয়ভাবে, এ সব রাস্তা পূর্বনির্ধারিত নিয়তি থেকে মুক্তি পাবার একটি নিষ্ফল প্রচেষ্টার প্রতীক। মূর্খ ব্যক্তিবর্গ মনে করে যে, তারা যদি জানে আগামীকাল তাদের ভাগ্যে কি রয়েছে, তারা আজ থেকে তার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। ঐভাবে তারা অকল্যাণ এড়াতে সক্ষম হতে পারে এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। তথাপি, আল্লাহ্ কর্তৃক আল্লাহর নবী করীম ﷺ-কে বলা হয়েছে–

وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ اِنْ اَنَا اِلاَّ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থাৎ, বল, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল মন্দের ওপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের সংবাদ জানতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না। আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী। (সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৮৮)

অতএব প্রকৃত মুসলমানগণ এ সব ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে থাকতে নৈতিকভাবে বাধ্য। একইভাবে আংটি, গলার হার ইত্যাদির ওপর যদি রাশিচক্রের চিহ্ন থাকে তবে তা ব্যবহার করা উচিত নয়, এমনকি কেউ তাতে বিশ্বাস না করলেও। এটি একটি বানোয়াট পদ্ধতির অংশ যা কুফর বিস্তার করে এবং একে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা আবশ্যক।

কোনো বিশ্বাসী মুসলমানের রাশিচক্র কি তা জিজ্ঞেস করা অথবা তার প্রতীক অনুমান করার চেষ্টা করাও উচিত নয়। কোনো পুরুষ অথবা নারী কর্তৃক পত্রিকার রাশিচক্রের কলাম পড়া অথবা পড়তে শ্রবণ করাও অনুচিত। যে মুসলমান তার কার্যক্রম নির্ধারণ করতে জ্যোতিষতত্ত্ব-বিষয়ক পূর্বাভাস ব্যবহার করে, তার উচিত আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা (তাওবা) করা এবং ইসলামের ওপর পুনরায় ঈমান আনয়ন করা।

দশম অধ্যায়

জাদু

জাদুর পরিচয় এভাবে দেয়া যায় যে, অতি প্রাকৃতিক মাধ্যমকে আচার অনুষ্ঠান দ্বারা ডেকে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনা অথবা ভবিষ্যৎ দেখা, উপরন্ত এই বিশ্বাসও করা যে কিছু সংখ্যক অনুষ্ঠান, পদ্ধতি ও কাজ দ্বারা মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে জোরপূর্বক বশ মানাতে সক্ষম। স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর অধ্যয়ন, যাকে প্রথাগতভাবে "সাদা" অথবা "প্রাকৃতিক জাদু" (White or Natural Magic) বলা হয় তা পাশ্চাত্য সমাজে আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হিসেবে প্রসার লাভ করে। এর সঙ্গে 'কালো জাদু' অথবা 'মায়াবিদ্যার' (Black Magic) পার্থক্য হলো ব্যক্তিগত অথবা অশুভ উদ্দেশ্যের জন্য অলৌকিক ক্ষমতা ব্যবহার করার প্রচেষ্টা।

ডাকিনী বিদ্যা, দেবত্ব প্রাপ্তি এবং প্রেতসিদ্ধি শব্দগুলো জাদু এবং এ পেশায় নিয়োজিত লোকদের উল্লেখ করার জন্য বেশী ব্যবহার হয়। অপদেবতা দ্বারা প্রভাবান্বিত নারীদের মাধ্যমে জাদু চর্চা করাকেই ডাকিনী বিদ্যা বলা হতো। ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে অলৌকিক জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টাকে দেবত্ব প্রাপ্ত (Divination) হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পক্ষান্তরে প্রেতসিদ্ধি অথবা মৃতের সাথে যোগাযোগ দেবত্ব প্রাপ্তির প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে অন্যতম।

অবশ্য আরবি ভাষায় 'সিহর' (জাদু) শব্দটি জাদুবিদ্যার বিভিন্ন শাখার মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। তাই এর মধ্যে মায়াবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা, দেবত্বপ্রাপ্তি এবং প্রেতসিদ্ধি সবই শামিল। গুপ্ত অথবা অতিসূক্ষ্ম শক্তি থেকে যা ঘটে তাকে আরবি ভাষায় সিহর বলা হয়। যেমন রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন "যথার্থই কতক ধরনের বক্তৃতা হলো জাদু"। একজন ভীষণ বাকপটু বক্তা, ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম। তাই প্রতারণামূলক বাকপটুতাকে রাসূল ﷺ জাদু হিসেবে নামকরণ

করেছেন। রোজার নিয়তে সুবহে সাদিকের পূর্বে ভোরের খাবারকে সাহুর (মূল সিহর থেকে) বলা হয় কারণ এ সময় রাত্রি শেষের অন্ধকার থাকে।

জাদুর বাস্তবতা

জাদুর মধ্যে যে আদৌ কোনো বাস্তবতা রয়েছে এটা অস্বীকার করা বর্তমানে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। হিষ্টিরিয়া ইত্যাদির মতো মানসিক ব্যাধি জাদুর প্রভাবের কারণে হয় বলে জনপ্রিয় গল্পগুলোতে বিশ্লেষণ করা হয় এবং বলা হয় যে যারা এতে বিশ্বাস করে জাদু কেবলমাত্র তাদের ওপর কাজ করে। সকল জাদুর কৃতিত্বকে অনেকগুলো ভ্রম এবং চাতুরীপূর্ণ ঘটনাভিত্তিক ধোঁকাবাজী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অকল্যাণ প্রতিরোধ করা এবং সৌভাগ্যকে আকর্ষণ করার জন্য জাদুমন্ত্র এবং মন্ত্রপূত কবচের যে প্রভাব রয়েছে এ বিষয় ইসলামী শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করলেও জাদুর বিশেষ কতিপয় অংশকে ইসলাম বাস্তব বলে স্বীকৃতি দেয়। এটা ঠিক যে বর্তমানের জাদুর অধিকাংশই প্রতারণার দ্বারা সৃষ্ট যা দর্শকদের ঠকানোর জন্য চাতুরীপূর্ণভাবে প্রস্তুত করা কলকব্জায় সম্পৃক্ত।

কতিপয় মানুষ আছে যারা তাদের সঙ্গে শয়তানদের (খারাপ জ্বীনের) যোগাযোগ থাকার কারণে ভাগ্য গণনার মতো সত্যিকার জাদুবিদ্যা চর্চা করে। জ্বীন এবং তাদের ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি দেবার আগে আমরা কুরআনে কারীম এবং হাদীসের আলোকে জাদুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি। বিষয়টির প্রতি এভাবে অগ্রসর হওয়া অত্যাবশ্যক, কারণ ইসলামে সত্য এবং মিথ্যার চূড়ান্ত মানদণ্ড মানুষের নিকট প্রেরিত কুরআন এবং সুন্নাহর ওহীর মধ্যে নিহিত। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে নিম্নবর্ণিত আয়াতে জাদু প্রসঙ্গে মৌলিক ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন–

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থাৎ, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নিকট রাসূল আগমন করল, যে তাদের নিকট যা রয়েছে এর সমর্থক, তখন যাদেরকে কিতাব দেওয়া

হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহর কিতাবটিকে পেছনে নিক্ষেপ করল যেন তারা জানে না। (সূরা–২ আল বাকারা : আয়াত-১০১)

ইহুদীদের নিকট প্রেরিত পয়গম্বরদের সাথে তাদের (ইহুদীদের) ভণ্ডামির কথা উল্লেখ করার পর পয়গম্বর সুলায়মান প্রসঙ্গে উদ্ভাবিত তাদের একটি মিথ্যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করত। সুলায়মান সত্য প্রত্যাখ্যান করে নি, কিন্তু শয়তানগণই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিল শহরে হারুত ও মারুত ফিরিশতাদ্বয়ের ওপর নাযিল হয়েছিল। তারা কাউকেও শিক্ষা দিত না এ কথা না বলে যে, আমরা পরীক্ষা-স্বরূপ; সুতরাং, তোমরা কুফরী করিও না। তারা তাদের নিকট থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা শিক্ষা করত, অথচ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তারা কারো কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করত তা তাদের ক্ষতি সাধন করত এবং কোনো উপকারে আসত না; আর তারা নিশ্চিতভাবে অবগত ছিল যে, যে কেহ তা ক্রয় করে আখিরাতে তার কোনো অংশ নেই। তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করেছে, যদি তারা জানত।"

(সূরা–২ আল বাকারা : আয়াত-১০২)

ইহুদীরা 'কাবালা' নামে একটি দুর্বোধ্য মরমী পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত জাদু চর্চার সত্যতা দেয়ার জন্য দাবি করত যে স্বয়ং পয়গম্বর সুলায়মানের নিকট থেকে তারা এটা শিখেছিল। আল্লাহ্ বলেন যে, স্বর্গীয় ধর্মগ্রন্থগুলোকে তাদের পিছনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এবং শেষ পয়গম্বরকে প্রত্যাখ্যান করে ইহুদীরা শয়তান দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত জাদুর পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা পছন্দ করে নেয়। কেবলমাত্র যাদু শিক্ষা দিয়েই এ শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা জ্যোতিষশাস্ত্র নামে একটি মায়াবিদ্যার কৌশলেরও প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রাচীনকালে ব্যবিলনের জনগণের পরীক্ষা হিসেবে প্রেরিত হারূত এবং মারূত নামে দুজন ফেরেশতা তাদের এ বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিল।

ফেরেশতারা মায়াবিদ্যার মূল তত্ত্বগুলো প্রশিক্ষণ দেবার আগে জনগণকে এ বিদ্যা শিখে অবিশ্বাসের কাজ না করার জন্য হুশিয়ার করে দিত। কিন্তু তারা সে সাবধান বাণী শুনেনি। মানুষের মধ্যে শক্রতা সৃষ্টি কীভাবে করা যায় এবং কীভাবে বিবাহ ধ্বংস করা যায় তা তারা জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে এমন এক পর্যায় পর্যন্ত শিখেছিল যে তারা মনে করত যাকে ইচ্ছা তাকেই তারা ক্ষতি করতে সক্ষম হবে। তবে আল্লাহ্ই একমাত্র সত্তা যিনি বাস্তবেই ঠিক করেন কার ক্ষতি হবে এবং কার হবে না। তাদের এ জ্ঞান তাদের সত্যিকার কোনো উপকারে আসেনি। কাজেই তারা এটা শিখে শুধু তাদের নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। সঠিক জাদু বিদ্যা চর্চা অবিশ্বাসের কাজ হবার কারণে তারা নিজেদের জন্য জাহান্নামে তাদের স্থান নিশ্চিত করে নিয়েছিল।

ইহুদীদের মধ্যে যারা এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল তারা উত্তমরূপেই জানত যে তারা অভিশপ্ত, কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থেও এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এখনও তাওরাতে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো পাওয়া যায়–

প্রভু! তোমার স্রষ্টা, তোমাকে যে ভূমি দিয়েছেন তাতে যখন প্রবেশ করবে তখন তুমি ঐ সকল জাতির জঘন্য আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করবে না। তোমাদের মধ্যে থেকে কেহ্ তার পুত্র অথবা কন্যাকে উৎসর্গ করবার জন্য আগুনে জ্বালাবে না, দেবত্ব চর্চা করবে না, একজন ভবিষ্যৎ-বক্তা (Soothsayer), দৈবজ্ঞ (Augur), মায়াবিনী (Charmer), মাধ্যম (Medium), ভেলকিবাজ (Wizard) অথবা প্রেতসিদ্ধ (Necromancer)

হবে না। যে কেহ এ সকল কার্যাদি সম্পন্ন করবে সে পালনকর্তার নিকট একজন নিদারুণ ঘৃণ্য ও বিভীষিকাজনক ব্যক্তি হবে এবং এই ঘৃণ্য ও বিভীষিকাময় কার্যাদির জন্য প্রভু, তোমার স্রষ্টা তাদেরকে বিতাড়িত করবে।

তখন তারা সেখানে ছিল না বলে ভান করে এসব ধর্মীয় আদেশের প্রতি তাকায়নি। এটা তাওরাতেও লেখা ছিল যে, যারা জাদু চর্চার অংশীদার হবে তারা স্বর্গের যে কোনো পুরস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিরন্তর আগুনে অবস্থান করবে। কিন্তু ইহুদীরা এ লাইনগুলো তাওরাত থেকে বাদ দিয়েছে এবং জাদুর কলাকৌশল অনুশীলন করছে।

তাদের অবস্থার গুরুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করার জন্য আল্লাহ্ অনুকম্পার সুরে পংক্তিটি সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আখিরাত জীবনের শাস্তি যে কত ভয়াবহ ইহুদীরা যদি তা শুধু অবগত হতো, তাহলে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে কিছু সস্তা দক্ষতা হাসিলের জন্য তাদের আত্মার ভবিষ্যৎ বিক্রয় করে দেয়া যে কত ভয়াবহ তা তারা বুঝতে সক্ষম হতো।

আয়াতে কারীমাগুলোর মধ্যে "যে কেহ উহা ক্রয় করে আখিরাতে তার জান্নাতের কোনো অংশ নেই" স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে জাদু হারাম (নিষিদ্ধ)। একমাত্র চরম হারাম কাজের শাস্তি হতে পারে আগুনে চিরস্থায়ী বাসস্থান। আলোচ্য আয়াত আরও প্রমাণ করে যে, জাদুকরের পাশাপাশি যে শিক্ষা গ্রহণ করে কিংবা শিক্ষা প্রদান করে তারাও কাফের (অবিশ্বাসী)। "যে এটি ক্রয় করে" (অর্থাৎ অর্জন করে) উক্তিটির রহস্য সর্বজনীন। যে জাদু শিক্ষা দানের মাধ্যমে ধনসম্পদ লাভ করে এবং যে শিক্ষা গ্রহণের জন্য খরচ করে অথবা যাদের এ প্রসঙ্গে শুধুমাত্র জ্ঞান রয়েছে তারাই এর মধ্যে শামিল। জাদু করা কুফুর (অবিশ্বাস), আল্লাহ্ এটাও এ উক্তির মধ্যে উল্লেখ করেছেন, "আমরা পরীক্ষা স্বরূপ : অতএব তোমরা কুফরী করিও না" এবং "সুলায়মান সত্য প্রত্যাখ্যান করে নি, কিন্তু শয়তানগণই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত......"।

নিঃসন্দেহে পূর্ব বর্ণিত আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, জাদুর মধ্যে কিছু বাস্তবতা বিদ্যমান রয়েছে। সহীহ্ আল-বুখারী এবং আরও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাদুর প্রভাবে কষ্ট ভোগ করেছিলেন। যাইদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন যে, লাবীদ ইবনে আসাম নামে এক ইহুদী

রাসূল ﷺ-এর ওপর জাদু নিক্ষেপ করেছিল। তিনি যখন এর থেকে কষ্ট ভোগ করতে থাকেন জিবরাইল (আ) তার নিকট আগমন করে মুআওয়ীজাতান (আল ফালাক ও আন-নাস সূরাদ্বয়) নাযিল করলেন এবং তাঁকে বললেন, "নিশ্চয়ই একজন ইহুদী আপনার ওপর এ জাদুমন্ত্র করেছিল এবং জাদুর মন্ত্রটি একটি কূপের ভিতর রয়েছে।"

রাসূলে করীম ﷺ আলী ইবনে আবু তালিবকে জাদুমন্ত্রটি নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি যখন নিয়ে এলেন রাসূল করীম ﷺ এক এক করে গিঁটগুলো খুলতে বললেন এবং প্রতিটির সঙ্গে সূরা দুটি থেকে আয়াত তিলাওয়াত করতে বললেন। যখন তিনি তা করলেন, রাসূল করীম ﷺ এমনভাবে উঠে পড়লেন তাতে মনে হলো যেন তিনি বাঁধন মুক্ত হলেন।

দুনিয়ার প্রত্যেক জাতির নিকট সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে যে তারা কোনো না কোনো ধরনের জাদুবিদ্যা চর্চা করেছে। যদিও এই সাক্ষ্যপ্রমাণের কিয়দংশ মিথ্যা হতে পারে তবুও এটা অসম্ভব যে সব মানবজাতির জাদু সম্বন্ধীয় এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলির প্রসঙ্গে একই জাতীয় গল্প নির্মানে সম্মত হয়েছিল। যদি কেউ গভীর চিন্তা করে, তাহলে সে অতিপ্রাকৃত কাহিনীগুলোর ব্যাপক লিপিবদ্ধ কাহিনী থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে যে এ সবের মধ্যে নিশ্চয়ই একটি সাধারণ বাস্তব যোগসূত্র বিদ্যমান আছে।

জ্বীনের জগৎ প্রসঙ্গে যারা অপরিচিত তাদের নিকট ভুতুড়ে বাড়ি, আধ্যাত্ম্য বৈঠক (Seances), উইজা তক্তা (Ouija boards), ডাকিনী বিদ্যাসর্বস্ব বিকৃত ধর্ম (Voodoo), পিশাচাবিষ্ট হওয়া, জিহ্বা দিয়ে কথা বলা, দেহকে শূন্যে ভাসমান করা (Levitation) ইত্যাদি সব দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এ জাতীয় ঘটনার নিজস্ব প্রকাশ রয়েছে।

এমনকি মুসলমান জগতেও এর দ্বারা পীড়িত, বিশেষ করে বিভিন্ন চরমপন্থী সূফী (মরমী) বিধানের শাইখগণ (সর্দারগণ)। তাদের অনেকে দেহকে শূন্যে ভাসাতে, মুহূর্তের মধ্যে বহু দূরত্ব অতিক্রম করতে, শূন্য থেকে খাবার অথবা অর্থ হাজির করতে পারে বলে মনে হয়। তাদের অজ্ঞ অনুসারীরা ঐ সব জাদুর ভেলকিকে স্বর্গীয় অলৌকিক ঘটনা বলে বিশ্বাস করে। তাই, তাদের পীরদের জন্য তাদের অর্থ ও জীবন স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে। এসব ঘটনার পিছনে গোপন এবং অশুভ জ্বীন জগতের কারসাজি রয়েছে।

পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, যারা সাপ এবং কুকুরের আকারে পরিণত হয়েছে তারা ছাড়া মূলত সব জ্বীনই অদৃশ্য। অবশ্য তাদের মধ্যে কতিপয় আছে যারা তাদের ইচ্ছা মতো মানুষসহ যে কোনো আকারে রূপ নিতে সক্ষম। যেমন–

আবু হুরায়রা বলেছেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে রমজান মাসের যাকাত (দান) পাহারা দেবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি যখন তা করছিলাম তখন একজন এসে খাবারের মধ্যে খোঁড়া আরম্ভ করলে আমি তাকে ধরে ফেললাম। আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাচ্ছি।" লোকটি অনুনয় করে বলল, "নিশ্চয়ই আমি গরিব এবং আমার পরিবার আছে। আমি খুব অভাবে আছি। কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরের দিন সকালে রাসূলে করীম ﷺ বললেন, "হে আবু হুরায়রা! গত রাতে তোমার বন্দী কি করেছিল?" আমি বললাম, "সে খুব অভাবে আছে এবং তার পরিবার আছে বলে অভিযোগ করায় আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূল করীম ﷺ জবাব দিলেন, "সে নিশ্চয়ই তোমার নিকট মিথ্যা বলেছে তোমার সাথে প্রতারণা করেছে এবং সে আবার তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। যেহেতু আমি জানতাম সে ফেরৎ আসবে তাই তাকে ধরার জন্য আমি অপেক্ষা করি।

যখন সে পুনরায় ফিরে এসে খাবারের মধ্যে খুঁড়তে আরম্ভ করল আমি তাকে ধরলাম এবং বললাম, "আমি নিশ্চয়ই তোমাকে আল্লাহর রাসূলের নিকট নিয়ে যাব। সে অনুনয় বিনয় করে বলল আমাকে যেতে দিন, আমি নিশ্চয়ই একজন গরিব লোক এবং আমার পরিবার আছে। আমি ফেরৎ আসব না"। অতএব তার ওপর করুণা হলো এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরের দিন সকালে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, "হে আবু হুরায়রা! তোমার বন্দী গত রাতে কি করেছে"। আমি বললাম যে, যেহেতু সে তার ভীষণ অভাবের কথা এবং পরিবার আছে বলে অভিযোগ জানাল আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। রাসূল করীম ﷺ উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই সে মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে পুনরায় আসবে"।

সুতরাং আমি তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম এবং সে এসে যখন চারিদিকে খাবার ছড়াতে শুরু করল আমি তাকে আবার ধরে ফেললাম।

আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাব। এবার নিয়ে তৃতীয় বার এবং তুমি ওয়াদা করেছিলে যে ফেরৎ আসবে না। তারপরও তুমি ফেরৎ এসেছ"। সে বলল, "আমাকে কিছু কথা বলতে দাও যার দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে কল্যাণ দান করবেন।" আমি বললাম, "সে কথাগুলো কি"? সে উত্তর দিল, "যখনই বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখনই তুমি আয়াতুল-কুরসীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। তুমি যদি তা কর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক সব সময় তোমার সঙ্গে থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান তোমার নিকট আসতে পারবে না।"

অতঃপর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরের দিন সকালে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, "তোমার বন্দী গত রাতে কি করেছিল"? আমি বললাম যে, সে আমাকে কিছু কথা শিখিয়েছিল যা দ্বারা আল্লাহ্ আমাকে কল্যাণ করবেন এ দাবি করায় আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। যখন রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন কথাগুলো কী? আমি তাকে বললাম যে, সেগুলো বিছানায় যাবার পূর্বে আয়াতুল-কুরসী পড়া। আমি তাঁকে আরও বললাম যে, সে বলেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অভিভাবক আমার সঙ্গে থাকবে এবং সকালে ঘুম ভাঙ্গার পূর্ব পর্যন্ত কোনো শয়তান আমার নিকট আসবে না। রাসূল ﷺ বললেন "নিশ্চয়ই সে সত্য কোনো কথা বলেছে যদিও সে একজন স্বভাবগত মিথ্যাবাদী। হে আবু হুরায়রা! তুমি কি অবগত আছ যে, গত তিন রাত্র ধরে তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে"? আমি উত্তর দিলাম 'না' এবং তিনি বললেন, সেটি একটি শয়তান ছিল।"

তারা বিশাল দূরত্বে নিমেষের মধ্যে ভ্রমণ করতে এবং মানুষের দেহে প্রবেশ করতে সক্ষম। আল্লাহ্ তাদেরকে এ অসাধারণ ক্ষমতা প্রদান করেছেন যেভাবে অন্যান্য প্রাণীকেও মানুষের ক্ষমতার চেয়েও বেশি ক্ষমতা প্রদান করেছেন। তবুও, তিনি মানুষকে সকল সৃষ্টির ওপরে রাখার জন্য পছন্দ করেছেন।

যদি জ্বীনদের ক্ষমতার মৌলিক বিষয়গুলো স্মরণ রাখা যায় তাহলে সব অলৌকিক এবং জাদু বিষয়ক ঘটনাবলি যা ধোঁকাবাজি নয় সেগুলো সহজেই বিশ্লেষণ করা যায়। যথা ভুতুড়ে বাড়ির ক্ষেত্রে, যেখানে আলো জ্বলে ও নিভে, দেয়াল থেকে ছবি পড়ে যায়, জিনিসপত্র বাতাসে উড়ে বেড়ায়, মেঝে ফেটে

যায় ইত্যাদি। জ্বীনরা অদৃশ্য অবস্থায় বিদ্যমান থেকে জড় উপাদানের ওপর সক্রিয় হয়। এটি আধ্যাত্মি বৈঠকের বেলায়ও সত্যি যেখানে মৃত ব্যক্তির রূহ আপাত দৃষ্টিতে জীবিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

যারা তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনদের গলার আওয়াজ চিনতে পারে তারা তাদের (মৃতদের) জীবনের ঘটনাবলি বলতে শোনে। মৃত ব্যক্তির জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে এমন জ্বীনের মাধ্যমে ডেকে এনে এ কর্ম সমাধা করা হয়। এ জ্বীনকে মৃত ব্যক্তির গলার আওয়াজ নকল করে এবং ব্যক্তিটির অতীতের ঘটনাসমূহ থেকে বলে। অনুরূপভাবে উইজা তক্তারও প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখা যায়। যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রস্তুত করা যায় তাহলে জ্বীন দ্বারা প্রদত্ত অদৃশ্য খোঁচা সহজেই বিস্ময়কর ফল দিতে পারে।

যারা শূন্যে ভাসতে অথবা কোনো জিনিসকে স্পর্শ না করেই উঠাতে সক্ষম বলে মনে হয়, সেগুলোও জ্বীনের অদৃশ্য হাত দিয়ে শূন্যে তোলা মাত্র। অনেকে তাদের অদৃশ্য সঙ্গীদের কর্তৃক পরিবাহিত হবার কারণে অথবা এমনকি জ্বীন তাদের রূপ ধরে দৃশ্যমান হবার কারণে বিশাল দীর্ঘপথ করতে সক্ষম হয় এবং প্রায় একই সময়ে দুই স্থানে হাজির থাকতে পারে। অনুরূপ, যারা শূন্য থেকে খাদ্যদ্রব্য অথবা টাকাকড়ি হাজির করতে সক্ষম হয় তা তারা অদৃশ্য এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন জ্বীনদের সাহায্যে করে। আপাতদৃষ্টিতে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হবার বিস্ময়কর কাহিনী রয়েছে, যেমন ভারতে শান্তি দেবী নামে সাত বছরের একটি মেয়ে তার অতীত জীবনের ঘটনাবলির সুস্পষ্ট এবং নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিল।

সে যেখানে বসবাস করত সেখান থেকে অনেক দূরের প্রদেশের মুতরা নামে একটি শহরে অবস্থিত তার পূর্বের বাড়ির বর্ণনা দিয়েছিল। জনগণ সেখানে পরীক্ষা করার জন্য গেলে মেয়েটি যে রকম বর্ণনা দিয়েছিল অনুরূপ একটি বাড়ি এক সময় ওখানে ছিল বলে স্থানীয় জনগণ স্বীকার করল। তারা মেয়েটির অতীত জীবনের কিছু বৃত্তান্তেরও সত্যতা স্বীকার করল। স্পষ্টতই, জ্বীনরা এসব তথ্যাদি তার অবচেতন মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। রাসূল ﷺ এ বিষয় সমর্থন করে বলেন, "মানুষ ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখে তা তিন প্রকার : আর-রাহমান (আল্লাহ) থেকে স্বপ্ন, শয়তান থেকে বিষাদপূর্ণ স্বপ্ন এবং অবচেতন স্বপ্ন।" নি:সন্দেহে, জ্বীন যেমন মনের ভিতর প্রবেশ করতে পারে তদ্রূপ মানুষের শরীরেও প্রবেশ করতে পারে।

জ্বীনের আছর হওয়ার ঘটনা অসংখ্য। এ জাতীয় ঘটনা সাময়িক হতে পারে। যেমন, বহু খ্রিস্টান এবং পৌত্তলিক গোষ্ঠীর মধ্যে মানুষ দৈহিক ও মানসিক প্রবল উত্তেজনার মধ্যে অচেতন অবস্থায় পড়ে বিজাতীয় ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করে। ঐ ধরনের দুর্বল অবস্থার সময় জ্বীন খুব সহজেই তাদের দেহে প্রবেশ করতে এবং তাদের মুখ দিয়ে আবোল-তাবোল বলাতে পারে। সুফিদের জিকির বৈঠকের মধ্যেও এ জাতীয় ঘটনার প্রমাণ আছে। অথবা জ্বীনের আছর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে যেখানে ব্যক্তিগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি প্রায়ই বিচারবুদ্ধিহীনভাবে ব্যবহার করে, আসুরিক শক্তি প্রদর্শন করে অথবা প্রকৃতপক্ষে জ্বীন তাদের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা করতে পারে।

অনুবাদকের কথা : ইসলাম অনুযায়ী ভূতপ্রেত ইত্যাদি বলতে কিছু নেই। তথাকথিত সব ভূতুড়ে কাহিনী এবং কাজই হচ্ছে জ্বীনের কাজ এবং ভেলকিবাজী।

মধ্যযুগে ইউরোপে ভূতপ্রেত (জ্বীন) বিতাড়ন প্রথা অধিক প্রসারিত হয়। বাইবেলে যিশু কর্তৃক ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিদের মন্ত্রের সাহায্যে ভূতপ্রেত দূর করার অসংখ্য কাহিনীর বর্ণনা হলো খ্রিস্টীয় আচারের প্রেত-বিতাড়নের ভিত্তি। একটি বর্ণনায় আছে যে যিশু এবং তাঁর সহচরগণ জেরাসিনেস এসে একটি ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির দেখা পান। যিশু প্রেতদের তাকে ছেড়ে দিতে আদেশ দিলে তারা তাকে ছেড়ে দেয় এবং নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের গায়ে খাবার গ্রহণরত একটি শুকরপালের মধ্যে প্রবেশ করে। শুকরগুলো তখন পাহাড়ের খাড়া গা ঘেষে নিচে ছুটে এসে হ্রদে পতিত হলো এবং ডুবে মরল।

এটি সত্তর এবং আশির দশকের শেষের দিকে প্রকাশিত বহু সিনেমাতেও (যথা The Exorcist, Rosemary's Baby ইত্যাদি) আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল। অতিপ্রাকৃত যাবতীয় বিষয় প্রত্যাখ্যান করা পশ্চিমা বস্তুবাদীদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং, পাশ্চাত্যে প্রেতবিতাড়ন তন্ত্রের কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই এবং একে কুসংস্কারের ফল হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্ধকার এবং মধ্যযুগে ইউরোপে ব্যাপক হারে ডাইনি খুঁজে বের করা এবং জ্বালানোর কাহিনী এ মনোভাবের কারণ। তবে, ভূতাবিষ্ট হবার ঘটনা

এবং এর থেকে উদ্ভূত অন্যান্য রোগের চিকিৎসার বৈধ পন্থা হিসেবে ইসলামে জ্বীন ছাড়ানোর চর্চা স্বীকৃত, যদি এর পদ্ধতি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হয়।

একজন ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ওপর থেকে জ্বীন দূর করার জন্য মূলত: তিন প্রকারের পদ্ধতি রয়েছে।

এক : অন্য একটি জ্বীনকে খোঁজ করে জ্বীন দূর করা যায়। কিন্তু জ্বীন ডাকতে প্রায়ই ধর্মবিরোধী কার্যাদির শরণাপন্ন হতে হয় বিধায় এ পদ্ধতি ইসলামে নিষিদ্ধ। এ জাতীয় কাজের মাধ্যমেই একজন জাদুকর অথবা ডাইনি অন্যের দ্বারা চালিত জাদুমন্ত্র নষ্ট করে।

দুই : জ্বীন এর সামনে দৃঢ়ভাবে শিরক বলবৎ করে তাকে তাড়ানো যায়। ভূতের ওঝার দ্বারা সংঘটিত শিরক-এ সন্তুষ্ট হয়েও জ্বীন চলে যেতে পারে। তা করার সময় সে ওঝাকে আশ্বাস দেয় যে, তার শিরক জড়িত প্রক্রিয়া এবং বিশ্বাস সঠিক। খ্রিস্টান যাজকগণও যিশুকে আহ্বান করে এবং ক্রুশ ব্যবহার করে জ্বীন তাড়ায়। একইভাবে পৌত্তলিক প্রধান যাজকগণও তাদের মিথ্যা দেবতাদের নাম নিয়ে ভূত তাড়ায়।

তিন : আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে প্রার্থনা করে এবং কুরআন তিলাওয়াত করেও জ্বীনকে বিতাড়িত করা যায়। এসব স্বর্গীয় শব্দাবলি এবং ধর্মীয়ভাবে অনুমোদিত বিধিসমূহ ভূতাবিষ্টের চতুর্দিকের পরিবেশে পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। তখন আদেশ দিয়ে এমনকি আঘাতের মাধ্যমে জ্বীনকে দেহ থেকে তাড়িয়ে দেয়া যায়। তবে এসব অনুশীলন ব্যর্থ হবে যদি যে এসব করছে তার ঈমান (বিশ্বাস) শক্তিশালী না থাকে এবং ন্যায়পরায়ণ কার্যাদির ভিত্তিতে আল্লাহর সাথে উত্তম যোগাযোগ বিদ্যমান না থাকে।

বর্তমানে কতিপয় মুসলমান পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাবে ভূতাবিষ্ট হওয়াকে খোলাখুলিভাবে অসত্য বলে ঘোষণা করে। এসব ব্যক্তিবর্গ এমনকি জ্বীনের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও, কুরআন এবং সুন্নাহ উভয়ই ভিন্ন কথা বলে। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে যার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে জ্বীন দূর করেছেন। এমন হাদীসও রয়েছে যেখানে বর্ণিত আছে যে, তাঁর সাহাবাগণও তাঁর অনুমতি নিয়ে এ কাজ করেছেন। তিনটি ভিন্ন প্রক্রিয়ার বর্ণনা নিম্নরূপ–

ইয়ালা ইবনে মাররাহ বলেন, "একদিন আমি যখন রাসূল-এর সঙ্গে সফরে বের হচ্ছিলাম, তখন একটি মহিলাকে তার শিশুসহ রাস্তায় বসে থাকতে দেখলাম। মহিলাটি বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! এ ছেলেটি রোগাক্রান্ত এবং আমাদের অনেক কষ্টে ভোগাচ্ছে। আমি জানি না প্রতিদিন কতবার তার ওপর আছর পড়ে।" রাসূলে করীম বললেন, "ওকে আমার নিকট দাও।" অতএব মহিলাটি তাকে উঠিয়ে রাসূল-এর নিকট দিয়ে তিনি তাঁর সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠের মাঝামাঝি ছেলেটিকে রাখলেন। তারপর তিনি শিশুটির মুখ খুলে তিনবার ফুঁ দিলেন এবং বললেন, "বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে)।

আমি আল্লাহর একজন বান্দা, কাজেই চলে যাও, হে আল্লাহর দুশমন! তারপর তিনি ছেলেটিকে মহিলার নিকট ফেরৎ দিয়ে বললেন, "আমাদের ফিরতি পথে এখানে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে কি হলো।" তারপর আমরা চলে গেলাম এবং ফিরতি পথে আমরা তাকে ঐ স্থানে পেলাম। তার সাথে তিনটি ভেড়া দেখতে পেয়ে রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ছেলেটি কেমন আছে? মহিলাটি উত্তর দিল, "তার নামে শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তারপর থেকে আমরা আর তার কোনো খারাপ দেখি নি, তাই আমি আপনার জন্য এ ভেড়াগুলো নিয়ে এসেছি।" রাসূল আমাকে বললেন, "বাহন থেকে নেমে পড় এবং একটি নাও। তারপর অবশিষ্টগুলো তাকে ফেরৎ দিয়ে দাও।"

আব্বান বিনতে আল-ওয়াজী উল্লেখ করেন যে, যখন তার পিতাসহ তাদের উপজাতি থেকে একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে আল্লাহর রাসূল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, তখন তার সঙ্গে তার একটি পাগল সন্তান ছিল। সে আল্লাহর রাসূল-এর নিকট পৌঁছে বলল, "আমার সঙ্গে আমার একটি সন্তান রয়েছে যে পাগল, তাই আমি তাকে আপনার নিকট নিয়ে এসেছি তার জন্যে দোয়া চাইতে।" রাসূল তাকে নিয়ে আসতে বললেন। সে তার ছেলের যাত্রাপথের কাপড় পরিবর্তন করে কিছু ভালো পোশাক পরিয়ে রাসূল-এর নিকট নিয়ে এল। রাসূল বললেন, "তাকে আমার নিকট নিয়ে এস এবং পিছন ফিরে দাঁড় করাও।" রাসূল তখন শক্ত করে ছেলেটির পোশাক ধরলেন এবং তার পিঠের উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে লাগলেন।

যখন তাকে আঘাত করছিলেন তিনি বলছিলেন, "দূর হও, আল্লাহর দুশমন দূর হও।" বালকটি এমনভাবে চতুর্দিকে দেখতে লাগল যেন ভালো হয়ে গেছে। রাসূলে করীম ﷺ তাকে তাঁর সামনে বসালেন এবং কিছু পানি আনতে বললেন। তিনি তখন ছেলেটির মুখ মুছে দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। রাসূল ﷺ দোয়া করার পর প্রতিনিধি দলের মধ্যে বালকটির মতো সুস্থ আর কেউ ছিল না।

খারিজা ইবনে আস-সালাত বর্ণনা দেন যে তার চাচা বলেছিলেন, "একদিন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহচর্য ছেড়ে রওয়ানা দিলে একটি বেদুইন উপজাতির সাক্ষাৎ পেলাম। তাদের কিছু সংখ্যক লোক বলল, "আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ঐ লোকটির অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে কিছু ভালো ভালো জিনিস নিয়ে এসেছ। তোমাদের নিকট কি একটি ভূতাবিষ্টের জন্য ওষুধ বা মন্ত্র আছে? আমরা উত্তর দিলাম "হ্যাঁ"। তাই তারা সম্মোহনগ্রস্ত এক পাগলকে নিয়ে এল।

আমি তিন দিন প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় তার ওপর ফাতিহা তিলাওয়াত করলাম। প্রত্যেক বার আবৃত্তি শেষ করার পর তার মুখে থু থু ফেললাম। শেষে সে এরূপে উঠে দাঁড়াল যেন বন্ধন মুক্ত হলো। বেদুইনরা তখন পুরস্কার হিসেবে একটি উপহার নিয়ে এলো। তাই আমি তাদের বললাম, "আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না করে আমি এটি গ্রহণ করতে পারি না। আমি যখন রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, "গ্রহণ কর, আমার জীবনের কসম, যে কেউ মিথ্যা জাদুমন্ত্র পড়ে উপার্জন করে খাবে সে তার পাপের বোঝা বহন করবে। কিন্তু তুমি এটা উপার্জন করেছ সত্য আয়াত তিলাওয়াত করে।

জাদু প্রসঙ্গে ইসলামের রায়

জাদু চর্চা এবং শেখা উভয়ই যেহেতু ইসলামে কুফরের (অবিশ্বাস) শামিল যে কেউ এটা চর্চা করছে বলে ধরা পড়বে তার জন্য শরি'আহ (আইন) আলাদাভাবে খুব কঠিন শাস্তি নির্ধারিত করেছে। যে কেউ এটা চর্চা করছে বলে ধরা পড়বে, সে যদি অনুতপ্ত না হয় এবং ছেড়ে না দেয় তাহলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যন্দুর ইবনে কাব কর্তৃক বর্ণিত নিম্নলিখিত একটি হাদীস হলো এ আইনটির ভিত্তি। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, "জাদুকরের জন্য নির্ধারিত শাস্তি হলো তাকে তরবারি দ্বারা মৃত্যুদণ্ড দেয়া।

রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর যে সব নীতিবান খলিফাগণ মুসলমান জাতিকে পরিচালিত করেছিলেন তাঁরা এ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করেন। বাজালাহ ইবনে আবদাহ্ বর্ণনা দেন যে খলিফা ওমর ইবনে আল খাত্তাব রোম এবং পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযানে লিপ্ত একটি মুসলিম বাহিনীর নিকট প্রেরিত একটি পত্রে তাদের মাতা, কন্যা এবং ভগ্নিদের বিবাহকৃত সকল যুরাষ্টীয়দের (অগ্নি উপাসক) বিবাহ বাতিল করার হুকুম দেন। আহলুল কিতাব শ্রেণীভুক্ত করার জন্য তাদেরকে (মুসলিম বাহিনীকে) যুরাষ্টীয় খাবার ভক্ষণ করতেও বলা হয়েছিল। তাদেরকেই মেরে ফেলার হুকুম দেন। বাজালাহ্ বলেন যে, এ আদেশের অধীনে তিনি নিজে তিনজন জাদুকরের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন।

মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেন যে রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী এবং ওমরের কন্যা হাফসার ওপর কিছু জাদু করার কারণে তাঁর একটি সেবিকাকে মেরে ফেলা হয়েছিল।

জাদু যে নিষিদ্ধ তা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের জানিয়ে আজও তৌরাতে এ শাস্তির উল্লেখ রয়েছে :

"পুরুষ অথবা মহিলা যে মৃত আত্মার মাধ্যমে অথবা জাদুকর হবে তাকে প্রাণদণ্ড দেয়া হবে, তাদেরকে পাথর ছুঁড়ে মারা হবে, তাদের রক্ত তাদের উপর স্থাপন করা হবে।"

ন্যায়পরায়ণ খলিফাদের সময়ের পর বিধি-বিধান শিথিল হয়ে পড়ে। উমাইয়া রাজারা জাদুকর এবং গণকদের নিষিদ্ধ কাজের অনুমতিই কেবল দেয়নি এমনকি তাদের রাজ দরবারে চালুও করেছিল। রাষ্ট্র এ আইন প্রয়োগ স্থগিত করায় কতিপয় সাহাবা (রাসূল ﷺ-এর সহচরবৃন্দ) নিজেরাই এ আইন বলবৎ রাখার দায়িত্ব নেন। আবু ওসমান আন-নাহ্দী বর্ণনা দেন যে, খলিফা আল-ওয়ালিদ ইবনে আবদিল-মালিক (শাসনকাল ৭০৫-৭১৫ খ্রিঃ) তার দরবারে একটি লোক রেখেছিল যে চাতুর্যপূর্ণ জাদু দেখাত।

একদিন সে এক ব্যক্তির মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলে। তার কাজে দর্শকবৃন্দ প্রচণ্ড চমকে উঠলে, সে মাথাটি পুনরায় সংযুক্ত করে তাদেরকে আরও অবাক করে দিল এবং লোকটি এরূপে হাজির হলো যেন তার মাথা কখনও কাটা হয়নি। দর্শকরা দম বন্ধ হয়ে আসার মতো হয়ে

বলল, "সুবহানাল্লাহ (মহিমা আল্লাহর) লোকটি মৃত ব্যক্তির জীবন দিতে সক্ষম!' যুন্দুব আল-আযাদী নামে এক সাহাবা আল-ওয়ালিদের দরবারে উত্তেজনা দেখে হাজির হলেন এবং জাদুকরের অনুষ্ঠান দেখলেন।

পরদিন, পিঠে তাঁর তরবারি বেঁধে নিয়ে ফিরলেন। যখন জাদুকর তার প্রদর্শনী দেখানোর জন্য অগ্রসর হলো, তখন যুন্দুব তাঁর তরবারি খুলে নিয়ে দর্শকদের মধ্য দিয়ে ছুটে গেলেন এবং জাদুকরের মাথাটা কোপ দিয়ে কেটে ফেললেন। তারপর তিনি হতবাক দর্শকদের দিকে ফিরে বললেন, "সে যদি সত্যি মৃত ব্যক্তির জীবন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় তাহলে তার নিজের জীবন ফেরৎ নিয়ে আসুক।" আল-ওয়ালিদ তাঁকে কারাগারে বন্দী করে রাখে।

কেবল আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য স্বর্গীয় গুণাবলী জাদুকরের ওপর আরোপ করে সমাজের দুর্বল ব্যক্তিরা যাতে তৌহিদ আল-আসমা ওয়াস সিফাতের শিরক এর মধ্যে না পড়ে সে জন্যই মূলত: জাদুকরের ওপর আইনের এ কঠোরতা প্রদর্শন। যারা ডাকিনীবিদ্যা চর্চা করে সে সব জাদুকররা ধর্মদ্রোহিতা সংঘটিত করা ছাড়াও সমর্থকমণ্ডলীকে আকর্ষণ এবং খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে প্রায়ই অলৌকিক ক্ষমতা এবং স্বর্গীয় গুণাবলির অধিকারী বলে নিজেদের দাবি করে।

এগারোতম অধ্যায়

অপার এবং অসীম আল্লাহ্

মানুষ যাতে আল্লাহকে অধিকতর উপলব্ধি করতে পারে সেজন্য সর্বশক্তিমান এবং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ আসমানী কিতাবসমূহ এবং তাঁর আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে নিজের প্রসঙ্গে বর্ণনা দিয়েছেন। জ্ঞানে এবং প্রসারতায় মানুষের বিচারশক্তি সীমিত বিধায় তাদের পক্ষে অসীম কিছু উপলব্ধি করা অসম্ভব। মানবজাতি যাতে আল্লাহর গুণাবলির সঙ্গে সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলি মিশ্রিত করে না ফেলে সেজন্য অনুগ্রহবশত হয়ে আল্লাহ্ তাঁর গুণাবলির কিয়দাংশ মানুষের নিকট প্রকাশ করার দায়িত্ব তাঁর নিজের ওপর নিয়েছেন।

আল্লাহর গুণাবলির সাথে সৃষ্টির গুণাবলি মিশ্রণ করে মানুষ পরিশেষে সৃষ্ট বস্তুর ওপর দেবত্ব আরোপ করে। সৃষ্টির ওপর এ জাতীয় দেবত্ব আরোপই সকল প্রকার পৌত্তলিকতার সারাংশ এবং ভিত্তি। সকল পৌত্তলিক ধর্ম এবং ধর্ম বিশ্বাসে মানুষ সৃষ্টিজাত প্রাণী অথবা বস্তুর ওপর মিথ্যাভাবে স্বর্গীয় গুণাবলি আরোপ করে এবং ফলশ্রুতিতে সেগুলো আল্লাহ্ ব্যতীত অথবা আল্লাহ্সহ উপাসনার বস্তুতে পরিণত হয়।

আল্লাহর অসংখ্য গুণাবলির মধ্যে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ গুণটি হলো একমাত্র তিনিই যাবতীয় ইবাদতের যোগ্য। গ্রীকদর্শন প্রভাবিত মু'তাজিলাহ্ মতাদর্শ অনুসারীদের আবির্ভাবের কারণে মুসলমানরা এ গুণটি প্রসঙ্গে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এখনও অনেক মুসলমান বিভ্রান্তিতেই রয়েছে। এ চরম গুরুত্বপূর্ণ গুণটি হলো আল উলু, (Al-Uloo) যার ইংরেজি অর্থ মহামান্য অথবা যা সমস্ত সীমার ঊর্ধ্বে। আল্লাহকে বর্ণনা করার জন্য যখন এটা ব্যবহার করা হয় তখন এ গুণটি হচ্ছে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির ঊর্ধ্বে এবং সৃষ্টিসীমা বহির্ভূত।

তিনি সৃষ্টির দ্বারা পরিবেষ্টিত নয় কিংবা সৃষ্টির কোনো অংশ কোনোভাবেই তার ঊর্ধ্বে নয়। তিনি সৃষ্টিজগতের অংশ নন কিংবা সৃষ্টিজগৎ তাঁর অংশ

নয়। মূলত: তাঁর সত্তা তার সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং আলাদা। তিনি বিশ্ব স্রষ্টা এবং এর মধ্যস্থিত সকল বস্তু তাঁর সৃষ্টির অংশ। তবে সৃষ্টির প্রকারভেদ সত্ত্বেও তাঁর গুণাবলি অপরিবর্তিত। তিনি সব কিছু দেখেন, শুনেন এবং জানেন এবং তিনি হলেন সৃষ্ট জগতে সব কিছু ঘটার মুখ্য হেতু। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না। ফলশ্রুতিতে, এ কথা বলা যেতে পারে যে আল্লাহর সাথে তাঁর সৃষ্টির সম্পর্ক প্রসঙ্গে ইসলাম দ্বৈত মতবাদ পোষণ করে। এ দ্বৈতবাদিতা এ অর্থে যে, আল্লাহ আল্লাহই এবং সৃষ্টি সৃষ্টিই। দুটি পৃথক সত্তা, স্রষ্টা অসীম এবং সৃষ্টি সসীম। একটি অপরটি নয় অথবা তারা উভয়ে এক নয়।

একই সঙ্গে ইসলামী মতবাদ আপোষহীনভাবে এককত্বের দর্শন এ অর্থে যে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং মাতাপিতা, সন্তান-সন্ততি অথবা অংশীদার বিহীন। তিনি তাঁর ঐশী শক্তিতে অনন্য এবং কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি বিশ্ব জগতের সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস এবং সব কিছুই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে, সৃষ্টির সাথে সম্পর্কের দিক থেকে তিনি দৃঢ়ভাবে একক, কারণ গোটা বিশ্বের যাবতীয় বস্তু আল্লাহ একাই সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত সৃষ্ট প্রাণী এবং সত্তা একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং এ কারণে 'প্রকৃতি' সৃষ্টির উপাদানসমূহ একই প্রাথমিক পদার্থসমূহ থেকে নির্মিত।

তাৎপর্য

ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর অপারতা ও অসীমতার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ইসলাম আবির্ভূত হবার পূর্বে এ মহৎ গুণের নিহিতার্থ হতে মানুষ গোমরাহী হয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছিল। খ্রিস্টানরা দাবি করে যে, আল্লাহ দুনিয়ায় রক্ত মাংসের মানুষের আকারে পয়গম্বর ঈসা (যিশু) হিসেবে আবির্ভূত হন যাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। এদের পূর্বে ইহুদীরা দাবি করেছিল যে আল্লাহ মানুষের রূপে দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন এবং একটি মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় পয়গম্বর ইয়াকুব (জেকব) এর নিকট পরাজিত হন। (নাউযুবিল্লাহ)

পারস্যবাসীরা তাদের রাজাদের আল্লাহর সকল গুণাবলিতে ভূষিত দেবতা বলে গণ্য করত এবং তাদের পূজা করত। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে ব্রহ্মা সর্বোচ্চ সত্তা সর্বস্থানে এবং সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজমান। ফলশ্রুতিতে তারা অগণিত মূর্তি, মানুষ এমনকি জন্তুকেও ব্রহ্মার ব্যক্তি রূপের প্রকাশ বলে পূজা করে। মূলত: এ বিশ্বাস হিন্দুদেরকে এমন এক অবিশ্বাস্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে

যেখানে শিব দেবতা, যাকে পুরুষের উত্তোলিত লিঙ্গ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং আদর করে যাকে "লিঙ্গম" বলা হয়, তাকে পূজা করার জন্য তাদের পবিত্র শহর বানারসে তীর্থযাত্রা করে।

ব্রহ্মা সর্বত্র বিরাজমান– এ হিন্দু মতবাদ পরবর্তীতে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের একটি অংশ হয়ে যায় এবং রাসূল ﷺ-এর অনেক প্রজন্মের পর অবশেষে মুসলমানদের মধ্যেও এ বিশ্বাস প্রবেশ করে। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে যখন ভারতবর্ষ, পারস্য এবং গ্রীক দেশের দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থগুলো অনুবাদ করা হয়; আল্লাহ্ সকল স্থানে এবং সব কিছুর মধ্যে বিরাজমান এ মতবাদ তখন দার্শনিক পরিমণ্ডলে পেশ করা হয়।

সূফীরা (মরমীরা) তখন এ মতবাদের অনুসরণ আরম্ভ করে। অবশেষে, মু'তাযিলাহ্র (যুক্তিবাদী) অনুসারীদের মধ্যে (যারা একটি দর্শনভিত্তিক গোষ্ঠী নামে পরিচিত এবং যাদের মধ্যে অনেকে আব্বাসীয় খলিফা মামুনের (শাসনকাল : ৮১৩ থেকে ৮৩২ খৃঃ) প্রশাসনের সময় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) এ মতবাদ আলোড়ন সৃষ্টি করে। খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় মু'তাযিলারা তাদের বিকৃত দর্শন ও মতবাদ বিশদভাবে প্রচার করতে আরম্ভ করল। সারা সাম্রাজ্যে আদালত বসানো হয় এবং মু'তাযিলাহ্ দর্শনের বিরোধিতা করার কারণে বহু জ্ঞানী ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড, জেল ও নিপীড়ন করা হয়।

এ অবস্থায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলই প্রথম (৭৭৮-৮৫৫ খ্রিঃ) নিজ অবস্থানে দৃঢ় থেকে প্রথম দিকের মুসলমান আলেম (পণ্ডিত) এবং সাহাবাদের (রাসূল ﷺ-এর সহচরবৃন্দ) পক্ষাবলম্বন করেন এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। খলিফা আলমুতাওয়াক্কিল (Al-Mutawakkil, শাসনকাল ৮৪৭-৮৬১) রাজত্বকালে মু'তাযিলাভুক্ত দার্শনিকদের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ থেকে অপসারণ করা হয় এবং তাদের দর্শন সরকারিভাবে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়।

যদিও তাদের অধিকাংশ মতবাদ সময়ের সাথে সাথে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তবুও আল্লাহ যে সর্বত্র বিরাজমান (সর্বব্যাপী) তার আশারীয় মতবাদ অনুসারীদের মধ্যে আজও বিদ্যমান। যে সব পণ্ডিত মু'তাযিলাহ্ দর্শন ছেড়ে দেন এবং মু'তাযিলাহ্ তত্ত্বের মাত্রাধিক দার্শনিক ভিত্তি খণ্ডন করার প্রচেষ্টা করেন তাঁরাই আশারীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সর্বব্যাপিতা মতবাদে বিপদ

স্বর্গীয় সর্বব্যাপিতা (স্রষ্টা সর্বত্র বিরাজমান এ বিশ্বাস) নামক ভ্রান্ত গুণাবলির ভিত্তিতে কেউ কেউ দাবি করে যে, স্রষ্টা প্রাণী, বৃক্ষরাজি অথবা খনি পদার্থের চেয়ে মানুষের মধ্যে বেশি বিদ্যমান ছিল। ঐ তত্ত্ব থেকে কেউ কেউ দাবি করেছিল যে অন্যান্য মানুষের তুলনায় স্রষ্টা, হুলুল (মানুষের মধ্যে বসবাসকারী আল্লাহ) অথবা ইত্তিহাদ (মানুষের আত্মার সাথে আল্লাহর আত্মার সম্পূর্ণ এককত্বতা) এর কারণে তাদের নিজেদের মধ্যে বেশি বিরাজমান।

নবম শতাব্দীর মুসলমানগণের মধ্যে আল হাল্লাজ (৮৫৮-৯৯২ খ্রিঃ) নামে একজন উন্মাদ সাধক এবং তথাকথিত ওলি সরাসরিভাবে ঘোষণা দেয় যে, সে এবং আল্লাহ এক। দশম শতাব্দীর শিয়া সম্প্রদায় থেকে দলত্যাগী নুশারাইতগণ দাবি করেছিল যে রাসূল ﷺ-এর জামাতা আলী ইবনে আবু তালিব এর মাধ্যমে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে দ্রুজ নামে অপর এক দলত্যাগী শিয়া সম্প্রদায় দাবি করেছিল যে, ফাতেমীয় শিয়া খলিফা আল হাকিম বিন আমরুল্লাহ (৯৯৬-১০২১ খ্রিঃ) মানুষের মধ্যে স্রষ্টার শেষ দেহধারণ। ইবনে আরাবী (১১৬৫-১২৪০ খ্রিঃ) নামে দ্বাদশ শতাব্দীর এক তথাকথিত সূফী ওলি বিশ্বাস করত যে, স্রষ্টা মানুষের ভিতরে বিরাজমান।

কাজেই তার কবিতার মাধ্যমে তার অনুসারীদের নিজেদেরকে প্রার্থনা করার এবং নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে প্রার্থনা না করায় উৎসাহিত করেছিল। এ একই মতবাদের সারমর্ম অনুযায়ী আমেরিকায় এলাইজা মুহাম্মদ (মৃত্যু : ১৯৭৫) দাবি করে যে প্রত্যেক কৃষ্ণকায় মানুষের মধ্যেই আল্লাহ আছে এবং তার পরামর্শদাতা ব্যক্তি মুহাম্মদ নিজেই সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ। মানুষের নিজেকে স্রষ্টা বলে দাবি করা এবং তা মেনে নেবার সবচেয়ে সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হলো ১৯৭৯ সনে গায়ানায় রেভারেন্ড জিম জোনস (Reverend Jim Jones) তাঁর ৯০০ জন অনুসারীসহ নিজস্ব জীবন বিসর্জন করা।

মূলত: জিম জোনস অন্য আর একজন আমেরিকান যে নিজের নাম "ফাদার ডিভাইন" (Father Divine স্বর্গীয় পিতা) রেখেছিল, তার নিকট থেকে নিরপরাধ ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের দর্শন এবং মনস্তাত্ত্বিক কৌশল শিখেছিল। ফাদার ডিভাইন এর বাস্তব নাম ছিল জর্জ

বেকার (George Baker)। ১৯২০ সনের পূর্বের মন্দা (depression) কালে জর্জ বেকার গরীবদের জন্য রেস্টুরেন্ট খুলেছিল। তাদের পেট জয় করার পর, সে তাদের ওপর এ দাবি প্রক্ষেপ করেছিল যে সে মূর্তিমান ঈশ্বর। সময় কালে সে বিবাহ্ করে এবং তার কানাডীয় স্ত্রীর নাম রাখে মাদার ডিভাইন। ত্রিশ দশকের মাঝামাঝির মধ্যে তার অনুসারীদের কোঠা নিযুত ছাড়িয়ে যায় এবং গোটা যুক্তরাষ্ট্র এমনকি ইউরোপেও তার অনুসারীদের দেখা যায়।

এভাবে ঈশ্বরতত্ত্বের এ সব দাবি কোনো নির্দিষ্ট স্থান অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা যেখানেই উর্বর জমি পেয়েছে সেখানেই সহজে শিকড় গজিয়েছে। মানুষরূপী-ঈশ্বর মতবাদ গ্রহণ করার জন্য কারো মনে যদি ইতোমধ্যেই ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতায় বিশ্বাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকে তাহলে যারা দেবত্ব দাবি করে তারা সহজেই এদেরকে অনুসারী হিসেবে পেয়ে যায়।

অতএব, পরিশেষে বলা যায় যে, "আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান" এ বিশ্বাস অতিশয় বিপজ্জনক; মুখ্যত এ কারণে যে, এ বিশ্বাস আল্লাহর সৃষ্টিকে দাসত্ব করার মতো সবচেয়ে বড় অপরাধকে উৎসাহিত করে, নিরাপত্তা বিধান করে এবং যুক্তিসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করে। এটা তৌহিদ আল আসমা ওয়াস সিফাত অন্তর্গত শিরকেরও একটি রূপ। কারণ এটি স্রষ্টার জন্য এমন গুণ দাবি করে যা তাঁর নয়। কুরআনে কারীম অথবা রাসূল ﷺ-এর মুখে আল্লাহ্র এ জাতীয় বর্ণনা পাওয়া যায় না। মূলত কুরআন এবং সুন্নাহ এর বিপরীত নিশ্চিত করে।

স্পষ্ট প্রমাণাদি

যেহেতু আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় পাপ হলো তাকে ছাড়া অথবা তাঁর পাশাপাশি অন্যকে দাসত্ব করা এবং তিনি ছাড়া অন্য সকলই তাঁর সৃষ্টি, সেহেতু ইসলামের সকল দর্শন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সৃষ্টিকে দাসত্ব করার বিরোধিতা করে। বিশ্বাসের মৌলিক দর্শন স্রষ্টা এবং তার সৃষ্টির মধ্যে অতি পরিষ্কার স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে। আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা এবং তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে এ বিষয়টি মুসলমান আলেমগণ প্রতিষ্ঠা করান এবং সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে যে অগণিত প্রমাণাদি রয়েছে তা ব্যবহার করেন। এ জাতীয় সাতটি প্রমাণ নিম্নরূপ–

১. সহজাত প্রবৃত্তি থেকে প্রমাণ

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ কিছু স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সে শুধুমাত্র তার পরিবেশের সৃষ্টি নয়। এ বিষয়টির ভিত্তি কুরআনের সেই অংশ যেখানে আল্লাহ্ বর্ণনা দিয়েছেন যে যখন তিনি আদম সৃষ্টি করেন তখন তিনি আদম থেকে তার সকল বংশধরদের বের করে এবং তার এককত্বের সাক্ষী করেন। এ মতবাদটি আরও শক্তিশালী হয় রাসূল ﷺ-এর বর্ণনায় যে, প্রতিটি সদ্যজাত শিশু আল্লাহকে প্রার্থনা করার প্রবণতা নিয়ে ভূমিষ্ট হয়। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে একজন ইহুদী, একজন জাদুকর অথবা একজন খ্রিস্টান হিসেবে গড়ে তোলে।

আল্লাহকে প্রার্থনা করার এ সহজাত প্রতিক্রিয়া "আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান" এ বিশ্বাসের যুক্তি হিসেবে কেউ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু যদি আল্লাহ্ সর্বত্র এবং সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে এটা ইঙ্গিত করে যে ঈশ্বরের নির্যাস নোংরা বস্তু এবং নোংরা স্থানেও দেখা যাবে। অধিকাংশ মানুষ স্বাভাবিকভাবে এ চিন্তা করতেই অরুচি বোধ করে। সহজাতভাবে তারা এমন কোনো বিবৃতি গ্রহণ করতে অপারগ যা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মানুষের বিষ্ঠা অথবা অন্য কোনো বস্তুর মধ্যে অথবা মহামান্যের জন্য যথাযথ নয় এমন স্থানে বিদ্যমান।

অতএব, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, "আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান" এ দাবি সঠিক হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। যারা "স্রষ্টা সর্বত্র বিরাজমান" এ বিশ্বাস ছাড়তে ইচ্ছুক নয়, তারা তর্ক করতে পারে যে সহজাত প্রবৃত্তির জন্য নয়, ছেলেবেলার শিক্ষাদীক্ষা এবং সামাজিক অবস্থানের ফলশ্রুতিতে মানুষের এ মতবাদের প্রতি বিকর্ষণ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বল্প বয়স্ক সন্তান-সন্ততিরা আল্লাহ্ যে সর্বত্র বিরাজমান সে প্রসঙ্গে আগেই শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দ্বিধা অথবা গভীর চিন্তা ছাড়াই তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে।

২. প্রার্থনা থেকে প্রমাণ

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সালাতের স্থানসমূহকে মূর্তি অথবা ছবি দ্বারা আল্লাহ্ বা তাঁর সৃষ্টিকে প্রকাশিত করা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে। এ ভিত্তি সালাতের বিভিন্ন ভঙ্গি (আনত হওয়া, অবনত হওয়া ইত্যাদি) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি উদ্দেশ্য করা নিষিদ্ধ। স্রষ্টা যদি সকল স্থান, বস্তু এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে বিরাজমান হতো তাহলে

অখ্যাত সূফী "ওলি" ইবনে আরাবীর দাবি অনুযায়ী একজন অপরকে উদ্দেশ্য করে অথবা এমনকি স্বয়ং তাদের নিজেদেরকে উদ্দেশ্য করে তাদের ইবাদত পরিচালনা করা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণীয় হতো।

একজন মূর্তিপূজারীকে অথবা বৃক্ষ এবং প্রাণী পূজারীকে যৌক্তিকভাবে বুঝানো সম্ভব হবে না যে তার পূজার পদ্ধতি ভুল এবং অদৃশ্য স্রষ্টা যিনি একা এবং অংশীদারবিহীন শুধু তাঁরই প্রার্থনা করা আবশ্যক। মূর্তিপূজারী পরিষ্কার উত্তর দেবে যে, সে বস্তুকে পূজা করছে না, সে এ বস্তুর মধ্যে নিহিত স্রষ্টার অংশ অথবা মানুষ বা প্রাণীর রূপ আকারে প্রকাশিত স্রষ্টাকে পূজা করছে। তথাপি হাজার যুক্তি সত্ত্বেও যে কেউ এ ধরনের কাজ করে ইসলাম তাকে কাফির (অবিশ্বাসী) শ্রেণীভুক্ত করে।

মূলত: এ জাতীয় ব্যক্তি বিশেষ স্রষ্টার সৃষ্টির সম্মুখে সিজদায় যায়। মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর দাসত্ব থেকে সরিয়ে নিয়ে একমাত্র স্রষ্টার দাসত্বের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল। অতএব উপাসনা প্রসঙ্গে ইসলাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, আল্লাহকে সৃষ্টি করা বস্তুর মধ্যে পাওয়া যাবে না; তিনি তাদের থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। এ অবস্থান আরও মজবুত হয় এ কারণে যে স্রষ্টা অথবা প্রাণিজগতের জীবন্ত কিছুকে ছবি দ্বারা প্রকাশ করাকে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

৩. মিরাজ থেকে প্রমাণ

মদীনায় হিজরত করার দুই বছর পূর্বে রাসূল ﷺ মক্কা থেকে জেরুজালেমে অলৌকিক রাত্রি সফর (ইসরা) করেন এবং সেখান থেকে রাসূল ﷺ বোরাকে চড়ে সাত আসমানের সৃষ্টির সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেন।

তিনি যাতে সরাসরি আল্লাহর সামনে হাজির হতে পারেন এ জন্য তাঁকে এ অলৌকিক সফর করানো হয়েছিল। সেখানে সপ্তম আসমানের উর্ধ্বে, দিনে পাঁচবার সালাত (আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা) আবশ্যক করা হয়, আল্লাহ সরাসরি রাসূল ﷺ-এর সাথে আলাপ আলোচনা করেন এবং সূরা আল-বাকারার (কুরআনের দ্বিতীয় সূরা) শেষ আয়াতগুলো নাযিল হয়।

যদি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান হতেন তাহলে রাসূল ﷺ-কে কোথাও যেতে হতো না। তিনি নিজের বাড়িতে সরাসরি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে

পারতেন। অতএব, অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বে স্বর্গারোহণে একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে যে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির ঊর্ধ্বে এবং এর কোনো অংশ নয়।

৪. কুরআনে কারীম থেকে প্রমাণ

আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির ঊর্ধ্বে কুরআনে বর্ণিত এরূপ অসংখ্য আয়াত রয়েছে। এগুলো কুরআনের প্রায় প্রতি সূরাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যে সব আয়াতে কোনো জিনিসের স্রষ্টা পর্যন্ত ঊর্ধ্বে গমন অথবা তাঁর পক্ষ থেকে অবতরণের উল্লেখ রয়েছে এগুলো পরোক্ষ ইঙ্গিতের মধ্যে পড়ে। যথা– আল ইখলাছে আল্লাহ্ নিজেকে আস-সামাদ বলে নামকরণ করেছেন, যার অর্থ : বস্তু যার নিকট ঊর্ধ্বগামী হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ জাতীয় উল্লেখ আক্ষরিক, যেমন ফেরেশতাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۔

অর্থাৎ, ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে যা দুনিয়ায় পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (সূরা–৭০ আল মা'আরিজ : আয়াত-৪)

এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক, যেমন সালাত এবং জিকির প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ۔

অর্থাৎ, তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে।

(সূরা–৩৫ ফাতির : আয়াত-১০)

এমনকি নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে–

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۔ اَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۔

"অর্থাৎ, ফিরাআউন বলল, 'হে হামান আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ অট্টালিকা যাতে আমি পাই আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যেন দেখতে পাই মূসার ইলাহকে; তবে আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।

(সূরা-৪০ মু'মিন : আয়াত-৩৬-৩৭)

আল্লাহর পক্ষ থেকে অবরোহণ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতে দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে-

قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থাৎ, বল! তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে রুহুল কুদস জিবরাঈল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যারা ঈমানদার তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদের জন্য।

(সূরা-১৬ আন নাহল : আয়াত-১০২)

আল্লাহর নামসমূহে এবং তাঁর প্রদত্ত স্পষ্ট বাণীতে প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, আল্লাহ্ নিজেকে আল-আলী এবং আল আলা বলে নামকরণ করেছেন, যার উভয়ের অর্থ সুউচ্চ, যার উপরে আর কিছু নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "আল আলী আল আধহীম" "রাবি কোল আলা।" তিনি নিজেকে তাঁর বান্দার ঊর্ধ্বে বলেও সুনির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন-

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ -

অর্থাৎ, তিনি আপন বান্দাদের ওপর পরাক্রমশালী।

(সূরা-৬ আল আন'আম : আয়াত-১৮ এবং ৬১)

এবং তিনি তাঁর ইবাদতকারীদেরও যেমন বর্ণনা দেন-

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ -

অর্থাৎ, তারা ভয় করে, তাদের ওপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে।

(সূরা-১৬ আন নাহল : আয়াত-৫০)

অতএব, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে, কুরআন নিজেই তাদের স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে আল্লাহ যে সৃষ্টির অনেক ঊর্ধ্বে এবং কোনো উপায়েই এর ভিতরে অথবা এর দ্বারা পরিবেষ্টিত নয়।

৫. হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণ

রাসূল ﷺ-এর বর্ণনায় অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে যেগুলো পরিষ্কারভাবে প্রতিষ্ঠা করে যে আল্লাহ্ পৃথিবী অথবা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নয়। কুরআনের আয়াতগুলোর মতো হাদীসে কতিপয় পরোক্ষ এবং কিছু প্রত্যক্ষ উল্লেখ রয়েছে। পরোক্ষ হাদীস ঐগুলো যেগুলোতে ফেরেশতাদের আল্লাহ্ পর্যন্ত ঊর্ধ্বগমনের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, "(একদল) ফেরেশতারা রাত্রে এবং (অন্য আর একদল) দিনে তোমার সাথে অবস্থান করে এবং আসর (সন্ধ্যা) ও ফজর (প্রত্যুষ) সালাতের সময় উভয় দল একত্রিত হয়। তরপর যে সব ফেরেশতা সারারাত তোমার কাছে ছিল তারা ঊর্ধ্বে গমন (আসমানে) করে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন (তোমাদের প্রসঙ্গে) যদিও তিনি তোমার প্রসঙ্গে সবই জানেন .....।"

আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় দু'আয় (প্রার্থনা) যদ্বারা রাসূল ﷺ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের তাদের নিজেদের জন্য প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন–

رَبَّنَا اللّٰهَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ ـ

রাব্বানা আল্লাহ্ আল্লাজি ফিস সামায়ী তাকাদাসাসমুকা।

অর্থাৎ, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ যিনি আসমানের উপর, আপনার নাম পবিত্র হউক।

সম্ভবত নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রত্যক্ষ উল্লেখের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত :

মু'আবিয়াহ ইবনে আল হাকাম বলেন, "আমার একটি চাকরাণী ওহুদ পাহাড় এলাকার আল জাওয়ারীয়াহ নামে একটি স্থানে ভেড়া চরাত। একদিন আমি এসে দেখলাম যে একটি নেকড়ে বাঘ তার ভেড়ার পাল থেকে একটি ভেড়া তুলে নিয়ে গেছে। যেহেতু আদমের অন্যান্য বংশধরদের মতো আমার মধ্যে দুঃখজনক কাজ করার প্রবণতা ছিল, আমি তার মুখে সজোরে আঘাত করলাম। আমি যখন ঘটনাটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট বর্ণনা দিলাম, তিনি এটাকে আমার পক্ষ থেকে গুরুতর কাজ সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করলেন। আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি কি তাকে মুক্তি দিতে পারি না?"

তিনি উত্তর দিলেন, "তাকে আমার নিকট নিয়ে এস।" অতএব আমি তাকে নিয়ে এলাম। তিনি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আল্লাহ্ কোথায়? এবং সে উত্তর দিল, "আসমানের উপরে।" তারপর তিনি চাকরাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কে?" এবং সে উত্তর দিল, "আপনি আল্লাহর রাসূল।" সুতরাং তিনি বললেন, "তাকে মুক্তি দাও, কারণ নিশ্চয়ই সে একজন সত্যিকার বিশ্বাসী।"

অন্যের বিশ্বাস পরীক্ষা করার সময় তাকে জিজ্ঞসা করার জন্য যৌক্তিক প্রশ্ন হবে "তুমি কি আল্লাহকে বিশ্বাস কর?" রাসূল ﷺ ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেননি কারণ ঐ সময় অধিকাংশ মানুষই আল্লাহকে বিশ্বাস করত, যেমন বারবার কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔

অর্থাৎ, যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্।

(সূরা–২৯ আনকাবুত : আয়াত-৬১)

যেহেতু ঐ সময়কার মূর্তীপূজারী মক্কাবাসীরা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্ যে কোনো ভাবেই হোক তাদের মূর্তিদের মধ্যে বিদ্যমান এবং তার ফলে সৃষ্টির কিছু অংশের মধ্যে বিদ্যমান, রাসূল ﷺ বের করতে চেয়েছিলেন যে, অন্যান্য মক্কাবাসীদের মতো ঐ চাকরাণীটির বিশ্বাস বিভ্রান্ত এবং মূর্তীপূজারী ভাবধারার ছিল, নাকি স্বর্গীয় শিক্ষানুযায়ী পরিষ্কারভাবে এককত্বের দর্শনের মধ্যে ছিল। এ কারণে রাসূল ﷺ এরূপে প্রশ্নটি করলেন যার ফলে নির্ধারণ করা যায় যে বালিকাটি কি জানে যে, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির অংশ নয়, নাকি সে বিশ্বাস করে যে সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টার দাসত্ব করা যায়।

খাঁটি মুসলমানদের ধরে নিতে হবে যে, 'আল্লাহ্ আসমানের উপরে', চাকরাণীটির এ উত্তর 'আল্লাহ্ কোথায়' এ প্রশ্নের একমাত্র বৈধ উত্তর। কারণ এরই ভিত্তিতে রাসূল ﷺ রায় দিয়েছেন যে, বালিকাটি সত্যিকার মুসলমান। যদি আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান হতো, যা নিয়ে এখনও কিছু মুসলমান তর্ক করে, তাহলে রাসূল ﷺ "আসমানের উপরে" এ উত্তরের ভুল সংশোধন

করতেন। রাসূল ﷺ-এর সামনে যা কিছু বলা হতো তা তিনি প্রত্যাখ্যান না করলে বিধান অনুযায়ী হিসেবে অনুমোদিত সুন্নাহ (তাকরীরিয়াহ্) বলে গণ্য হতো এবং তা জায়েয হতো। যা হোক, রাসূল ﷺ বালিকাটির ভাষ্য শুধু গ্রহণই করেননি, বরং তিনি তাকে একজন সত্যিকার বিশ্বাসী হিসেবে গণ্য করার একটি ভিত্তি হিসেবেও ব্যবহার করেছিলেন।

৬. যুক্তিসম্মত প্রমাণ

যুক্তিসম্মতভাবে বলতে গেলে, এটা সুস্পষ্ট যে যখন দুটি জিনিস বিদ্যমান থাকে, তাদের মধ্যে একটি নিশ্চয়ই অপরটির একটি অংশ এবং এর গুণাবলির ওপর নির্ভরশীল হয় অথবা অন্যটির থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করে। এ অনুযায়ী স্রষ্টা যখন বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন তখন হয় তিনি তাঁর নিজের ভিতরে তা সৃষ্টি করেছিলেন অথবা তাঁর নিজের বাইরে সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথম সম্ভাবনা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তখন এর অর্থ দাঁড়াতো যে আল্লাহর অসীম সত্তার মধ্যে অসম্পূর্ণ এবং দুর্বল সসীম গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে। অতএব তিনি নিশ্চয়ই তাঁর নিজের বাইরে তাঁর থেকে স্বতন্ত্র অথচ তাঁর ওপর নির্ভরশীল একটি সত্তা হিসেবে বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন।

নিজের থেকে বাইরে বিশ্ব সৃষ্টি করে মনে হয় তিনি তাঁর থেকে উপরে অথবা নিচে এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। যেহেতু মানব জাতির অভিজ্ঞতায় নিচের দিকে প্রার্থনা করা কোথাও নিশ্চিত করে না এবং সৃষ্টির নিচে হওয়াকে স্রষ্টার মহত্ত্ব মহিমা এবং সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা করা হয়, সেহেতু স্রষ্টা নিশ্চয়ই তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে এবং এর থেকে স্বতন্ত্র। স্রষ্টা পৃথিবীর সাথে সম্পৃক্ত নয়, এর থেকে আলাদাও নয় অথবা তাঁর অস্তিত্ব পৃথিবীর মধ্যেও নয় এবং এর বাইরেও নয়। এ জাতীয় পরস্পর বিরোধী বক্তব্য শুধু অযৌক্তিকই নয় এগুলো মূলত: স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এ জাতীয় দাবি স্রষ্টাকে মানুষের চিন্তার পরবাস্তববাদী (Surrealistic) রাজ্যে নিয়ে যায় যেখানে বিপরীত বস্তু সহ-অবস্থানে থাকতে পারে এবং অসম্ভব বিদ্যমান থাকে (যেমন একের মধ্যে তিন স্রষ্টা)।

৭. পূর্ববর্তী আলেমদের ঐকমত্য

স্রষ্টার সীমাবহির্ভুত অস্তিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পূর্বেকার ইসলামী আলেমগণের এত অসংখ্য বক্তব্য রয়েছে যে তা তুলে ধরা এ সংক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার বাইরে। পঞ্চদশ শতকের হাদীস পণ্ডিত আধ-ধাহাবী আল্লাহর অপার

এবং অসীম অস্তিত্ব নিশ্চিত করে অতীতের দুই শতেরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ আলেমদের ভাষ্য 'আল-উলু লিল 'আলী আল-আধহীম' নামে একটি পুস্তকে গ্রন্থিত করেছিলেন।

এ জাতীয় ভাষ্যের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত মূতী আল-বালাখীর বর্ণনায় পাওয়া যায়, যেখানে তিনি আবু হানীফা (র)-এর নিকট জানতে চান সেই ব্যক্তি প্রসঙ্গে যে জানে না তার পালনকর্তা আসমানে না জমিনের উপর বিদ্যমান। আবু হানীফা উত্তর দিলেন, "সে অবিশ্বাস করেছে, কারণ আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "দয়াময় 'আরশে সমাসীন।' (সূরা-২০ ত্বাহা : আয়াত-৫)

এবং তাঁর সিংহাসন সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে।" অতঃপর তিনি (আল-বালাখী) বললেন, "যদি সে বলে যে, তিনি (আল্লাহ) সিংহাসনের উপরে কিন্তু যে জানে না সিংহাসনটি আসমানে না জমিনের উপরে, তাহলে কি হবে?"

তিনি (আবু হানীফা) উত্তর দিলেন, "সে অবিশ্বাস করেছে কারণ তিনি (আল্লাহ) আসমানের ঊর্ধ্বে বিদ্যমান এ কথা সে অস্বীকার করেছে এবং তিনি আসমানের ঊর্ধ্বে এ কথা যে অস্বীকার করবে সে অবিশ্বাসী।" যদিও আবু হানীফার আইন শিক্ষার বহু অনুসারীগণ বর্তমানে দাবি করে যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, পূর্বের অনুসারীগণ এ দাবির সঙ্গে একমত ছিলেন না। ঐ সময়ের এবং তৎকালীন সময়ের বহু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে বিশর আল মারীছী যখন আল্লাহ সিংহাসনের ঊর্ধ্বে এ কথা অস্বীকার করেছিল তখন আবু হানীফা (র)-এর প্রধান ছাত্র আবু ইউসুফ তাকে অনুতপ্ত হতে বলেছিলেন।

সারমর্ম

অতএব, ইসলাম এবং এর প্রধান তত্ত্ব তাওহীদ অনুসারে নিরাপদে বলা যায় যে–

১. আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক।

২. কোনো প্রকারেই সৃষ্টি তাঁকে বেষ্টিত করেনি অথবা তাঁর ঊর্ধ্বে বিদ্যমান নেই।

৩. আল্লাহ সকল বস্তুর ঊর্ধ্বে।

ইসলামের মূল সূত্র হিসেবে আল্লাহ প্রসঙ্গে এটাই হলো সঠিক মতবাদ। এটা অত্যন্ত সহজ এবং দৃঢ়। এতে এমন কোনো স্থান নেই যার ফলে সৃষ্টিকে দাসত্ব করার মতো ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করার আশংকা থাকে।

এ মতবাদ অবশ্য অস্বীকার করে না যে, আল্লাহর গুণাবলি তাঁর সৃষ্টির সর্বাংশে চালু রয়েছে। কিছুই তাঁর দৃষ্টি, জ্ঞান এবং শক্তি এড়িয়ে যেতে পারে না। ঘরের আরামদায়ক পরিবেশে বসে দুনিয়ার অপর প্রান্তের ঘটনা অবলোকন করাকে যখন প্রযুক্তির প্রধান অগ্রগতি মনে করা হয়, সেখানে এটা মোটেও অসম্ভব নয় যে বিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান না থেকেও আল্লাহ্ যেখানে যা কিছু ঘটে তা সবই দেখতে, শুনতে এবং জানতে পান।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন "তোমাদের হাতে সরিষার দানা যেমন, আল্লাহর হাতে সপ্ত আসমান, সপ্ত পৃথিবীর, তাদের অভ্যন্তরস্থ এবং মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু তেমন।" রিমোট কন্ট্রোলের (Remote Control) সাহায্যে টেলিভিশন চালানোকে যেখানে প্রযুক্তির বিরাট অগ্রগতি গণ্য করা হয়, সেখানে সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম কণার নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্র উপস্থিতি ব্যতিরেকেই অবিঘ্নিতভাবে ঘটা কোনো ব্যাপার নয়। মূলত, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান, এ দর্শন তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত বিরোধী শিরক। কারণ এখানে আল্লাহর ওপর মানুষের দুর্বলতা আরোপ করা হয়েছে। দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে তা দেখা, শুনা, জানা এবং প্রভাব ফেলতে হলে মানুষকেই এ পৃথিবীতে হাযির থাকতে হয়।

অন্যদিকে, আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতার কোনো শেষ নেই। মানুষের চিন্তাভাবনা আল্লাহর নিকট একেবারেই অনাবৃত এবং এমনটি তার অন্তরের আবেগপূর্ণ কার্যাদিও আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভরশীল। এ জ্ঞানালোকের দ্বারা কতিপয় আয়াত যেগুলো আল্লাহর নিকটবর্তীতার ইঙ্গিত করে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ـ

অর্থাৎ, আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।

(সূরা–৫০ কাফ : আয়াত-১৬)

তিনি আরও ইরশাদ করে–

يَٓا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ মানুষ ও তাঁর অন্তরের অন্তরালে থাকেন এবং তারই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (সূরা–৮ আনফাল : আয়াত-২৪)

আলোচ্য আয়াতগুলো দ্বারা এ ধারণা করা উচিত হবে না যে, আল্লাহ্ মানুষের ঘাড়ের মোটা শিরা থেকেও কাছে রয়েছে অথবা মানুষের অন্তরের অভ্যন্তরে থেকে এর অবস্থার পরিবর্তন করছে। এগুলোর অর্থ এই যে, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না, এমনকি মানুষের অন্তরের চিন্তাভাবনা ও তার অন্তরের ভাবাবেগও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনের ক্ষমতার বাইরে নেই। যেমন আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–

اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তারা কি জানে না যে, যা তারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা অবগত আছেন। (সূরা–২ বাকরা : আয়াত-৭৭)

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ـ

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর দয়ায় তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।

(সূরা–৩ আলে ইমরান : ১০৩)

এবং রাসূল ﷺ প্রায়ই এ মর্মে প্রার্থনা করতেন–

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ ـ

"ইয়া মুকাল্লিব আল-কুলূব সাব্বিত ক্বালবী আলা দ্বীনিক"। (হে অন্তর পরিবর্তনকারী! তোমার ধর্মে আমার অন্তর স্থির করে দাও)।

অনুরূপভাবে আয়াতগুলো–

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلاَثَةٍ اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ اِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلآَ اَكْثَرَ اِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ـ

"অর্থাৎ, তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি হাজির থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি হাজির থাকেন না; তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন। (সূরা–৫৮ আল মুজাদালা : আয়াত-৭)

বুঝতে হবে তাদের পটভূমি অনুসারে। একই আয়াতের পূর্ববর্তী অংশ তিলাওয়াত করে–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ ـ

অর্থাৎ, তুমি কি অনুধাবন কর না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন। (সূরা–৫৮ মুজাদালাহ : আয়াত-৭)

এবং আয়াতের সমাপনী থেকে,

ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ـ

অর্থাৎ, তারা যা করে, তিনি তাদেরকে শেষ বিচার দিবসে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। (সূরা–৫৮ মুজাদালা : আয়াত-৭)

এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ এখানে তাঁর সর্বব্যাপিতা নয় বরং তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কারণ তিনি তাঁর সৃষ্টির ঊর্ধ্বে এবং নাগালের বাইরে।

অনেকে দাবি করে রাসূল ﷺ বলেছেন, যেটা আসলে অনির্ভরযোগ্য হাদীস, "আসমান এবং পৃথিবী আল্লাহকে ধারণ করতে পারে না কিন্তু সত্যিকার ঈমানদারের হৃদয় তাঁকে ধারণ করতে পারে। কিন্তু কোনো যুক্তিবাদী ব্যক্তির পক্ষেই আল্লাহ যে ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান এ অনুমান করার কোনো উপায় নেই। যদি একজন বিশ্বাসীর অন্তর আল্লাহকে ধারণ করে এবং সে বিশ্বাসী যদি আসমান এবং জমিনের মধ্যে অবস্থান করে তাহলে আল্লাহ আসমান এবং জমিনের অন্তর্ভুক্ত। কারণ যদি ক, খ-এর ভিতরে থাকে এবং খ, গ-এর ভিতরে থাকে তাহলে ক অবশ্যই গ-এর ভিতরে আছে।

অতএব, কুরআন ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ ভিত্তিক চিরায়ত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে মহাবিশ্ব এবং এর অন্তর্গত সকল কিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ এরূপে বিদ্যমান আছেন যা তাঁর মহিমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এর অভ্যন্তরস্থ বস্তুবিদ উর্ধ্বে এবং তিনি কিছুতেই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অথবা তাঁর নিজের মধ্যে ধারণকৃত নয়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির সমস্ত কণিকার মধ্যে কোনো বাধা ব্যতীতই তাঁর অসীম জ্ঞান, ক্ষমতাশীলতা এবং নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পাদন করে।

বারোতম অধ্যায়
আল্লাহকে দেখা

আল্লাহর প্রতিচ্ছবি

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের মানসিক ক্ষমতা সীমিত এবং আল্লাহর ক্ষমতা সীমাহীন; কাজেই আল্লাহ্ যতটুকু প্রকাশ করতে ইচ্ছা পোষণ করেন ততটুকু ছাড়া মানুষ আল্লাহর গুণাবলির কিছুই উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। মানুষ যতখানি উপলব্ধি করতে সক্ষম আল্লাহ্ তার থেকে ভিন্ন বিধায় মানুষ যদি আল্লাহকে মনে মনে কল্পনা করতে চায় তাহলে সে শুধু বিপথেই যাবে। মানুষ তার কল্পনায় স্রষ্টার যে প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে তা সৃষ্টির কিছু অংশ থেকে নির্মিত অথবা তার দেখা বিভিন্ন সৃষ্ট বস্তুর যৌগিক উৎপাদন।

কাজেই সে যদি তার কল্পনায় আল্লাহর ছবি আঁকে তাহলে সে আল্লাহর ওপর সৃষ্টির গুণাবলি আরোপ করে। তবে মানুষের পক্ষে জ্ঞান অথবা আবেগের মাধ্যমে আল্লাহর কিছু কিছু গুণাবলি উপলব্ধি করা সম্ভব। তাই আল্লাহ্ তার গুণাবলির কিছু কিছু মানুষের নিকট প্রকাশ করেছেন যথা, আল-কাদির, সর্বশক্তিমান, যার অর্থ এমন কিছুই নেই যা আল্লাহ্ করতে অক্ষম।

অনুরূপভাবে, আর-রহ্মান : সর্ব-করুণাময়, যার অর্থ সৃষ্টিজগতে এমন কিছুই নেই যার যোগ্যতা থাক বা না থাক আল্লাহ তার ওপর করুণা বর্ষণ করেননি। এ ধরনের উপলব্ধির জন্য অন্তরে চিত্র দ্বারা প্রকাশিত কোনো প্রতীকের দরকার হয় না। অতএব এভাবেই মানুষের অন্তর সঠিকভাবে একমাত্র আল্লাহকে বুঝতে সক্ষম। পয়গম্বর যিশুর বাস্তব শিক্ষা থেকে গ্রীস ও রোমের প্রাচীন খ্রিস্টানদের বিপথে যাবার বিবিধ কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো আল্লাহকে একটি সীমারেখার মধ্যে কল্পনা করার প্রচেষ্টা। যে সব ইউরোপীয়রা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা তাদের গির্জা এবং পুণ্যস্থানে

লম্বা সাদা দাড়ি বিশিষ্ট প্রবীণ ইউরোপীয় বিশপের আকারে স্রষ্টার ছবি ও মূর্তি স্থাপন করত।

প্যালেস্টাইনের আদি খ্রিস্টানরা ইহুদী পশ্চাৎপট (Background) থেকে এসেছিল বিধায় তাদের মধ্যে যে কোনো চিত্র দ্বারা স্রষ্টার রূপায়ণ দৃঢ়ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ইউরোপীয়রা অবশ্য তাদের দেবতাদের মানুষের আকারে রূপায়ণ করার দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় পথ-নির্দেশের জন্য ইহুদীদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থগুলোর ওপর নির্ভরতার কারণে বিপথে চলে গিয়েছিল। সৃষ্টিতত্ত্ব (Genesis), তাওরাতের প্রথম গ্রন্থে, মানুষের সৃষ্টি প্রসঙ্গে ইহুদীরা নিম্নরূপ লিখেছিল :

"তারপর স্রষ্টা বললেন, চল আমাদের প্রতিচ্ছবি দ্বারা একটি মানুষ তৈরি করি, আমাদের সাদৃশ্যে।" সুতরাং স্রষ্টা তাঁর নিজের প্রতিচ্ছবির মতো মানুষ সৃষ্টি করলেন, স্রষ্টার মধ্যে তিনি তাকে সৃষ্টি করলেন। (১ : ২৬, ২৭)

তৌরাতের এ জাতীয় উক্তির কারণেই ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা এ সিদ্ধান্তে পৌছে যে, পৌরাণিক দেবতাদের যেভাবে মানুষের প্রতিকৃতিতে অঙ্কন করা হয়েছিল অনুরূপভাবে স্রষ্টাও মানুষের মতো একই রকম দেখতে। ফলশ্রুতি তারা অঢেল ধনদৌলত, সময় এবং সামর্থ্য খরচ করে মূর্তি তৈরি এবং চিত্রাঙ্কণের মাধ্যমে স্রষ্টাকে মানুষের আকারে রূপদান করেছিল।

স্রষ্টাকে মানুষের আকারে রূপদানের ব্যাপক প্রচলন পূর্বেও ছিল এবং এখনও আছে। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির অনুরূপ নয় এবং স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সঙ্গে মানুষ যখন সংস্পর্শ হারাল তখন সে তার দাসত্ব সৃষ্টির দিকে চালনা আরম্ভ করল। এই করতে যেয়ে যে প্রায়ই স্রষ্টাকে মানুষের আকারে রূপদান করা বেছে নিল। কারণ স্পষ্টত মানুষ দুনিয়ায় সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণী। উদাহরণস্বরূপ, চৌ রাজবংশের (১০২৭ খৃ: পূ: ৪০২ খৃ:) সময়কাল থেকে চীন দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্মে বির্মূত দেবতা তিয়েন (Tien) (স্বর্গ) কে "ইউ হুয়াং" (Yu Huang) নামের পরিশ্রান্ত সম্রাট, সর্বোচ্চ প্রভু স্বর্গীয় বিচারালয়ের শাসক হিসেবে মানুষের রূপ দেয়া হয়েছিল।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, কোনো কিছুতেই আমরা তার মতো করে কল্পনা করতে পারি না। আল্লাহ ঘোষণা করেন–

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ -

অর্থাৎ, কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ্য নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।
(সূরা–৪২ আল-শুরা : আয়াত-১১)

এবং

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থাৎ, এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই। (সূরা–১১২ আল-ইখলাছ : আয়াত-৪)

পয়গম্বর মূসা আল্লাহর দর্শন চান

তিনি তাঁর সৃষ্টির সদৃশ নন এটা পরিষ্কার করে দেয়ার পর আল্লাহ্ আমাদের জানিয়ে দেন যে, আমাদের চক্ষু তাঁকে উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। তিনি বলেন–

لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ـ

অর্থাৎ, তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টি শক্তি তাঁর অধিগত।
(সূরা–৬ আল আন'আম : আয়াত-১০৩)

আলোচ্য আয়াত নির্দেশ করে যে, মানুষ আল্লাহকে অবলোকন করতে অক্ষম।

এ বিষয়টির ওপর আরও গুরুত্ব প্রদানের জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পয়গম্বর মূসার (Moses) জীবনের একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার বিবরণ দেন।

وَلَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِىْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِىْ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ, মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে হাজির হলো এবং তার পালনকর্তা তার সাথে কথা বললেন তখন সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব, তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি তাকাও, তা স্বস্থানে স্থির থাকলে

তবে তুমি আমাকে দেখবে। যখন তার পালনকর্তা পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আর মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, তখন বলল, 'মহিমাময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই ফিরে আসলাম এবং ঈমানদারদের মধ্যে আমিই প্রথম।

(সূরা-৭ আল আরাফ : আয়াত-১৪৩)

পয়গম্বর মূসা ধারণা করেছিলেন যে, যেহেতু আল্লাহ্ তাঁর স্বর্গীয় বাণী নাযিল করতে ঐ সময়কার মানবজাতির মধ্যে তাকে পছন্দ করেছিলেন সেহেতু সে হয়ত স্রষ্টাকে দেখতে পাবে। কিন্তু আল্লাহ্ এটা পরিষ্কার করে দেন যে, মূসা বা অন্য কারোর পক্ষেই তা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ অসীম সত্তাতো দূরের কথা তার জ্যোতির উজ্জ্বলতাই মানুষ সহ্য করতে পারবে না। যখন পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে গেল, পয়গম্বর মূসা তার ভুল বুঝতে সক্ষম হলেন এবং যে জিনিসের অনুমতি নেই তা চাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

রাসূল ﷺ কি আল্লাহর দর্শন লাভ করেছিলেন?

কিছু সংখ্যক মুসলমান ধারণা করে যে, পয়গম্বরদের মধ্যে শেষ পয়গম্বর রাসূল ﷺ-এর সময় আল্লাহ্ এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটান। তারা মনে করে আল্লাহ্ যখন রাসূল ﷺ-কে মিরাজে নিয়ে যান এবং সেখানে রাসূল ﷺ সেই সীমা অতিক্রম করেন যে পর্যন্ত ফেরেশতাদেরও যাওয়ার অনুমতি নেই, সেখানেই রাসূলে করীম ﷺ আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেন। কিন্তু যখন মাশরূখ নামে একজন তাবেয়ী রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রাসূল ﷺ পালনকর্তার দর্শন পেয়েছিলেন কি না, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আপনি যা জিজ্ঞাসা করছেন তাতে আমার কেশাগ্র খাড়া হয়ে যাচ্ছে।

যে বলেছে রাসূল ﷺ আল্লাহর দর্শন লাভ করেছিলেন, সে মিথ্যা বলেছে। যখন আবু যর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি পালনকর্তার দর্শন পেয়েছেন কি না, রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, "সেখানে শুধু জ্যোতি ছিল, আমি কীভাবে তাঁকে দেখব? অন্য আর এক সময় রাসূল ﷺ আলোর জ্যোতি যে স্বয়ং আল্লাহ্ নন তার ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, "আল্লাহ্ নিদ্রা যান না এবং নিদ্রা যাওয়া তার জন্য শোভনীয় নয়। তিনি মানদণ্ড হ্রাস করেন এবং বৃদ্ধি করেন।

দিনের কাজের পূর্বেই রাতের কাজ এবং রাতের কাজের পূর্বেই দিনের কাজ তার নিকট পৌঁছায় এবং জ্যোতি হলো তাঁর অবগুণ্ঠন।"

অতএব নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, রাসূল ﷺ তাঁর পূববর্তী পয়গম্বরদের মতো এ জীবনে মহান এবং করুণাময় আল্লাহকে দেখেনি। এ ঘটনার ভিত্তিতে যারা এ জীবনে আল্লাহর দেখা পেয়েছেন বলে দাবি করে তাদের দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যেখানে পয়গম্বরগণ, যাদেরকে স্রষ্টা সকল মানব জাতির মধ্য থেকে পছন্দ করেছিলেন, তারা তাঁকে দেখতে সক্ষম হননি, সেখানে একজন মানুষ, সে যত ন্যায়নিষ্ঠ ও ধার্মিকই হোক না কেন, কীভাবে তাঁর দর্শন পেতে সক্ষম? আল্লাহর দর্শন পাওয়া গেছে বলে কেউ দাবি করলে মূলত সেটি একটি ইসলাম বিরুদ্ধ বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসপূর্ণ বিবৃতি। কারণ এর অর্থ দাঁড়ায় যে, সে পয়গম্বরদের থেকেও উর্ধ্বে।

শয়তান আল্লাহ বলে ভান করে

নি:সন্দেহে অনেক সাধক (সূফীগণ) যারা আল্লাহর দর্শন লাভ করেছে বলে দাবি করে তারা কিছু একটা দেখেছিল। তারা প্রায়ই জমকালো আলোর জ্যোতি এবং এমনকি অপার্থিব বস্তু দেখেছে বলে দাবি করে। তবে, এ জাতীয় অভিজ্ঞতার পরে অনেক সাধক যখন ইসলামের মৌলিক অনুশীলন বাতিল করে দেয় তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে তারা যার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছে তা শয়তান প্ররোচিত এবং আসমানী নয়। যারা ঘোষণা দেয় যে তারা আল্লাহর দর্শন লাভ করেছে তারা প্রায়ই দাবি করে যে সাধারণ মানুষের মতো তাদের সালাত আদায় করা এবং রোজা রখার দরকার নেই।

কারণ আধ্যাত্মিকভাবে তারা জনসাধারণের সমতল থেকে উর্ধ্বে পৌঁছে গেছে। শেখ আবদুল কাদির জিলানী (১০৭৭-১১৬৬ খৃ:), যার নামানুসারে কাদেরীয় সূফী মতবাদের নামকরণ হয়েছে, এ জাতীয় একটি ঘটনায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তার বর্ণনা দেন। যারা আবিষ্ট অবস্থায় আল্লাহর দর্শন লাভ করেছিল বলে দাবি করে এবং এ জাতীয় দর্শন লাভের পর কেন তারা প্রায়ই ইসলামের মৌলিক অনুশীলন বাতিল করে দেয় এ ঘটনায় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "একদিন আমি যখন গভীরভাবে উপাসনায় মগ্ন ছিলাম তখন হঠাৎ আমার সম্মুখে একটি চমৎকার সিংহাসন দেখতে পেলাম যার চতুর্দিকে অতিশয় উজ্জ্বল আলোর জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

তখন একটি বজ্রধ্বনিতুল্য আওয়াজ আমার কানে আঘাত করল, ওহে! আবদুল কাদির আমি তোমার রব; আমি অন্যের জন্য যা নিষিদ্ধ (হারাম) করেছি তোমার জন্য তা বৈধ (হালাল) করলাম। আবদুল কাদির জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি আল্লাহ, যিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই"। যখন কোনো উত্তর এল না, তিনি বললেন, "দূর হও, হে আল্লাহর দুশমন!"। সাথে সাথে আলোটি নিভে গেল এবং অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আওয়াজটি তখন বলল, আবদুল কাদির, ধর্ম প্রসঙ্গে তোমার বোধশক্তি এবং জ্ঞানের কারণে তুমি আমার পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করতে পেরেছ। আমি এ কৌশল দ্বারা সত্তর জনেরও অধিক পুণ্যাত্মা ইবাদতকারীকে বিপথে চালিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। পরবর্তীতে লোকে আবদুল-কাদিরকে জিজ্ঞেস করল তিনি কিভাবে বুঝলেন যে, সেটা শয়তান ছিল।

তিনি উত্তর দিলেন, "আমি জানতাম যে রাসূল ﷺ-এর নিকট যে ধর্মীয় ওহী নাযিল হয়েছে তা বাতিল বা পরিবর্তন করা যায় না। তাই অন্যের জন্য যা নিষিদ্ধ (হারাম) আমার জন্য তা বৈধ (হালাল) করার দাবি করাতেই আমি চিনতে পেরেছিলাম যে সে একটা শয়তান। যখন শয়তান ঘোষণা করল যে, সে আমার রব, কিন্তু সে যে অংশীদারবিহীন আল্লাহ্ তা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করতে পারল না তখন আমি আরও বুঝতে পারলাম সে ছিল শয়তান।"

একইভাবে অতীতে কতিপয় লোক বর্ণনা দিয়েছিল যে তারা আবিষ্ট অবস্থায় কা'বা দেখেছিল এবং তার চারদিকে প্রদক্ষিণ করেছিল। অন্যরা আরো বর্ণনা দিয়েছিল যে একটি বিশাল সিংহাসন তাদের সামনে প্রসারিত করা হয় যার উপর সম্মানিত একজন উপবিষ্ট ছিল এবং অগণিত লোক তার চারপাশে আরোহণ এবং অবরোহণ করছিল। তারা লোকগুলোকে ফেরেশতা এবং সিংহাসনে আরোহণকারীকে মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলে ধারণা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে তারা ছিল শয়তান এবং তাদের অনুসারী।

ফলে, এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, স্বপ্নে অথবা উন্মুক্ত দিনের আলোয় আল্লাহর দর্শন লাভের দাবিসমূহের উৎস হলো শয়তানি মনস্তাত্ত্বিক এবং আবেগপ্রবণ অবস্থা। এ অবস্থায় শয়তান উজ্জ্বল আলোর আকার ধারণ করে এবং যারা আবিষ্ট অবস্থায় আছে তাদের নিকট দাবি করে যে সে তাদের পালনকর্তা। খাঁটি তাওহীদ প্রসঙ্গে অজ্ঞতার কারণে তারা এ জাতীয় দাবি গ্রহণ করে এবং ফলশ্রুতিতে গোমরাহী হয়।

আন-নজম সূরার অর্থ

সূরা আন-নজম এর নিম্নোক্ত আয়াত ব্যবহার করে কতিপয় মানুষ দাবি করে যে রাসূল ﷺ আল্লাহকে দেখেছিলেন–

وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ـ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ـ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ـ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ـ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ـ اَفَتُمَارُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ـ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ـ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ـ

অর্থাৎ, তখন সে উর্ধ্ব দিগন্তে; অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী অথবা এরও কম। দুই ধনুকের ব্যবধান রইল তখন আল্লাহ তাঁর দাসের প্রতি যা ওহী (প্রত্যাদেশ) করবার তা ওহী (প্রত্যাদেশ) করলেন। যা সে দেখেছে তার অন্তকরণ তা অস্বীকার করে নি। সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল প্রান্তবর্তী বদরিকা বৃক্ষের নিকট। (সূরা–৫৩ আন-নাজম : আয়াত-৭-১৪)

তারা দাবি করে যে আলোচ্য আয়াতগুলো রাসূল ﷺ কর্তৃক আল্লাহর দর্শন লাভ সম্পর্কিত। তবে মাশরুখ যখন রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশাকে এ আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি উত্তর দিলেন, "আমি এ উম্মাহর (মুসলমান জাতির) প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে ঐ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে রাসূল ﷺ উত্তর দিয়েছিলেন, "তিনি অবশ্যই জিবরাঈল ছিলেন, তাঁর ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি মাত্র দুবার ব্যতীত তাঁকে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে সে আকারে দেখি নি; আমি তাঁকে আসমান থেকে অবতরণ করতে দেখিছি এবং তাঁর আকৃতি এতই বৃহৎ ছিল যে, আসমান এবং জমিন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।"

তারপর আয়েশা (রা) বললেন, "আপনি কি শোনেননি যে, আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ـ

অর্থাৎ, তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন, কিন্তু দৃষ্টি শক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা-৬ আল আন'আম : আয়াত-১০৩)

এবং আপনি কি শোনেননি যে, আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, "মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার অন্তরাল ছাড়া, অথবা এমন দ্রুত প্রেরণ ছাড়া। (সূরা-৪২ আস শুরা : আয়াত-৫১) সূরা আন-নাজম এর আয়াতগুলো রাসূল ﷺ-এর নিজ প্রদত্ত ব্যাখ্যার আলোকে বিবেচনা করা হলে কোনো ক্রমেই সমর্থন করা যায় না যে রাসূল ﷺ আল্লাহ্র দর্শন লাভ করেছিলেন।

আল্লাহ্র দর্শন লাভ না করার পিছনে বিজ্ঞতা

যদি এ জীবনে আল্লাহ্র দর্শন পাওয়া সম্ভব হত তাহলে এ জীবনের পরীক্ষা অর্থহীন হতো। আল্লাহকে বাস্তবে না দেখে তাঁকে স্বেচ্ছায় বিশ্বাস করার মধ্যেই এই জীবনের সত্যিকারের পরীক্ষা। যদি আল্লাহ্ দৃশ্যমান হতো, তাহলে সকলেই তাঁকে এবং পয়গম্বর ﷺ যা শিক্ষা দিয়েছিলেন তা বিশ্বাস করত।

মূলত, মানুষের পরিণতি হতো ফেরেশতাদের মতো, আল্লাহ্র পূর্বে আজ্ঞানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে। যেহেতু আল্লাহ্ মানুষকে ফেরেশতাদের (ফেরেশতাদের আল্লাহকে বেছে বিশ্বাস করে নেবার কোনো অধিকার ছিল না।) থেকে শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু অবিশ্বাস ছেড়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করে নেবার অধিকার এমন একটা পরিস্থিতিতে হওয়া আবশ্যক যেখানে আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রসঙ্গে প্রশ্ন জাগে। তাই আল্লাহ্ নিজে মানবজাতির দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছেন এবং শেষদিন পর্যন্ত সেখানে থাকবেন।

পরবর্তী জীবনে আল্লাহ্র দর্শন লাভ

কুরআনে কতিপয় ঘটনা বর্ণিত আছে যেখানে আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, মানুষ পরবর্তী জীবনে তাঁর দর্শন লাভ করবে। শেষ বিচার দিবসের (কিয়ামত) কিছু ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন—

وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ـ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ـ

অর্থাৎ, সেদিন কোনো কোনো চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি তাকিয়ে থাকবে। (সূরা-৭৫ আল কিয়ামাহ : আয়াত-২২-২৩)

রাসূল ﷺ এ মহান ঘটনাটির আরও ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা দিয়েছেন। যখন কতিপয় সাহাবী (সহচরবৃন্দ) জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কি শেষ বিচার দিবসে আল্লাহর দর্শন লাভ করব?" তখন তিনি উত্তর দিলেন, "পূর্ণ চন্দ্রের দিকে তাকালে তোমরা কি ক্ষতিগ্রস্ত হও"? তারা উত্তর দিলেন, "না"। তখন তিনি বললেন, "তোমরা ঐ রূপেই তাঁকে দেখবে। অন্য আর এক সময় তিনি বলেছিলেন, "তুমি যেদিন অবশ্যই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তোমরা প্রত্যেকে আল্লাহকে দর্শন করবে এবং তোমার এবং তাঁর মাঝখানে কোনো পর্দা অথবা কোনো অনুবাদক থাকবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর আরও বর্ণনা দেন যে, একদিন রাসূল ﷺ বলেছিলেন, "শেষ বিচার দিবসই প্রথম দিন যে দিন কোনো চক্ষু সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিমান্বিত আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহর দর্শন লাভ করা জান্নাতীদের জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ। জান্নাতের বাগানসমূহের সৎকর্মশীল ওয়ারীশগণের জন্য আল্লাহ কর্তৃক জমাকৃত অন্যান্য যে কোনো আনন্দের তুলনায় এ অনুগ্রহ অধিকার আনন্দদায়ক। আল্লাহ এ আনন্দ প্রসঙ্গে বলেছেন–

لَهُمْ مَّا يَشَآؤُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ـ

অর্থাৎ, সেথায় তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক। (সূরা–৫০ কাফ : আয়াত-৩৫)

রাসূল ﷺ-এর দুজন বিশিষ্ট সহচর (সাহাবা) আলী ইবনে আবু তালেব এবং আনাস বর্ণনা দিয়েছেন বলে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ এখানে "অধিক" জিনিসের উল্লেখ করেছেন তা হলো তাঁকে দেখা। সহচর (সাহাবী) শুয়াইব উল্লেখ করেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তেলাওয়াত করেছিলেন (আয়াত)–

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ـ

অর্থাৎ, যারা কল্যাণজনক কার্য করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরও অধিক। (সূরা–১০ ইউনূস : আয়াত-২৬)

এবং বলেছিলেন, "যখন বেহেশত প্রাপ্তির উপযুক্ত ব্যক্তিরা জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম প্রাপ্তির উপযুক্ত ব্যক্তিরা জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করবে তখন একজন ঘোষক চিৎকার করে ঘোষণা দেবে, ওহে জান্নাতবাসীগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা তিনি

পালন করতে ইচ্ছুক। তারা জিজ্ঞাসা করবে, তা কি? তিনি কি আমাদের মানদণ্ড (ভালো কাজের পাল্লা) ভারী করেননি, আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি, আমাদের কি জান্নাতে স্থান দেন নি এবং আমাদের (কয়েকজনকে) দোযখ হতে বের করে আনেননি? তখন পর্দা অপসারিত হবে এবং তারা তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। তাদের যা কিছু প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর কিছুই তাঁর দর্শন লাভ থেকে অধিক প্রিয় হবে না এবং সেটাই অধিক কিছু।

পূর্বে উল্লেখকৃত আয়াত, "তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টি শক্তি তাঁর অধিগত," এ জীবনে আল্লাহর দর্শন লাভের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াত পরবর্তী জীবনে শুধুমাত্র সামাজিকভাবে আল্লাহর দর্শন লাভের সম্ভাবনা বাতিল করে। শুধুমাত্র সৎকর্মশীলগণই আল্লাহর একটি অংশ মাত্রের দর্শন লাভ করতে সক্ষম হবে। কারণ তাদের দৃষ্টিশক্তি তখনও সসীম থাকবে পক্ষান্তরে আল্লাহ সর্বদাই অসীম, অসৃষ্ট প্রতিপালক যাকে দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান অথবা শক্তি দ্বারা পরিবেষ্টন করা যায় না। যারা অবিশ্বাসী তারা পরবর্তী জীবনে আল্লাহর দেখা পাবে না যা তাদের জন্য খুবই দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক হবে। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ -

অর্থাৎ, না অবশ্যই সেই দিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে আন্তরিক থাকবে। (সূরা–৮৩ আল মুতাফফিফীন : আয়াত-১৫)

রাসূলﷺ-এর দর্শন

এটা অন্য আর একটি ক্ষেত্র যার কিছু অংশ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি উৎস হিসেবে কাজ করছে। লোকে রাসূলﷺ-এর দর্শন লাভ এবং তাঁর কাছ থেকে বিশেষ পথনির্দেশ প্রাপ্তির দাবি করে থাকে। কেউ কেউ দাবি করে যে স্বপ্নের মধ্যে তারা রাসূলﷺ-এর দেখা পেয়েছে। অথবা তাঁকে মূলত জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে বলে দাবি করে। যারা এ জাতীয় দাবি করে তারা সাধারণত জনগণের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করে। তারা প্রায়ই বিভিন্ন প্রকারের ধর্মীয় নব্যতা প্রবর্তন (বিদ্যা) করে এবং সেগুলো রাসূলﷺ-এর ওপর আরোপ করে।

এসব দাবির ভিত্তি হলো আবু হুরায়রা, আবু কাতাদাহ এবং জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীস যেখানে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে বাস্তবেই আমাকে দেখেছে কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।" আলোচ্য হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এ কারণে অস্বীকার বা অবিশ্বাস করা যায় না। তবে এর অর্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে–

ক. আলোচ্য হাদীসটি দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছে যে, স্বপ্নে শয়তান বিভিন্ন আকারে আবির্ভূত হতে পারে এবং মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে আমন্ত্রণ করতে পারে।

খ. আলোচ্য হাদীসটি উল্লেখ করছে যে, শয়তান রাসূল ﷺ-এর প্রকৃত আকার অথবা চেহারা গ্রহণ করতে পারে না।

গ. আলোচ্য হাদীসটি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছে যে, স্বপ্নে রাসূল ﷺ-এর আকার দেখা যেতে পারে।

যেহেতু যে সব সহচরদের রাসূল ﷺ-এর মুখমণ্ডল পরিচিত ছিল তাদের নিকট তিনি এ বক্তব্য পেশ করেছিলেন সেহেতু এর অর্থ দাঁড়ায় যে, কেউ যদি জ্ঞাত থাকে রাসূল ﷺ ঠিক কি রকম দেখতে, সে যদি ঐ বর্ণনার মতো সঠিক কাউকে স্বপ্নে দেখতে পায় তাহলে সে নিশ্চিত হতে পারে যে, আল্লাহ তার ওপর রাসূল ﷺ-এর দর্শন লাভের আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন। এর কারণ হলো আল্লাহ শয়তানকে রাসূল ﷺ-এর প্রকৃত রূপ ধরে আবির্ভূত হবার ক্ষমতা দেননি। তবে এটার অর্থ এও যে, যাদের নিকট রাসূল ﷺ-এর চেহারা পরিচিত নয় শয়তান তাদের স্বপ্নের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারে এবং দাবি করতে পারে যে, সে আল্লাহর পয়গম্বর। সে তখন স্বপ্নাবিষ্টকে ধর্মীয় নব্যতা প্রবর্তনের পরামর্শ দেয়, অথবা তাকে বলে যে, সে আল-মাহদী (প্রতীক্ষিত সংস্কারক) অথবা এমনকি পয়গম্বর ঈসা (যিশু) যিনি শেষ যুগে ফিরে আসবেন।

স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে ধর্মীয় নব্যতা প্রবর্তন (বিদা) আরম্ভ করেছে বা এ জাতীয় দাবি করেছে এমন ব্যক্তি বিশেষের সংখ্যা অগণিত। উল্লেখিত হাদীসটির নিহিতার্থ ভুলভাবে বোঝার কারণে মানুষ এ সব দাবি গ্রহণ করার

প্রবণতায় বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়। যেহেতু শরী'আহ আইন (ইসলামী আইন) পূর্ণাঙ্গ, কাজেই স্বপ্নে রাসূল ﷺ নতুন সংযোজন নিয়ে এসেছেন এ দাবি অবশ্যই মিথ্যা। এ জাতীয় দাবি দুটি বিষয়ের যে কোনো একটির ইঙ্গিত করে–

১. হয় রাসূল ﷺ তার জীবদ্দশায় ধর্মপ্রচারণা সমাপ্ত করতে পারেননি।

২. আল্লাহ উম্মাহর ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে জ্ঞাত ছিলেন না এবং সেজন্য রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করেননি। উভয় নিহিতার্থই মৌলিক ইসলামী তত্ত্বেও বিরোধী।

জাগ্রত অবস্থায় রাসূল ﷺ-কে দর্শন লাভ অসম্ভব এবং কোনোভাবেই কোনো হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়। মূলত আবিষ্ট অবস্থায় এ জাতীয় যা কিছু দৃশ্যমান হয়, তার ফলাফল যাই হোক না কেন, সন্দেহাতীত তা শয়তানের অপচ্ছায়া। মিরাজের সময় আল্লাহ রাসূল ﷺ-কে পূর্বেকার কয়েকজন পয়গম্বরকে অলৌকিকভাবে দেখিয়েছেন এবং রাসূল ﷺ তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। যারা রাসূল ﷺ-কে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে বলে দাবি করে, বাস্তবে তারা নিজেদেরকে ঐ পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করে।

রাসূল ﷺ-কে আবিষ্ট অবস্থায় দর্শন অথবা অন্য কোনোভাবে ধর্মীয় যে কোনো নতুন কিছু প্রাপ্তি (বিদাহ) অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার কারণে ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আয়েশা (রা) উল্লেখ করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে কেউ আমাদের ব্যাপারে (অর্থাৎ ইসলামের ব্যাপারে) এমন কিছু নতুন প্রবর্তন করবে যা ইসলামের মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।"

তেরতম অধ্যায়

ওলি পূজা

আল্লাহর দয়া

মানুষের স্বভাবই হচ্ছে কতিপয় মানুষকে নিজের ওপর স্থান দেয়া। সে তাদের ব্যাপারে উচ্চ ধারণা পোষণ করে এবং নিজে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে সে তাদের অনুসরণ করতে পছন্দ করে। আল্লাহ কিছু লোককে অন্যের থেকে বিভিন্ন উপায়ে অধিক পরিমাণ দয়া প্রদর্শনের কারণে এ জাতীয় চিন্তাধারা কাজ করে। সামাজিকভাবে পুরুষকে মহিলার ওপর স্থান দেয়া হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -

অর্থাৎ, পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (সূরা আন নিসা : আয়াত-৩৪)

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ -

অর্থাৎ, মহিলাদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে।

(সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-২২৮)

এবং কতিপয় লোককে অর্থনৈতিকভাবে অন্যের ওপরে স্থান দেয়া হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ -

অর্থাৎ, আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকেও কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (সূরা আন্ নাহ্ল : আয়াত-৭১)

আসমানী পথনির্দেশ দ্বারা বনি ইসরাঈলীদের অবশিষ্ট মানবজাতি থেকে অধিক দয়াপ্রদর্শন করা হয়েছিল। তাইতো আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ.

অর্থাৎ, হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম এবং বিশ্বে সবার ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৪৭)

স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আম্বিয়ায়ে (আ)-কে সকল মানবজাতির মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছিল এবং একইভাবে আল্লাহ কিছু সংখ্যক পয়গম্বরকে অন্যদের তুলনায় বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এ মর্মে তিনি বলেন–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

অর্থাৎ, এ রাসূলগণ, তাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।
(সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-২৫৩)

কাজেই আল্লাহ অন্যান্য লোকদের ওপর যে দয়া প্রদর্শন করেছেন আমাদেরকে সে সব বস্তু কামনা করতে নিষেধ করেছেন–

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

অর্থাৎ, যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা কর না। (সূরা আন নিসা : আয়াত-৩২)

কারণ এসব দয়া প্রদর্শন বিশাল দায়িত্ব বহন করে এবং এগুলো এক জাতীয় পরীক্ষাস্বরূপ। ঐ অনুগ্রহগুলো মানুষের চেষ্টায় অর্জিত ফসল নয় বিধায় তা অহংকারের উৎস হওয়া ঠিক নয়। ঐগুলো প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ কোনো প্রতিদান দেবেন না, যদিও আমরা কীভাবে ঐগুলো ব্যবহার করেছি তার হিসাব দিতে হবে। অতএব আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, "যারা শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে তোমাদের নিচে তাদের দিকে তাকাও এবং যারা ওপরে তাদের দিকে নয়। এটা তোমাদের জন্য উত্তম। কারণ তাতে তোমাদের ওপর বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহ তোমরা অস্বীকার করবে না।

কোনো না কোনো উপায়ে একজনকে অন্যের ওপরে স্থান দেয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে এবং তার জন্য সে দায়ী থাকবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন রাখাল এবং প্রত্যেকেই তার মেষ পালের জন্য দায়ী।" এ দায়িত্বগুলো এ জীবনের পরীক্ষার জন্য মৌলিক উপাদান। আমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি শুকরিয়া আদায় করি এবং এগুলোর যথাযথ প্রয়োগ করি তবেই আমরা সফলতা অর্জন করতে পারব; নতুবা ব্যর্থ হব। কিন্তু দায়িত্বের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা বোধ হয় অন্যান্য সকল সৃষ্টির ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া। ফেরেশতাদের আদমকে সেজদা করার আল্লাহর আদেশের মাধ্যমে এ অনুগ্রহ শক্তিশালী করা হয়েছে। কাজেই দায়িত্ব দুই শ্রেণির–

ক. এটা ইসলাম গ্রহণ করার ব্যক্তিগত দায়িত্ব বহন করে : আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

খ. এটা সর্বত্র আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার দলগত প্রতিশ্রুতিও বহন করে।

অতএব এ দায়িত্ব গ্রহণের সম্মতির কারণে আল্লাহর দৃষ্টিতে অবিশ্বাসীদের থেকে বিশ্বাসীরা পদমর্যাদায় অনেক শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ۔

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আগমন ঘটেছে; তোমরা নেক আমলের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর। (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১১০)

তাকওয়া : বিশ্বাসী সমাজে কিছু সংখ্যক লোক অন্যান্যদের থেকে উন্নততর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং এ উন্নততর পদমর্যাদা হচ্ছে ঈমান, যা বিশ্বাসের শক্তি এবং গভীরতার সাথে মিলিত। একটি জীবন্ত বিশ্বাস তার ধারককে এরূপে চালনা করে যে আল্লাহ যা কিছুতে অসন্তুষ্ট হন সেগুলো থেকে ঢাল হিসেবে তাকে রক্ষা করে। এ ঢালকে আরবি ভাষায় "তাকওয়া" বলা হয়। একে নানাভাবে অনুবাদ করা হয়েছে যেমন– "আল্লাহ ভীতি", "ধর্মানুরাগ",

এমনকি "স্রষ্টা সচেতনতা"। তাকওয়া শব্দটি এ জাতীয় আরও অনেক অর্থ বহন করে। মহান আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাষায় "তাকওয়ার" উন্নততর মর্যাদা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। (সূরা আল হুজুরাত : আয়াত-১৩)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন যে, একজন পুরুষের অথবা মহিলার অন্যজনের থেকে সত্যিকার উচ্চতর পদমর্যাদা পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। এ ধর্মানুরাগ এবং আল্লাহ্র ভয় মানুষকে "চিন্তাশীল প্রাণী" থেকে গ্রহের প্রশাসক (খলিফা) পর্যায়ে উন্নীত করে। একজন মুসলমানের জীবদ্দশায় আল্লাহ্ ভীতির গুরুত্বের পরিসীমা নেই। আল্লাহ্ কুরআন কারীমে ২৬ বার তাকওয়া এবং এর থেকে উৎপন্ন শব্দের উল্লেখ করে তাকওয়াকে জীবন্ত বিশ্বাসের পিছনের চালিকা শক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তাকওয়া ব্যতীত বিশ্বাস শুধু মুখস্থ করা অর্থহীন শব্দাবলি এবং "ন্যায়পরায়ণ" কার্যাদি শুধু ফাঁকা খোলস ও ভণ্ডামি মাত্র। এ কারণে জীবনের অন্যান্য সকল কর্ম থেকে ধার্মিকতা অধিক পছন্দনীয়।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "চারটি কারণে একটি মহিলাকে বিবাহ্ করা হয় : তার ধনসম্পদ, তার আভিজাত্য, তার সৌন্দর্য এবং তার ধার্মিকতা। ধার্মিকতাকে পছন্দ কর এবং কৃতকার্য হও"। একটি মহিলা যত সুন্দরী, ধনী ও অবস্থা সম্পন্নই হোক না কেন, যদি সে ধার্মিক না হয়, তাহলে সে মর্যাদাহীন বংশের একটি ধার্মিক, কুৎসিত, গরিব নারী থেকে নিকৃষ্টতর। বিপরীতটাও সত্য; রাসূল ﷺ যেমন বলেছেন, "যদি একজনের ধর্মীয় অনুশীলন তোমাকে সন্তুষ্ট করে, সে যদি তোমার কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তাহলে তার নিকট বিবাহ্ দেয়া উচিত হবে; নতুবা দুনিয়ায় অশান্তি ও ব্যাপক বিপর্যয় ঘটবে।"

এক সময় বিলালকে উপহাস করে "কালো স্ত্রীলোকের পুত্র" বলে আহ্বান করায় রাসূল ﷺ আবূ জরকে কঠোর তিরস্কার করে বলেছিলেন, "দেখ,

আল্লাহকে অধিক ভয় করা ছাড়া তুমি একজন বাদামি অথবা কালো রঙের মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ নও।" এ উপলব্ধি অনুধাবন করার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ বার বার চেষ্টা করেছেন। এমনকি তাঁর ইন্তিকালের কিছু পূর্বে বিদায় হজ্বে তিনি উপস্থিত জনতাকে সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের অর্থহীনতা এবং তাকওয়ার বিশেষ গুরুত্ব প্রসঙ্গে ভাষণ দিয়েছিলেন।

সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তি বিশেষ প্রসঙ্গে কেবল আল্লাহই অবগত। কারণ তাকওয়ার স্থান হলো অন্তরে। মানুষ শুধু বাহ্যিক কর্মকাণ্ড দ্বারা একজন অপর জনকে বিচার করতে পারে। তবে তা বিভ্রান্তিকর হতে পারে বা নাও হতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়কে পরিষ্কার করেছেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ۔

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে এমন কতিপয় ব্যক্তি রয়েছে, দুনিয়াবী জীবন প্রসঙ্গে যার আলাপ আলোচনা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে প্রসঙ্গে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। মূলত সে কিন্তু ঘোর বিরোধী।

(সূরা আল-বাক্বারা : আয়াত-২০৪)

অতএব, কোন ধার্মিক ব্যক্তিকে এমন পর্যায়ে ওঠানো উচিত না যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। রাসূল ﷺ তাঁর সহচরগণের (সাহাবাগণ) মধ্যে কতিপয়কে এ জীবনেই সুনির্দিষ্টভাবে জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ দিয়েছেন। যা হোক এ ধরনের ঘোষণা ঐশী সংবাদের ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছিল, তার অন্তর বিচার করার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যারা বাই'আত আর-রিদওয়ান নামে আনুগত্যের অঙ্গীকার করে তাদের ব্যাপারে যখন রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, "যারা বৃক্ষের নিচে অঙ্গীকার প্রদান করেছে তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না", তখন তিনি এ বিষয়ে নাযিল হওয়া কুরআনের আয়াত নিশ্চিত করছিলেন–

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔

অর্থাৎ, ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ যখন গাছের নীচে তোমার নিকট বাই'আত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। (সূরা আল ফাতহ : আয়াত-১৮)

অনুরূপভাবে, রাসূল ﷺ কিছু সংখ্যককে জাহান্নামী হবে বলে উল্লেখ করেন, যাদেরকে সবাই জান্নাতবাসী বলে মনে করেছিলেন। ঐ সব বিচার ওহী ভিত্তিক ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন যে, ওমর ইবনে আল-খাত্তাব বলেছিলেন যে, খায়বরের দিনে রাসূল ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবা এসে বললেন, "অমুক অমুক এবং অমুক অমুক শহীদ," কিন্তু তারা যখন একটি লোক প্রসঙ্গে বলল, "অমুক শহীদ," তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, "কিছুতেই নয়। আমি তাকে অসৎভাবে নেয়া (লুটের মালামাল থেকে) একটি আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায় জাহান্নামে দেখেছি।" আল্লাহর রাসূল ﷺ তারপর বললেন, "ইবনে আল-খাত্তাব যাও এবং গিয়ে জনগণের সম্মুখে তিন বার ঘোষণা দাও যে, কেবলমাত্র বিশ্বাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

খ্রিস্টান ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুসারে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বিশেষকে দীর্ঘদিন যাবত তাদের কথিত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভের জন্য অতি প্রশংসা করে আসা হচ্ছিল। তাদের ওপর অলৌকিক ঘটনা আরোপ করা হয়েছিল এবং দরবেশ (Saint) মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছিল। হিন্দু এবং বৌদ্ধ ঐতিহ্যে যে সব শিক্ষককে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছে বলে ধারণা করা হতো এবং যারা অলৌকিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করত তাদের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্দিষ্ট করার জন্য তাদেরকে "গুরু", "অবতার" ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হতো। এ উপাধিগুলো পরবর্তীতে সেসব তথাকথিত সাধুদেরকে ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী অথবা তাদেরকে দেবতা হিসেবে উপাসনা করার জন্য সাধারণ মানুষকে পরিচালিত করেছে।

ফলশ্রুতিতে, এ সব ধর্মীয় ঐতিহ্যে অনেক সাধক রয়েছে যাদেরকে জনগণ ভক্তি ভরে পূজা করে। অন্যদিকে, ইসলাম এমনকি রাসূল ﷺ-এর মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করারও বিরোধিতা করে। রাসূল ﷺ বলেছেন, "খ্রিস্টানরা যে রকম ঈসা ইব্‌নে মরিয়ামকে প্রশংসা করত আমাকে ঐ রকম মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না, আমি শুধু একজন বান্দা মাত্র। কাজেই আমাকে বরঞ্চ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর বার্তাবাহক (রাসূল) বলে সম্বোধন কর।"

ওলি : Saint

আরবি "ওলি" (বহুবচন আউলিয়া) শব্দটি অনুবাদ করার জন্য সন্ত বা দরবেশ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ বলে নির্বাচিত করেন তাদের জন্য ওলি শব্দটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আরও সঠিক অনুবাদ হলো "ঘনিষ্ঠ বন্ধু" কারণ শাব্দিক অর্থে ওলী হচ্ছে "মিত্র"। এমনকি আল্লাহ নিজেকে উল্লেখ করার জন্যও আয়াতে এ শব্দ প্রয়োগ করেন। যেমন– তিনি বলেন

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ـ

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের ওলি (অভিভাবক), তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকে নিয়ে যান। (সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-২৫৭)

তিনি শয়তানের উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত আয়াত–

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ـ

অর্থাৎ, আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা আন নিসা : আয়াত-১১৯)

এ শব্দটি (ওলি) "ঘনিষ্ঠ আত্মীয়" অর্থও করা যায়, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطَانًا فَلَايُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ـ

অর্থাৎ, কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার ওলিকে (অভিভাবককে) তো আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার বিষয়ে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩৩)

মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বুঝাতেও কুরআন কারীমে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ–

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ, ঈমানদারগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-২৮)

কিন্তু যে প্রয়োগটি আমাদের সবচেয়ে উদ্বিগ্ন করে তাহলো "আউলিয়া-উল্লাহ", আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ। কুরআন কারীমে আল্লাহ মানবজাতির মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি বিশেষকে তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বলে নির্বাচিত করেছেন। তাঁর ওলিগণ প্রসঙ্গে আল্লাহর বর্ণনা সূরা-আনফালের মধ্যে পাওয়া যাবে, যেখানে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন–

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ـ

অর্থাৎ, পরহেযগারগণই তার তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (সূরা আল আনফাল : আয়াত-৩৪)

এবং সূরা ইউনুছে ঘোষণা করা হয়েছে–

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ـ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ـ

অর্থাৎ, জেনে রাখ। আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। যারা বিশ্বাস করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে।

(সূরা ইউনুছ : আয়াত-৬২-৬৩)

আল্লাহ ব্যাখ্যা করেন যে, 'ওয়ালাইয়াহ' (স্বর্গীয় বন্ধুত্ব) এর মানদণ্ড হলো ঈমান (বিশ্বাস) এবং তাকওয়া (ধর্মানুরাগ) এবং সকল সত্যিকার বিশ্বাসীগণ এ গুণাবলির অধিকারী। মূর্খ জনগণের মধ্যে "ওয়ালাইয়াহর' প্রধান মানদণ্ড হলো অলৌকিক কার্য সম্পাদন করা, যেগুলো আম্বিয়ায়ে কেরামের অলৌকিক মু'যিজাত থেকে আলাদা করার জন্য কারামাত বলা হয়।

অধিকাংশই যারা এ মত পোষণ করে তাদের নিকট ঈমান এবং কারামত (কেরামতি) চর্চাকারীদের আমলের কোন গুরুত্ব নেই। অতএব কয়েকজন যাদেরকে "ওলি" বলে নির্বাচিত করা হয়েছে তারা নব্যতান্ত্রিক (খারেজী) বিশ্বাস ধারণ এবং অনুশীলন করে। ঠিক অনুরূপভাবে অন্যান্যরা সঠিক ইসলামী জীবন প্রথা পরিত্যাগ করেছে বলে জানা যায় এবং এমনকি কয়েকজন অশ্লীল আচার-আচরণে বিজড়িত থাকে।

অবশ্য, আল্লাহ কোথাও তাঁর ওলি হবার জন্য অলৌকিক কাজ ঘটাতে হবে বলে উল্লেখ করেননি। কাজেই সকল বিশ্বাসী যাদের ঈমান এবং তাকওয়া রয়েছে তারাই আল্লাহর ওলি এবং তিনি (আল্লাহ) তাদের ওলি। আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন–

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসী আল্লাহ তাদের ওলি (অভিভাবক)।

(সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-২৫৭)

ফলস্বরূপ, বিশেষ কতিপয় বিশ্বাসীকে আল্লাহর 'আউলিয়া' নির্বাচিত করার জন্য মুসলমানদের অনুমতি প্রদান করা হয়নি। এ ধরনের ইসলামি হুকুম আহকাম পরিষ্কারভাবে থাকা সত্ত্বেও, তথাকথিত মুসলমান ওলিদের প্রাধান্য সূফি মহলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়েছে।

অনেকেই এদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। যোগ্যতার ঊর্ধ্ব ক্রমানুসারে তারা হলো : আখিয়ার (পছন্দকৃত) যাদের সংখ্যা ৩০০, আবদাল (বিকল্পগণ) সংখ্যায় ৪০, ৭ জন আবরার (ধার্মিক), ৪ জন আওতাদ (খুঁটি), ৩ জন নুকাবা (প্রহরীরা), কুতুব (খুঁটি) যাকে তার সময়কার সবচেয়ে বড় ওলি বলে গণ্য করা হয়। তালিকার শীর্ষে ওলিদের প্রধান হলো 'গাউথ' (গাউছ বা ত্রাণকারী) যাকে কোন কোন মহল বিশ্বাস করে যে, তিনি বিশ্বাসীদের পাপের কিয়দংশ নিজের কাঁধে নিতে সক্ষম।

সুফী বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বোচ্চ তিন শ্রেণীর ওলিগণ সালাতের সময় অদৃশ্যভাবে মক্কায় হাজির হয়। গাউছ-এর মৃত্যু হলে কুতুব তার স্থানে অধিষ্ঠিত হয় এবং এভাবে সবাই তালিকার উপরের দিকে উঠতে থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীর সবচেয়ে পুণ্যাত্মা পরবর্তী উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হতে থাকে। এ সব বিশ্বাস খ্রিস্টীয় ধর্মের পৌরাণিক কাহিনী থেকে ধার করা হয়েছে। যেমন, 'মিলাদ' ক্রিসম্যাস (খ্রিস্টের জন্মোৎসব বা বড়দিন) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ফানা : আল্লাহর সাথে মানুষের একীকরণ

তথাকথিত নামকরা ওলিদের তালিকায় আল হাল্লাজের মতো ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। আল হাল্লাজকে তাঁর 'আনাল-হক্ক' অর্থাৎ "আমিই সত্য" এ

ভয়ংকর ঘোষণার ঐশ্বরিক দাবির মাধ্যমে খোলাখুলিভাবে স্ব-ধর্ম ত্যাগ করার কারণে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। অথচ আল্লাহ্ ঘোষণা করেন-

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِي الْمَوْتٰى ـ

অর্থাৎ, "ইহা এজন্য যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন।" (সূরা আল হজ্জ্ব : আয়াত-৬)

বৌদ্ধ ধর্মের 'নির্ভানা' (চরম অবস্থা প্রাপ্তি) নামের অনুরূপ একটি তত্ত্বের ওপর বিশ্বাস করে এ উন্মাদগ্রস্ত আল হাল্লাজ এ জাতীয় ঘোষণা দিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের চিন্তাধারার একটি শাখা অনুসারেহ এ অবস্থায় আত্মকেন্দ্রিকতা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং মানুষের আত্মা এবং সচেতনতা লোপ পায়।

এ মতবাদ "মরমিবাদ" (Mysticism) নামে পরিচিত একটি দর্শনের মূলভিত্তি রচনা করে। এ মতবাদ অনুযায়ী স্রষ্টার সাথে মানবাত্মার একীভূত (মিলে যাওয়া) হওয়া সম্ভব এবং মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক যে, সেই একীকরণ খোঁজ করা। মরমিবাদের মূল খুঁজলে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের লেখায় পাওয়া যায় যেমন "প্লেটোর আলোচনা সভা" (Plato's Symposium)। এ পুস্তকে উল্লেখ আছে কী করে আরোহণের সিঁড়ির শক্ত এবং দুর্গম ধাপগুলো পার হয়ে অবশেষে স্রষ্টার সাথে মানবাত্মার একীকরণ অর্জন হয়।

একই ধরনের তত্ত্ব হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মার (নৈর্ব্যক্তিক অসীম) সঙ্গে 'আত্মা' (মানুষের আত্মার) অভিন্নরূপে মিলিত হওয়ার তত্ত্বের মধ্যেও পাওয়া যায়, যা হাসিল করা অথবা পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পাওয়াই মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আধ্যাত্মিক খ্রিস্টান আন্দোলনের মাধ্যমে ভ্যালেন্টিনাস (Valentinus, c 140 CE) এর মতো গ্রিক মরমিবাদ ভাবধারা বিকশিত হয়, যা দ্বিতীয় শতাব্দিতে শীর্ষে পৌছায়।

তৃতীয় শতাব্দিতে মিশরীয়-রোমান দার্শনিক প্লুটিনাস (Plotinus, 205-270 CE) কর্তৃক এ সব ভাবধারা মিলে নিওপ্ল্যাটোনিজম (Neoplatonism) নামে একটি ধর্মীয় দর্শন সৃষ্টি হয়। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দিতে কিছু খ্রিস্টান বৈরাগী ও সন্ন্যাসিরা মিশরের মরুভূমিতে সরে গিয়ে খ্রিস্টান ধর্মে সন্ন্যাস প্রথা প্রবর্তন করেছিল। তারা ঐ সময় আত্মকৃচ্ছ এবং

আত্মত্যাগী ধ্যানমূলক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার সাথে একীকরণের নিওপ্ল্যাটোনিক তত্ত্ব অবলম্বন করেছিল।

'পাছোমিয়াস' (St. Pachomius, 290-346 CE) নামের খ্রিস্টান সাধক সন্ন্যাস জীবনের জন্য প্রথমে কিছু বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছিলেন এবং মিসরের মরুভূমিতে নয়টি সন্ন্যাস-আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু নুরাসিয়ার "সাধক বেনেডিক" (St. Benedict of Nurasia, 480-537 CE) ইটালির মন্টে ক্যাসিনো (Monte Cassino) আশ্রমের জন্য বেনেডিকটিয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে যেয়েই পাশ্চাত্যের সন্ন্যাস প্রথার প্রতিষ্ঠাতা বলে খ্যাতি লাভ করে।

খ্রিস্টান ধর্মের সন্ন্যাসব্রতের এ মরমিবাদ পদ্ধতিগুলো অষ্টম শতাব্দী থেকে মুসলমানদের নিকট প্রকাশ পেতে শুরু করে যখন ইসলামি রাজ্যের সীমানা বিস্তারিত হয়ে মিশর, সিরিয়া এবং এর প্রধান আশ্রমগুলোকে শামিল করে। ইসলামি শরিয়াতে (ইসলামি আইন) সন্তুষ্ট না হয়ে একদল মুসলমান একটি অনুরূপ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এবং তার নাম দেয় "তরিকা" (পথ)।

হিন্দুদের যেমন চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মার সঙ্গে একীভূত হওয়া এবং খ্রিস্টানদের ছিল স্রষ্টার সঙ্গে একীকরণ; এ উদ্ভাবিত তরিকার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ফানা এবং উসূল। "ফানা' হচ্ছে আত্মবিসর্জন এবং 'উসূল' হচ্ছে এ জীবনে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর সঙ্গে মানব আত্মার একীকরণ। ফানা এবং উসূল লাভ করতে গিয়ে কতগুলো প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করতে হয়– যার নাম দেয়া হয় মাকামাত (স্তর) এবং হালাত (অবস্থা)। মানুষের সাথে স্রষ্টার এ মিলনের জন্যে এক ধরনের আধ্যাত্মিক অনুশীলনও প্রণয়ন করা হয়েছিল। এ অনুশীলনে প্রায়ই মাথা এবং দেহ দুলিয়ে যিকির করা হয় এবং এমনকি অনেক সময় এতে নৃত্যও জড়িত থাকে (যেমন ঘূর্ণমান দরবেশের বেলায় দেখা যায়)। এসব অনুশীলনগুলো বলবৎ করার উদ্দেশ্যে পরস্পর সংযুক্ত কাহিনী দিয়ে এদের উৎপত্তি রাসূল ﷺ-এর ওপর আরোপ করা হয়েছে।

কিন্তু কোন বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থে এ দাবির কোন নির্ভরযোগ্য সমর্থন নেই। এ সত্ত্বেও সময়ের সাথে সাথে অনেক তরিকার সৃষ্টি হয়েছে এবং খ্রিস্টান মরমিবাদের মতো এ সব তরিকার নামকরণ করা হয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের নামে; যেমন কাদেরী, চিশতী, নকশাবন্দী এবং তীযানী

ইত্যাদি। এর পাশাপাশি এসব তরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের নামে অধিক পরিমাণে লোক কাহিনী এবং রূপকথার উৎপত্তি হয়। খ্রিস্টান ও সন্ন্যাসীদের যেরূপে তাদের বসবাসের জন্য বিশেষ ধরনের বিচ্ছিন্ন কাঠামো (আশ্রম) বেছে নেয়, সূফী গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিবর্গ যা'ওইয়াহ (শাব্দিক অর্থ : নিভৃত স্থান) নামে অনুরূপ গৃহায়ণ প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত করে।

সময়ের বিবর্তনে "আল্লাহর সঙ্গে একীকরণ" এ মরমি বিশ্বাস থেকে বিভিন্ন নব্যতান্ত্রিক মতাবলম্বী গোষ্ঠী প্রকাশ লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, অধিকাংশ তরিকা দাবি করে যে উসূল অবস্থায় পৌছালে আল্লাহকে দেখা যায়। যদিও যখন আয়েশা সিদ্দীকা (রা) রাসূলে করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে মিরাজে (ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ) আল্লাহকে দেখেছিলেন কি না।

রাসূল ﷺ উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি আল্লাহকে দেখেননি। ঐশী বাণী নাযিলের সময় আল্লাহ তাঁর সত্তার কিছু অংশ একটি পাহাড়ের কাছে প্রকাশ করলে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধুলায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ পয়গম্বর মূসা (আ)-কেও দেখিয়েছিলেন যে, তিনি বা অন্য কেউ এ জীবনে আল্লাহর দর্শন সহ্য করতে পারবে না।

কতিপয় সূফী বিশেষ দাবি করে যে, উসূল অবস্থায় পৌছালে দৈনিক পাঁচবার সালাতের বাধ্যবাধকতা আর অবশ্য করণীয় থাকে না। তাদের অনেকে পরামর্শ দেয় যে, রাসূল ﷺ অথবা তথাকথিত আউলিয়াদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা পৌছানো যায়।

অনেকে আবার আউলিয়াদের সমাধি ফলক ও কবরের চারপাশে তাওয়াফ, পশু বলি এবং অন্যান্য ধরনের ইবাদতও শুরু করেছিল। বর্তমানে মিশরের জয়নাব এবং সাদ আল-বাদওইর কবর, সুদানের মোহাম্মদ আহম্মদ (মাহদী)-এর সমাধি ফলক এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অগণিত আউলিয়া ও সাধকদের দরগাহের চারপাশে লোকদের তাওয়াফ করতে দেখা যায়।

শরিয়াতকে দেখা হতো অজ্ঞ জনগণের উদ্দেশ্যে নির্মিত বাইরের পথ হিসেবে, পক্ষান্তরে তরিকা ছিল বাছাই করা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত গুটি কয়েকের জন্য গোপন পথ। এ মরমিবাদ (Mystic) মতবাদ সমর্থন করার উদ্দেশ্যে কুরআনের আয়াতের অর্থ বিকৃত করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাফসির (কুরআন সম্পর্কিত মন্তব্য) প্রকাশ করা হয়। গ্রিক দার্শনিক চিন্তা চেতনার সাথে জাল

হাদীস মিশিয়ে একগুচ্ছ অসত্য আবিষ্কার করা হয় যা অবশেষে জনগণের মধ্যে থেকে সত্যিকার ইসলামি ধ্যান-ধারণাকে হটিয়ে দেয়।

অধিকাংশ পরিবেশে গান চালু করা হয় এবং তথাকথিত ধর্মীয় পরিবেশে নকল-আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বেগবান করার মাধ্যম হিসেবে মারিজুয়ানার মতো মাদকদ্রব্যও সেবন করতে দেখা যায়। এটাই সূফীদের আধুনিক বংশধরগণের অতীত যা মানুষের আত্মার সাথে আল্লাহর একীকরণ যে সম্ভব সেই মিথ্যা ভূমিকার ওপর সৃষ্টি হয়েছিল।

ধার্মিক ব্যক্তিগণ যথা, আবদুল কাদির আল-জিলানী এবং অন্যান্য জন যাদের ওপর কিছু তরিকা আরোপ করা হয় তারা পরিষ্কারভাবে স্রষ্টা এবং সন্তুষ্টির মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। দুটি কখনো এক হতে পারে না, যেহেতু একটি আসমানী এবং চিরন্তন, অপরপক্ষে অন্যটি মানবিক এবং সসীম।

মানুষের সঙ্গে আল্লাহর একীকরণ

কিছুই আল্লাহর দৃষ্টি এড়ায় না কাজেই যারা একথা মনে রেখে কাজ করে তারাই জ্ঞানী। তারা সব সময় তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে। তারা খুব সাবধানতার সঙ্গে সকল বাধ্যতামূলক (ফর্‌জ) কার্যাদি সমাধা করে। তারপর তারা অবশ্যম্ভাবী ত্রুটিসমূহ কতিপয় স্বতঃপ্রবৃত্ত (সুন্নত ও নফল) কার্যাদি দ্বারা পূরণ করতে চেষ্টা করে। এ সব স্বতঃপ্রবৃত্ত ধার্মিক কাজগুলো বাধ্যতামূলক দায়িত্বাদি (ফরজ) রক্ষা করতে সাহায্য করে।

উদাহরণস্বরূপ, দৈহিক অথবা আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে একজন তার ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে শিথিল হয়ে যেতে পারে। তবে, যারা সুন্নত ও নফল অনুশীলনে অভ্যস্ত তারা এ অবস্থায় স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুশীলন অবহেলা করলেও তাদের আবশ্যকীয় দায়িত্বাদি অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত কার্যাদির আত্মরক্ষামূলক বর্ম না থাকে এবং আত্মিক অলসতায় পড়ে তবে কিছু আবশ্যকীয় দায়িত্বাদি ছেড়ে দেয়ার অথবা অবহেলা করার ভয় থাকে।

একজন সুন্নত ও নফল কার্যাদি দ্বারা যতই বাধ্যতামূলক বা ফরজ অনুশীলন শক্তিশালী করবে, ততই তার জীবন শরী'আহ, সর্বশক্তিমান আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলবে। আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে দিয়ে একটি হাদীসের

মাধ্যমে এ তত্ত্বই পৌঁছে দিয়েছেন : "সবচেয়ে প্রিয় বস্তু যার দ্বারা আমার বান্দা আমার নিকট আসতে পারবে তা হলো যা আমি তার ওপর বাধ্যতামূলক (ফরজ) করেছি। আমার বান্দা স্বতঃপ্রবৃত্ত ধার্মিক কার্যাদি (ইবাদত) যত অধিক পালন করতে থাকবে তত বেশি সে আমার নিকটবর্তী হবে যে পর্যন্ত না আমি তাকে ভালোবাসব। আমি যদি তাকে ভালোবাসি, আমি তার শ্রবণেন্দ্রিয় হব যা দিয়ে সে শ্রবণ করে, দৃষ্টিশক্তি হব যা দিয়ে সে দেখে, হাত হব যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হব যা দিয়ে সে হাঁটে। সে আমার নিকট যা চাইবে তাই দেব এবং সে যদি আমার নিকট আশ্রয় চায়, আমি তাকে রক্ষা করব।"

আল্লাহর এ ওলি যা হালাল (আইনসম্মত) শুধু তাই শ্রবণ করবে, দেখবে, ধরবে এবং তার দিকে চলবে। পাশাপাশি সকল হারাম (নিষিদ্ধ) এবং যে এ কাজ হারামের দিকে নিয়ে যায় তা এড়িয়ে চলবে। এটাই হলো একজনের জীবন উৎসর্গ করার মতো একমাত্র যোগ্য লক্ষ্য। যখন এ লক্ষ্য অর্জিত হবে মানুষ আল্লাহর দাস এবং দুনিয়ায় আল্লাহর দূত হিসেবে দ্বৈত ভূমিকার উৎকর্ষতা লাভ করবে। কিন্তু, হাদীসে যে পথ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সে পথ ছাড়া অন্য কোন পথ অবলম্বন করলে এ লক্ষ্য সাধন হবে না।

প্রথমে, সম্পূর্ণভাবে আবশ্যকীয় কার্যাদি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তারপর নির্দিষ্ট করে দেয়া ইবাদতের স্বতঃপ্রবৃত্ত ধার্মিক কার্যাদি অটলভাবে এবং সুন্নাহ অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে বিশ্বাসীদের এ প্রসঙ্গে গুরুত্ব প্রদানের জন্য জোর দিতে বলেছেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে (মুহাম্মাদ) অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৩১)

অতএব, একমাত্র আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশাবলি (সুন্নাহ) অনুসরণ করে এবং সতর্কতার সঙ্গে ধর্মে সকল রকম নতুন বিষয়ের প্রবর্তন এড়িয়ে আল্লাহর ভালোবাসা হাসিল করা সম্ভব। এ অনুমোদিত বিধি নিম্নলিখিত হাদীসে রয়েছে যা রাসূল বর্ণনা দিয়েছেন বলে আবূ নাজিহ উল্লেখ করেছেন,

"আমার সুন্নাহ্ এবং সঠিকভাবে পথ নির্দেশকারী খলিফাদের অনুসরণ কর। এটা মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়িয়ে ধর এবং নতুন প্রবর্তন প্রসঙ্গে সতর্কতা অবলম্বন কর, কারণ সেগুলো সব প্রচলিত ধর্মমত-বিরুদ্ধ বিশ্বাস (বিদ'আত) এবং বিরুদ্ধ বিশ্বাস হলো ভুল পথ, যা জাহান্নামের আগুনের দিকে চালিত করে।"

যে দৃঢ়ভাবে এ তত্ত্ব অনুসরণ করে সে আল্লাহ্ তাকে যা শুনাতে চান শুধুমাত্র তাই শোনে। কারণ ন্যায়পরায়ণের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا .

অর্থাৎ, রাহ্মানের বান্দারা যখন জমিনে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে, সালাম।

(সূরা আল ফোরকান : আয়াত-৬৩)

কুরআনের অন্য আয়াতে এ প্রসঙ্গে তিনি আরও ইরশাদ করেছেন–

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِى حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শ্রবণ করবে আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বসো না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হবে। (সূরা আন নিসা : আয়াত-১৪০)

আল্লাহ্ তাকে যা শোনাতে চান তা শোনায় রূপকভাবে (Metaphorically) আল্লাহ্ তার শ্রবণেন্দ্রিয় হয়ে যান। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ তার দৃষ্টিশক্তি, হাত এবং পা হয়ে যান।

পূর্বে বর্ণিত হাদীসের এটাই বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনি মানুষের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, হাত ও পা হয়ে যান। দুর্ভাগ্যক্রমে,

অতীন্দ্রিয়বাদ এবং মরমিবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ আল্লাহর সঙ্গে একীকরণ মতবাদের (ফানা) সমর্থন হিসেবে আলোচ্য হাদীসটির অপব্যাখ্যা করেছে।

রুহুল্লাহ : আল্লাহর আত্মা

মানব আত্মাকে আল্লাহর সাথে একীকরণের মতো অতীন্দ্রিয়বাদ বিশ্বাসের সমর্থনের জন্য কুরআনের কতিপয় আয়াতের মিথ্যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিম্নলিখিত আয়াত যেখানে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ -

অর্থাৎ, পরে তিনি (আল্লাহ) তাকে (আদম) করেছেন সুঠাম এবং তাতে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। (সূরা আস্ সাজদা : আয়াত-৯)

এবং

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ -

অর্থাৎ, যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রুহ (আত্মা) সঞ্চার করব .....। (সূরা আল হিজর : আয়াত-২৯)

আলোচ্য আয়াতগুলো ব্যবহার করে প্রমাণ করা হয় যে প্রত্যেক মানুষের দেহের অভ্যন্তরে আল্লাহর কিছু অংশ বিদ্যমান আছে। আল্লাহর আত্মার অংশ যা তিনি আদমের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন তা আদমের বংশধরগণ ওয়ারিসসূত্রে পেয়েছে বলে দাবি করা হয়। পয়গম্বর ঈসার প্রসঙ্গও ব্যবহার করা হয়েছে যার মাতা প্রসঙ্গে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا اٰيَةً لِّلْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ, যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমি আমার রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। (সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-৯১)

এভাবে, মরমিবাদ বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করে যে মানুষের ভিতরের এ স্বর্গীয় চিরন্তন আত্মা যেখান থেকে এসেছিল সেই উৎসের সাথে পুনর্মিলনের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। তবে তা সত্য নয়। ইংরেজি ভাষার মতো আরবি ভাষায় অধিকারসূচক সর্বনামগুলো (আমার, তোমার, তার,

আমাদের) কি প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে দুই ধরনের অর্থ হয়। ঐগুলো একটি স্বাভাবিক গুণ বা অধিকৃত সত্ত্ব বর্ণনা করতে পারে যা তার মালিকের একটি অংশ হতে পারে অথবা নাও পারে। উদাহরণস্বরূপ, পয়গম্বর মূসা (আ)-কে আল্লাহর আদেশ–

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ ـ

অর্থাৎ, তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, এটা বাহির হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে। (সূরা ত্বাহা : আয়াত–২২)

উভয় 'হাত" এবং "জামা" পয়গম্বর মূসার কিন্তু তার হাত হলো তার দেহের একটি অংশ পক্ষান্তরে তার শার্ট তার দেহের অংশ ছিল না। আল্লাহর গুণাবলি এবং সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ও একই ধরনের।

উদাহরণস্বরূপ, ঐশ্বরিক করুণার বেলায় আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ অনুকম্পার জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন। (সূরা আল্ বাকারা : আয়াত-১০৫)

আল্লাহর করুণা তাঁর গুণাবলির এবং তাঁর সন্তুষ্টির একটি অংশ নয়। অন্যদিকে তিনি সন্তুষ্টি করেছেন এ বিষয়ে জোর দেয়ার জন্য আল্লাহ অনেক সময় সৃষ্টিকৃত বস্তুকে "তাঁর" বলে উল্লেখ করেন। সৃষ্টির যে সকল উপাদানকে আল্লাহ বিশেষ সম্মানিত বলে গণ্য করেন, তাদের প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে তিনি তাদের তাঁর বলে উল্লেখ করেন। যেমন, পয়গম্বর সালিহ্-এর ছামুদ জাতির লোকদের পরীক্ষা করার জন্য প্রেরিত উষ্ট্রী প্রসঙ্গে পয়গম্বর সালিহ্ বলেছিলেন বলে আল্লাহ উদ্ধৃত করেন–

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহর এ উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। তাকে আল্লাহর জমিতে চরে খেতে দাও। (সূরা আল্ আরাফ : আয়াত-৭৩)

ছামুদ জাতির কাছে নিদর্শন হিসেবে উষ্ট্রীটিকে অলৌকিকভাবে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং উষ্ট্রীটিকে তৃণক্ষেত্র ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করার কোন অধিকার

তাদের ছিল না; কারণ সমগ্র জমিন আল্লাহর। এমনিভাবে, কা'বা প্রসঙ্গে আল্লাহ পয়গম্বর ইব্রাহীম (আব্রাহাম) এবং ইসমাঈল (ঈশমায়েল)-এর সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন–

اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ

অর্থাৎ, তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সিজ্‌দাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম। (সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১২৫)

এবং নেককার বান্দাদেরকে বিচার দিবসে আল্লাহ নির্দেশ দিবেন, "আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা আল ফজর : আয়াত-৩০)

কাজেই জান্নাত যেমন আল্লাহর সৃষ্টি, আত্মা (রুহ) প্রসঙ্গেও বলা যায় যে, এটা আল্লাহর একটি সৃষ্টি। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً ـ

অর্থাৎ, তোমাকে তারা রূহ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে। বল, রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।

(সূরা আল বনি ইসরাঈল : আয়াত-৮৫)

কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

অর্থাৎ, তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, হও, এবং তা হয়ে যায়।

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৪৭)

এবং তিনি আরও ইরশাদ করেন–

خَلَقَهٗ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

অর্থাৎ, তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, অতঃপর তাকে বলেছিলেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৫৯)

সকল সৃষ্টির জন্য আদেশ হলো, 'হও'। সুতরাং আত্মা আল্লাহর আদেশে সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলাম স্রষ্টাকে অশরীরী আত্মা বলে গণ্য করে না যেমন খ্রিস্টান

ধর্মের মতো কিছু ধর্মে করে থাকে। তাঁর কোন দৈহিক সত্তা নেই কিংবা তিনি একটি আকারহীন আত্মাও নন। তাঁর মহিমার মানানসই সেই আকার আল্লাহর আছে যা কোন মানুষ কোনদিন দেখেনি অথবা কখনো করেনি এবং যা কেবল জান্নাতীদের (মানুষের সীমিত আওতায়) দৃষ্টিগোচর হবে।

কাজেই আল্লাহ যখন আদম (আ)-এর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়ার কথা বলেন তখন তিনি অবশিষ্ট মানবজাতির তুলনায় আদমের বিশিষ্টতার উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে, কুমারী মরিয়ম (আ)-এর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়ার কথার মাধ্যমে পয়গম্বর ঈসার জন্ম সম্পর্কিত বিভ্রান্তি পরিষ্কার করেন এবং তাঁর আত্মার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। এমনকি, ফুঁ দেয়ার দায়িত্ব তাঁর নিজের ওপর আরোপ করার অর্থ, মূলত: তাঁর ইচ্ছাশক্তি এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার একটি ব্যাখ্যা। কারণ ফেরেশতারাই বস্তুত মানুষের মধ্যে আত্মা ঢুকায় এবং টেনে বের করে।

এ বিষয়টি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিম্নলিখিত হাদীস থেকে সহজবোধ্য হবে যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "মিলিতভাবে তোমার মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন তৈলাক্ত তরল পদার্থের আকারে, তারপর অনুরূপ সময় ধরে লিচের মতো রক্ত পিণ্ডের আকারে এবং আরও অনুরূপ সময় ধরে একটি গুচ্ছ মাংস আকারের মধ্য দিয়ে তোমার সৃষ্টি হয়। তারপর তার মধ্যে ফুঁ দিয়ে আত্মা প্রবেশ করানোর জন্য একজন ফিরিশতা প্রেরণ করা হয়।"

এভাবে আল্লাহ তাঁর ফিরিশতাদের মধ্যে একজনকে দিয়ে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ফুঁ দিয়ে আত্মা প্রবেশ করেছেন। "তিনি ফুঁ দিলেন" এ কথা দিয়ে আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে মনে করিয়ে দেন যে সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু ঘটে তার জন্য তিনিই মুখ্য কারণ, যেমন তিনি ঘোষণা করেছেন–

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, মূলত: আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা বানাও তাও। (সূরা আস সাফফাত : আয়াত-৯৬)

ঠিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময় রাসূল ﷺ এক মুষ্ঠি ধুলা কয়েকশত গজ দূরে সমবেত হওয়া শত্রু সৈন্য সারির দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন, কিন্তু

আল্লাহ অলৌকিকভাবে কিছু ধূলিকণা সকল শত্রু সৈন্যের চোখে পৌছে দেন। আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর উক্ত কাজ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন–

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى -

অর্থাৎ, তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন নিক্ষেপ কর নি, আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন। (সূরা আল আনফাল : আয়াত-১৭)

এভাবে, ঐ আত্মাকে তাঁর নিজের ওপর আরোপ করে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট আত্মাদের মধ্যে তাঁদের (পয়গম্বর আদম ও ঈসা (আ)-এর) প্রতি বিশেষ সম্মান দেখিয়েছিলেন। তার মানেই এই নয় যে, আল্লাহর নিকট যে রূহ রয়েছে তার থেকে একটি টুকরা ফুঁ দিয়ে পয়গম্বর আদম এবং পয়গম্বর ঈসার ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন। এ বিষয়টির ওপর আরও জোর দেয়ার জন্য আল্লাহ মরিয়মের নিকট তাঁর একজন ফিরিশতাকে 'তার আত্মা' হিসেবে প্রেরণ করার বিষয় উল্লেখ করেন–

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا -

অর্থাৎ, অতঃপর আমি তার নিকট আমার আত্মাকে প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (সূরা মরিয়াম : আয়াত-১৭)

কুরআন একটি সম্পূর্ণ বিধান। এর আয়াতগুলো স্ব-ব্যাখ্যামূলক এবং রাসূল ﷺ-এর হাদীস এবং অনুশীলন (সুন্নাহ) আয়াতগুলোর অর্থ আরও পরিষ্কার করে দেয়। যদি আয়াতগুলোর বর্ণনা প্রসঙ্গ এবং পটভূমি থেকে পৃথক করে নেয়া হয় তাহলে সহজেই কুরআনের অর্থ বিকৃত করা যায়। যেমন, সূরা আল মাউনের চার নম্বর আয়াত বলে–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ -

অর্থ : অতএব দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের।

(সূরা আল মাউন : আয়াত-৪)

কেবল আলোচ্য আয়াতটি কুরআন এবং ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ সমস্ত কুরআনে সালাতকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

إِنَّنِيْٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَاْ فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ ـ

অর্থাৎ, আমিই আল্লাহ্, আমার ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই! অতএব আমার উপাসনা কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত প্রতিষ্ঠা কর।

(সূরা ত্বাহা : আয়াত-১৪)

তথাপি যারা সালাত আদায় করে এ আয়াত তাদের লা'নত দেয়। যাহোক, এ আয়াতের পরবর্তী আয়াত বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়–

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ـ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآؤُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যারা তাদের সালাত প্রসঙ্গে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

(সূরা আল মাউন : আয়াত-৫-৭)

অতএব এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্র লা'নত শুধু মুনাফিকদের সালাতের ওপর যারা বিশ্বাসী হিসেবে ভাণ করে, সকল সালাত আদায়কারীদের ওপর নয়। এ আয়াত, "তারপর তিনি তাঁকে (আদমকে) গঠন করলেন এবং তাঁর ভিতরে তাঁর আত্মা ফুঁ দিয়ে প্রবেশ করালেন" এর আরও অর্থপূর্ণ অনুবাদ হলো, "তারপর তিনি তাঁকে গঠন করলেন এবং তাঁর একজন আত্মাকে (পবিত্র) তাঁর ভিতরে প্রবেশ করালেন।" ফলশ্রুতিতে, কুরআনে মানুষের অসৃষ্টিকৃত রূহের উৎস আল্লাহ্র সঙ্গে তার পুনর্মিলনের আকুল আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত মরমিবাদ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই। ইসলামে আরবি শব্দ রূহ (আত্মা, বহুবচনে আরওয়াহ্) এবং নফ্স (আত্মা, বহুবচনে আনফুস)-এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই, শুধুমাত্র যখন এটা দেহের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তখন তাকে নফস বলা হয়। কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন–

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ـ

অর্থাৎ, আল্লাহই প্রাণ (আন্ ফুস) হরণ করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসে নি তাদের প্রাণও (তিনি হরণ করেন) নিদ্রার সময়। (সূরা আয্ যুমার : আয়াত-৪২)

রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন বলে উম্মে সালামাহ উল্লেখ করেন, "অবশ্যই যখন আত্মা (রূহ) হরণ করা হয় চক্ষু তাকে অনুসরণ করে।"

সফল ন্যায়পরায়ণ আত্মাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন–

يَـٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ . ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً . فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ . وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ .

অর্থাৎ, হে প্রশান্ত চিত্ত!" তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট প্রত্যাবর্তন কর সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা আল ফাজর : আয়াত-২৭-৩০)

অতএব, পরিশেষে নেককার মানুষের আত্মা সর্বশক্তিমানের সঙ্গে এক হয়ে যাবে না, বরং সসীম আত্মা হিসেবে সসীম দেহের সাথে এক হয়ে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন ততদিন জান্নাতের সুখ ভোগ করতে থাকবে।

চৌদ্দতম অধ্যায়

কবর পূজা

মৃত্যুর পর বড় অনুষ্ঠান, সাজ সজ্জিত কবর ও সমাধি নির্মাণ এবং মৃতকে সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রশংসা ও ভক্তিমূলক উৎসব পালনের কারণে বহুবার ধর্মের মধ্যে বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে, মানব জাতির অধিকাংশই কোন না কোন উপায়ে কবর পূজার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। মূলত, চীন দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর (যারা সংখ্যায় মানবজাতির প্রায় এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ) ধর্মীয় অনুষ্ঠান কবর সম্পর্কিত এবং তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক।

হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান পুণ্যবান বা সাধু ব্যক্তিদের কবরগুলো তীর্থস্থানে রূপান্তরিত হয়েছে যেখানে উপাসনার নামে প্রার্থনা, পশুবলি এবং তীর্থযাত্রা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে পালন করা হয়। যুগের বিবর্তনে, মুসলমান শাসক ও জনগণ ইসলামের মূল দর্শন থেকে সরে এসে তাদের চারদিকের বিধর্মীদের পৌত্তলিক প্রথা অনুসরণ করা আরম্ভ করেছে। আলী (রা)-এর মতো সাহাবাগণের (রাসূল ﷺ-এর সহচরবৃন্দের), আবূ হানিফা ও ইমাম শাফীর মতো প্রধান আইনজ্ঞগণ এবং জুনায়েদ ও আবদুল-কাদির আল-জিলানীর মতো সূফী হিসেবে আখ্যায়িত ওলিদের কবরের উপর বিরাট সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে এমনকি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতো সামাজিক আন্দোলনের নেতা এবং তথাকথিত সুদানের মাহদীর কবরের উপরও সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে।

বর্তমান যুগে অনেক মূর্খ মুসলমান এ সব সমাধির চতুর্দিকে তাওয়াফ করার জন্য বহুদূর সফর করে। অনেকে এমনকি ঐ সমাধিগুলোর ভিতরে এবং বাইরে প্রার্থনা করে এবং অন্যেরা জবেহ (ধর্মীয় আচারের মাধ্যমে কোরবানী)-এর মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য কোরবানির পশু নিয়ে

গমন করে। যারাই কবরে প্রার্থনা করে তাদের অধিকাংশই এ ভ্রান্ত ধারণা বহন করে যে, মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা নেককার তারা আল্লাহ্র এতই নিকটে যে তাদের আশপাশে যে সব উপাসনার কাজ করা হয় সেগুলো আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত হবার সম্ভাবনা অধিক।

অর্থাৎ, যেহেতু এসব মৃত ব্যক্তি বিশেষরা আশীর্বাদ প্রাপ্ত, তাদের আশপাশের সব কিছুও নিশ্চয় আশীর্বাদ প্রাপ্ত। তাদের সমাধি-ফলক এবং এমনকি যে জমির উপর ঐগুলো প্রতিষ্ঠিত সেগুলোর উপরেও নিশ্চয়ই আশীর্বাদ প্রবাহিত হচ্ছে। এ বিশ্বাসের কারণে কবর-পূজারীরা প্রায়ই অতিরিক্ত আশীর্বাদ হাসিলের নিমিত্তে কবরের দেয়ালে হাত মুছে দেহের উপর বুলায়।

তারা প্রায়ই কবরের আশপাশের মাটি সংগ্রহ্ করে এ ভ্রান্ত বিশ্বাসে যে, যাদের কবর দেয়া হয়েছে তাদের ওপর আশীর্বাদ আরোপের কারণে ঐ মাটির আরোগ্য করার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। শিয়া সম্প্রদায়ের কয়েকটি শাখার অনেকে কারবালায় ইমাম হোসেন যেখানে শহীদ হয়েছিলেন সেখানকার কাদা মাটি যোগাড় করে আগুনে সেঁকে ছোট ছোট ফলক তৈরি করে এবং সালাতের সময় সেগুলোর উপর সাজদাহ্ করে।

মৃতের প্রতি প্রার্থনা

যারা কবর-পূজার সঙ্গে জড়িত তারা দুভাবে মৃতের প্রতি প্রার্থনা করে

১. কতিপয় লোক মৃতদের মধ্যস্থ হিসেবে ব্যবহার করে। ক্যাথলিকরা যেভাবে তাদের অপরাধ স্বীকারের জন্য পাদ্রিদের ব্যবহার করে তারা সেভাবে মৃতদের কাছে প্রার্থনা করে। ক্যাথলিকরা তাদের পাদ্রিদের কাছে পাপ স্বীকার করে এবং পাদ্রিরা তাদের জন্য স্রষ্টার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এভাবে, পাদ্রিরা মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে দালাল হিসেবে কাজ করে।

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى -

অর্থাৎ, আমরা তো তাদের পূজা এজন্যই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে এনে দিবে। (সূরা আয্ যুমার : আয়াত-৩)

মুসলমানদের মধ্যে কিছু কবর-পূজারী আছে যারা তাদের চাহিদা পূরণের আবেদন আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য মৃতের নিকট প্রার্থনা করে। এ জাতীয় কার্যকলাপ এ বিশ্বাসের ওপর গড়ে উঠেছে যে, নেককার মৃত ব্যক্তিরা

তাদের থেকে আল্লাহর নিকটবর্তী এবং তারা মৃত্যুর পরেও যে কোন মানুষের অনুরোধ শ্রবণ করতে এবং পূরণ করতে সক্ষম। এভাবে জীবিতদের অনুগ্রহ করার জন্য মৃত ব্যক্তি মধ্যস্থতাকারী মূর্তি হয়ে যায়।

২. অন্যেরা তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সরাসরি মৃতদের নিকট প্রার্থনা করে। এটা করতে যেয়ে তারা মৃত ব্যক্তিদের ওপর (আত্-তাওয়াব) আল্লাহর গুণাবলি আরোপ করে। কারণ একমাত্র আল্লাহ্ অনুশোচনা প্রাপ্তির যোগ্য এবং একমাত্র তিনিই পাপ ক্ষমা করতে সক্ষম (আল গফুর)। তাদের প্রথা এবং ক্যাথলিকদের প্রথার মধ্যে জোরালো মিল রয়েছে।

যেমন, কিছু হারালে তা পাবার জন্য ক্যাথলিকরা থেবসের সন্ত এন্থোনীর (Saint Anthony of Thebes) কাছে প্রার্থনা করে। অনুরূপভাবে সন্ত জুড থাড্ডাইস (St. Jude Thaddaeus) হলো অসাধ্য সাধনের রক্ষক এবং দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা, অসম্ভাব্য বিবাহ অথবা অনুরূপ ব্যাপারে মধ্যস্থতার জন্য তার নিকট প্রার্থনা করা হয়।

১৯৬৯ সাল পর্যন্ত যদি কেউ সফরে বের হতো তখন তারা তাদের পাহারা দেবার জন্য পর্যটকদের রক্ষক সেইন্ট ক্রিস্টোফারের নিকট প্রার্থনা করত। তারপর ১৯৬৯ সালে পোপের আদেশে তার নাম সন্ত বা দরবেশের তালিকা থেকে বাদ হয়ে গেলে নিশ্চিত হওয়া গেল যে, সে কল্পিত ছিল। সাধারণ খ্রিস্টানগণ পয়গম্বর যিশুকে স্রষ্টার অবতার হিসেবে গণ্য করে।

অধিকাংশ খ্রিস্টানরাই স্রষ্টার পরিবর্তে যিশুর কাছে প্রার্থনা করে। গোটা বিশ্বে অনেক মূর্খ মুসলমান রয়েছে যারা একই কায়দায় রাসূল ﷺ-এর প্রতি তাদের ইবাদত চালিত করে। ইসলাম এ উভয় পদ্ধতিকেই সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং এ শিক্ষা দেয় যে, একজন মৃত্যুবরণ করে বারযাখ নামে একটি ব্যাপ্তির মধ্যে প্রবেশ করে যেখানে তার কার্যাদি শেষ হয়ে যায়। সে জীবিতদের জন্য কোন কিছু করতে অক্ষম, যদিও তার কর্মফল জীবিতদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা দেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যখন একজন মৃত্যুবরণ করে, তিনটি ভালো কাজ ছাড়া তার (ভালো) কার্যাদির সমাপ্তি ঘটে : কল্যাণ অব্যাহত থাকে এ জাতীয় দান, জনগণের জন্য

মঙ্গলকর জ্ঞান এবং সৎকর্মশীল সন্তানাদি যারা তার জন্য প্রার্থনা করে।" রাসূল ﷺ অনেক জোর দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে তাঁর সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা থাকুক না কেন এ জীবনে তিনি কারোরই কোন কল্যাণ করতে সক্ষম নন। তাঁর অনুসারীদের বলার জন্য কুরআনে আল্লাহ্ তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেছেন–

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

অর্থাৎ, বল, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালো-মন্দের ওপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে তো প্রভূত কল্যাণই হাসিল করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।" (সূরা আল আরাফ : আয়াত-১৮৮)

সাহাবী আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা দিয়েছেন যে, যখন "তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও" আয়াতটি রাসূল ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছেন, "হে কোরায়েশগণ! আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তি নিশ্চিত কর (ভালো কাজ করে)।

হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ! আল্লাহর বিপক্ষে আমি কোনভাবেই তোমাদের সাহায্য করতে পারি না; হে আমার (চাচা) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আমি কোনভাবেই আপনাকে সাহায্য করতে পারি না; হে আমার (চাচি) সাফিয়্যাহ! আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আমি কোনভাবেই আপনাকে সাহায্য করতে পারি না; হে ফাতিমা! মুহাম্মাদের কন্যা, আমার নিকট যা ইচ্ছা চাও, কিন্তু আমার নিকট এমন কিছুই নেই যা তোমাকে আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিপক্ষে সাহায্য করতে পারে।"

অন্য আরো এক সময়, সাহাবাদের মধ্যে একজন রাসূল ﷺ-এর নিকট তার বক্তব্য এ উক্তি দিয়ে শেষ করলেন যে, "আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন এবং আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন।" রাসূল ﷺ তৎক্ষণাৎ তার ভুল সংশোধন

করে বললেন, "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ করলে?" বল, "আল্লাহ এককভাবে যা ইচ্ছা করেন এটা তাই।"

রাসূল ﷺ-এর নিকট প্রার্থনা করার এভাবে পরিষ্কার বাধা থাকা সত্ত্বেও অনেক মুসলমান শুধু তাই করে না বরঞ্চ তারা বিভিন্ন আউলিয়াদের নিকটও প্রার্থনা করে। 'মরমিবাদীদের' (সূফীদের) একটি খারেজী দাবি হলো, 'রিজাল আল-গাইব্ নামে নির্দিষ্ট কতিপয় আউলিয়াদের (গায়েবী জগতের মানুষ) দ্বারা মহাজাতিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। যখন তাদের মধ্যে পবিত্র একজন মৃত্যুবরণ করে, তৎক্ষণাৎ একজন বদলি তার স্থান পূরণ করে।

আউলিয়াদের ক্রম-উচ্চ শ্রেণীবিভাগের শীর্ষে রয়েছে 'কুতুব' (মেরু অথবা দুনিয়ার অলৌকিক মেরুদণ্ড), অথবা 'গাউস' (বিপদ থেকে উদ্ধারকারী)। আবদুল কাদির আল জিলানীকে (মৃ ১১৬৬ খ্রি.) জনপ্রিয়ভাবে আল গাউস আল আধ্হাম (গউছ-ই আযম), সাহায্যের সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং দুর্যোগের সময় অনেকে তাঁর নিকট সাহায্য চেয়ে বলে, "ইয়া আবদুল-কাদির আঘিতাব" (হে আবদুল কাদির আমাকে রক্ষা কর)।

এ জাতীয় সন্দেহাতীত শিরক-এর ঘোষণা প্রায়ই শোনা যায়– যদিও মুসলমানগণ প্রতিদিন অন্তত সতেরো বার তাদের সালাতে তিলাওয়াত করে "ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন– আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।"

উপরে উল্লিখিত উভয় পদ্ধতির প্রার্থনাতেই গুরুতর শিরক জড়িত, যা ইসলাম সতর্কভাবে বিরোধিতা করে; তথাপি উভয় পদ্ধতিই কোন একভাবে বর্তমানে মুসলমানদের ধর্মীয় আচারের মধ্যে নিঃশব্দে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ -

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁরা শরীক করে।

(সূরা ইউসুফ : আয়াত-১০৬)

রাসূল ﷺ ও এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন। আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, "ইঞ্চি ইঞ্চি গজ গজ করে তোমরা তোমাদের উত্তরসূরিদের প্রথা অনুসরণ করবে; এমনকি যদি

তাদেরকে একটি টিকটিকির গর্তে প্রবেশ করতে হয়ে থাকে, তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে।" যখন রাসূলকে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি কি ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্য করে বললেন, (মুসলমানরা কি ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের অনুসরণ করবে?) জবাবে তিনি বললেন, "তারা নয়ত অন্য কারা?"

থ'বানও উল্লেখ করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, "শেষ প্রহর আসবে না যতক্ষণ না আমার জাতির একদল মূর্তি পূজা করে এবং আবূ হুরায়রা (রা) উল্লেখ করেন যে, তিনি ﷺ ইরশাদ করেছেন, "শেষ প্রহর আসবে না যতক্ষণ না দজ গোষ্ঠীর নারীরা আল-খালাসা মূর্তির মন্দিরের চতুর্দিকে তাদের নিতম্ব না নাড়াবে (যখন তারা পদব্রজে তা প্রদক্ষিণ করবে)।" কাজেই মুসলমানদের ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের উৎস এবং এর ঐতিহাসিক পর্যায় প্রসঙ্গে একটি পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। এ সব আচারের সঠিক প্রসঙ্গ তখন সহজে বোঝা যাবে এবং তাদের ওপর ইসলামি রায় খুব পরিষ্কার হবে।

ধর্মের বিবর্তনমূলক মডেল

অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী (Social Scientists) এবং নৃবিজ্ঞানীগণ (Anthropologists) ডারউইনের বিবর্তন প্রক্রিয়া তত্ত্বের প্রভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রাচীনকালের মানুষের প্রকৃতির শক্তির ওপর দেবত্ব আরোপের মাধ্যমে ধর্ম আরম্ভ হয়েছে। তাদের মতে, প্রাচীনকালের মানুষ বিদ্যুৎ চমকানো, বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প ইত্যাদির মতো প্রকৃতির মহান এবং বিধ্বস্তকারী শক্তি দর্শন করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে সেগুলোকে তারা অতি প্রাকৃত (Supernatural) সত্তা হিসেবে ধারণা করেছিল। ফলে, তারা যেভাবে তাদের দলপতি অথবা শক্তিশালী গোষ্ঠীর সাহায্য কামনা করত সেভাবে ঐসব শক্তিকে প্রশমিত করার উপায় উদ্ভাবনের রাস্তা খুঁজেছিল।

এভাবে প্রার্থনা এবং পশুবলির মতো প্রাচীনকালের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্রমবিকাশ ঘটে। উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের, যারা নদী, জঙ্গল ইত্যাদির আত্মা আছে বলে বিশ্বাস করত, তাদের ধর্মের এ বিবর্তন প্রক্রিয়ার মডেলের প্রাথমিক ধাপকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তারা দাবি করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির একদল ব্যক্তিগত দেবতা ছিল।

যখন পরিবার গঠিত হওয়া আরম্ভ হয় পারিবারিক দেবতাগণ ব্যক্তিগত দেবতাদের স্থান দখল করল। এ ধাপের দৃষ্টান্ত হিসেবে ভারতের হিন্দুদের বহু ঈশ্বরবাদের উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব দেবতা রয়েছে। অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং টিকে থাকার সংগ্রামের পরিণতি হিসেবে পরিবার সম্প্রসারিত হয় এবং গোত্রের উদ্ভব হয়। পালাক্রমে গোত্রের দেবতা পুরাতন পারিবারিক দেবতাদের স্থান দখল করে। প্রত্যেক প্রজন্মের পাশাপাশি গোত্র ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পারিবারিক দেবতাদের সংখ্যা ধারাবাহিক কমতে থাকে।

পরিণামে দুই ঈশ্বরবাদের আবির্ভাব হয়, যার মধ্যে সকল অতি-প্রাকৃত শক্তিগুলো কল্যাণের জন্য একজন এবং অকল্যাণের জন্য একজন, এ দুজন প্রধান দেবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। বিবর্তন মতবাদীদের মতে, এ অবস্থার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পারস্য দেশের যুরাষ্ট্রীয়দের ধর্মে। পারস্য দেশীয় সংস্কারক, যারাথুসত্রা (Zarathustra, গ্রিক ভাষায় Zoroaster)-এর আবির্ভাবের পূর্বে পারস্যবাসীরা প্রকৃতি আত্মা, গোত্রীয় আত্মা এবং পারিবারিক আত্মায় বিশ্বাস করত বলে মনে করা হয়।

নৃবিজ্ঞানীগণের মতে যুক্তরাষ্ট্রের সময় গোত্রীয় দেবতারা সংখ্যায় হ্রাস পেয়ে দুটিতে দাঁড়ায় : আহুরা মাজদা, যে তাদের মতে, দুনিয়ায় সব কল্যাণ সৃষ্টি করেছে এবং আংগ্রা মানিউ, যে সব অকল্যাণ সৃষ্টি করেছে। গোত্র যখন জাতিদের জন্য রাস্তা উন্মুক্ত করে দিল, তখন পর্যায়ক্রমে গোত্রীয় দেবতারা জাতীয় ঈশ্বরের জন্য রাস্তা উন্মুক্ত করে দিল এবং এককত্বের দর্শনের সৃষ্টি হলো বলে ধারণা করা হয়। পুরাতন বাইবেলে ইসরাঈলীয়দের ঈশ্বরকে জাতীয় স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যে তাদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইসরাঈলীয়দের তার পছন্দনীয় সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে মিশরীয় শাসক আখেনাতেন (Akhenaten), যিনি চতুর্থ আমেনহোটেপ (Amenhotep IV) বলেও পরিচিত ছিলেন, তাঁকেও ধর্ম সম্পর্কিত বিবর্তনবাদের প্রমাণ হিসেবে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়। যখন মিশরের জনগণের প্রচলিত বিশ্বাস ছিল বহু-ঈশ্বরবাদে সেই সময় তিনি রা (Ra) নামে ঈশ্বরের এককত্বের প্রার্থনার প্রচলন করেন এবং সেই ঈশ্বরকে সূর্যের চাকতির দ্বারা প্রতীকায়িত করেন।

অতএব, সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানীদের মতে ধর্মের কোন স্বর্গীয় ভিত্তি নেই। এটা শুধু প্রাচীনকালের জনগণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কুসংস্কারের বিবর্তন মাত্র। তারা বিশ্বাস করে যে শেষ পর্যন্ত যখন বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হবে, তখন ধর্ম বিলুপ্ত হবে।

ধর্মের অধ:পতিত রূপরেখা

ধর্ম প্রসঙ্গে ইসলামি মতবাদ এবং এর ক্রমবিকাশ পূর্ববর্তী মতামতের সম্পূর্ণ বিপরীত। এটি অধঃপতন (স্ব-ধর্মচ্যুতি) এবং নবজন্ম লাভের একটি প্রক্রিয়া এবং বিবর্তনের প্রক্রিয়া নয়। মানুষের যাত্রা আরম্ভ হয় আল্লাহর এককত্বের দর্শন দিয়ে। কিন্তু সময়ের সাথে নানা রকম বহু-ঈশ্বরবাদে গোমরাহ্ হয়ে পড়ে। এটা কখনো ছিল দ্বি-ঈশ্বরবাদ, কখনো ত্রি-ঈশ্বরবাদ এবং কখনো সর্বেশ্বরবাদ। স্রষ্টা পৃথিবীর সকল জাতি এবং উপজাতির নিকট আম্বিয়ায়ে কেরামকে প্রেরণ করেছিলেন তাদেরকে পুনরায় আল্লাহর এককত্বের দর্শনের সরল পথে ফিরিয়ে আনার জন্য।

কিন্তু, কালক্রমে তারা বিপথে চলে যায় এবং পয়গম্বরদের শিক্ষা পরিবর্তন করা হয়, নতুবা হারিয়ে যায়। এ বাস্তবতার প্রমাণ এ ঘটনায় পরিলক্ষিত হয় যে, যে সব আদিম গোত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাদের সকলেই একজন সর্বোচ্চ সত্তায় বিশ্বাসী ছিল। বিবর্তনবাদ তত্ত্ব হিসেবে ধর্মের ক্রমবিকাশ যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, অধিকাংশ লোকই অন্যান্য সকল দেবতা অথবা আত্মার ঊর্ধ্বে একজন সর্বোচ্চ স্রষ্টায় বিশ্বাস করে। মধ্য-আমেরিকার মায়াদের স্রষ্টা-ঈশ্বর ইত্যামানা (Itzamana) থেকে সিয়েরা লিওন মেন্ডেদের (Sierra Leone Mende) গোটা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এনগিউ (Ngewo) এবং হিন্দু ধর্মের অসীম ব্রহ্মা থেকে প্রাচীন শহর ব্যবিলনের মন্দিরের সর্বোচ্চ ঈশ্বর মারদুকে দেখলে সর্বোচ্চ সত্তা পরিষ্কারভাবে দৃষ্ট হয়।

এমনকি যুক্তরাষ্ট্রীয়দের দ্বি-ঈশ্বরবাদে মঙ্গলের ঈশ্বর আহুরা-মাজদার (Ahura Mazda) স্থান, আংগারা মানিউ (Angra Manyu) থেকে ঊর্ধ্বে এবং তাদের বিশ্বাস অনুসারে যে দিন আহুরা মাজদা পরাজিত করবে আংগারা মানিউকে সেদিন হবে বিচারের দিন। অতএব আহুরা-মাজদা তাদের সত্যিকারের সর্বোচ্চ ঈশ্বর। বিবর্তনবাদের মডেল অনুসারে এরকম হওয়া উচিত নয়, কারণ এককত্বের বিশ্বাস যা বহু ঈশ্বরবাদ থেকে উৎপত্তি

হয়েছে তা কখনো সর্বপ্রাণবাদের সাথে সহ-অবস্থান করতে পারে না। তবে মাত্র একজন সর্বোচ্চ সত্তার ধারণা অধিকাংশ ধর্মেই আছে। সৃষ্টির বিভিন্ন অংশের ওপর স্রষ্টার গুণাবলি আরোপ করে জনগণ আম্বিয়ায়ে কেরামের আল্লাহর এককত্বের দর্শনের শিক্ষার পথ থেকে সরে গিয়েছিল।

অধঃপতনের (স্বধর্মচ্যুতি) সত্যতার অন্য আর একটি প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় এককত্ববাদী ইহুদি ধর্ম থেকে বহু-ঈশ্বরবাদী খ্রিস্টীয় ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালে। যিশুর শেখানো এককত্বের দর্শনের অধঃপতন হয়ে দ্বৈতবাদের উদ্ভব হলো। দ্বৈতবাদ অনুযায়ী যিশু পিতা-ঈশ্বর ছিলেন না, স্বর্গীয় পুত্র ছিলেন। গ্রিকরাও এ্যনাক্সাগোরাস (Anaxagoras) থেকে এরিস্টটল পর্যন্ত প্রচারিত দর্শনে যিশুকে লোগস (Logos) হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। পরবর্তীকালে, এর আরও অধঃপতন হয়ে রোমানদের মধ্যে ত্রি-ঈশ্বরবাদ হয় যারা সরকারিভাবে ত্রিত্ব (Trinity) মতবাদ অনুমোদন করেছিল।

অবশেষে রোমান ক্যাথলিক গির্জায় পরিপূর্ণভাবে অনেক ঈশ্বরবাদের সূচনা হয় যখন যিশুর মা মেরী ও অনেকগুলো তথাকথিত সন্ত বা দরবেশের ওপর মানুষ ও প্রভুর মধ্যে মধ্যস্থতা করার এবং মানুষের নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষমতা আরোপ করা হয়। একইভাবে, আমরা যদি শেষ পয়গম্বর রাসূল ﷺ কর্তৃক আনীত ইসলামের খাঁটি এবং চূড়ান্ত ধর্মীয় শিক্ষার দিকে তাকাই এবং আধুনিককালে বহু মুসলমানদের বিশ্বাসের সাথে তুলনা করি তাহলে আমরা তাদের বিশ্বাস এবং আচারেরও একই রকম অবক্ষয় দেখি।

সময়ের বিবর্তনে ইসলামের খাঁটি এককত্বের দর্শনের অবক্ষয় হয়েছে। বিভিন্ন মতবাদের বা ফেরকার উৎপত্তি হয়েছে, সে সব ফেরকার মাধ্যমে রাসূল ﷺ তাঁর বংশধরগণ এবং এর পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মদের মধ্য থেকে ধার্মিক এবং অধার্মিক ব্যক্তি বিশেষদের ওপর আল্লাহর গুণাবলি আরোপ করে আউলিয়া হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

ডারউইনের (Darwin) জৈব বিবর্তন মতবাদ অনুযায়ী জীবনের শুরু এবং বিকাশ একটি এ্যমিবা-সদৃশ (amoeba-like) এককোষী প্রাণিসত্তা থেকে। এসব অবিভক্ত জীবনের আকার পরবর্তীতে টিকে থাকার সংগ্রামে ক্রমবর্ধমানভাবে যৌগিক আকারে প্রকাশিত হয়। এ তত্ত্ব যদি সরাসরি ধর্মের বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো তাহলে, মূলত: অধঃপতন (স্বধর্মচ্যুতির) মডেলকে সমর্থন করত।

কারণ অধঃপতন (স্ব-ধর্মচ্যুতির) মডেল প্রস্তাব দেয় যে এককত্বের মতো সহজ আকারে ধর্ম শুরু হয়েছিল কিন্তু সময়ের বিবর্তনে ধর্ম ক্রমেই কঠিন আকারের মূর্তিপূজায় পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এর সাফল্য হারিয়ে ফেলে। বিভিন্ন কালে এবং জনপদে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে দ্বি-ঈশ্বরবাদ, ত্রি-ঈশ্বরবাদ (ত্রিত্ব), বহু-ঈশ্বরবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদ বিস্তার লাভ করে।

শিরকের সূত্রপাত

মহান আল্লাহ্র এককত্বের দর্শন যা পয়গম্বর আদম (আ) থেকে আরম্ভ হয়েছিল তা থেকে মানব জাতির মধ্যে প্রথমে বহু-ঈশ্বরবাদ কীভাবে রাস্তা করে নিল, রাসূল ﷺ সে বিষয়ে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। রাসূল ﷺ-এর সাহাবাগণ সূরা নূহ-এর ২৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় যে চিত্রের বর্ণনা দেন সেখানে আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর নূহ (Noah)-এর জাতির একমাত্র স্রষ্টার ইবাদত করার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন তিনি ঘোষণা করেন–

وَقَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلاَ سُوَاعًا وَّلاَ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ـ

অর্থাৎ, এবং, (তারা পরস্পরকে) বলেছিল, "তোমরা কখনো ছেড়ে দিবে না তোমাদের দেবদেবীকে; ছেড়ে দিবে না ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়া'উক ও নাস্‌র-কে। (সূরা–৭১ নূহ : আয়াত-২৩)

কুরআনের আলোচ্য আয়াতের ওপর মন্তব্য করে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "এগুলো নূহের জাতির মূর্তি যা সময়কালে আরবদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। দাওমাতুল-যানদাল এলাকার কালব গোত্রের দেবতা হয় 'ওয়াদ', হুদাইয়াল গোত্র কর্তৃক 'সুওয়া' গ্রহণ করা হয়, সাবার নিকটবর্তী জারফের ঘুতাইফ গোত্র কর্তৃক 'ইয়াগুছ' গ্রহণ করা হয়, হামদান গোত্র কর্তৃক 'ইয়াউক' গ্রহণ করা হয় এবং 'নাস্‌র' হয়ে যায় হিমইয়ারা গোত্রের ধূল-কালা শাখার দেবতা। নূহ-এর জাতির মধ্যে নেককার ব্যক্তিবর্গের নামানুসারে এসব মূর্তিদের নামকরণ করা হয়েছিল।

এ সব নেককার ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করলে তাদের নামানুসারে মূর্তি তৈরির জন্য শয়তান লোকদের উৎসাহিত করল। সৎকর্মশীলতার স্মারক হিসেবে ঐসব মূর্তিগুলোকে তাদের দেখা সাক্ষাৎ করার জনপ্রিয় স্থানগুলোতে স্থাপন করা হয় এবং ঐ প্রজন্মের কেউ মূর্তিগুলো পূজা করেনি। তবে, ঐ প্রজন্মের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে মূর্তিগুলো স্থাপনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে গেল। (তখন শয়তান তাদের বংশধরদের নিকট এসে বলল যে, তাদের পূর্ব পুরুষরা মূর্তিগুলো পূজা করত কারণ তাদের কারণেই বৃষ্টিপাত হতো। বংশধরগণ প্রতারণার শিকার হলো এবং মূর্তিগুলোর পূজা অর্চনা আরম্ভ করল।) পরবর্তী বংশধরগণ তাদেরকে পূজা করা অব্যাহত রাখল।"

আমাদের পূর্বপুরুষগণের খাঁটি এককত্বের দর্শনে বিশ্বাসের ভিতর মূর্তিপূজা এবং বহু-ঈশ্বরবাদ কি প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছিল তা রাসূল ﷺ-এর এ দুজন বিশিষ্ট সাহাবা আয়াতটির তাফসীর বর্ণনার মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে চিত্রিত করেছেন। এটা অধঃপতন (স্ব-ধর্মচ্যুতির) মডেল দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে, পূর্বপুরুষ পূজার ঐতিহাসিক উৎস চিহ্নিত করে এবং ইসলাম কেন মানুষ এবং প্রাণীর আকারকে মূর্তি বা চিত্রকর্মের মাধ্যমে চিত্রিত করা দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে তারও ব্যাখ্যা করে। পয়গম্বর মূসা (আ)-কে প্রদত্ত আল্লাহর দশটি বিধান এবং পুরাতন বাইবেলেও প্রতিমূর্তি নিষিদ্ধ করা হয়–

তোমরা নিজেদের জন্য কোন খোদাই করা প্রতিমূর্তি বানাবে না অথবা আসমানের উর্ধ্বে অথবা মাটির নিচে অথবা মাটির নিচের পানিতে যা কিছু বিদ্যমান তার সদৃশ কিছু বানাবে না।"

গ্রিক-রোমান চিন্তাধারার সংমিশ্রণে পয়গম্বর যিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত না হওয়া পর্যন্ত আদি খ্রিস্টধর্ম এ মনোভাব বজায় রেখেছিল। এ পরিবর্তনের ফলে মূর্তি নির্মাণের ধুম পড়ে গেল, যার মধ্যে ধর্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী যোদ্ধা, দরবেশ, ধর্ম সংস্কারক, মেরী, যিশু এবং এমনকি স্বয়ং স্রষ্টাকেও চিত্রায়িত করা হলো।

যারা চিত্রকর্ম করে ও মূর্তি বানায় তাদের এবং তার পাশাপাশি যারা ঐগুলো প্রদর্শনের জন্য ঝুলিয়ে রাখে, তাদের প্রসঙ্গে শেষ নবী রাসূলে করীম ﷺ সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ পরবর্তী জীবনে তাদের চরম শাস্তি

দিবেন। রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন, "একদিন রাসূল ﷺ আমাকে দেখতে এলেন এবং আমার নিভৃত কক্ষটি পাখাওয়ালা ঘোড়ার ছবি বিশিষ্ট একটি উলের পর্দা দিয়ে আবৃত ছিল।

পর্দাটি দেখে তাঁর মুখের রং পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, "হে আয়েশা! যারা আল্লাহর সৃষ্টি করা কাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তারা শেষ বিচার দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি পাবে। তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তারা যা সৃষ্টি করেছিল সেগুলোর মধ্যে প্রাণ আনতে বলা হবে।" রাসূল ﷺ আরও বলেন, "যে সব ঘরে ছবি এবং মূর্তি রয়েছে সে সব ঘরে রহমতের ফেরেশতারা কখনোই প্রবেশ করে না।" তখন আয়েশা (রা) বললেন, "কাজেই আমরা (পর্দাটি) কেটে টুকরা টুকরা করে ফেললাম এবং এর থেকে একটা বা দুটা বালিশ বানালাম।"

সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে অতিরিক্ত প্রশংসা করা

পয়গম্বর নূহের জাতির সময়কালের ওপরে বর্ণিত পথ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে নেককার ব্যক্তিদের অতিরিক্ত ভালোবাসা ও প্রশংসা করা মূর্তিপূজা করার একটি ভিত্তি রচনা করে। বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মে বুদ্ধ এবং যিশুর প্রতিমূর্তির উপাসনা, অতিভক্তি থেকে মূর্তিপূজার শুরুর একটি পরিষ্কার উপমা।

অতিরিক্ত প্রশংসা করার মধ্যে নিহিত বিপদের কারণে রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবাগণ এবং সাধারণভাবে সকল মুসলমানদের তাঁর অতিরিক্ত প্রশংসা না করতে আদেশ দিয়েছেন। ওমর ইবনে আল খাত্তাব (রা) বর্ণনা দেন যে, রাসূল ﷺ বলেছিলেন, "খ্রিস্টানরা যেভাবে মরিয়মের পুত্রের প্রশংসা করেছিল ঐভাবে আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করো না। আমি একজন বান্দা মাত্র, কাজেই (আমাকে উল্লেখ কর) আবদুল্লাহ্ ওয়া রাসূলুহু (আল্লাহর দাস এবং তাঁর সংবাদবাহক) হিসেবে।"

যেহেতু, যেগুলো পয়গম্বর ও দরবেশের কবর বলে বিশ্বাস করা হতো তার ওপর প্রার্থনার ক্ষেত্র নির্মাণ করা ঐ সময়কার খ্রিস্টান ও ইহুদিদের প্রথা ছিল, রাসূল ﷺ ঐ প্রথাকে লা'নত করেছেন। ইসলাম যে সম্পূর্ণভাবে এ জাতীয় মৃত ব্যক্তির পূজার বিরোধী এটা পরিষ্কারভাবে বোঝানোর জন্য এবং নেককার ব্যক্তিদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা থেকে সাবধান করার জন্য, ভবিষ্যতে যারা অনুরূপ কাজ করবে রাসূল ﷺ তাদেরও লা'নত করেছেন।

রাসূলে কারীম ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামাহ্ (রা) ইথিওপিয়ায় একটি গির্জার দেয়ালে ছবি দেখেছিলেন বলে একবার রাসূল ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করেন। রাসূল ﷺ বললেন, "তাদের লোকদের মধ্যে একজন নেককার ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তারা তার কবরের উপর উপাসনার ক্ষেত্র তৈরি করে এবং তার উপর ঐ জাতীয় ছবি আঁকে। তারা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।"

রাসূলে কারীম ﷺ যখন তাঁর মৃত্যুশয্যায় তখন উম্মে সালামাহ্ (রা) গির্জা প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ করেন এবং রাসূল ﷺ-এর "সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি" হিসেবে ঐ গির্জা নির্মাণকারীর বর্ণনা দেয়া থেকে বোঝা যায় তাদের ঐ আচার মুসলমানদের জন্য কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। তাদেরকে এত কঠোরভাবে লা'নত করার কারণ হলো এই যে, তাদের এ আচার অনুশীলন হচ্ছে মূর্তিপূজার দুই প্রধান উৎস– ১. কবর সাজানো এবং ২. চিত্র তৈরি। পয়গম্বর নূহের সময়ের প্রতিমার গল্প থেকে এটাই সুস্পষ্ট যে, উভয় কাজই নিশ্চিতভাবে শিরক-এর পথ প্রদর্শন করে।

কবর প্রসঙ্গে বিধিনিষেধ

ইন্তেকালের পূর্বে কবর পূজাই শেষ বিষয় যে বিষয় রাসূল ﷺ সতর্ক করে দিয়েছিলেন– এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, এ প্রথা তাঁর উম্মতের জন্য কঠিন পরীক্ষা হবে। ইসলামের গঠনাত্মক বছরগুলোতে রাসূল ﷺ এমনকি তাঁর অনুসারীদের জন্য কবর দেখতে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে তৌহিদ (আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাস) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ নিষেধ বলবৎ রাখেন।

রাসূল ﷺ বলেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে, "আমি তোমাদেরকে কবর পরিদর্শন নিষেধ করতাম, কিন্তু বর্তমানে তোমাদের পরিদর্শন করা আবশ্যক কারণ তারা পরবর্তী জীবনকে মনে করে দেয়।" কবর ভ্রমণের অনুমতি দিলেও পরবর্তী প্রজন্মে এটা কবর-পূজায় অবনতি এড়াবার জন্য রাসূল ﷺ কবর পরিদর্শনের উপর কিছু নিয়ম-কানূন বেচে দিয়েছেন। বিধি নিষেধগুলো হলো নিম্নরূপ–

ক. কবর পূজার পথে একটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে (নিয়ত যাই থাকুক না কেন) কবরস্থানে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আবূ সাঈদ আল্ খুদ্‌রী বর্ণনা দেন যে, রাসূল ﷺ বলেছিলেন, "কবরস্থান এবং শৌচাগার ব্যতীত জমিনের সকল জায়গাই মসজিদ (ইবাদতের স্থান)।" আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)ও বর্ণনা দেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের বাড়িতে সালাত আদায় কর, তাকে কবরস্থান বানিও না।"

পরিবারের নিকট উপমা স্থাপনের জন্য ঘরে নফল (স্বেচ্ছাপ্রণোদিত) সালাত আদায় করার সুপারিশ করা হয়। যদি সেখানে সালাত আদায় করা না হয় তাহলে ঐস্থান কবরের মতো হয়ে যায়, কারণ কবরে সালাত আদায়ের অনুমতি নেই। যদিও কবরস্থানে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা শিরক নয়, তবুও শয়তানের প্ররোচনায় জনগণ মনে করে নিতে পারে যে, কবরস্থানে প্রার্থনা করা হয় মৃতের প্রতি। ফলে মূর্তিপূজার এ পথ পরিপূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। যেমন এক সময় দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনে আল খাত্তাব (রা) রাসূল ﷺ-এর অপর এক সাহাবীকে একটি কবরের নিকট সালাত আদায় রত দেখে চিৎকার করে তাঁকে বললেন, "কবর, কবর।"

খ. দ্বিতীয় যে কাজটি রাসূল ﷺ নিষিদ্ধ করেন তাহলো ইচ্ছাকৃতভাবে কবরের দিকে হয়ে প্রার্থনা করা। কারণ পরবর্তীতে লোকেরা এ জাতীয় কাজকে স্বয়ং মৃতদের প্রতি উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা করা বলে ধরে নিতে পারে। আবূ মারথাদ আল ঘানাবী বর্ণনা দেন যে, রাসূল ﷺ বলেছিলেন, "কবরের দিকে লক্ষ্য করে সালাত আদায় কর না অথবা ঐগুলোর উপর বস না।"

গ. কবরস্থানে কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি নেই। কারণ রাসূল ﷺ অথবা তাঁর সাহাবাগণ তিলাওয়াত করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। বিশেষ করে রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কবরস্থানে গমন করে কী পড়তে হবে? তিনি সালাম (শান্তির সম্ভাষণ) এবং প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে আল

ফাতিহা তিলাওয়াত করতে বলেননি। আবূ হুরায়রা (রা) আরও বর্ণনা দেন যে, রাসূল ﷺ বলেছিলেন–

"তোমাদের বাসস্থানকে কবরস্থান বানিও না; কারণ যে ঘরে সূরা আল বাক্বারা তিলাওয়াত করা হয় শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়।"

এ জাতীয় বর্ণনা কবরস্থানে কুরআন না পড়ার ইঙ্গিত বহন করে। ঘরে কুরআন পাঠ করা উৎসাহিত করা হয়েছে এবং ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করা (যেখানে কোন কুরআন তিলাওয়াত করা করা উচিত নয়) নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ঘ. রাসূল ﷺ কবর চুনকাম করা, তাদের উপর কাঠামো তৈরি, তাদের উপর লেখা অথবা মাটির উচ্চতা থেকে উপরে উঠানো নিষেধ করেছেন। তিনি আরও শিখিয়েছেন যে, কবরের উপর নির্মিত যে কোন কাঠামো ভেঙে ফেলতে হবে এবং কবর মাটির সাথে মিলিয়ে ফেলতে হবে।

আলী ইবনে আবু তালেব (রা) বর্ণনা দেন যে, কোন মূর্তি দেখলেই তা ভেঙ্গে ফেলার জন্য রাসূল ﷺ আদেশ দেন। আলী (রা) আরো বলেন, যে সব কবর আশপাশের জমিন থেকে হাতের তালুর প্রশস্ততার চেয়ে উঁচু সেগুলোও রাসূল ﷺ সমান করে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন।

ঙ. রাসূল ﷺ কবরের উপর মসজিদ তৈরি করা সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) উল্লেখ করেন যে, যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের সময় হয়ে আসে, তখন তিনি তাঁর চেহারার উপর তাঁর ডোরা কাটা আলখাল্লা টেনে দিয়ে বলেছিলেন, "আল্লাহর লা'নত পড়ুক ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের ওপর যারা তাদের নবীদের কবরকে প্রার্থনার স্থান বানিয়েছে।"

চ. কবর পূজা বন্ধ করার জন্য রাসূল ﷺ এমনকি তাঁর নিজের কবরের চতুর্দিকেও বাৎসরিক অথবা মৌসুমি জলসা নিষিদ্ধ করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা দেন যে, তিনি (স) বলেছিলেন, "আমার কবরকে ঈদ (উৎসবের স্থান) অথবা তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না এবং তোমরা যেখানেই থাক আমার জন্য (আল্লাহর) আশীর্বাদ চাও, কারণ তা আমার নিকট পৌঁছাবে।"

ছ. রাসূল ﷺ কবর পরিদর্শন (যিয়ারত) করার উদ্দেশ্যে যাত্রায় বের হওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। অন্যান্য ধর্মে এ জাতীয় প্রথা পৌত্তলিক তীর্থযাত্রার ভিত্তি রচনা করে। আবূ হুরায়রা (রা) এবং আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) উভয়ে বর্ণনা দিয়েছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, "মসজিদুল হারাম (মক্কার কাবা), রাসূলের মসজিদ এবং আল আকসা মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করো না।"

একদা আবূ বস্‌রা আল গিফারী (রা) এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে দেখা হলে আবূ হুরায়রাহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি কোথা থেকে এলেন। আবূ বসরা (রা) জবাব দিলেন যে, তিনি আত্‌তুর (at-Toor) থেকে আগমন করেছেন যেখানে তিনি সালাত আদায় করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, "তুমি রওয়ানা দেয়ার পূর্বে যদি আমি তোমাকে ধরতে পারতাম। কারণ আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের জন্য সফর করো না।"

কবরকে ইবাদতের স্থান গণ্য করা

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা দেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, "মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারা যারা শেষ দিনে (কেয়ামতের পূর্বে) জীবিত থাকবে এবং যারা কবরকে ইবাদতের স্থান করে নেয়।" যুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা দেন যে, রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের পাঁচদিন পূর্বে তিনি (আবদুল্লাহ) তাঁকে ﷺ বলতে শুনেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাদের পয়গম্বরদের কবরকে প্রার্থনার স্থান করে নিয়েছিল। কবরকে ইবাদতের স্থান বানিও না। কারণ আমি অবশ্যই তা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছি।"

পূর্বে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে রাসূল ﷺ যে কবরকে ইবাদতের স্থান করতে নিষিদ্ধ করেছেন সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝার পর, "কবরকে ইবাদতের স্থান গণ্য করা" এ শব্দসমষ্টি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে তার সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা দরকার। আরবি ভাষায় এ শব্দসমষ্টির তিন প্রকারের সম্ভাব্য অর্থ অনুমান করা যেতে পারে–

১. **একটি কবরের উপরে অথবা কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় অথবা সেজদা করা :** আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে কবরের উপর সালাত আদায় স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ, যে হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কবরের দিকে হয়ে অথবা তার উপরে সালাত আদায় কর না।" পূর্বে বর্ণিত আবূ মারথাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

২. **একটি কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ অথবা মসজিদের ভিতরে কবর স্থাপন :** উম্মে সালামার হাদীস মোতাবেক কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ। আলোচ্য হাদীসে রাসূল ﷺ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যারা কবরের উপর ইবাদতের স্থান বানায় তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। "যারা তাদের নবীগণ আলাহিস সাল্লাম এদের কবরকে মসজিদ করে নেবে আল্লাহ যেন তাদের লা'নত দেন," আয়েশা (রা) কর্তৃক রাসূল ﷺ-এর এ শেষ হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মসজিদে কবর স্থাপনও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। রাসূল ﷺ-এর এ শেষ ভাষ্যের ওপর ভিত্তি করেই আয়েশা (রা) রাসূল ﷺ-কে মসজিদে কবর দেবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

৩. **যে মসজিদের ভিতর কবর বানানোর তাতে সালাত আদায় করা :** কবরের উপর মসজিদ বানানোর নিষেধাজ্ঞার স্বাভাবিক পরিণতি হলো কবরের উপর নির্মিত মসজিদে প্রার্থনা নিষিদ্ধ করা। একটি রাস্তা নিষিদ্ধ করা হলে, রাস্তার শেষ মাথায় যা অবস্থিত তাও আবশ্যকীয়ভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাসূল ﷺ বাঁশি এবং তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র (মাআযীফ) নিষিদ্ধ করেছেন। আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রা) উল্লেখ করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "আমার অনুসারীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক থাকবে যারা অবিবাহিত অবস্থায় যৌন-সহবাস এবং ব্যভিচার করা, রেশমের কাপড় পরিধান করা (পুরুষদের জন্য), মাদকদ্রব্য গ্রহণ এবং বাদ্যযন্ত্র (মাআযীফ) ব্যবহার করা অনুমোদন (হালাল) করবে।"

কাজেই বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে বাদ্যযন্ত্র বাজানো এবং শ্রবণ করাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, কবরের উপর মসজিদ তৈরি করা নিষিদ্ধ

হওয়ার কারণ এই নয় যে, মসজিদ তৈরি করা একটা খারাপ কাজ; বরং কবরের উপর নির্মিত মসজিদে সালাত আদায় করাই মূলত: নিষিদ্ধ।

কবরসহ মসজিদ

কবরসহ মসজিদ দু' রকমের হতে পারে–

ক. কবরের উপর নির্মিত মসজিদ, এবং

খ. একটি মসজিদ যার ভিতর মসজিদ নির্মাণের পরে একটি কবর দেয়া হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই সালাত আদায়ের ব্যাপারে ঐগুলোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কবরের প্রতি সম্মান দেখানো আবশ্যক, কিন্তু একইভাবে কবরকে উদ্দেশ্য করে সালাত আদায় করা হারাম। যাহোক, উৎসের ওপর ভিত্তি করে এ জাতীয় মসজিদের সংশোধন করার প্রক্রিয়া ভিন্ন হয় :

১. কবরের উপর যদি মসজিদ নির্মাণ করা হয় তবে সে মসজিদ ভেঙে ফেলতে হবে এবং ঐ কবরের উপর কোন কাঠামো থাকলে তাও ধ্বংস করতে হবে। কারণ শুরুতে এ জাতীয় মসজিদ একটি কবর ছিল এবং তাকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

২. যে মসজিদের ভিতর পরে কবর স্থাপন করা হয়েছে সে মসজিদ থেকে কবর স্থানান্তর করতে হবে। এক্ষেত্রে শুরুতে এ মসজিদ কবরস্থান ছিল না, কাজেই একে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

রাসূল ﷺ-এর কবর

মদীনায় রাসূল ﷺ-এর মসজিদের অভ্যন্তরে তাঁর কবরের উপস্থিতিকে অন্য মসজিদে মরদেহ স্থাপন অথবা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য যুক্তি বা কারণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ রাসূল ﷺ তাঁর মসজিদের অভ্যন্তরে তাঁকে দাফন করার আদেশ দেন নি, তাঁর সাহাবাগণও তাঁর কবর মসজিদের অভ্যন্তরে করেননি।

রাসূল ﷺ-এর সাহাবাগণ বিচক্ষণভাবে রাসূল ﷺ-কে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা এড়িয়ে গিয়েছেন এ ভয়ে যে, পরবর্তী প্রজন্ম যাতে তাঁর কবরের অতিরিক্ত অনুরাগী না হয়ে পড়ে। ঘাফরাহ-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস উমর বর্ণনা দেন যে, যখন সাহাবাগণ রাসূল ﷺ-কে দাফন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

গ্রহণের জন্য একত্রিত হয়েছিলেন তখন একজন বলেছিলেন, "তিনি যেখানে সালাত আদায় করতেন চলুন আমরা তাঁকে সেখানে দাফন করি।"

আবূ বকর (রা) জবাব দিয়েছিলেন, "তাঁকে পূজা করার জন্য মূর্তি নির্মাণ থেকে আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন।" অন্যেরা বলেছিলেন, "চলুন আমরা তাঁকে আল-বাকীতে (মদীনার একটি কবরস্থান) দাফন করি যেখানে মুহাজিরীণদের (মক্কা থেকে যে সব মুসলমান মদীনায় এসেছিলেন) কবর দেয়া হয়েছে। আবূ বকর (রা) জবাব দিয়েছিলেন, "অবশ্যই, রাসূল-কে আল বাকীতে দাফন করা ঘৃণার্হ। কারণ কতিপয় মানুষ তাঁর নিকট আশ্রয় নেবার চেষ্টা করতে পারে যা একমাত্র আল্লাহ্র অধিকার।

অতএব যদি আমরা তাঁকে কবরস্থানে দাফন করি, আমরা সাবধানতার সঙ্গে তাঁর কবর পাহারা দিলেও আল্লাহ্র অধিকার ধ্বংস করব।" তখন তারা জিজ্ঞাসা করল, "হে আবূ বকর! আপনার অভিমত কী?" জবাবে তিনি বললেন, "আমি আল্লাহ্র রাসূল-কে বলতে শুনেছি, যেখানে নবীগণের মৃত্যু হয়েছে সেখানে দাফন করা ছাড়া আল্লাহ্ তাঁর কোন পয়গম্বরের জীবন নেননি।"

তাদের মধ্যে কয়েকজন বললেন, "আল্লাহ্র কসম! আপনি যা বললেন তা শ্রুতিমধুর এবং বিশ্বাসযোগ্য।" তখন তারা রাসূল-এর শয্যার (আয়েশার ঘরে) চতুর্দিকে লাইন টানলেন এবং যেখানে তাঁর বিছানা ছিল সেখানেই কবর খনন করলেন। আলী, ইবনে আব্বাস, আল ফাদী এবং রাসূল-এর পরিবার তার শরীর দাফন করার জন্য প্রস্তুত করলেন।

আয়েশা (রা)-এর ঘর একটি দেয়াল দ্বারা মসজিদ থেকে আলাদা করা ছিল এবং এর একটি দরজা দিয়ে রাসূল সালাত পরিচালনার জন্য মসজিদে প্রবেশ করতেন। রাসূল-এর কবরের থেকে তাঁর মসজিদের পৃথকীকরণ সম্পন্ন করতে সাহাবাগণ এ প্রবেশপথ বন্ধ করে দিলেন। ফলে, তাঁর কবর দেখার একমাত্র রাস্তা হলো মসজিদের বাইরে থেকে।

দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা) এবং তৃতীয় খলিফা ওসমান (রা)-এর সময়ে মসজিদের সম্প্রসারণ হয়। কিন্তু উভয়েই আয়েশা (রা) অথবা রাসূল-এর অন্য কোন স্ত্রীর ঘর অন্তর্ভুক্ত করা সাবধানতার সঙ্গে এড়িয়ে যান। রাসূল-এর স্ত্রীদের ঘরের দিকে সম্প্রসারণ করলে স্বাভাবিকভাবেই

রাসূল ﷺ-এর কবর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। তবে যে সকল সাহাবা মদীনায় ছিলেন তাদের ইন্তেকালের পর, খলিফা আল ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক (শাসনকাল ৭০৫-৭১৫ খৃ.) প্রথম পূর্বদিকে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। তিনি আয়েশা (রা)-এর ঘর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন কিন্তু রাসূল ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীদের ঘর ভেঙে ফেলেন। আল ওয়ালিদের গভর্নর উমর ইবনে আবদুল আজিজ সম্প্রসারণ কাজ করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

যখন আয়েশা (রা)-এর ঘর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন এর চারদিকে গোল করে উঁচু দেয়াল তৈরি করা হয় যাতে মসজিদের ভিতর থেকে তা আদৌ না দেখা যায়। পরবর্তীকালে, ঘরের দুই উত্তর কোণ থেকে আরও দুটি অতিরিক্ত দেয়াল এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে তারা পরস্পর ত্রিভুজাকারে মিলিত হয়। সরাসরি যাতে কেউ কবরের সম্মুখীন না হতে পারে তা বন্ধ করার জন্য এটা করা হয়েছিল।

দীর্ঘকাল পর, মসজিদের ছাদের সঙ্গে সবুজ গম্বুজ সংযোজন করা হয় এবং সরাসরি রাসূল ﷺ-এর কবরের উপরে স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে কবরটিকে দরজা ও জানালা বিশিষ্ট পিতলের খাঁচা দ্বারা বেষ্টন করা হয় এবং কবরের দেয়াল সবুজ পোশাক দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। রাসূল ﷺ-এর কবরের চতুর্দিকে প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা সত্ত্বেও এখনো এ ভ্রান্তি সংশোধন করার দরকার রয়েছে। কেউ যাতে ঐ কবরের দিকে হয়ে সালাত আদায় করতে না পারে অথবা মসজিদের অভ্যন্তর থেকে সেটিকে না দেখতে পারে সেজন্য আবারও দেয়াল উঠিয়ে মসজিদ থেকে কবরকে পৃথক করা আবশ্যক।

রাসূল ﷺ-এর কবরে সালাত আদায়

একমাত্র রাসূল ﷺ-এর মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন কবর বিশিষ্ট মসজিদে সালাত আদায় করা নিষেধ। রাসূল ﷺ-এর মসজিদে সালাত আদায় প্রসঙ্গে যে সব গুণাবলির বিবরণ রয়েছে আর কোন কবর বিশিষ্ট মসজিদের বিষয়ে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। রাসূল ﷺ নিজেই এ বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেছেন, "তিনটি মসজিদ ব্যতীত ভ্রমণে যেও না : আল মসজিদ আল হারাম, আল মসজিদ আল আকসা এবং আমার মসজিদ।"

তিনি আরও বলেন, "আমার মসজিদের এক রাক'আত সালাত আদায় করা, আল মসজিদ আল হারাম ব্যতীত অন্যত্র ১০০০ রাকাত সালাতের থেকে উত্তম।" এমনকি তিনি তাঁর মসজিদের এক অংশের বিশেষ তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমার ঘর এবং আমার মিম্বরের (খুৎবার স্থান)-এর মধ্যস্থ এলাকায় জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান রয়েছে।"

যদি রাসূল ﷺ-এর মসজিদে সালাত আদায় করা মাকরূহ (অপছন্দনীয়) হতো তাহলে তাঁর মসজিদে ইবাদতের গুণাবলি বাতিল হয়ে যেত এবং অন্যান্য মসজিদের সমকক্ষ হতো। যেমন সাধারণভাবে বিশেষ কিছু সময়ে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ হলেও নফল সালাত ছাড়া যদি অন্য কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থেকে থাকে (যথা- জানাযার সালাত) তবে সালাত আদায় করা যায়। একইভাবে, ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের কারণেই রাসূল ﷺ-এর মসজিদে সালাত আদায়ের অনুমোদন আছে। এবং, আল্লাহ্ না করুন, "আল মসজিদ আল হারাম" অথবা "আল মসজিদ আল আকসা"-তে যদি একটি কবর দেয়া হতো, তবে তা সত্ত্বেও মসজিদ দুটির বিশেষ সৎ গুণের জন্য এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সম্মানযোগ্য স্থান হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে সালাত আদায় অনুমোদনযোগ্য হতো।

উপসংহার

আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় সত্যিকার ঈমান পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে সেভাবে শিরক মুক্ত তৌহিদের ওপর ভিত্তি করে হতে হবে। যারা স্রষ্টার সঙ্গে শরীক করে তারা যত দৃঢ়ভাবেই আল্লাহতে তাদের বিশ্বাস ঘোষণা দিক অথবা যত দক্ষতা এবং যুক্তির সঙ্গেই তাদের আচার ব্যাখ্যা করুক না কেন তারা আসলে এক জাতীয় মূর্তিপূজা বা অবিশ্বাস করে।

আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক এবং ব্যবহারিকভাবে মানুষের জীবনের সকল দিকে আল্লাহর এককত্ব বজায় রাখতে হবে। স্রষ্টার পয়গম্বরগণ যে আল্লাহর এককত্বের দর্শন প্রচার করেছিলেন তা শুধুমাত্র দার্শনিকভাবে মূল্যায়নকৃত অথবা আবেগ তাড়িত একটি তত্ত্ব নয় বরং মানুষের অস্তিত্বের জন্য সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণের একটি অবিচ্ছেদ্য পরিকল্পনা। মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যেই এ সত্যতার তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ -

অর্থাৎ, আমি জ্বীন এবং মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।

(সূরা আয যারিয়াত : আয়াত-৫৬)

তবে, মানুষ সৃষ্টি স্বয়ং আল্লাহর নিখুঁত গুণাবলির একটি প্রকাশ। তিনি সৃষ্টিকর্তা (আল খালিক) অতএব অস্তিত্বহীনতা থেকে মানুষের অস্তিত্ব আনা হয়েছিল। তিনি সবচেয়ে দয়ালু (আর রহমান) তাই মানুষকে দুনিয়ার সুখ

মঞ্জুর করেছেন। তিনি সর্ব-জ্ঞানী (আল-হাকিম) তাই যে সব বস্তু এবং কার্যাদি মানুষের জন্য ক্ষতিকর সেগুলো নিষিদ্ধ করে যেগুলো নয় সেগুলোর অনুমতি দিয়েছেন।

তিনি সবচেয়ে ক্ষমাশীল (আল গফুর) তাই যারা আন্তরিক অনুশোচনায় তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। আবূ আইয়ুব (রা) এবং আবূ হুরায়রা (রা) উভয়ে বর্ণনা দেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, "তোমরা যদি পাপ না করতে তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটাতেন এবং এমন এক জাতি আনতেন যারা পাপ করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইত এবং আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করে দিতেন।"

অনুরূপভাবে, আল্লাহ্র ইচ্ছায়, মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অন্যান্য সকল স্বর্গীয় গুণাবলির প্রকাশ ঘটেছে। স্রষ্টাকে প্রার্থনা করা মানুষের নিজের কল্যাণের জন্যই, কারণ মানুষের প্রার্থনার আল্লাহ্র কোন দরকার নেই। স্রষ্টাকে প্রার্থনা করার মধ্যে দিয়ে মানুষ বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উভয় কল্যাণের সকল দিক উপলব্ধি করে এবং ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়াবী পথযাত্রার শেষে তার নিজের জন্য স্বর্গসুখের চিরস্থায়ী বাসস্থান অর্জন করে। ফলে, আসমানী জীবন ব্যবস্থা ইসলাম মানুষের প্রতিটি কর্মকে, তা যত তাৎপর্যহীন অথবা নিরসই মনে হোক না কেন, ইবাদতের কাজে পরিণত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিম্নের দুটি মৌলিক শর্ত প্রতিপালিত হয়–

১. একমাত্র স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যই সচেতনভাবে কাজ করতে হবে।

২. আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী এটা করতে হবে।

মানুষের গোটা জীবন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র কাজের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। তিনি নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেছেন–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের পালনকর্তা আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে। (সূরা আল আন'আম : আয়াত-১৬২)

তবে, একমাত্র তৌহিদের জ্ঞান এবং স্রষ্টার শেষ পয়গম্বর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ﷺ-এর শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী সচেতনভাবে মানুষ ঐ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে।

সুতরাং সকল আন্তরিক ঈমানদার পুরুষ এবং নারীর কর্তব্য তার সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা এবং পরিবার, গোষ্ঠী অথবা জাতির সঙ্গে তার আবেগপূর্ণ বন্ধন এক পাশে সরিয়ে রেখে বিশ্বাসের ভিত্তি তৌহিদ প্রসঙ্গে জ্ঞান হাসিল করা। কারণ, একমাত্র এ জ্ঞানের প্রয়োগেই মানুষ নাজাত (মুক্তি) পেতে পারে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

ড. বিলাল ফিলিপস্

সংকলন

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

সম্পাদনা

মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা।

পনেরোতম অধ্যায়

স্বপ্নের মূল

স্বপ্ন দেখা– যদিও মানবের জন্য নতুন বিষয় নয়। (একটা অবস্থা যা বাইরের দিকে মানুষের স্বপ্নের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সকল ছোট প্রাণী এবং কিছু পাখিদের এবং সরীসৃপের ক্ষেত্রেও ঘটে। The New Encyclopaedia Britannica খ-২৭, পৃ-৩০৭)

মানবেতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে তা বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস, কল্পনা এবং অনুমানের জন্ম দিয়েছে। তা দিয়েছে এর রহস্যময় প্রকৃতির অনুভূতি এবং পরীক্ষামূলক উভয় দিকেই। স্বপ্নের বাস্তব পরিসর সাধারণ এবং বাস্তবতা থেকে শুরু করে উদ্ভট এবং অবাস্তব পর্যন্ত। মানবের সর্বদাই স্বপ্নের সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। যদিও তাদের উৎস এবং গুরুত্বের বিষয়টা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রাচীন মরু পৃথিবীর পূর্ববর্তী বিশ্বাস ছিল যে, স্বপ্ন দেবতাদের প্রদত্ত এবং সেগুলো ছিল ভবিষ্যৎ সমস্যা বা অসুস্থতার পূর্ব ধারণা। প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে মিশরীয়রা স্বপ্নের ব্যাখ্যাকে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন। নবীদের স্বপ্নের বিষয়াদি মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার গ্রন্থগুলোতে এমনকি বাইবেল ও কুরআনেও স্থান পেয়েছে। প্রাচীন গ্রীকের অধিবাসীগণ সাধারণভাবে এ বিশ্বাস করতেন যে, স্বপ্ন হলো ভবিষ্যদ্বাণী। এটা উল্লেখ্য যে, এরিস্টোটল অধিকতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বপ্নের আলোচনা করেছিলেন।

সেগুলোর ব্যাপারে আবেগ, অনুভূতি এবং ভাবাবেগের গুরুত্বও রেখেছিলেন। যাহোক, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে স্বপ্নের স্বর্গীয় উৎস সম্পর্কিত বিশ্বাসের হ্রাস পেতে থাকে। এ সময়ে ফ্রান্সের একজন চিকিৎসক আলফ্রেড মৌরী স্বপ্নের ওপর সামগ্রিক অধ্যয়ন করে উপসংহার টানেন যে, সেগুলো হল ঘুমের মধ্যকার অনুভূতির চাপের ভুল ব্যাখ্যা। (যেমন, রাতে কোন উচ্চধ্বনি হলে

স্বপ্নে দেখবে বজ্রপাত)। স্বপ্নের আধুনিক তত্ত্ব এ বিষয়ের আরও জোর দিয়েছে যে, সেগুলো হলো জাগ্রত অবস্থার বর্ধিতাংশ।

সম্ভবত স্বপ্নের গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তত্ত্ব হলো মনঃসমীক্ষণগত মডেল যা সিগমাণ্ড ফ্রেউড কর্তৃক উন্নতি লাভ করে। তার পুস্তক The Interpretation of Dreams (German : Die Traumdeutung; 1900) (The New Encyclopaedia Britannica খ-২৭, পৃ-৩০৭)

ফ্রাউড এ মত পোষণ করতেন যে, স্বপ্ন হল জাগ্রত অভিজ্ঞতার প্রতিবিম্ব। তিনি তাদের অদ্ভুত আচরণের বাস্তব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি সেগুলোর ব্যাখ্যার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং তাদের প্রতিবিধানের বিষয়াবলীও ব্যাখ্যা করেন।

ফ্রেউড থিওরি প্রদান করেন যে, ঘুমের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করা প্রাথমিক স্তর এবং ভুলে যাওয়ার ফলাফলগুলো সংকুচিত হয়। তিনি আরো দাবি করেন যে, যে সকল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত অবস্থায় অপূর্ণ থাকে, বিশেষ করে যেগুলো যৌনতা এবং শত্রুতার সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলো স্বপ্নের মধ্যে মুক্তি পায়। স্বপ্নের সন্তুষ্টি বলা হয় যে ব্লাডারের ওপর পেশাবের চাপা (যখন কেউ স্বপ্নীল ঘুমের অবস্থায় থাকে সে উত্তেজিত হয় (কথা, শব্দ, অথবা তার গায়ের ও পানির ফোঁটা পড়ার দ্বারা) এ ধরনের বাইরের প্রভাব ও উত্তেজনার দ্বারা খুব কম স্বপ্নই সংঘটিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে লোকেরা ঘুমানোর পূর্বে জলজ্যান্ত মুভি দেখলে তার প্রভাবে স্বপ্ন দেখতে পারে, তবে তার প্রভাবও সীমিত বলে জোর দেয়া হয়েছে। The New Encyclopaedia Britannica খ-২৭, পৃ-৩০৬)-এর উত্তেজনা, পূর্বদিনের অভিজ্ঞতার রেশ এবং অপরিণত স্মৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। (The New Encyclopaedia Britannica খ-২৭, পৃ-৩০৬)

কার্ল জাং (১৮৭৫-১৯৬১) ফ্রাউড এর স্বপ্নের গঠন অর্থাৎ গোপন বা ছদ্মবেশী ভুলে যাওয়া আকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্ট এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। জাং অনুভব করেন যে, স্বপ্নগুলো ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে, যে সেগুলো মানবের জীবন-যাপনের সাথে চরিত্রের প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য রক্ষা করে। জাং-এর

মতে স্বপ্ন হলো ২৪ ঘন্টার মানসিক কর্মতৎপরতার প্রতিনিধিত্ব করে, যা ঘুমের উপরিভাগে ঘটে যখন অবস্থা ঠিক থাকে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্বপ্নের ওপর গবেষণা দু'টো বিষয়ের ওপর ঘটে–

ক. স্বপ্নের শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি

খ. স্বপ্নসূচি

গবেষকগণ শারীরিক সূত্রগুলো পান বস্তুত যখন স্বপ্ন ঘটতে থাকে। মূল স্বপ্নের সময়, দ্রুত চক্ষুর নড়া-চড়ার দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। যাকে সংক্ষেপে (R E M) বলে, যা-কিনা মেধার তরঙ্গ পদ্ধতি যা জাগ্রত অবস্থায় সৃষ্ট পদ্ধতির অনুরূপ এবং শারীরবৃত্তীয় কর্মতৎপরতাকে বলে REM অথবা D-(Dream) -State. (REM ঘটে প্রায় প্রতি ৯০ মিনিট ঘুমানোর মধ্যে। ১০ থেকে ৬০ বছরের লোকেরা তাদের ঘুমানোর সময়ের চারভাগের এক ভাগ REM ঘুমের মধ্যে কাটায় : The New Encyclopaedia Britannica খ-৩৪, পৃ-২১৭)

যেহেতু এগুলো আবিষ্কৃত হয় ১৯৫০ সালের মধ্য সময়ে গবেষকগণ পরীক্ষা পরিচালনা করেন এ অবস্থা দেখিয়ে যে, R E M ঘুম এবং বাস্তব, স্বতঃস্ফূর্ত পুনঃস্থাপিত স্বপ্নের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সম্পূর্ণ আচরণগত গঠন যেমন রাত্রি ভয়, বোবাধরা, বিছানায় পেশাব (বিছানা ভিজা) এবং ঘুমে হাঁটা, পাওয়া যায় সাধারণ স্বপ্নের (The New Encyclopaedia Britannica খ-৪, পৃ-২১৭) সাথে অসম্পৃক্ত। অধ্যয়ন এ কথা প্রস্তাব করে যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত রাত্রির ভয় এবং বোবাধরা গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ করে জেগে উঠার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে যা পরীক্ষামূলকভাবে নিদ্রাহীনতার অবস্থায় এনে দেয়। (The New Encyclopaedia Britannica খ-২৭, পৃ-৩০৮)

পরীক্ষাগারের প্রাণীদের বাছাইকৃত মস্তিষ্কের গঠন এবং সার্জিক্যাল ধ্বংসের মাধ্যমে গবেষকগণ নির্দেশনা দিয়েছেন যে, Pontine tegmentum নামে পরিচিত মস্তিষ্কের একটি এলাকার ধারার ওপর স্বপ্নাবস্থা নির্ভর করে এবং ঐ স্বপ্নাবস্থা যা norepinephrine (The New Encyclopaedia Britannica খ-২৭, পৃ-৩০৭) নামের শারীরিক রসের সাথে জড়িত। যাহোক, বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা স্বপ্নের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারে নি। ফ্রয়েড এবং জাং-এর মত শারীরিক তত্ত্ববিদগণের স্বপ্নের মূল

সম্পর্কে প্রদত্ত তত্ত্বগুলো বস্তুনির্ভর হয়ে রয়ে গেছে যা প্রকৃত স্বপ্নের মূল স্থান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে নি। উভয়ে ধরে নিয়েছেন যে স্বপ্নে সম্ভাব্য উত্তর হল মানুষ, কেননা তারা খোদা বলতে মনে করেন এটা মানুষের কল্পনাপ্রসূত একটি সত্তা মাত্র এবং তারা আত্মিক জগতকে অস্বীকার করেন।

যাহোক, স্বপ্ন সম্পর্কে তাদের গবেষণার পরিসমাপ্তি সন্দেহযুক্ত, কারণ গবেষকগণ সরাসরি সূচি রেকর্ড করতে পারেন নি। শুধুমাত্র স্বপ্নদ্রষ্টারাই বাস্তবে স্বপ্ন দেখে ও অভিজ্ঞতা হাসিল করতে পারে এবং গবেষকগণকে অবশ্যই স্বপ্নদ্রষ্টাদের জাগরিত হওয়ার পরের রিপোর্টের ওপরই নির্ভর করতে হয়। অতএব, সম্পূর্ণ এবং সঠিক জ্ঞান যা স্বপ্ন সম্পর্কে তা আসতে পারে শুধুমাত্র মস্তিষ্কের ডিজাইনার, তার দাতা এবং এর চিন্তার স্রষ্টার নিকট থেকে। সেই তথ্য শুধুমাত্র মানবজাতির নিকট পৌঁছাতে পারে স্বর্গীয় ওহীর মাধ্যমে এবং তা প্রভুর নবীগণের মাধ্যমে তাদের অনুসারীদের প্রতি মৌখিক এবং শাস্ত্রের ধারায় পৌঁছিয়ে থাকেন।

স্বপ্নের ইসলামী ধারণা

ওহীর ভিত্তিতে ১৪০০ বছর পূর্বে নবী মুহাম্মদ ﷺ স্বপ্নের তিনটি প্রাথমিক উৎস চিহ্নিত করেছিলেন। যথা– ১. আল্লাহ্ প্রদত্ত. ২. শয়তানের দ্বারা, ৩. মানবীয়।

তিনি এ সকল প্রকারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যাতে তাঁর অনুসারীবৃন্দ তাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবনে তার প্রভাবও বুঝতে পারেন। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল বলেন–

اَلرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرٰى مِنَ اللّٰهِ وَرُؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ .

স্বপ্ন তিন প্রকারের

১. সঠিক স্বপ্ন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ।

২. দুঃশ্চিন্তা সৃষ্টিকারী স্বপ্ন, যা শয়তানের পক্ষ থেকে।

৩. এবং ঐ স্বপ্ন যা মানুষ নিজে নিজে চিন্তা করার ফলে হয়।

১. ক. আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বপ্ন : সত্য স্বপ্ন

নবীদের স্বপ্ন হলো এক প্রকারের ওহী। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরআনে বর্ণনা করেন যে, নবীদের নিকট ওহী তিন প্রকারে আগমন করে–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاۤءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۔

অর্থাৎ, 'মানুষের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তার সঙ্গে কথা বলবেন, তবে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে পর্দার আড়াল থেকে অথবা তিনি কোন রাসূল (জিব্রাঈল) পাঠাবেন যিনি তার অনুমতি নিয়ে তাকে বলবেন। বস্তুতঃ তিনি সর্বোচ্চ এবং সর্বজ্ঞ।' (সূরা আশ্-শূরা : আয়াত-৫১)

অতএব, পন্থাগুলো হলো

১. উৎসাহ প্রদান (যেমন : সত্য স্বপ্নাবলী)

২. পর্দার আড়ালে থেকে কথা বলা।

৩. ফেরেশ্তার মাধ্যমে অহী প্রেরণ।

জীব্রাঈল (আ) যদি এরূপ না হতেন তাহলে নবী ইবরাহীম (আ) স্বপ্নের নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করে স্বীয় পুত্রকে কুরবানী করতেন না, এমনকি তার পুত্রও বিনা প্রশ্নে তাঁর নিজ কুরবানী মেনে নিতেন না। সূরা আস্ সাফ্ফাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বপ্নের ঘটনা নিম্নরূপে বর্ণনা করেন–

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّيْۤ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ فَلَمَّاۤ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يّٰۤاِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۔

অর্থাৎ, 'অতঃপর যখন (ইসমাঈল (আ)) দৌড়াদৌড়ির বয়সে পৌছলেন; ইবরাহীম (আ) বললেন : হে আমার বৎস! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি

তোমাকে জবাই করছি, অতএব এ ব্যাপারে তোমার মত কি? জবাবে ইসমাঈল (আ) বললেন : হে পিতা! আপনি তাই করুন যার নির্দেশ আপনাকে দেয়া হয়েছে। আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। অতঃপর যখন তারা উভয়ে আত্মসমর্পণ করলেন, এবং তাঁকে (কুরবানী করার জন্য) কপালের ওপর শুইয়ে দিলেন। আমি তখন তাকে ডেকে বললাম : হে ইবরাহীম! আপনি স্বপ্নকে (উদ্দেশ্যকে) সত্যে পরিণত করেছেন। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি।'

(সূরা সফফাত : আয়াত-১০২-১০৫)

আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন : ওহী শুরু হয় আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি সঠিক স্বপ্ন (রুইয়া ছালিহা)-এর মাধ্যমে যা হতো ঘুমের মধ্যে। যখনই তিনি স্বপ্ন দেখতেন, তা দিনের আলোর মত সত্যে পরিণত হতো।

(সহীহ্ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-৯১ নং-১১১)

আকীল থেকে বর্ণিত অপর ভার্সনে "সঠিক" এর স্থানে "সত্য" (সাদিকা) ব্যবহৃত হয়েছে। নবীগণের স্বপ্ন একাধারে "সত্য" এবং "সঠিক" ছিল। উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দ্বিতীয় বাক্যে, যেখানে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) সত্য স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করেছেন। এ স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় তেমনি ঘটত যেমন তিনি দেখতেন নিদ্রাবস্থায়। এটা হলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি ওহী, যে ঘটনা নিকট অথবা দূর অতীতে ঘটত।

নবুওয়তের স্বপ্নের ধারার চূড়ান্ত পর্ব নিম্নরূপ। মক্কার বাইরে হেরা পর্বতের গুহায় যখন নবী করীম ﷺ ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) আসলেন এবং কুরআন অবতরণ শুরু হলো। এভাবে সত্য স্বপ্নের আকারে অহী নবী করীম ﷺ-এর পূর্ণ নবুওয়তি জিন্দেগী ব্যাপী আসতে থাকে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী করীম ﷺ-এর একটি স্বপ্নের কথা সূরা ফাত্‌হ্-তে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لاَ تَخَافُوْنَ

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا .

অর্থাৎ, 'অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের স্বপ্নকে সত্যে রূপদান করবেন, আল্লাহ্ চাহেনতো তোমরা মাথা মুণ্ডন করে অথবা চুল খাট করে পবিত্র মক্কার ঘরে (কা'বার চত্বরে) নিরাপদে ও নির্ভয়ে প্রবেশ করবে। তোমরা যা জান না আল্লাহ্ তা জানেন, এর পাশাপাশি তিনি তোমাদের নিকটবর্তী বিজয়ও দান করবেন।' (সূরা-৪৮ ফাতহ : আয়াত-২৮)

সত্য স্বপ্নের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো : ইহা আল্লাহ্ প্রদত্ত উপহার। এ উপহার নবীগণ এমনকি ঈমানদারগণও পেতে পারেন। বহু ঈমানদার লোকের পক্ষ থেকে সত্য স্বপ্নের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ .

অর্থাৎ, 'সত্য স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়।' সত্য স্বপ্ন সম্পর্কে এ হলো নবী করীম ﷺ-এর পক্ষ থেকে সাধারণ বর্ণনা। এ কথা শুধু মু'মিনদের জন্য সত্য স্বপ্ন তা বুঝায় না। এর বাইরেও সত্য স্বপ্নের ঘটনা জানা যায়। আল-কুরআনের সূরা ইউসুফে বর্ণিত।

(সূরা-১২ ইউসুফ : আয়াত-৩৬-৫০)

ইউসুফ (আ)-এর দু'জন কয়েদী সঙ্গীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা এবং মিশরের মরুচারী নেতৃবৃন্দের স্বপ্ন সত্য হিসেবে প্রমাণিত হওয়ার ঘটনা অমুসলিমদের সত্য স্বপ্নের দৃষ্টান্ত।

সত্য স্বপ্নগুলো হলো ঐ সকল নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত যা আল্লাহ্ মানবের মধ্যে দিয়েছেন যার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন বিদ্যমান। যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না তারা হয়তো ডারউইনের বিবর্তনবাদ অথবা আইনস্টাইন এর আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্যে তাদের দৈহিক অস্তিত্বের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পেতে পারে। তবে তারা স্বপ্ন সত্যে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাবে না। মহান আল্লাহ্র বাণী–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ .

অর্থাৎ, 'আমি তাঁদেরকে দেখাব আমার নিদর্শনাবলী পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যে যাতে তাদের নিকট এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এটাই সত্য।' (সূরা-৪২ শূরা : আয়াত-৫৩)

নবী করীম ﷺ মুসলমানদের এ তথ্য দিয়েছেন যে, কিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে, তার আলামতগুলোর মধ্যে এটিও একটি যে, মু'মিনদের বেশিরভাগ স্বপ্নই সত্যে পরিণত হবে। আবু হুরায়রাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ .

অর্থাৎ, 'যখন পুনরুত্থানের দিবস নিকটবর্তী হবে, তখন মু'মিনের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে।' (সহীহ্ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-১১৮ ও ১১৯ নং ১৪৪)

উপরের হাদীস থেকে এতটুকু জানা যায় যে, মু'মিন বান্দাগণ বুঝতে পারবেন যে, তাদের স্বপ্ন সত্য হবে। তবে নিশ্চিত সত্য স্বপ্ন হল ঐগুলো যা বাস্তবে সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

সত্য স্বপ্নের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, শুধুমাত্র নবীগণই তা বাস্তবে পরিণত হবার পূর্বে নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন যে, সেগুলো সত্য স্বপ্ন। অন্য সকল লোকেরই স্বপ্ন বাস্তবে রূপলাভ করার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এ সিদ্ধান্তে আসার জন্য যে, এ স্বপ্ন সত্য। তবে স্বপ্নদ্রষ্টার তাকওয়ার মান, স্বপ্ন কি পরিমাণ স্পষ্ট এবং অতীতের স্বপ্নগুলো কি পরিমাণ সত্যে পরিণত হয়েছিল তার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

সত্য স্বপ্নের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো , সেগুলো দুটি মৌলিক ধারায় বিভক্ত

ক. যেগুলোর কোন ব্যাখ্যারই প্রয়োজন নেই, সেগুলো পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকার জন্য অথবা স্বপ্নদ্রষ্টার নিকট পরিষ্কার হওয়ার জন্য।

খ. যেগুলোর অস্পষ্টতার জন্য অথবা স্বপ্নদ্রষ্টার অজ্ঞতার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে।

সত্য স্বপ্নের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, সেগুলো মানব চরিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। যদিও সকলেই সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে, তবে তার স্বপ্ন অধিকতর সত্য

হবে, যে অধিকতর ধার্মিক। আবু হুরায়রা (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا

'তোমাদের মধ্যে তাদের স্বপ্ন অধিক সত্য, যারা বক্তব্যে অধিক সত্যবাদী।'

সত্য স্বপ্ন সম্পর্কে পঞ্চম নীতি হলো, যেসব স্বপ্ন এক সঙ্গে অনেকে দেখতে পারেন। ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছু লোককে স্বপ্নে দেখানো হলো যে, লাইলাতুল ক্বদর হবে রমাদান মাসের শেষ সাতদিনের মধ্যে। তখন নবী করীম ﷺ বলেন : এটা শেষ সাতদিনের মধ্যেই হবে।

(সহীহ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-১০০, নং-১২০)

স্বর্গীয় : ভাল স্বপ্ন

নবী করীম ﷺ আরো ইরশাদ করেন যে, আনন্দদায়ক স্বপ্নগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেন–

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا -

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার পছন্দমত স্বপ্ন দেখে, তা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে, এজন্য সে যেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে এবং অন্যদের নিকট তা আলোচনা করে।' (সহীহ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-৯৫, ৯৬ নং ১১৪)

অবশ্যই নবী করীম ﷺ-এর এ বর্ণনা শুধু হালাল স্বপ্ন সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেউ হয়তো স্বপ্নে অপরাধ বা পাপ অর্জন করা দেখে আনন্দ লাভ করতে পারে। শয়তানী স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। তবে এগুলো এরূপভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় যেভাবে জাগ্রত জগতে আল্লাহর অনুমতিতে হয়ে থাকে, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয় (কেউ যদি কোন শয়তানী কাজে মজা পায় এবং মনে-প্রাণে তা করার উদ্যোগ নেয় তা হলে সে গুনাহগার হবে এবং সফলও হবে। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পাপ নয় বরং আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে সফলতা নাও দিতে পারেন। – অনুবাদক)

স্বপ্ন নুবুওয়তের অংশ

নবী করীম ﷺ সত্য স্বপ্নকে নুবুওয়তের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছেন, যা কিয়ামতের পূর্ব দিন পর্যন্ত চালু থাকবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ اِنْقَطَعَتْ ، فَلاَ رَسُوْلَ بَعْدِيْ، وَلاَ نَبِىَّ ـ قَالَ : فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : لٰكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ ـ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ : رُؤْيَا الْمُسْلِمِ وَهِىَ جُزْءٌ مِنْ اَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ

অর্থাৎ, আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন : বস্তুতপক্ষে রিসালাত এবং নুবুওয়ত শেষ হয়ে গিয়েছে, সুতরাং আর কোন নবী এবং রাসূল আমার পরে আসবেন না। তিনি (আনাস রা) বলেন : মানুষ একে কঠিন মনে করলেন, সুতরাং নবী করীম ﷺ পুনরায় বললেন : তবে সুসংবাদ ব্যতীত। তারা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল "সুসংবাদ কি?" তিনি উত্তর দিলেন : একজন মুসলিমের স্বপ্ন, ইহা নুবুওয়াতের একটা অংশ।

(সহীহ সুনানু তিরমিযী খ-২, পৃ-২৫৮, নং-১৮৫৩)

অন্য বর্ণনায় নবী করীম ﷺ আরো পরিষ্কার করেছেন যে, মুসলমানের যে কোন স্বপ্নই নয় বরং মুসলমানের ভাল স্বপ্নগুলো হলো নুবুওয়তের অংশ। আরেকটি হাদীস–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوْا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ .

অর্থাৎ, 'আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন : আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি : নুবুওয়তের কোন অংশ বাকী নেই তবে সুসংবাদ ব্যতীত। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন সুসংবাদ কি? তিনি বললেন : 'সঠিক স্বপ্ন'।

(সহীহ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-৯৮ নং-১১৯)

এমনকি অন্য বর্ণনায়, নবী করীম ﷺ ব্যাখ্যা করেন যে, এটা যেকোন মুসলমানের স্বপ্ন নয়, যা নুবুওয়তের অংশ, বরং একজন মুত্তাকীর স্বপ্নই নুবুওয়তের অংশ–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

অর্থাৎ, 'আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তির স্বপ্ন নুবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।'

(সহীহ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-৯৪ নং-১১২)

আবু হুরায়রাহ্ এবং উবাদাহ্ ইবনে ছামিত এদের বর্ণনাগুলো থেকে বর্ণিত, তারা নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : একজন ঈমানদারের স্বপ্ন নুবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।" (সহীহ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-৯৭ নং-১১৭ এবং আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১৩৯৫ নং ৫০০০)

ভাল স্বপ্নগুলো ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ। নুবুওয়তের অংশ হওয়ার অর্থ হলো তিনটির যেকোন একটি হওয়া। এর নিশ্চিত অর্থ হলো নুবুওয়তের ছেচল্লিশটি গুণ অথবা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং একজন ভাল মুসলিমের স্বপ্ন তার মধ্যে একটি। ইমাম বাইহাকী (আল হুসাইন ইবন মাসউদ আল বাগাভী ১০৪৪-১১১৭. যিনি ফিক্হ শাস্ত্রের হাদীস এবং তাফসীরের বড় আলেম ছিলেন। তার শহর খুরাসানের 'বাগা' এর নামে তার উপাধি 'বাগাভী' ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর বড় বড় কাজের মধ্যে– আত্তাহযীব ফি ফিকহিশ শাফেয়ী, শারহুস সুন্নাহ, মাসাবিহুস সুন্নাহ, আল-জাম'আ বাইনাস সাহীহাইন ফিল হাদীস। (আল-আ'লাম, খ-২, পৃ-২৮৪.)

পয়েন্ট আউট করেছেন যে, নবী করীম ﷺ-এর বাণী "নুবুওয়তের একটা অংশ" এর অর্থ হলো, এর ওপর জোর দেয়া যে, স্বর্গীয় নির্দেশনা স্বপ্নের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। ভাল স্বপ্ন নুবুওয়তের অংশ হওয়া এটা শুধু নবীদের জন্যই। (শারহুস সুন্নাহ, খ-১২, পৃ-২০৩)

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, ভাল স্বপ্ন জ্ঞানের একটা অংশ যা নুবুওয়তের মধ্যে ছিল। যদিও সর্বশেষ নবীর ইন্তিকালের মাধ্যমে নুবুওয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তবুও নুবুওয়তের এ ধারার জ্ঞান সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে চলতে থাকবে। তৃতীয় ব্যাখ্যা হলো, নবী করীম ﷺ তার মিশন শুরু করার ছয় মাস পূর্ব থেকেই স্বপ্ন দেখছিলেন যেগুলো সত্যে পরিণত হচ্ছিল। আর তিনি মোট নুবুওয়ত লাভ করেন ২৩ বছর যাবত। অতএব ছয় মাস ২৩ বছরের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

(আওন আল মাবুদ খ-৪, পৃ-৪৬৩, আরো দেখুন শারহুস সুন্নাহ, খ-১২, পৃ-২০৪)

স্বপ্ন সম্পর্কে মিথ্যা বলা

যেহেতু ভাল স্বপ্নগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং তা নুবুওয়তের সাথে সম্পৃক্ত তাই সেগুলো সম্পর্কে মিথা বলা নিষেধ। ইবনে ওমর (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন–

إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ.

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই! সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা হলো কোন ব্যক্তির স্বপ্ন সম্পর্কে মিথ্যা বলা।' (সহীহু লিল বুখারী, খ-৯, পৃ-১৩৫ নং ১৬৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

অর্থাৎ, 'যেকোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখার দাবি করে যা সে দেখেনি'। তাকে দুটো যবের দানা দিয়ে গিরা দিতে বলা হবে, যা সে কখনো করতে সক্ষম হবে না, যদি কোন ব্যক্তি তাদের কথা আড়ি পেতে শোনে যারা পছন্দ করে না যে, সে তা শুনুক বা তারা তার নিকট থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছে, তার কানে গলিত সীসা কিয়ামতের দিন ঢেলে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং রূহ ফুঁকে দেবার আদেশ করা হবে, অথচ সে কখনো তা করতে সক্ষম হবে না।

আল-কুরআনের মুফাস্‌সির ইবন জারির আত-তাবারী বলেন, স্বপ্ন সম্পর্কে মিথ্যা বলার শাস্তি এত মারাত্মক হবার কারণ– জাগ্রত বিষয়াবলী সম্পর্কে মিথ্যা বলার চেয়েও বেশি–স্বপ্ন সম্পর্কে মিথ্যা বলা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলারই শামিল। যে ব্যক্তি এ দাবি করে যে, আল্লাহ তাকে কিছু দেখিয়েছেন, যা তিনি করেন নি'। আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলা তার সৃষ্টি সম্পর্কে মিথ্যা বলার চেয়ে বেশি পাপ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা হুদে ইরশাদ করেন–

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ـ

অর্থাৎ, 'তার চেয়ে আর বড় জালিম কে হতে পারে যে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে?' (সূরা–১১ হুদ : আয়াত-১৮-৪৩)

ভাল স্বপ্ন সম্পর্কে প্রথম নীতি হলো, সেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে। ভাল স্বপ্ন মানুষের মানসিক কর্ম ক্রিয়ার ফলে হয়, আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদদের দাবি সঠিক নয়। সেগুলো স্বপ্নীল অবস্থায় আল্লাহর সৃষ্ট, যেমনভাবে জাগ্রত অবস্থায় মানবমনে ইলহামের মাধ্যমে ভাল চিন্তার সঞ্চার করে।

ভাল স্বপ্ন সম্পর্কে দ্বিতীয় নীতি হলো, সেগুলো মৌলিকভাবে সুখবর। অর্থাৎ সেগুলোকে শুধুমাত্র ভাল দৃষ্টিতে দেখতে হবে। ফলে, যারা ঐগুলো দেখবে তাদের ঐ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আবুদ্ দারদা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "এ দুনিয়ায় তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।" এ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি উত্তর দিলেন যে, অন্য আরেক ব্যক্তি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সুতরাং তিনি আল্লাহর রাসূলকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন–

مَا سَأَلَنِىْ عَنْهَا اَحَدٌ غَيْرَكَ مُنْذُ اُنْزِلَتْ هِىَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرَى لَهُ .

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে তুমি ছাড়া আর কেউ এ প্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। এটা হলো ঐ সকল সুস্বপ্ন যা কোন মুসলিম দেখে অথবা তাকে তার সম্পর্কে দেখানো হয়।

(সহীহ সুনান আত তিরমিযী খ-২, পৃ-২৫৯ নং-১৮৫৪)

ভাল স্বপ্ন সম্পর্কে তৃতীয় নীতি হলো, সুখবর সকলে মিলে শোনার মত তারা ও অনেকে মিলে সুস্বপ্ন দেখতে পারে। যদিও নবী করীম ﷺ পরিষ্কার করেছেন যে, সুস্বপ্ন সকলের সাথে একত্রে অংশীদারের ভিত্তিতে দেখানো হবে না। আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন–

اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا اِلاَّ مَنْ يُحِبُّ .

অর্থাৎ, "ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তা দেখে যা সে পছন্দ করে সে যেন তাদের নিকট ছাড়া অন্যদের নিকট ইহা প্রকাশ না করে যাদের সে ভালবাসে।"

(সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১২২৩-১২২৪, নং-৫৬১৯)

ইমাম নাসায়ী (র)-এর এ মত ছিল যে, নবী করীম ﷺ তাদেরকে স্বপ্নের কথা বলতে নিষেধ করেছেন যারা তাকে অপছন্দ করে, কেননা তারা সেগুলোকে খারাপ অর্থে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং এর দ্বারা সুখ বা ভাল খবরের পরিবর্তে খারাপ ব্যাখ্যা করতে পারে মূর্খতা বা বিদ্বেষবশত। ইমাম বায়হাকি এর সাথে আরো যোগ করেছেন যে, অপছন্দকারী ব্যক্তিদের নিকট প্রকাশ করলে স্বপ্নদ্রষ্টার ব্যাপারে খারাপ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ফলে আমাদের নবী ﷺ-এর নির্দেশনা কেমন যেন ইয়াকুব (আ)-এর নির্দেশ স্বীয় পুত্র ইউসুফ (আ)-এর প্রতি। (শারহুস সুন্নাহ খ-১২, পৃ-২১৩)

قَالَ يَا بُنَىَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلٰى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ

অর্থাৎ, 'তিনি বললেন হে প্রিয় বৎস! তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের নিকট বল না, হয়তো তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শক্র।' (সূরা–১২ ইউসুফ : আয়াত-৫)

অতএব এভাবে সমাপ্তি টানা যায় যে, স্বপ্নের সাড়ায় ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক ফল হতে পারে।

২. শয়তানী : খারাপ স্বপ্ন

খারাপ স্বপ্ন হলো, স্বপ্ন সংগঠনের সময় শয়তান জ্বিনদের হস্তক্ষেপ। একইভাবে, যেভাবে শয়তান জ্বিনগুলো মানবমনে খারাপ চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক করে জাগ্রত অবস্থায়। তারা ঐরূপ ঘুমন্ত অবস্থায়ও স্বপ্নের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ (رضى) قَالَ كُنْتُ اَرَى الرُّؤْيَا اُعْرَى مِنْهَا غَيْرَ اَنِّىْ لاَ اُزَمَّلُ حَتّٰى لَقِيْتُ اَبَا قَتَادَةَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ـ

অর্থাৎ, 'আবু সালামাহ (রা) বলেন, আমি মাঝে মাঝে এমন স্বপ্ন দেখি যেগুলো আমাকে টুকরা টুকরা করে ছাড়ে, অথচ আমি চাদর আবৃত হতে পারি না এভাবে আমি আবু কাতাদার সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং তাকে (খারাপ স্বপ্নের কথা) বলি। তিনি আল্লাহর রাসূলের কথা বলেন : ভাল স্বপ্ন আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং খারাপ স্বপ্ন আসে (এ হাদীসের বর্ণনায় ভাল স্বপ্নের জন্য আরবি رُؤْيَا ব্যবহার করা হয়েছে এবং খারাপ স্বপ্নের জন্য আরবি حِلْمٌ

শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য বর্ণনায় رُؤْيَا উভয় প্রকারের স্বপ্নের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।) শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এমন স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে না, সে যেন তার বাম দিকে তিন বার থু থু নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এর খারাপী থেকে, তাহলে ইহা তার ক্ষতি করতে পারবে না।'

(সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২২৩, নং-৫৬১৩)

এ বর্ণনা যা খারাপ স্বপ্ন সম্পর্কে দেয়া হলো, তা রাত্রি ভয় সংক্রান্ত সাধারণ স্বপ্নের বৈসাদৃশ্য হওয়ার বৈজ্ঞানিক বর্ণনার পরিপন্থী। গবেষকদের মতে, বোবায় ধরা অবস্থা সম্ভবত: স্বপ্নের স্বাভাবিক উৎস REM থেকে আসে। সেগুলোকে স্বতঃস্ফূর্ত পরিচালিত বলে অভিহিত করা হয়, অর্থাৎ তার মূল বা কারণ অজ্ঞাত। তাদের আধ্যাত্মিক জগতকে অস্বীকার করার কারণে, বৈজ্ঞানিকেরা বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, "বোবা ধরা" হয়তো বা গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ করে জাগ্রত হওয়ার কারণে হয় এবং পরীক্ষায় সেগুলোকে মনে হয় স্বপ্নহীন। (The New Encyclopaedia Britannica খ-২৭, পৃ-৩০৮) বিষয়গুলোর মূলবস্তু হল এই যে, এ ধরনের স্বপ্নের উৎস হলো আত্মিক জগতের খারাপ শক্তি যা নবী করীম ﷺ-এর নির্ভরযোগ্য সুন্নাহ থেকে জানা যায়।

শয়তানী স্বপ্নগুলো দুঃখের কারণ হতে পারে। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছেন–

اَلرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ فَرُؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللّٰهِ وَرُؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ .

অর্থাৎ, 'স্বপ্ন তিন প্রকারের, ক. ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, খ. যে স্বপ্নগুলো দুশ্চিন্তার কারণ ঘটায় তা হলো শয়তানের পক্ষ থেকে গ. আরেক ধরনের স্বপ্ন হলো মানুষ নিজ আত্মার সাথে যে কথা বলে তার ফলশ্রুতি।' (সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২২৪, নং-৫৬২১, আরো দেখুন ছহীহু লিল বুখারী, খ-৯, পৃ-৯৬, নং ১১৬ এবং সুনানে আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১৩৯৫, নং ৫০০১, এবং সিলসিলাহ আহাদীসুস সহীহাহ খ-৪, পৃ-৪৮৭, নং-১৮৭০ দ্বারা সত্যায়িত।)

শয়তানের আকাঙ্ক্ষা মানবজাতির মধ্যে দুঃখ সৃষ্টি করা, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিম্নোক্ত ঘোষণা করেন :

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ـ

অর্থাৎ, 'গোপন বৈঠক শুধু শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়, মু'মিনদের দুশ্চিন্তাগ্রস্থ করার জন্য, অথচ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ মু'মিনদের ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব মু'মিনদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।'

(সূরা আল-মুজাদালা : আয়াত-১০)

কোন বন্ধু বিয়োগ অথবা আঘাতপ্রাপ্তির দ্বারা মানুষের মধ্যে দুঃখের সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের স্বপ্ন সৎ অসৎ উভয় প্রকারের লোকদের আঘাত করতে পারে। অপরদিকে ব্যভিচার করা, মদ্যপান অথবা সম্পদ চুরি এগুলো সৎ লোকদের নিকট দুঃখের, অন্যদিকে অপরাধপ্রবণ অসৎ লোকদের নিকট এগুলো সুখের এবং এর দ্বারা তারা এ সকল কাজের প্রতি উৎসাহিত হয়ে থাকে।

শয়তানী স্বপ্ন ভয়ের কারণেও হয়ে থাকে, যেমন আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে এ প্রসঙ্গে নির্দেশনা পাওয়া যায়। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلرُّؤْيَا ثَلَاثٌ حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ ـ

'স্বপ্ন তিন প্রকারের : মনের আকুলি-বিকুলি, শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতির সঞ্চার এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ।' (সহীহ সুনানে ইবন মাজাহ, খ-২, পৃ-৩৪০ নং ৩১৫৪, আরো দেখুন সহীহ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-১১৮-১১৯ নং ১৪৪)

ভয়ানক চিন্তা-ভাবনা আসতে পারে ভয়ানক দুর্ঘটনা, অথবা দুর্যোগ অথবা সেগুলো হতে পারে ভয়ানক অনুভূতি যেমন বিশাল উচ্চতা থেকে পতিত

হওয়া অথবা আবদ্ধ স্থানে আটকা পড়ে শ্বাসরোধ হয়ে মারা যাওয়া। এগুলো ব্যক্তির ভয়ের কারণের সাথে জড়িত যেমন সুনির্দিষ্ট কোন প্রাণী বা পোকামাকড়ের যেমন সাপ বিচ্ছুর আক্রমণ। এ ধরনের ভীতিগুলো আবেগ অথবা আত্মিক দুর্বলতা থেকে সৃষ্ট যা মানুষকে ভৌতিক আঘাতের অনুরূপ।

শয়তানী স্বপ্নের প্রথম নীতি হলো, ঐ সকল স্বপ্ন যা খারাপ সূচির অন্তর্গত এগুলো শয়তানের উৎস থেকে। সেগুলোকে ইতিবাচক হিসেবে ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই। কেননা, সেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। খারাপ স্বপ্নের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে ভুল পথে পরিচালনা করা এবং তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করানো, মু'মিনগণ সেগুলো থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম। ইবন হাজার আল-আসকালানী। (আহমদ ইবন আলী ১৩৭২-১৪৪৯)

কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে তিনি তাঁর সময়ের হাদীস শাস্ত্রের নেতৃস্থানীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মিশরের শরীয়া কোর্টের বিচারক নিযুক্ত হন। তিনি অগণিত ইসলামী পুস্তক রচনা করেন, তার মধ্যে–

– সহীহ্ আল-বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারী ১৩ খণ্ডে

– তাহযীবুত তাহযীব – হাদীসের রাবীদের জীবনী সংক্রান্ত বহু খণ্ডে বিভক্ত

– লিসানুল মীযান হাদীস বর্ণনাকারীদের সমালোচনামূলক গ্রন্থ

– আল ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবা – রাসূলের সাহাবীদের জীবনপঞ্জি (আল আলাম খ-১, পৃ-১৭৩, ১৭৪)

এবং ইমাম আল বায়হাকি উভয়ে বলেন, "এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, ভিজা (আরবি ক্রিয়া احتلم। (ইহতালাম) অর্থ এমন স্বপ্ন যার মধ্যে লোকেরা যৌন ক্রিয়া করতে দেখে (Arabic-English Lexicon, খ-১, পৃ-৬৩২. যার ফলে পুরুষের বীর্যপাত এবং নারীদের পানিপাত হতে পারে। এ ধরনের স্বপ্নদোষের দ্বারা গোসল ফরয হয়ে থাকে।)

স্বপ্নগুলো হলো শয়তানের খেলা, যা সে স্বপ্নের মধ্যে তাদের সঙ্গে খেলে। (আর্দ্র স্বপ্ন সাধারণভাবে অবিবাহিত যুবক ছেলেদের মধ্যে ঘটে। সেগুলো বেশিরভাগই অবিবাহিত বালিকা বা মহিলাদের সাথে যৌন সম্ভোগের স্বপ্ন থেকে নির্গত। যেহেতু এ ধরনের সম্পর্ক নিষিদ্ধ এবং পাপময়, এগুলো মূলত শয়তান থেকেই হয়। কিছু স্বপ্নদোষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেও হতে পারে। বৈজ্ঞানিক

গবেষণায় দেখা গেছে কিছু লোকের কোনরূপ স্বপ্নদোষই হয় না। (The New Encyclopaedia Britannica খ-২৭, পৃ-৩০৮) এ সকল স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যা নেই। (ফতহুল বারী খ-১২, পৃ-৩৫৩ (সালাফীয়া প্রেস সংকলন) আরো দেখুন শারহুস সুন্নাহ খ-২১২, পৃ-২১১)

শয়তানী স্বপ্নের দ্বিতীয় নীতি হলো, যারা এ ধরনের স্বপ্ন দেখবে তারা যেন বাম দিকে তিন বার থু থু নিক্ষেপ করে এবং তিনবার আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় (أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ে।) এ ধরনের কথা এবং কাজ অবশ্যই যেন করা হয় সর্বোচ্চ মনোযোগের সাথে এবং অর্থহীন প্রক্রিয়ায় যেন না করে। এর সাথে সাথে সে যেন তার ঘুমের অবস্থান পরিবর্তন (ডান-বাম) করে নেয়। জাবির (রা) আল্লাহর রাসূল থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন–

اِذَا رَاٰى اَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ .

অর্থাৎ, 'যখন তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে, সে যেন তার বাম দিকে তিন বার থু থু নিক্ষেপ করে, শয়তান থেকে তিনবার আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়, এবং সে তার পার্শ্বকে পরিবর্তন করে নেয়।" (সহীহ মুসলিম শারহুন নববী খ-৮, পৃ-২২ নং ৫-২২৬২. দেখুন সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১২২৪ নং ৫৬২০। ইংরেজি অনুবাদ যদিও সম্পূর্ণ। পার্শ্ব পরিবর্তনের বাড়তি বিষয়গুলো ইংরেজি সংস্করণে পাওয়া যাবে আবু সালামাহ'র বর্ণনায় পৃ-১২২৩ নং ৫৬১৭)

যদি কেউ ডান পাশে শুয়ে থাকে তাহলে বাম পাশে শয়ন করবে, এর বিপরীত। তবে যদি কেউ পিঠের ওপরে শুয়ে থাকে তাহলে সে পাকস্থলির ওপর ভর দিয়ে ঘুমাবে না, কেননা রাসূল ﷺ পেটের ওপর ভর দিয়ে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন।' (বর্ণনার জন্য ৬০ নং পৃষ্ঠা দেখুন। এটা উল্লেখ্য যে, যখন এ নিষেধাজ্ঞা আসে তখন পাকস্থলীর ওপর ভর দিয়ে ঘুমানোর ক্ষতিকর দিক জানা ছিল না। সাম্প্রতিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা

দেখিয়েছে যে, পাকস্থলির ওপর ভর দিয়ে নিয়মিত ঘুমালে পরিণত বয়সে মেরুদণ্ডে সমস্যা দেখা দেয় একইভাবে পিঠের অন্যান্য সমস্যাও দেখা দেয়।)

শয়তানী স্বপ্নের তৃতীয় নীতি হলো, একজন আত্মরক্ষার জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে পারে। আমর ইবন শু'আইব তাঁর দাদা থেকে তাঁর দাদা তাঁর পিতা থেকে, রাসূল ﷺ তাদেরকে নিম্নোক্ত শব্দাবলী কষ্ট থেকে (বোবায় ধরা) রক্ষা করবে–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَحْضُرُوْنَ .

(আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত্তাম্মাহ্ মিন গাজাবিহি ও শাররী ইবাদিহি ওয়া মিন হামাঝাতিশ্ শায়াত্বীন ওয়া আই ইয়াহদুরূন।)

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ তা'আলার সকল কালিমা দ্বারা তাঁর নিকট আশ্রয় চাই, আরো আশ্রয় চাই তাঁর গজব থেকে এবং তাঁর বান্দাদের খারাবী থেকে এবং শয়তানের দেয়া কুমন্ত্রণা এবং তাদের উপস্থিতি থেকে।" (এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) সদ্যপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের ইহা শিক্ষা দিতেন; এবং যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি, তাদেরকে লিখে ঝুলিয়ে দিতেন। একথা নির্ভরযোগ্য নয়। (দেখুন সহীহ সুনানে আবু দাউদ খ-২, পৃ-৭৩৭ নং ৩২৯৪. এবং এটা তাবীজ ব্যবহারের পক্ষে দলীল একথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুনান আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১০৯১-৯২, নং ৩৮৮৪ এবং সুনান আবী দাউদ খ-২, পৃ-৭৩৭ নং ৩২৯৪ দ্বারা সত্যায়িত আরো দেখুন–মুয়াত্তা ইমাম মালিক পৃ-৪০০-৪০১ নং ১৭১০)

শয়তানী স্বপ্নের চতুর্থ নীতি হল, ইচ্ছা করলে কেউ উঠে দু'রাকা'আত বা তার চেয়েও বেশি নফল সালাত আদায় করতে পারে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ﷺ বলেন–

اَلرُّؤْيَا ثَلاَثٌ حَدِيْثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيْفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرٰى مِنَ اللّٰهِ فَاِنْ رَاٰى اَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ -

অর্থাৎ, 'স্বপ্ন হলো তিন ধরনের ক. মনের কথা-বার্তা খ. শয়তানের ভীতি প্রদর্শন গ. এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। যদি তোমাদের কেউ

অপছন্দনীয় কিছু দেখে তাহলে সে যেন উঠে পড়ে এবং (অজু করে) দু'রাকা'আত সালাত আদায় করে।' (সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১২২৪ নং ৫৬২১)

নবী করীম ﷺ-এর এ নির্দেশনা মু'মিনদেরকে খারাপ স্বপ্ন থেকে আত্মিক সুবিধা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে যা মধ্যরাতের অপ্রত্যাশিত জাগরণ থেকে সৃষ্টি হয়। আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাতের সালাত হলো সর্বোত্তম সালাত, নবী করীম ﷺ বর্ণনা করেন–

'ফরয সালাতের পরে সর্বোত্তম সালাত হলো, মধ্যরাতের সালাত (তাহাজ্জুদ সালাত)। (প্রাগুক্ত খ-২, পৃ-৫৬৯ নং ২৬১১)

শয়তানী স্বপ্নের পঞ্চম নীতি হলো, সেগুলোকে অন্যের নিকট প্রকাশ করা যাবে না, সেগুলোর ব্যাখ্যার অনুসন্ধান না করাই উচিত, চাই তা কোন পণ্ডিতের নিকট থেকে হোক কিংবা কোন পুস্তক থেকে হোক। কেননা নবী করীম ﷺ এগুলোকে শয়তানের পক্ষ থেকে হওয়ার ব্যাপারে বিভক্ত করেছেন এবং এ ধরনের স্বপ্ন সত্য বা ভাল স্বপ্ন হতে পারে না।

মানুষের মধ্যে শয়তানী অনুপ্রবেশ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো, মানব জাতিকে সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করা এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। স্বপ্নে প্রাপ্ত ভয়ে মানুষ অদৃশ্য ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অবৈধ পন্থাবলম্বন করে। যেহেতু অনুপ্রবেশ মানব নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তাই নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীদের জানিয়েছেন যে, আল্লাহ খারাপ চিন্তা থেকে রক্ষা করতে পারেন যতক্ষণ তা অন্যের নিকট আলোচনা না করা হয় বা সে অনুযায়ী কাজ না করেন। (যাহোক, এটা হলো শুধু চলমান খারাপ চিন্তা-ভাবনার জন্য, যদি কেউ এ ধরনের চিন্ত-ভাবনা দ্বারা স্বাদ উপভোগ করে তার গুনাহ হবে।)

আবু হুরায়রা রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : "আল্লাহ মুসলিম জাতির খারাপ চিন্তা-ভাবনা ততক্ষণ পর্যন্ত এড়িয়ে যান যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা অথবা সেগুলোর ওপরে আমল না করে।'

(সহীহ মুসলিম খ-১, পৃ. ৭৪ নং ২৩০)

একইভাবে যখন কোন ব্যক্তি শয়তানী স্বপ্ন দেখে সে অবস্থায় অন্যের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা অথবা তার ওপর কোন কাজ করা উচিত নয় এবং স্বপ্নদ্রষ্টার এ বিষয়ে কোন পাপও গণ্য হবে না।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا رَاَى اَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَاِنَّمَا هِىَ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَاِذَا رَاَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَاِنَّمَا هِىَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لاَحَدٍ فَاِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ ـ

অর্থাৎ, 'আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যদি তোমাদের কেউ তার পছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে, তাহলে ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে। এজন্য তার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত এবং অন্যদের নিকট তা বলা উচিত। সে যদি এমন স্বপ্ন দেখে যা তার নিকট পছন্দনীয় নয়, তাহলে ইহা শয়তানের পক্ষ থেকে, তার এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া উচিত এবং ইহা অন্য কাউকে বলা উচিত নয়, তাহলে ইহা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' (সহীহ্ আল বুখারী, খ-৯, পৃ-৯৫-৯৬ নং ১১৪)

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَاَنَّ رَاْسِىْ ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ فَاشْتَدَدْتُ عَلٰى اَثَرِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْاَعْرَابِىِّ : لاَ تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِىْ مَنَامِكَ ـ وَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ بَعْدُ يَخْطُبُ فَقَالَ : لاَ يُحَدِّثَنَّ اَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِىْ مَنَامِهِ ـ

অর্থাৎ, 'জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুইন নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, আমি ঘুমের

মধ্যে দেখলাম যে, আমার শিরশ্ছেদ করা হয়েছে এবং আমার মাথা গড়িয়ে গেল এরপরও আমি দৌড়েছিলাম। আল্লাহর রাসূল হাসলেন এবং (সহীহ মুসলিম খ-৪ পৃ-১২২৬ নং ৫৬৪২) বললেন, তুমি লোকদের নিকট এমন গল্প করো না যা তোমার ঘুমের মধ্যে শয়তান তোমার সঙ্গে খেলেছে।' জাবির (রা) আরো বলেন : পরবর্তীতে শুনলাম আল্লাহর রাসূল ﷺ এক খুতবায় (বক্তৃতায়) বলছেন : তোমাদের ঘুমের মধ্যে শয়তান তোমাদের সঙ্গে যে খেলা করে, তা নিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা কর না।' (যখন তিনি বেদুঈনকে নিষেধ করেন, তখন তিনি সাধারণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন لا تُحَدِّثْ এরপর তিনি যখন খুৎবায় বলেন তখন অধিকতর তাকীদ দিয়ে বলেন : لَا يُحَدِّثَنَّ নিষেধাজ্ঞার ওপর অধিক জোর দেন।

(সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১২২৬ নং ৫৬৪১)

আবু সাঈদ (রা)-এর বর্ণনায় নবী করীম ﷺ বর্ণনা করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ অন্যদের সাথে আলোচনা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তানী স্বপ্নে কারো ক্ষতি করতে পারে না। কারো খারাপ স্বপ্ন সম্পর্কে অন্যদের জ্ঞাত করানোর কারণে, স্বপ্নদ্রষ্টা অবচেতনভাবে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস করতে থাকে। এর ফলে, এ ধরনের ব্যক্তি স্বপ্ন সম্পর্কে বিশ্বাস এর ফলে দুঃখ অথবা দুঃশ্চিন্তার ক্ষতির মধ্যে পড়ে থাকে।

মানবীয় : মানসিক প্রতিবিম্ব

তৃতীয় প্রকারের হলো মানব মনের কাজ। এ প্রকারের স্বপ্ন সাধারণত: মানুষের অতীত অথবা বর্তমানের অথবা কল্পনা অথবা বাস্তবের অসংলগ্ন অনুভূতির সমষ্টি দ্বারা হয়। আওফ ইবনে মালিক রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন–

إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ : مِنْهَا أَهَاوِيلُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهَا ابْنَ آدَمَ ـ وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِيْ يَقْظَتِهِ فَيَرَاهُ فِيْ مَنَامِهِ وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

"নিশ্চয়ই স্বপ্ন তিন ধরনের

ক. শয়তানের পক্ষ থেকে আদম সন্তানদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য ভয় প্রদর্শন করা।

খ. কোন ব্যক্তির নিকট যা গুরুত্বপূর্ণ তার জাগ্রত অবস্থায় তা সে দেখে ঘুমন্ত অবস্থায়।

গ. এবং আরেকটি হলো যা নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

(সহীহ্ সুনানে ইবন মাজাহ্ খ-২, পৃ-৩৪০ নং ৩১৫৩)

এ বর্ণনা স্বপ্ন প্রসঙ্গে আধুনিক থিওরীগুলোর সাথে মিল খায়। যারা বলেন যে, স্বপ্ন হলো মানুষের জাগ্রত অবস্থার বর্ধিতাংশ যা জাগ্রত অভিজ্ঞতার প্রতিবিম্ব। দ্বাদশ শতাব্দীর পণ্ডিত ইমাম বাগাভী বর্ণনা করেন যে, ভিজা স্বপ্ন হতে পারে মানসিক প্রতিবিম্বের কারণে, কোন নারী অথবা পুরুষ জাগ্রত অবস্থায় ঐ কাজের মধ্যে লিপ্ত আছে এরূপ মানসিক কার্যক্রমের ফলশ্রুতি। তেমনিভাবে, যে ভালবাসার মধ্যে রয়েছে সে নারী বা পুরুষ তার ভালবাসার পাত্রকে দেখতে পারে।

মানবীয় স্বপ্নের প্রধান নীতি হলো, সেগুলো অর্থহীন। সেগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদও নয় আবার শয়তানের পক্ষ থেকে খারাপ প্রস্তাবনাও নয়। মানসিক প্রতিবিম্ব বেশিরভাগই মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীর অংশ। ফলে, সেগুলোর ব্যাখ্যা অন্যের নিকট জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। যাহোক, এরপরও এ ধরনের স্বপ্নকে আল্লাহ্র রহমত হিসেবে গণ্য করা হয়। বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি দেখিয়েছে যে, স্বপ্নীল ঘুম (REM Sleep) স্বপ্নহীন ঘুমের চেয়ে ভাল। যে সকল লোকেরা স্বপ্নীল ঘুম থেকে বঞ্চিত, তারা অবশেষে বেশি বেশি স্বপ্ন দেখে যাতে অতীতের ক্ষতিপূরণ হতে পারে। এ ছাড়াও, মানুষের বৃদ্ধি এবং উন্নতির জন্য একটা হরমোন দায়ী, যাকে বর্ধনশীল হরমোন বলা হয়, যা রাতে নির্গত হয় বিশেষত: REM Sleep (স্বপ্নীল ঘুমের) মধ্যে। অতএব, স্বপ্নীল ঘুমের অভাব মানুষের বৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।" (Clinical Medicine p-৭৯৭)

ষোলতম অধ্যায়

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অত্যন্ত সাধারণ অভ্যাস ছিল যে, তিনি তার সাহাবীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। ইবন ওমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায়, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ স্বপ্ন দেখতেন এবং তাঁর নিকট বর্ণনা করতেন এবং তিনি আল্লাহ্ যেমন চাইতেন তেমনভাবে ব্যাখ্যা করতেন। (সহীহ আল-বুখারী, খ-৯, পৃ-১২৭-১২৮, নং ১৫৫)

এ ধরনের আলোচনা সাধারণত সালাতুল ফজরের পরে ঘটত। সামুরা ইবন জুনদুব বর্ণনা করেন যে, যখনই আল্লাহর রাসূল সালাতুল ফজর সম্পূর্ণ করতেন, তিনি সাহাবীদের প্রতি ফিরে বলতেন-

هَلْ رَاٰى اَحَدٌ مِّنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا ـ

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি গত রাতে স্বপ্ন দেখেছে?' (সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১২২৯, নং ৫৬৫২ আরো দেখুন সহীহ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-১৩৮-১৪২, সুনান আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১৩৯৫ নং ৪৯৯৯)

ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী

ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী হলো গাইব-এর একটি অংশ। যদিও গাইব-এর মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ্ তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর সাহাবীদের এ বাস্তবতা ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন-

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, 'বলুন! আসমান এবং জমীনে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানেন না।' (সূরা আন নাহল-২৭ ঃ ৬৫)

এর কারণ এই যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তার ভবিষ্যত বাণীতে কিছু তথ্য দিচ্ছিলেন, কিছু লোকে হয়তো ভাবতে পারতো যে, তিনি গায়েব জানেন। তিনি ভবিষ্যত সম্পর্কে যে সামান্য তথ্য দিচ্ছিলেন তা ছিল তাঁর নিকট আল্লাহ প্রদত্ত ওহী যা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে আসত এবং এগুলো রাসূল ﷺ-এর নিজ জ্ঞান দ্বারা উদ্ভূত নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের নিকট এ ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন–

قُلْ لاَّ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلاَ ضَرًّا اِلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ .

অর্থাৎ, 'বলুন! আমি আমার জন্য কোনরূপ ভাল অথবা মন্দ করার ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান তা ছাড়া, যদি আমি গায়েব জানতাম তা হলে আমার জন্য ভাল জমা করতাম এবং কোন খারাপী আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না।' (সূরা–৭ আল আরাফ : আয়াত-১৮৮)

এভাবে, নবী করীম ﷺ-এর নিজ এবং তাঁর সাহাবীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা যার মধ্যে ভবিষ্যতের কথাও আসত, এগুলোকে ভাগ্য গণনার সঙ্গে তুলনা করা যাবে না, সাধারণত স্বপ্নের ব্যাখ্যার পুস্তকগুলোতে যেরূপ করা হয় (যেখানে স্বপ্নের বইগুলো অনিশ্চিত অভিব্যক্তি যেমন, May/could ব্যবহার করে, যার অর্থ সম্ভবত হতে পারে ইত্যাদি, তাদের ব্যাখ্যাগুলো ভবিষ্যত বক্তব্য হিসেবে বা ভাগ্য গণনা হিসেবে ধরা যায় না। তবে অভিব্যক্তি যখন নিশ্চয়তা প্রদান করে যেমন, অর্থাৎ হবে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আকীলীর স্বপ্নের বইতে তিনি বর্ণনা করেন : 'যদি কোন বিছানায় পড়া ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে ক্রীতদাস মুক্ত করতে দেখে। এর অর্থ তার মৃত্যু কেননা মৃত ব্যক্তির কোন সম্পদ থাকে না। স্বপ্নে কোন বন্ধুকে অসুস্থ দেখা অর্থাৎ ঐ রোগ তার নিজেরই হবে।' (p-২২১))

নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ভবিষ্যতবাণীগুলো ছিল আল্লাহর ওহীর ভিত্তিতে, অতএব সেগুলো ছিল ১০০ ভাগ সঠিক, অন্যদিকে ভাগ্য গণনার পুস্তকগুলো মিথ্যা এবং সম্ভাব্য মিশ্রণে পূর্ণ থাকে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, যখন তিনি আল্লাহর রাসূলকে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন : তারা নিরর্থক। তিনি এরপর উল্লেখ করেন তারা তো মাঝে মাঝে সঠিকও

বলে। নবী করীম ﷺ উত্তরে বললেন : সেগুলো হলো ঐ সত্যের একটা অংশ যা জ্বিনেরা চুরি করে তার বন্ধুর নিকট কিছু বলেছে। কিন্তু সে এর সঙ্গে শতশত মিথ্যাকে যোগ করে।' (সহীহ আল-বুখারী, খ-৭, পৃ-৪৩৯, নং-৬৫৭ এবং সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১২০৯, নং-৫৫৩৫।)

সালাতুল ইস্তিখারাহ

ইসলাম প্রাকৃতিকপন্থি হওয়ার কারণে, মানব প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করে এবং এর অনুসারীদের অপরাধ থেকে ঈমান রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং তাদেরকে সন্তুষ্টি এবং শান্তির অন্বেষা প্রাত্যহিক জীবনের নির্দেশনার মাধ্যমে দিয়ে থাকে। যখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই তাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান চূড়ান্ত পর্যায়ে রেখে মু'মিনগণ দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করে। যখনই আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারণের ওপর বিশ্বাস কেন্দ্রীভূত হয়, তখনই সুখ ও সন্তুষ্টির একটি অনুভূতি তার সাথে যুক্ত হয়। জাবির (রা) বলেন, "নবী করীম ﷺ আমাদেরকে সকল কাজে সালাতুল ইসতিখারার শিক্ষা এমনভাবে দিয়েছেন যেমনভাবে তিনি কোন সূরা শিক্ষা দেন। তিনি বলেন, যদি তোমাদের কেউ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তার দুই রাকা'আত সালাত আদায় করা উচিত। অতঃপর বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ ، وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ ـ اَوْ قَالَ : فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاَجِلِهٖ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ ـ اَوْ قَالَ : فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاَجْلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِىْ بِهٖ ـ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ .

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আমার জন্য যা ভাল হবে তার জন্য তোমার নিকট তোমার (অশেষ) জ্ঞান থেকে নির্দেশনা চাই, আমি তোমার (অশেষ) করুণা থেকে সাহায্য চাই। কেননা তুমি সক্ষম, আমি অক্ষম, তুমি জান, আমি জানি না এবং একমাত্র তুমিই অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞানী।

হে আল্লাহ! যদি আপনি এ কাজ আমার দ্বীন এবং জীবিকার জন্য এবং আমার ভবিষ্যতের জন্য ভাল মনে করেন, (স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী) তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন এবং আমার জন্য তাকে সহজ করে দিন এবং এতে আমার উপরে আপনার করুণা বর্ষণ করুন।

আর যদি আপনি এটা আমার দ্বীন এবং জীবিকার জন্য এবং আমার ভবিষ্যতের জন্য (তা স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী হোক) ক্ষতিকর মনে করেন, তাহলে তাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিন এবং আমাকেও তা থেকে দূরে সরিয়ে নিন এবং আমার জন্য তাই নির্ধারণ করুন যা আমার জন্য কল্যাণকর, তা নিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দান করুন।'

উপরে লিখিত হাদীস থেকে নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশনা থেকে জানা যায়, যখনই দুই অথবা ততোধিক বৈধ বিষয় থেকে একটিকে বাছাই করার প্রশ্ন ওঠে। (ইবনে আবী জামরাহ, ফতহুল বারী পৃ-১৮৮ হতে উদ্বৃত।)

ইসলামের জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যবহার করে একটা সিদ্ধান্ত আসা উচিত। ইহা করে একজনের আল্লাহর নির্দেশনা চাওয়া উচিত, বাছাই করার জন্য দু রাক'আত সালাত আদায় করে (অনুমোদিত সময়ে) (নিষিদ্ধ পাঁচ সময় হলো– সকালের সালাত (সালাতুল ফজর) এরপর সূর্যোদয় পর্যন্ত যখন সূর্য উদয় হচ্ছে, সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকা অবস্থায় বিকেলের সালাত (সালাতুল আসর) এরপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং সূর্য যখন অস্ত যায়।) এরপর উপরে লিখিত দু'অ ইসতিখারাহ্ বলতে হবে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশনা মুসলিমগণ আজ সম্পূর্ণরূপে তাদের সিদ্ধান্তের জন্য সালাতের ওপর নির্ভর করে। তারা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সালাত আদায় করে প্রার্থনা করে এবং তার উত্তর প্রাপ্তির জন্য স্বপ্নের ওপর নির্ভর করে। ইহা লোকদের মধ্যে বহুল প্রচলিত যে, তারা অন্যের নিকটেও নিজেদের জন্য ইসতিখারা করার আবেদন জানায়। এ ধরনের সালাত সাধারণত ঘুমের পূর্বে আদায় করা হয়। দিনের সেট নাম্বার

এবং স্বপ্নের বই-এর সঙ্গে মিল করা হয় তাদের সেই স্বপ্নে দেখা লক্ষণগুলোর অর্থ জানার জন্য। এর কোনটিরই শিক্ষা রাসূল ﷺ-এর পদ্ধতির ভিত্তির সঙ্গে মিল খায় না। একথা না বললেও চলে যে, যেকোন ধরনের ভাল স্বপ্ন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিশ্চয়তা বিধান করে না, ইস্তিখারা যে কাজ সম্পাদন করে।

স্বপ্ন ব্যাখ্যার নীতি

স্বপ্ন ব্যাখ্যার প্রথম মূলনীতি হলো, নবী করীম ﷺ ছাড়াও অন্যদের জন্য স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার অনুমতি আছে। আবু রাজীন আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন–

اَلرُّؤْيَا عَلٰى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَاِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ . قَالَ وَاَحْسِبُهٗ قَالَ : وَلاَ تَقُصَّهَا اِلاَّ عَلٰى وَادٍّ اَوْ ذِىْ رَاْىٍ .

অর্থাৎ, 'কোন ব্যক্তির স্বপ্ন ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর উড়তে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যাখ্যা করা না হয়। কিন্তু যখনই তার ব্যাখ্যা করা হয় তখনই তা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং আমি মনে করি তিনি আরো বলেন : স্বপ্নের কথা শুধুমাত্র প্রিয় কোন বন্ধুর নিকট বল অথবা যার সুন্দর বিচার জ্ঞান রয়েছে।
(সুনান আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১৩৯, নং ৫০০২ এবং সহীহ সুনানে আবী দাউদ খ-৩, পৃ-৯৪৭, নং ৪১৯৮ দ্বারা সত্যায়নকৃত।)

মানবমন ততক্ষণ পর্যন্ত অস্থির থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা না করা হয়। এটা স্বাভাবিক যে কেউ তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বুঝার চেষ্টা করবে। যদিও মহানবী ﷺ নির্দেশনা দিয়েছেন যে, স্বপ্নের বর্ণনা শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধু অথবা জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট দিতে হবে।

স্বপ্ন ব্যাখ্যার দ্বিতীয় মূলনীতি হলো, শুধুমাত্র ভাল স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে হবে। ইমাম বাগভী বলেছেন, নবী করীম ﷺ-এর বর্ণনা "স্বপ্ন তিন প্রকারের।" এর অর্থ হলো, মানুষ স্বপ্নে যা দেখে তার সবই সঠিক নয় এবং সবগুলোরই ব্যাখ্যা করা যাবে তাও নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে যা আসে তাই সঠিক...এ ছাড়া যা আছে সবই সন্দেহমূলক এবং সন্দেহজনক স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যা হয় না।" (শারহুস সুন্নাহ খ-১২, পৃ-২১১)

এ মূলনীতি ঐ হাদীস দ্বারা সমর্থিত, যে হাদীসে শয়তানী স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। এক বেদুঈন রাসূলﷺ-এর নিকট আসলেন এবং স্বপ্নে দেখলেন তার শিরচ্ছেদ করা হয়েছে। নবী করীমﷺএ ঘটনা শুনে হাসলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে চতুর্থনীতি হলো, একমাত্র নবীগণই স্বপ্নের ১০০% সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারতেন। সাধারণ মানুষের ব্যাখ্যা, তিনি আলিম কিংবা অনুসারী যেই হোন না কেন, লক্ষণের জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে, তার কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যাও হতে পারে। (সহীহ মুসলিম, শারহুন নববী খ-৮, পৃ-৩৪)

এ নীতি নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকে গৃহীত–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَرَى اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَاَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا بِاَيْدِيْهِمْ فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَاَرَى سَبَبًا وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ فَاَرَاكَ اَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلاَ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَعَلاَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهٗ فَعَلاَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاللّٰهِ لَتَدَعَنِّىْ فَلَاَعْبُرَنَّهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (اُعْبُرْهَا) قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْاِسْلاَمِ وَاَمَّا الَّذِىْ يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْاٰنُ حَلاَوَتُهٗ وَلِيْنُهٗ وَاَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذٰلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْمُسْتَقِلُّ وَاَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِىْ اَنْتَ عَلَيْهِ تَاْخُذُ بِهٖ فَيُعْلِيكَ اللّٰهُ بِهٖ ثُمَّ يَاْخُذُ

بِهٖ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُوْ بِهٖ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهٖ رَجُلٌ اٰخَرُ فَيَعْلُوْ بِهٖ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهٖ فَيَنْقَطِعُ بِهٖ ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُوْ بِهٖ فَأَخْبِرْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ اَصَبْتُ اَمْ اَخْطَأْتُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (اَصَبْتَ بَعْضًا وَاَخْطَأْتَ بَعْضًا) قَالَ فَوَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَتُحَدِّثَنِّىْ مَا الَّذِىْ اَخْطَأْتُ قَالَ : لَا تُقْسِمْ .

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ 'ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের নিকট আগমন করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! গতরাতে আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, একখণ্ড মেঘ (আরবি পরিভাষা ظُلَّةً শাব্দিক অর্থ এমন জিনিস যা ওপরে থাকে এবং ছায়াদান করে। ইমাম বাগভী বর্ণনা করেন যে, এখানে এর অর্থ মেঘ। (শারহুস সুন্নাহ খ-১২, পৃ-১২৮)

যেখান থেকে মাখন এবং মধু পড়ছিল এবং আমি দেখলাম লোকেরা এর বিভিন্ন পরিমাণ তাদের হাতের তালুতে সংগ্রহ করছে। আমি আরো দেখলাম এক খণ্ড রশি (দড়ি) জমিন ও আসমানের মাঝে ঝুলেছিল এবং আমি দেখলাম আপনি এ দড়ি ধরে আসমানে (ওপরে) উঠে গেলেন। আপনার পরে আরো দুই ব্যক্তি এ রশি ধরে উপরে উঠে গেলেন, একজনের পরে আরেকজন। যখন তৃতীয় ব্যক্তি এ রশি ধরলেন, ইহা ছিঁড়ে গেল, এরপর একে পুনরায় জোড়া দেয়া হল এবং তিনিও ওপরে উঠে গেলেন। আবু বকর (রা) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা আপনার কুরবানী হোক।

আল্লাহর কসম, আমাকে এর ব্যাখ্যা করতে দিন। আল্লাহর রাসূল বলেন : 'ব্যাখ্যা কর'। আবু বকর (রা) বলেন : মেঘ দ্বারা ইসলামের শামিয়ানাকে বুঝানো হয়েছে এবং এর থেকে যে ঘি এবং মধুর ফোঁটা পড়ছিল তা হলো আল-কুরআনের মিষ্টতা ও কোমলতার স্থলাভিষিক্ত। মানুষ তাদের হাতের তালুতে যে পরিমাণ ধরেছে, এর দ্বারা ঐ সকল লোকের অবস্থা বুঝানো হয়েছে যারা আল-কুরআন থেকে অনেক পড়েছে এবং জেনেছে এবং যারা কম ধরেছে এর দ্বারা যারা কম পড়েছে এবং শিখেছে তাদের বলে বুঝানো হয়েছে। আসমান-জমীনের মধ্যে যে দড়ি রয়েছে তা ঐ সত্যের রূপক যে

সত্য নিয়ে আপনি এসেছেন এবং যার দ্বারা আল্লাহ আপনাকে উত্তোলন করেছেন (জান্নাতে)।

এরপরে দুই ব্যক্তি যারা আপনার পরে ইহাকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরবেন এবং এর সাহায্যে উর্ধ্বে উঠবেন। আরেক ব্যক্তি একে ধরবেন তবে উহা ভেঙ্গে যাবে, অতঃপর উহা পুনরায় জোড়া লাগবে এবং তিনিও এর সাহায্যে উর্ধ্বে আরোহণ করবেন। হে আল্লাহর রাসূল। আমার পিতা আপনার জন্য কুরবানী হোক, আমি কি সঠিক (ব্যাখ্যা দিয়েছি) নাকি বেঠিক? আল্লাহর রাসূল উত্তর দিলেন : তুমি এ স্বপ্নের এক অংশের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে করেছ এবং অপর অংশের ব্যাখ্যা বেঠিকভাবে করেছ। এরপর আবু বকর (রা) জোর দিয়ে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আপনি আমাকে বলে দিন কোন অংশ আমি ভুল করেছি? রাসূল ﷺ বলেন কসম দিও না।" (সহীহ আল-বুখারী খ-০৯, পৃ-১৩৭, নং-১৭০ এবং সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১২২৬–২৭, নং-৫৬৪৩।)

ইবন হাজার আসকালানী সুলাইমান ইবন কাছীর (র)-এর ওপরে বর্ণিত হাদীসে যেখানে আবু বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোন অংশে ভুল করেছি? কিন্তু রাসূল ﷺ তাকে তা জানাতে অস্বীকার করলেন। এর বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি আদ দাউদীর এ বাক্যাংশের ব্যাখাও পেশ করেছেন "কসম দিও না" অর্থাৎ তোমার কসমের পুনরাবৃত্তি করো না। কেননা আমি তোমাকে জানাব না।" (ফতহুল বারী খ-১২, পৃ-৪৫৪।)

নবী করীম ﷺ আবু বকর (রা)-কে তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভুল অংশ বলতে অস্বীকার করেন এবং শুধুমাত্র কসম করতে নিষেধ করেন। রাসূল ﷺ আবু বকর (রা)-কে বলতে পারতেন, যখন তিনি ব্যাখ্যা করার অনুমতি চেয়েছিলেন যে, তিনি এর ব্যাখ্যা সঠিকভাবে করতে পারবেন না বরং তিনি উদারতার সাথে তাকে চেষ্টা করার অনুমতি দিলেন, যাতে তাঁর নিকট, সাথে সাথে পূর্ণ মুসলিম জাতির নিকট এর ব্যাখ্যার অপূর্ণতা পরিষ্কার হয়ে যায়। ওখান থেকে এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, রাসূল ﷺ-এর সর্বোত্তম সাহাবী সঠিকভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে অপারগ ছিলেন। অতএব, তারপরে কেউই স্বপ্নের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে করার প্রত্যাশা করতে পারে না।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার পঞ্চম নীতি হলো, একজন ভাল স্বপ্নে যা দেখে তাকে কার্যকরী করতে পারে। অর্থাৎ যদি কোন নারী বা পুরুষ স্বপ্নের মধ্যে ভাল কোন জিনিস নিজেকে করতে দেখে (যেমন তাহাজ্জুদ বা নফল সালাত আদায় করতে দেখা, সাওম পালন, দান-সদকা অথবা হাজ্জ আদায় করতে দেখে কেউ অনুরূপ আমল করতে পারে।) জাগ্রত হয়ে এরূপ আমল করা তার জন্য বৈধ রাখা হয়েছে।

মুররাহ্ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, খুযাইমা ইবন ছাবিত বর্ণনা করেন যে, তিনি একটা স্বপ্নে দেখলেন যাতে তিনি নবী করীম ﷺ-এর কপালের সঙ্গে নিজে অবনত হয়েছেন। যখন তিনি এটা আল্লাহর রাসূলের নিকট বর্ণনা করলেন তিনি বললেন বস্তুত "আত্মারা মিলিত হন না।" এরপর নবী করীম ﷺ তার মাথা ঝুঁকালেন এবং তিনি তার কপাল রাসূল ﷺ-এর কপালের ওপর রাখলেন। (মুসনাদে আহমদ খ-৫, পৃ-২১৫ এবং আল ফাতহুর রব্বানী খ-১২, পৃ-২২৫, নং-৩২৮৫ দ্বারা সত্যায়নকৃত।)

স্বপ্নের প্রতীকী ব্যাখ্যা

ইসলামী সকল জ্ঞানের মূল ভিত্তি হলো ওহী যা কুরআন এবং সুন্নাহতে নিহিত। যেহেতু ভাল স্বপ্নগুলোও আল্লাহর ইলহামের এক প্রকার, সেহেতু স্বপ্নের প্রতীকী ব্যাখ্যা শুরু করার আগে, প্রাথমিকভাবে কুরআন সুন্নাহতে প্রাপ্ত প্রতীকগুলোর ওপর নির্ভর করা উচিত।

পণ্ডিতগণ সার্বিক অধ্যয়নের পর নবী করীম ﷺ-এর প্রতীকী স্বপ্নের ব্যাখ্যার পদ্ধতিকে তিনভাগে বিভক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন–

১. কুরআনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা।

২. সুন্নাহভিত্তিক ব্যাখ্যা

৩. এবং শাব্দিক ব্যাখ্যা। (শারহুস সুন্নাহ খ-১২ পৃ-২২০)

১. কুরআনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা

যেহেতু ভাল স্বপ্নগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আল-কুরআনও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাই কুরআনে ব্যবহৃত প্রতীক এবং ধারণা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হতে পারে। আল-কুরআনে ব্যবহৃত প্রতীকগুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য কাউকে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য তাফসীরগুলোর ওপর ভিত্তিশীল হতে হবে এবং যে কোন ধরনের দলাদলি পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করতে হবে।

সর্বোচ্চ মানের কুরআনের তাফসীরগুলো অনেক সময় কুরআনের প্রতীকগুলোর সঠিক অর্থ প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, নবী মূসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ : "ফিরআউনের নিকট যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে।" (সূরা-৭৯ নাযি'আত : আয়াত-১৭)

কিছু সুফি, যারা ছিলেন ১০ম শতাব্দীর, এখানকার "ফিরআউন" বলতে "হৃদয়কে" বুঝানো হয়েছে] কারণ, "হৃদয়ই প্রত্যেকের ওপর জুলুম করার মাধ্যম। তারা লাঠিকে পার্থিব জীবন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে আল্লাহ মূসা (আ) কে বলেছেন أَلْقِ عَصَاكَ "তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।" (২৭ : ১০) ফল এ দাঁড়ালো যে, এ আয়াতে নবী মূসা (আ)-কে পার্থিব জীবন ত্যাগ করে শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করতে বলেছেন। (দেখুন : পৃ-১৮–২১ তাফসীরে সূরা আল-হুজুরাতের ভূমিকা আল-কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে।) (এটা হলো এক ধরনের উপদলীয় ব্যাখ্যা, কুরআন হাদীসে যার কোন ভিত্তি নেই।)

সঠিক প্রতীকী ব্যাখ্যার একটি দৃষ্টান্ত আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে, যেখানে রশিকে আল্লাহর সাথে চুক্তির অর্থে রূপকভাবে ইসলাম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا .

অর্থাৎ, 'তোমরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর রশিকে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'
(সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-১০৩)

অতএব, স্বপ্নে দড়ি দেখা ইসলামের চুক্তি অর্থে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। শক্ত মুষ্ঠিতে রশি ধারণ করা স্বপ্নে দেখা, ইসলামকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

২. সুন্নাহর ভিত্তিতে ব্যাখ্যা

সুন্নাহর উপমাগুলো ও ভাল স্বপ্নের একই উৎস থেকে উৎসাহব্যঞ্জক। অতএব, স্বপ্নের উপমাগুলো সঠিক সুন্নাহতে ব্যবহৃত প্রতীকগুলো দ্বারা ব্যাখ্যায়িত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্বপ্নে দেখা একটি পাঁজর দ্বারা একজন মহিলা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, এটা রাসূল ﷺ-এর বর্ণনা থেকে লাভ করা যায়। "মহিলাগণ পাঁজরের বাঁকা হাড়ের তৈরি।" (সহীহ আল-বুখারী খ-৭, পৃ-৮১ নং ১১৪ এবং সহীহ মুসলিম খ-২, পৃ-৭৫২–৫৩, নং-৩৪৬৮।)

একই ধরনের প্রতীকের ব্যাখ্যা রাসূল ﷺ যেভাবে দিয়েছেন সেভাবে আমরাও তা ব্যবহার করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, নবী করীম ﷺ-এর একটি হাদীসের ভিত্তিতে জামাকে দ্বীন বা ধর্ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। যে হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন : আমি যখন ঘুমন্ত ছিলাম তখন লোকেরা আমার সামনে জামা পরে দেখা দিল, কিছু লোক শুধুমাত্র তাদের বুক ঢেকে রেখেছে, কেউ কেউ তার নিচ পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। অতঃপর ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে দেখানো হলে দেখলাম তিনি এত দীর্ঘ জামা পরিধান করেছেন যে, তা পিছন থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। যখন লোকেরা নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি এর কি ব্যাখ্যা করলেন, তিনি ﷺ উত্তর দিলেন : ইহা দ্বারা ধর্মকে বুঝানো হয়েছে।"

(সহীহ্ আল-বুখারী খ-৭, পৃ-১১৩-১১৪, নং-১৩৭।)

এ ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যার সঙ্গে কিয়াস জড়িত। এরূপই ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ পয়েন্ট আউট করেছেন। তিনি বলেন, পোশাক পরা ব্যাখ্যায় জামার মতই দ্বীন বা ধর্ম এর প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। সেগুলো লম্বা কিংবা খাট, পরিষ্কার অথবা ময়লা হতে পারে, এগুলো ব্যক্তির ধর্মীয় অবস্থা বুঝায়। এভাবে রাসূল ﷺ জামা দ্বারা জ্ঞান এবং ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন। পোশাক পরা, জ্ঞান এবং ধর্মের একত্রে বিষয়গুলো হলো, যে ব্যক্তি এগুলোর মালিক হয় তাকে আবরণ ও সুন্দর করে। জামা শরীরকে আবৃত করে, জ্ঞান এবং ধর্ম বা দ্বীন আত্মা এবং অন্তরকে আবৃত (রক্ষা) করে।"

(ই'লামুল মুয়াক্কীন খ-১, পৃ-১৯৫।)

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যা

ব্যক্তি এবং বস্তুর নাম থেকে আশাব্যঞ্জক অর্থ বের হয়ে আসতে পারে, যেমনভাবে নবী করীম ﷺ করতেন। নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন–

رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ كَاَنَّا فِىْ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَاُتِيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَاَوَّلْتُ اَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِى الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ دِيْنَنَا قَدْ طَابَ .

অর্থাৎ, 'গতরাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমরা উকবা ইবন রাফির ঘরের মধ্যে ছিলাম এবং কিছু ইবন তাব-এর তাজা খেজুর আনা হলো। আমি এর ব্যাখ্যা এভাবে করছি যে, ইহা আমাদের এ দুনিয়ার উন্নতি এবং পরকালের আশীর্বাদ এবং আমাদের দ্বীনের পূর্ণতা।' (সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১২২৮, নং ৫৬৪৭ এবং সুনানে আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১৩৯৭, নং-৫০০৭)

নবী করীম ﷺ পরকালীন আশীর্বাদ (عَاقِبَة- আকিবাহ্) অর্থ গ্রহণ করেছেন (عُقْبَة -উকবাহ্) থেকে এবং উচ্চতা (رِفْعَة-রাফ্য়া) অর্থ গ্রহণ করেছেন (رَافِعٌ -রাফি) থেকে এবং পূর্ণতা বা ভাল অর্থ গ্রহণ করেছেন (طَابَ -ত্বাবা) (طَاب -তাব) থেকে। (এ হাদীস থেকে প্রচ্ছন্নভাবে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, দুনিয়ার ফলই আখিরাতে ভোগ করতে হবে এবং দুনিয়া আগে আখিরাত তার পরে।)

ব্যাখ্যাকৃত স্বপ্নাবলী

যেহেতু নবীদের সকল স্বপ্নই ওহী, সেগুলো সবই ছিল সত্য স্বপ্ন। তাঁদের কোন স্বপ্নই শয়তানী প্রভাবযুক্ত ছিল না, এমনকি মানুষের অবচেতন মনের প্রতিবিম্বও তা নয়, এভাবেই সকল স্বপ্নই ছিল ব্যাখ্যার উপযুক্ত। যেরূপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, শয়তানী স্বপ্ন বলতে সকল খারাপ স্বপ্নকেই বুঝায়। যাহোক নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের ব্যাখ্যাকৃত স্বপ্নাবলীকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

ক. বিধান সংক্রান্ত স্বপ্নাবলী

খ. সাধারণ স্বপ্নাবলী

ক. বিধান সংক্রান্ত স্বপ্নাবলী : নবী করীম ﷺ-এর স্বপ্নাবলী এবং তাঁর সাহাবীগণের স্বপ্নাবলী যেগুলো তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তার কিছু ছিল ইসলামের বিধান এবং গাইব সংক্রান্ত। উদাহরণস্বরূপ, সূরা সদ তিলাওয়াতের সময় সিজদার বিধান রাসূল ﷺ-এর একজন সাহাবীর স্বপ্নের মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নিজে অধ্যায় সদ লিখছিলেন। যখন তিনি সিজদার আয়াতে পৌছালেন, তিনি দেখলেন দোয়াত, কলম এবং তার চারিদিকের সবকিছুই সিজদায় পড়ে

গেলেন। তিনি ইহা নবী করীম ﷺ-কে জানালে তিনি তখন থেকে সিজদার বিধান চালু করে দেন।

(মুসনাদে আহমাদ, আল-ফাতহুর রব্বানী খ-৪, পৃ-১৮২, নং-৯২০ দ্বারা সত্যায়নকৃত)

এরূপভাবে নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে আর রুমাইছা এবং বিলাল (রা)-কে জান্নাতের অধিকারী হিসেবে তাঁর একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে জানিয়ে দেন। জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি জান্নাতে প্রবেশ করছিলাম এবং আমি দেখলাম আবু তালহার স্ত্রী আর রুমাইছা কে (জান্নাতে)। এরপর আমি পদধ্বনি শুনতে পেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, কে? কেউ উত্তর দিলেন : ইনি হলেন বিলাল (রা) এরপর আমি একটি রাজপ্রাসাদ দেখতে পেলাম যার উঠানে একজন মহিলা বসে রয়েছেন এবং আমি জিজ্ঞেস করলাম : এ প্রাসাদটি কার? কেউ উত্তর দিলেন : এটা ওমর (রা)-এর। আমি এর মধ্যে প্রবেশ করে এর চতুর্দিক দেখতে চাইলাম কিন্তু আমি তোমার (ওমর রা এর) মর্যাদার অনুভূতি স্মরণ করলাম (এবং প্রবেশ করা থেকে বিরত রইলাম)। ওমর (রা) বলেন আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মর্যাদার অনুভূতি আপনাকে ফিরিয়ে রাখল?"

(সহীহ আল-বুখারী খ-৫, পৃ-২১-২২, নং-২৮।)

এ ধরনের ব্যাখ্যায়িত স্বপ্নগুলো স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করা যায় না, যদিও তা নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের সাথে সাথে ওহীর বিধান শেষ হয়ে গেছে। যদি এ ধরনের ব্যাখ্যা গ্রহণের সুযোগ থাকত তাহলে প্রত্যেক প্রজন্মেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দ্বারা আইন প্রণয়নের সুযোগ থাকত। অর্থাৎ আজ যদি কেউ কুরআনের এমন কোন স্থান তিলাওয়াতের সময় (স্বপ্নে) দোয়াত কলমকে সিজদারত দেখে যেখানে রাসূল ﷺ সিজদা করতে বলেন নি'। তাহলে সেখানে সিজদার বিধান জারি করা যাবে না, এ ধরনের স্বপ্নকে মিথ্যা হিসেবে গণ্য করতে হবে। এরূপে যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে জান্নাতে দেখতে পায়, তাহলে এটা তার চূড়ান্ত জান্নাতে দাখিল হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্ব্যর্থহীনভাবে নবী করীম ﷺ-এর যুগেই দ্বীনের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়েছেন, এভাবে-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا .

অর্থাৎ, 'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং আমার নি'আমতকে তোমাদের ওপর পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের দ্বীন ইসলামের ওপর আমি সন্তুষ্ট হলাম।' (সূরা–৫ আল-মায়িদা : আয়াত-৩)

এ ছাড়াও নবী করীম যেকোন ধরনের নতুন বিধান যোগ করতে নিষেধ করেছেন : এমন কোন জিনিস নেই যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে তবে আমি যা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি তার ওপর আমল করলে।"

(আল-মুসতাদরাক, শারহুস সুন্নাহ খ-১৪, পৃ-৩০২–৩০৫ দ্বারা সত্যায়নকৃত।)

এভাবে নবী করীম ﷺ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সকল অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন তবে ঐ সকল পন্থা ব্যতীত যা অহী মারফত তাঁর নিকট আগমন করেছে।

ইমাম নববী (র) বর্ণনা করেন যে, এমনকি কোন ব্যক্তির স্বপ্ন সত্য বা ভাল হলেও তার দ্বারা নতুন কোন বিধান প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, কেননা ঘুমন্ত অবস্থায় যা দেখা বা শোনা হয় তার কোন নিশ্চয়তা নেই। (স্বপ্নের ঘটনাবলী যেগুলো শরী'আতে বিদ্যমান বিধানগুলোর সাথে বৈপরীত্য নেই, সেগুলো স্বপ্নদ্রষ্টা জাগরিত হওয়ার পর পালন করতে পারেন। যেমন পূর্ববর্তী এক হাদীসে রাসূল ﷺ-এর এক সাহাবী রাসূল ﷺ-এর কপালে সিজদা করতে দেখেছিলেন। এভাবে যদি স্বপ্নদ্রষ্টা তাকে সালাত, সাওম পালন করতে দেখে, হজ্জ করতে, বিবাহ করতে দেখে, ভ্রমণ করতে দেখে, সে নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন নফল হিসেবে সেগুলো করতে পারে, বাধ্যতামূলক হিসেবে নয়।) পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, অবস্থাসমূহের মধ্যে জাগ্রত। (মিন আফআলির রাসূল খ-২, পৃ-১৬২, আলআযকার, তাযীলুস সুকইয়া ফী তাবীরুর রুইয়া পৃ-৫৮।)

অবস্থা এমন যে, তার বর্ণনা এবং সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ইবনুল হাজ্জ[১১২] যুক্তি পেশ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষকে স্বপ্নযোগে সংগঠিত কোন বিষয়কে করার জন্য বাধ্য করবেন না, নবী করীম ﷺ-এর হাদীস থেকে এর

ভিত্তি গ্রহণ করা হয়েছে : "তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে (অর্থাৎ তাদের অপরাধ গণ্য করা হবে না) তাদের মধ্যে একজন হলেন : ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ সে ঘুম থেকে জাগ্রত না হয়।

(মিন আফ-আলির রাসূল খ-২, পৃ-১৬২, তাযীলুস সুকয়া ফী তাবীরুর রুইয়া পৃ-৫৮-৫৯)

অর্থাৎ লোকদের তাদের স্বপ্নে সংগঠিত বিষয় সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে না। ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নীতি যাকে গ্রহণ করা কর্তব্য, কেননা পূর্ণ মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে যে সকল বিদ'আত অনুশীলন হচ্ছে তার মূল হলো স্বপ্ন। (অনেক সময় যখন লোকেরা তাদের জিজ্ঞেস করে কেন তোমরা এমন কাজ করছ যা রাসূল ﷺ করেন নি বা তাঁর সাহাবীগণও করেন নি, তারা উত্তর দেয় যে, তাদের শায়খের শায়খের শায়খ স্বপ্নে দেখেছিল তাদের এরূপ করতে তাই তারা তা করছে।) মহান আল্লাহও অবনতির এ চ্যানেলের উল্লেখ নিম্নোক্ত আয়াতে করেছেন-

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَٰذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ .

অর্থাৎ, 'তাদের স্বপ্নগুলো কি তাদের এ কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছে, নাকি তারা অবাধ্য সম্প্রদায়?' (সূরা-৫২ আত তুর : আয়াত-৩২)

খ. সাধারণ স্বপ্ন : যে সকল স্বপ্নের ব্যাখ্যা রাসূল ﷺ করা সত্ত্বেও তার মধ্যে বিধানগত বিষয়াবলী না থাকার কারণে রাসূল ﷺ-এর যুগ পার হয়ে গেলেও স্বপ্নের ব্যাখ্যায় সেগুলোর উপমা ব্যবহার করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, নবী করীম ﷺ-এর নিজ স্বপ্নে দুধের ব্যাখ্যা করেছেন জ্ঞান হিসেবে। আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : যখন আমি ঘুমন্ত ছিলাম, আমাকে এক পেয়ালা পূর্ণ দুধ দেয়া হলো এবং আমি ইহা থেকে পান করলাম এমনকি আমি আমার ঠোঁটের ভিজাও অনুধাবন করলাম। এরপর এর বাকি অংশ আমি ওমর ইবনে খাত্তাবকে দিলাম। তাঁর পাশে উপবিষ্ট যারা ছিলেন তারা জিজ্ঞেস করলেন আপনি উহার ব্যাখ্যা কি দ্বারা করেন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি উত্তর দিলেন (ইহা ধর্মীয়) জ্ঞান।"

(সহীহ আল-বুখারী খ-৯, পৃ- ১১২, নং-১৩৫।)

এ প্রকার হলো স্বপ্নের ব্যাখ্যার মূল সুন্নাহ অনুযায়ী। প্রতীকী ব্যাখ্যা শিরোনামে পূর্বে এ প্রকারের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সতেরতম অধ্যায়

ঘুমানোর আদব

ঘুমানোর জন্য দৈহিক এবং আত্মিক প্রস্তুতিসহ ঘুমানোর সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ এমনকি তিনিই ঘুমানোর সঠিক ভঙ্গিমার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। নিম্নোদ্ধৃত নবীর নীতিমালাগুলো ঘুমের মধ্যেকার নাজুকতার হাত থেকে মু'মিনদেরকে রক্ষা করবে।

১. ঘরের প্রস্তুতি

রাত যখন ছড়িয়ে যায় তখন তার ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য মু'মিনদেরকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহই শিক্ষা দিয়েছেন।

(সূরা–১১৩ ফালাক : আয়াত-৩)

অন্ধকারের আচ্ছাদনে শয়তানী শক্তিগুলো অধিকতর শক্তিশালী ও সক্রিয় হয়। এ কারণে, শিশুদেরকে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ঘরে রাখতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে ঘর সঠিকভাবে নিরাপদ করতে হবে–

عَنْ جَابِرٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ اَوْ قَالَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوْا وَاَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَاَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَاَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرْ اِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا .

অর্থাৎ, 'জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন : রাত যখন নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদের নিকটে রাখ, কেননা ঐ সময় শয়তানেরা আধিপত্য বাড়িয়ে দেয়। এক ঘণ্টা পরে তোমরা তাদেরকে যেতে দিও। তবে ঘরের দরজা বন্ধ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নাও এবং তোমাদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখার সময়ও আল্লাহর নাম নাও।'

(সহীহ্ আল-বুখারী খ-৪, পৃ-৩২১, নং-৫০৪।)

২. ঘুমানোর পূর্বে বিতর সালাত আদায় করা

সালাতের বেজোড় রাক'আত যা সাধারণত শেষ রাতের নফল সালাত তাহাজ্জুদের পরে পড়া হয়। যদি বিতর সালাত বাদ পড়ে যাবার আশঙ্কা করে তাহলে সে যেন তা ঘুমানোর পূর্বে আদায় করে নেয়। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আল্লাহ্‌র রাসূলকে বলতে শুনেছেন–

أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُؤْتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اٰخِرِهٖ فَاِنَّ قِرَاءَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَذٰلِكَ أَفْضَلُ .

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ ভয় করে যে, সে রাতের শেষভাগে জাগতে ব্যর্থ হবে, সে যেন রাতের প্রথম ভাগে বিতর সালাত আদায় করে তারপরে ঘুমাতে যায়। আর যে ব্যক্তি জেগে উঠার ব্যাপারে প্রত্যয়ী এবং রাতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে আশাবাদী সে যেন উহাকে শেষ রাতে আদায় করে। কেননা শেষ রাতের তিলাওয়াতের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা হয় এবং এটা সর্বোত্তম।' (সহীহ্ মুসলিম খ-১, পৃ-৩৬৪, নং-১৬৫১)

৩. অসিয়তনামার প্রস্তুতি

কেউই নিশ্চিত নয় যে সে ঘুম থেকে জাগ্রত হতে পারবে কি না। যখন কোন ব্যক্তি ঘুমায়, তখন তার আত্মা চলে যায় এবং এরপর আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত নেন কার আত্মা ফিরিয়ে দিবেন কার আত্মা ফিরাবেন না। ফলে, যদি আর্থিক দায় দায়িত্ব অথবা ঋণ থাকে যেগুলো রেকর্ড করা হয় নি। একটি অসিয়তনামা

লিখে রাখা উচিত অন্যের অধিকার সংরক্ষণের জন্য, যদি ঘুমের অবস্থায় কেউ মারা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন–

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ .

অর্থাৎ, 'কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে, তার অসিয়ত করার কিছু থাকা সত্ত্বেও দু'রাত তা না লিখে রাখবে।'

৪. কুরআনের ছায়া

নবী করীম ﷺ তাঁর অনুসারীদের ঘুমানোর পূর্বে আল-কুরআনের কতিপয় সূরা এবং আয়াত শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে আত্মিক হেফাজতের জন্য তিলাওয়াত করতে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। কুরআনের যে সকল আয়াতের ব্যাপারে বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য সীমিত করা নয়; বরং উৎসাহিত করা। যা হোক, কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যা তিলাওয়াত করা হয় বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটানো। না বুঝে অথবা প্রতিফলনবিহীন তিলাওয়াতের খুব কমই মূল্য আছে। আল্লাহ্ কত সুন্দরই না কাব্যিকভাবে বলেছেন–

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ

অর্থাৎ, 'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না?'

(সূরা–৪ আন নিসা : আয়াত-৮২)

عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدِ الْبَدْرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَاَهُمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ .

অর্থাৎ, আবূ মাসউদ আল-বদরী বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল বলেন : 'যে ব্যক্তিই রাতে সূরা আল বাকারার সর্বশেষ ২টি আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার হিফাযতের জন্য উহাই যথেষ্ট হবে।'

(সহীহ আল-বুখারী খ-৫, পৃ-২৩০, নং-৩৪৫।)

عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ (رضى) اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَقُوْلُهُ اِذَا اَوَيْتُ اِلٰى فِرَاشِىْ قَالَ : اِقْرَاْ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ فَاِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ .

অর্থাৎ, 'ফারওয়াহ ইবন নওফল রাসূল ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি বিছানায় যাওয়ার পূর্বে তিলাওয়াত করতে পারি। তিনি উত্তর দিলেন কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন (সূরা কাফিরূন) (আল-কুরআন- ১০৯ নং সূরা) তিলাওয়াত কর। (সুনানে আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১৪০৩, নং-৫০৩৭।) কেননা ইহা শিরক থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা।

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَنْ يَرْقُدَ وَقَالَ : اِنَّ فِيْهِنَّ اٰيَةً اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ اٰيَةٍ .

অর্থাৎ, ইরবাজ ইবন সারিয়া আল্লাহর রাসূল থেকে বলেন : রাসূল ﷺ ঘুমানের পূর্বে মুসাব্বিহাত তিলাওয়াত করতেন এবং বলতেন : সেগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াতের চেয়েও উত্তম।'

(সুনানে আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১৪০৪, নং ৫০৩১ সহীহ সুনানে তিরমিযী খ-৩, পৃ-১৪৫, নং-২৭১২ দ্বারা সত্যায়নকৃত।)

عَنْ اَبِىْ لُبَابَةَ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ (رضى) : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيَنَامُ عَلٰى فِرَاشِهٖ حَتّٰى يَقْرَاَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَالزُّمَرَ .

অর্থাৎ, 'আবূ লুবাবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ সূরা বনী ইসরাঈল ও আয্যুমার তিলাওয়াত করার পূর্বে ঘুমাতেন না।' (সহীহ সুনান আত্ তিরমিযী খ-৩ পৃ-১১, নং-২৩৩২)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَاَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اُحَدٌ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَاُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهٖ وَوَجْهِهٖ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

অর্থাৎ, 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, প্রত্যেক রাতে রাসূল ﷺ যখন বিছানায় যেতেন তিনি তার দু'হাতের তালু একত্র করতেন। অতঃপর তার মধ্যে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস তিলাওয়াত করতেন, অতঃপর ঐ দু'হাত দ্বারা তার দেহের যতদূর সম্ভব অংশ মাসেহ করতেন। তিনি মাথা ও চেহারা মাসেহ দ্বারা শুরু করতেন এবং দেহের সম্মুখভাগ মাসেহ করতেন। এভাবে তিনি তিনবার করে করতেন।' (সহীহ আল-বুখারী খ-৬, পৃ-৪৯৫, নং-৫৩৬)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَاَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهٗ وَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ وَلِىَ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ قَالَ اَمَا اِنَّهٗ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَعَرَفْتُ اَنَّهٗ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ اِنَّهٗ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهٗ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهٗ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعْنِىْ فَاِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ لَا اَعُوْدُ فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ قَالَ اَمَا اِنَّهٗ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهٗ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَهٰذَا اٰخِرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ قَالَ دَعْنِىْ اُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ (اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ) حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ فَاِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ اَنَّهٗ يُعَلِّمُنِىْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِى اللّٰهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ قَالَ مَا هِىَ قُلْتُ قَالَ لِىْ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ مِنْ اَوَّلِهَا حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةِ (اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ

الْقَيُّوْمُ) وَقَالَ لِيْ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ وَكَانُوْا اُحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَا اِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثَ لَيَالٍ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ .

অর্থাৎ, 'মুহাম্মাদ ইবন সীরীন আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমাকে রাসূল ﷺ রমযানের যাকাতের মাল হিফাজতের দায়িত্ব দিলেন। (বাধ্যতামূলক দান যা খাদ্যাকারে বার্ষিক মাহে রমযানের পরে দেয়া হয় এবং সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করা হয়।)

আমি এ দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় একজন আগমন করে খাদ্যের মধ্যে খোজাখুঁজি করল, আমি তাকে ধরে ফেললাম। আমি বললাম আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূলের নিকট পাকড়াও করে নিয়ে যাব। লোকটি নম্রভাবে বলল : আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার ওপর নির্ভরশীল পরিবার রয়েছে। আমি খুবই অভাবী।

সুতরাং আমি তাকে যেতে দিলাম। পরবর্তী ভোরে রাসূল ﷺ বললেন : হে আবু হুরাইরা! তোমার বন্দী গতরাতে কি করল? আমি বললাম : সে খুবই অভাবী বলে দাবি করল এবং তার ওপর নির্ভরশীল পরিবার রয়েছে বলেও জানাল, সুতরাং আমি তাকে যেতে দিলাম। নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন : নিশ্চয়ই সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে এবং সে পুনরায় আসবে। যেহেতু আমি জানি যে, সে প্রত্যাবর্তন করবে, আমি তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। যখন সে আসল এবং খাদ্যের মধ্যে হাত ঢুকালো, আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম : নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূলের নিকট নিয়ে যাব। সে উত্তর দিল। আমাকে ছেড়ে দিন! নিশ্চয়ই আমি গরীব এবং আমার একটি পরিবার রয়েছে। আমি আর আসবো না।

সুতরাং আমি তার প্রতি দয়াপরবশ হলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। পরবর্তী সকালে আল্লাহর রাসূল বললেন : হে আবু হুরায়রা তোমার বন্ধু গত রাতে

কি করল? আমি বললাম যে, সে বড়ই দরিদ্র এবং তার ওপর নির্ভরশীল পরিবারও রয়েছে। সুতরাং আমি তাকে যেতে দিলাম। নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন : নিশ্চয়ই সে মিথ্যা বলেছে এবং আবার ফিরে আসবে। সুতরাং পুনরায় আমি তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম এবং যখন সে খাদ্য এলোমেলো করছিল তখন তাকে পাকড়াও করলাম। আমি বললাম : আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূলের নিকট নিয়ে যাব। এটা হলো, তৃতীয়বার এবং তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে তুমি আর আসবে না। এরপরও তুমি আবার এসেছ। সে বলল : তুমি আমাকে তোমাকে কিছু শিখিয়ে দেবার সুযোগ দাও যার দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে উপকার দিবেন। আমি বললাম : সেগুলো কি? সে উত্তর দিল, যখনই আপনি বিছানায় যাবেন আয়াতুল কুরসীর ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করবেন।

(সূরা–২ বাক্বারা : আয়াত-২২৫)

যদি আপনি এরূপ করেন তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক আপনার সঙ্গে থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান আপনার নিকট আসতে পারবে না। অতপর আমি তাকে যেতে দিলাম। পরবর্তী সকালে আল্লাহর রাসূল বললেন : গতরাতে তোমার বন্দী কি করল? আমি বললাম যে, সে দাবি করল যে, সে আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিবে যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন, সুতরাং আমি তাকে যেতে দিলাম। যখন রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন সেগুলো কি? আমি তাঁকে বললাম সেগুলো হলো ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করা।

আমি তাঁকে আরো বললাম : সে আরো বলেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক আমার সঙ্গে থাকবে এবং সকালে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত শয়তান আমার নিকট আসবে না। নবী করীম ﷺ বলেন : নিশ্চয়ই সে সত্যই বলেছে, যদিও সে সর্বদা মিথ্যার আশ্রয়ী। হে আবু হুরাইরা তুমি কি জান বিগত তিনদিন যাবত তুমি কার সঙ্গে কথা বলেছ? আমি উত্তর দিলাম 'না'। তিনি বললেন : সেটা ছিল একটা শয়তান জিন।"

(সহীহ আল-বুখারী খ-৬, পৃ-৪৯১, নং-৫৩০।)

৫. অজু করা

নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, ঘুমানোর পূর্বে অজু করা উচিত। অজুর উদ্দেশ্য হলো মু'মিনদেরকে ইবাদতের পূর্বে মনকে আত্মার আকারে আনা। ঘুমে যাওয়ার দ্বারা একজন একনিষ্ঠ অবস্থায় জাগ্রত পৃথিবী ছেড়ে আত্মার দিক দিয়ে খাঁটি হবে।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضى) قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّاْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الاَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَ مَلْجَاَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ـ فَاِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَاَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهٖ ـ قَالَ : فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ : اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ ـ قُلْتُ وَرَسُوْلِكَ قَالَ : لاَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ـ

অর্থাৎ, 'বারা ইবন আযিব বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : যখনই তুমি বিছানায় যাবে, তখন তুমি সালাতের অজুর মত অজু কর, তোমার ডান দিকে শয়ন কর এবং বল : "আল্লাহুম্মা আসলামতু অজহী ইলাইকা ওয়া ফাওয়াদ্‌তু আমরী ইলাইকা, ওয়া আলজাতু জাহরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা।' হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম, আমার সকল বিষয় তোমার নিকট সোপর্দ করলাম এবং তোমার ওপর নির্ভর করলাম, তোমার রহমতের জন্য আশাবাদী ও ভীতু হয়ে (তোমার ওপর নির্ভর করলাম)।

লা মালজায়া, ওয়ালা মানজায়া মিনকা ইল্লা ইলাইকা (তোমার নিকট থেকে পালাবার কোন সুযোগ নেই, তুমি ছাড়া কেউ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা দিতে

পারে না।) আল্লাহুম্মা আমানতু বিকিতাবিকাল্লাজি আনযালতা ওয়া বিনাবীয়্যিকাল্লাজী আরসালতা (হে আল্লাহ্! আমি তোমার সে কিতাবের ওপর ঈমান এনেছি যা তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার সে নবীর ওপর ঈমান এনেছি যাকে তুমি প্রেরণ করেছ।) এরপর যদি তুমি সে রাতেই মারা যাও তাহলে তুমি ঈমানের সাথে মারা যাবে। সুতরাং এগুলোকে তুমি তোমার শেষ বাক্য বানাও (ঘুম বা মৃত্যুর পূর্বে)।

(আল বারাআ বলতে থাকেন) আমি এ দু'আটি রাসূল ﷺ-এর নিকট পুনরায় ব্যক্ত করলাম। যখন আমি : আল্লাহুম্মা আমানতু বিকিতাবিল্লাজী আনযালতা (হে আল্লাহ! আমি সে কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি যা তুমি নাযিল করেছ) অতঃপর আমি বললাম : ওয়া রাসূলিকা (এবং আপনার রাসূল-এর প্রতি)" নবী ﷺ বলেন : না (বরং) ওয়া নাবীয়্যিকাল্লাজী আরসালতা (তোমার নবী যাকে তুমি প্রেরণ করেছ।) (নবী করীম ﷺ একই সঙ্গে নবী ও রাসূল ছিলেন। তিনি আল-বারা এর মূল বাক্যকে সংশোধন করার মূল কারণ হলো শিক্ষা যা দেয়া হয়েছে তার অনুসরণই আমল তাই শিক্ষা দেয়া। (সহীহ্ আল-বুখারী খ-১, পৃ-১৫৫, নং-২৪৭।)

৬. বিছানা ঝাড়ু দেয়া

বিছানায় যাওয়ার পূর্বে, রাসূল ﷺ বলেন, একে পোকা-মাকড় মুক্ত করার জন্য ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে। কেননা কারো অজ্ঞাতে পোকা বা অন্য কোন ক্ষতিকর প্রাণী বিছানায় উঠে থাকতে পারে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَوٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهٗ بِدَاخِلَةِ اِزَارِهٖ فَاِنَّهٗ لاَ يَدْرِىْ مَا خَلَفَهٗ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ : بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ .

অর্থাৎ, 'আবু হুরায়রা (রা) উল্লেখ করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যখন তোমাদের কেউ বিছানায় যায়, সে যেন তার বিছানা ঝেড়ে নেয়, তার

বিছানার নিচের দিকসহ, কেননা সে জানে না তার অনুপস্থিতিতে তার নিচে কি প্রবেশ করেছে। এরপর তার বলা উচিত, বিইসমিকা রাব্বী ওয়াদাতু জানবী ওয়া বিকা আরফাউহু (হে আমার প্রভু! আমি আমার পার্শ্বকে তোমার নামে রাখছি এবং তোমার নামে উত্তোলন করবো।) ইন আসমাকতা নাফসী ফারহামহা ওয়া ইন আরসালতাহা ফাহফাজহা বিমা তাহফাযু বিহি ইবাদাকাস সালিহীন। (যদি তুমি আমার আত্মাকে গ্রহণ কর, তাহলে এর ওপর তোমার দয়া কর, এবং যদি তুমি তাকে ছেড়ে দাও, তাহলে তাকে সেভাবেই হিফাজত কর যেভাবে তোমার প্রিয় বান্দাদের হিফাজত কর।)'

(সহীহ আল-বুখারী খ-৮, পৃ-২২৪, নং-৩৩২।)

৭. শরীর মুছে ফেলা

আল-কুরআনের নির্দিষ্ট কিছু সূরা তিলাওয়াত করার পর, যেগুলোকে শয়তানের বিরুদ্ধে রূপদান করা হয়েছে, নবী করীম ﷺ নির্দেশনা দিয়েছেন যে, সেগুলোকে হাতের তালুতে ফুঁকে দিতে হবে এবং সারা শরীর মুছতে হবে। এগুলো শয়তানী আধ্যাত্মিক শক্তির বিরুদ্ধে, যারা তাদের আধ্যাত্মিক আক্রমণ গিরার মধ্যে ফুঁক দেয়ার মাধ্যমে করে থাকে।

(সূরা–১১৩ আল ফালাক : আয়াত-৪)

'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, প্রত্যেক রাতে রাসূল ﷺ যখন বিছানায় যেতেন তিনি তার দু'হাতের তালু একত্র করতেন। অতঃপর তার মধ্যে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস তিলাওয়াত করতেন, অতঃপর ঐ দু'হাত দ্বারা তার দেহের যতদূর সম্ভব অংশ মাসেহ করতেন। তিনি মাথা ও চেহারা মাসেহ দ্বারা শুরু করতেন এবং দেহের সম্মুখভাগ মাসেহ করতেন। এভাবে তিনি তিনবার করে করতেন।'

৮. ডান কাতে শয়ন করা

নবী করীম ﷺ শোয়ার সময় তাঁর অনুসারীদের ডান কাতে শয়ন করার জন্য উৎসাহিত করেছেন–

عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ صَالِحٍ يَاْمُرُنَا اِذَا اَحَدُنَا اَنْ يَنَامَ اَنْ يَضْطَجِعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ

وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ . وَكَانَ يَرْوِيْ ذٰلِكَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

অর্থাৎ, 'সুহাইল (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু সালিহ তাদেরকে প্রায়ই শিখাতেন, যখন আমাদের কেউ ঘুমাতে যেতে চাইতেন, যেন তারা তাদের ডান পাশে শয়ন করে এবং বলে : আল্লাহুম্মা রাব্বিস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বিল আরদ্ ওয়া রাব্বিল আরশিল আজীম। রাব্বানা ওয়া রাব্বি কুল্লি শাইয়িন। ফালিকাল হাব্বি ওয়ান নাওয়া ওয়া মুনযিলাত্ তাওরাতি ওয়াল ইনযিলী ওয়াল ফুরকান। (হে আল্লাহ! আকাশ পৃথিবী এবং মহান আরশের মালিক, আমাদের এবং সকল কিছুর মালিক, শস্যদানা এবং খেজুর দানার অঙ্কুরোদগমকারী, তাওরাত, ইনজীল এবং আল-কুরআনের অবতরণকারী) আউজু বিকা-মিন শাররি কুল্লি শাইয়িন আনতা আখিজুন বিনাসিয়াতিহী।

(আমি সকল ধরনের অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই, আপনিই সেগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী) আল্লাহুম্মা আনতাল আওয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইউন ওয়া আনতাল আখিরু ফালাইমা বাদাকা শাইউন (হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম আপনার পূর্বে আর কেউ নেই, আপনিই শেষ আপনার পরে আর কেউ নেই।) ওয়া আনতাজ জাহিরু ফালাইসা ফাওকাকা শাইউন, ওয়া আনতাল বাতিনু ফালাইসা দুনাকা শাইউন (আপনি প্রকাশ্য আপনার ওপরে আর কেউ নেই, আপনিই বাতিন (বিষয়ে জ্ঞানী) এবং তা জানা থেকে আপনাকে কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারে না।) ইকদি আন্নাদ্ দাইনা ওয়াগ্নিনা মিনাল ফাক্‌রি)। (আমাদেরকে ঋণের ভারমুক্ত কর এবং আমাদেরকে

অভাবমুক্ত কর।) আবু সালিহ (র) আবু হুরাইরা (রা) থেকে এ দু'আ মাঝে মাঝে পড়তেন যিনি রাসূল ﷺ থেকে এটা বর্ণনা করেছেন।'

(সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১৪২২-২৩, নং-৬৫৫১।)

দু'পা আড়াআড়ি করে পিঠের ওপর শয়ন করা

عَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰى ظَهْرِهٖ .

অর্থাৎ, 'জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদেরকে এক সেণ্ডেল পায়ে হাঁটতে নিষেধ করেছেন, (রাসূল ﷺ তাঁর অনুসারীদের এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি একটি সেণ্ডেল ভেঙ্গে যায় অথবা একটি পাদুকা হারিয়ে যায় তা হলে কাউকে এক সেণ্ডেল পায়ে হাঁটা উচিত হবে না। রাসূল ﷺ-এর এ উপদেশের মানব কল্যাণ এখনো স্পষ্ট না হলেও এটা নিরর্থক কোন শিক্ষা নয়। কোন সময় ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এক সেণ্ডেলে হাঁটার ক্ষতিকর দিক অবশ্যই আবিষ্কার করতে পারবে যেমন সে পাকস্থালির ওপর চাপ দিয়ে ঘুমানোর ক্ষতিকর দিক আবিষ্কার করেছে। যা হোক, হুযুর ﷺ যদি কোন বিষয়ের বিপরীতে সাবধান করে দেন তাহলে সত্যিকার মু'মিন তার ক্ষতিকর দিক আবিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না বরং নির্দেশনা পাওয়ার সাথে সাথেই তার ওপর আমল করতে শুরু করবে।) এক কাপড়ের নিচে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন, তাদের পিঠের ওপর ঘুমানোর সময় এক পায়ের ওপর অন্য পা রেখে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম খ-৩, পৃ-১১৫৫, নং-৫২৩৭)

পাকস্থলীর ওপর ভর দিয়ে ঘুমান

নবী করীম ﷺ তার অনুসারীদের পেটের ওপর ভর দিয়ে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। মেরুদণ্ডের সমস্যা এবং তার কারণের ওপর বাড়তি গবেষণার মাধ্যমে চিকিৎসা পেশার বিশেষজ্ঞগণ নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করেন : অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঘুম ভঙ্গি নিশ্চিতরূপেই পিঠ ব্যথাকে আহ্বান জানানো। শক্ত বিছানা ব্যবহার করুন। হাঁটু ভেঙ্গে এক পাশের ওপর শয়ন করুন! পেটের

ওপর ভর দিয়ে ঘুমান ত্যাগ করুন, যে অবস্থায় মেরুদণ্ডের বাকা বৃদ্ধি পায়, পিঠের ওপর চাপ সৃষ্টিকারী পরিচিত স্যাগিং রোগের কারণ। (Jame Magagine (Grropean Edition, July 14.1980) P-34 third paragraph)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : رَاَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مُضْطَجِعًا عَلٰى بَطْنِهٖ فَقَالَ : اِنَّ هٰذِهٖ ضَجْعَةٌ لاَ يُحِبُّهَا اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, 'আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, যখন আল্লাহর রাসূল এক ব্যক্তিকে পেটের ওপর ভর দিয়ে শোয়া দেখে বললেন : এ হলো ঐ ধরনের শোয়া যা আল্লাহ্ অপছন্দ করেন।'

(সংগ্রহে আত-তিরমিযী, সত্যায়নে সহীহ সুনান আত্-তিরমিযী খ-২, পৃ-৩৫৯, নং-২২২১ দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ খ-২, পৃ-৯৮৭।)

৯. মাথার নিচে ডান হাত রেখে শোয়া

নবী করীম ﷺ মাঝে মাঝে তাঁর ডান বাহু ভাঁজ করে তাঁর মাথার নীচে বালিশের মত রাখতেন–

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَسَّدُ يَمِيْنَهٗ عِنْدَ الْمَنَامِ ثُمَّ يَقُوْلُ : رَبِّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ

অর্থাৎ, 'বারা ইবন আযিব (রা) বলেন যে, যখনই আল্লাহর রাসূল ঘুমাতে চাইতেন, তিনি তার ডান হাত তার চিবুকের নিচে রাখতেন এবং তিনবার বলতেন : رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ 'রাব্বি কিনী আজাবাকা ইয়াওমা তাব'আছু ইবাদাকা। (হে আল্লাহ তোমার শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা কর, সেই দিন যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থান ঘটাও।) (সংগ্রহে আত্-তিরমিযী এবং আবু দাউদ হাফসা (রা.) থেকে, সত্যায়নে সহীহ সুনানে তিরমিযী খ-৩, পৃ-১৪৩, নং-২৭০৫।)

১০. দু'আ-মুনাজাতের মাধ্যমে সংরক্ষণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ اَمَرَ رَجُلاً اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِىْ وَاَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَافِيَةَ - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ - اَسَمِعْتَ هٰذَا مِنْ عُمَرَ فَقَالَ : مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

'আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা) এক ব্যক্তিকে শিক্ষা দিলেন যে, যখন সে বিছানায় যায় তার বলা উচিত اَللّٰهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِىْ وَاَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفِظْهَا وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْلَنَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَافِيَةَ . 'আল্লাহুম্মা খালাক্‌তা নাফসী ওয়া আনতা তাওয়াফফাহা, লাকা মামাতুহা ওয়া মাহ্‌ইয়াহা ইন আহইয়াইতাহা ফাহফিজহা অ ইন আমাত্তাহা ফাগ্‌ফিরলাহা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়াহ। (হে আল্লাহ! তুমি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছ এবং একে মৃত্যু দান তুমিই করবে। এর জীবন-মৃত্যু তোমারই হাতে।

যদি তুমি একে জীবন দান কর, তাহলে একে রক্ষা কর এবং যদি তুমি একে মৃত্যু দান কর তাহলে একে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নিরাপত্তা চাই।) এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ইহা ওমর (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'তাঁর থেকেও উত্তম ব্যক্তির নিকট থেকে, আল্লাহর রাসূলের নিকট থেকে।'

(সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১৪২২, নং-৬৫৫০)

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاَوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِىَ لَهٗ وَلاَ مُؤْوِىَ -

'আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, যখনই আল্লাহর রাসূল বিছানায় যেতেন তিনি বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِىَ لَهٗ وَلاَ مُؤْوِىَ .

অর্থাৎ, আল-হামদু লিল্লাহিল্লাজি আত্'আমানা ওয়া সাকানা, ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা, ফাকাম মিম্মান লা কাফিয়া লাহু ওয়ালা মু'বী। (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাদ্য খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন, আমাদেরকে যথেষ্ট দিয়েছেন এবং আশ্রয় দান করেছেন, অনেক লোক এমনও রয়েছেন যাদের যথেষ্ট (রুজি) নেই এবং আশ্রয়ও নেই।"

(সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১৪২২–২৩, নং-৬৫৫১)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِىْ بِشَىْءٍ اَقُوْلُهُ اِذَا اَصْبَحْتُ وَاِذَا اَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ : اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ قَالَ قُلْهُ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ وَاِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ .

অর্থাৎ, 'আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, আবু বকর (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু বলে দিন যা আমি সকাল এবং সন্ধ্যায় পড়তে পারি। তিনি ﷺ বলেন, বলুন–

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ .

অর্থাৎ, "আল্লাহুম্মা আলিমিল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাতি ফাতিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, রব্বি কুল্লা শাইয়িন ওয়া মালীকাহু আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আউজু বিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররিশ্ শাইত্বানি ওয়া শিরকিহি।

(হে আল্লাহ! দৃশ্য ও অদৃশ্যমানের জ্ঞানী, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, সকল কিছুর প্রভু ও মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই, আমি আমার কুপ্রবৃত্তির মন্ত্রণা ও শয়তানের অনিষ্ট এবং তার শিরক থেকে মুক্তি চাই।' তিনি ﷺ তাকে এ দু'আ সকাল-বিকাল এবং ঘুমাতে যাওয়ার সময় পড়তে বলেন।' (সংগ্রহে আবু দাউদ এবং তিরমিযী, সত্যায়নে সহীহ সুনানে তিরমিযী খ-ত, পৃ-১৪২, নং-২৭০১।)

عَنْ عَلِيٍّ (رضـى) اَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُ فَبَلَغَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِسَبْىٍ فَاَتَتْهُ تَسْاَلُهٗ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقْهُ فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ لَهٗ فَاَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ فَقَالَ : عَلٰى مَكَانِكُمَا، حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِىْ فَقَالَ : اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَاَلْتُمَاهُ اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللّٰهَ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَاَلْتُمَاهُ .

অর্থাৎ, 'আলী (রা) বলেন, 'ফাতিমা (রা) যাতা এবং পেষণ ব্যবহারের দ্বারা তিনি কি ধরনের যাতনা ভোগ করতেন তা অভিযোগ করেন। যখন তিনি খবর পেলেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট কিছু যুদ্ধবন্দীকে আনা হয়েছে, তিনি [ফাতিমা (রা)] ﷺ-এর নিকট গেলেন একজন ক্রীতদাসী চাওয়ার জন্য। তিনি রাসূল ﷺ-কে পেলেন না, তাই তিনি আয়েশা

(রা)-কে ঐ কথা বলে আসলেন। যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ ফিরে আসলেন, আয়েশা (রা) তাঁকে অবগত করালে তিনি আমাদের নিকট চলে আসলেন। যখন আমরা বিছানার মধ্যে চলে গিয়েছিলাম রাসূল ﷺ-কে দেখে আমরা প্রায় উঠেই গিয়েছিলাম) কিন্তু তিনি বলেন, 'তোমরা যেখানে আছ সেখানে থাক, (তিনি আমাদের কাছে উঠে এসে পা ছড়িয়ে দিলেন) এবং আমি নবী করীম ﷺ-এর পায়ের ঠাণ্ডা আমার বুকের সাথে অনুভব করতে পারলাম। অতঃপর তিনি বলেন তোমরা যা চেয়েছ আমি কি তোমাদের তার চেয়েও ভাল জিনিসের সন্ধান দেব না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে তখন : আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) ৩৪ বার, আলহামদু লিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর) ৩৩ বার, সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র) ৩৩ বার পড়বে। তোমরা যার অনুরোধ করেছ তার চেয়ে এটা উত্তম।'

(সহীহ আল-বুখারী খ-৪, পৃ-২২১-২২২, নং-৩৪৪।)

১২. সাধারণ দু'আ

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

অর্থাৎ, হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তিনি তার হাত চিবুকের নিচে রাখতেন, অতপর পড়তেন اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا 'আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া (হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নামে জীবিত হই) এবং যখন তিনি জাগ্রত হতেন তখন তিনি বলতেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ . 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর। (সকল প্রশংসা সে

আল্লাহর যিনি আমাদের মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং (এভাবেই) তার নিকট আমাদের পুনরায় (মৃত্যুর পর) জীবিত হয়ে ফিরে যেতে হবে।'

(সহীহ আল-বুখারী খ-৮, পৃ-২১৪, নং-৩২৬)

عَنْ اَبِى الْاَزْهَرِ الْاَنْمَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهٗ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاَخْسِئْ شَيْطَانِىْ وَفُكَّ رِهَانِىْ وَاجْعَلْنِىْ فِى النَّدِيِّ الْاَعْلٰى .

অর্থাৎ, 'আবুল আজহার আল-আনমারী থেকে বর্ণিত যে, রাতে যখন আল্লাহর রাসূল বিছানায় যেতেন তিনি বলতেন–

بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاَخْسِئْ شَيْطَانِىْ وَفُكَّ رِهَانِىْ وَاجْعَلْنِىْ فِى النَّدِيِّ الْاَعْلٰى .

বিসমিল্লাহি ওদা'তু জানবী, আল্লাহুম্মাগফিরলী জানবী ওয়া আখসী শায়তানী ওয়া ফুক্কা রিহানী ওয়াজ'আলনী ফিন নাদিয়্যিল আ'লা। (আল্লাহর নামে আমি আমার পার্শ্বকে বিছানায় রাখছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ কর, আমার থেকে শয়তানকে দূরে সরিয়ে দাও, আমার দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্ত কর, আমাকে সর্বোচ্চ পরিষদের অন্তর্ভুক্ত কর।'[১৪৫]

১৩. রাত্রি ভয়ে জাগরণ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلٰى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْاَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ .

অর্থাৎ, 'মু'আয ইবনে জাবাল নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে মুসলমান পবিত্র অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাতে যায়,

রাতের কোন অংশে ভয়ে জাগরিত হয় এবং সে দুনিয়া আখিরাতের কোন কল্যাণ কামনা করে তাকে নিশ্চিতভাবেই তা দেয়া হয়।'
(সুনান আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১৪০১, নং-৫০২৪ সত্যায়নে সহীহ সুনানে আবী দাউদ খ-৩, পৃ-৯৫১, নং-৪২১৬।)

১৪. তাহাজ্জুদের জন্য জাগরণ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اسْتَيْقَظَ اُرَاهُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهٖ فَتَوَضَّاَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثًا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهٖ .

অর্থাৎ, 'আবু হুরায়রা (রা) থেকে তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : আমাকে দেখানো হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যেকার কেউ যদি ঘুম থেকে জেগে উঠে অজু করে, তার উচিত তার নাকের মধ্যে তিনবার পানি দ্বারা ধৌত করা, কেননা শয়তান তার নাকের উপরি অংশে রাত্রি যাপন করেছে।'
(সহীহ আল-বুখারী খ-৪, পৃ-৩২৮–৩২৯, নং-৫১৬।)

১৫. ঘুমের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضى) قَالَ: ذَكَرُوْا تَفْرِيْطَهُمْ فِى النَّوْمِ فَقَالَ : نَامُوْا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ، فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ صَلاَةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ .

অর্থাৎ, 'আবু কাতাদাহ বর্ণনা করেন যে, লোকেরা তাদের অতিরিক্ত ঘুমের ব্যাপারে কথা বলছিল এবং তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে (তার অবস্থা কি) যে বেলা উঠা পর্যন্ত ঘুমায়? আল্লাহর রাসূল উত্তর দিলেন– ঘুমানোর ব্যাপারে কোন অলসতা নেই বরং অলসতা হলো জাগরিত হওয়ার ব্যাপারে। (যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে, সে ঘুমন্ত অবস্থায় ধর্মীয় কোন দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তাকে দায়ী করা হবে না। জাগ্রত

অবস্থায় কাজের অবহেলা করা হলে অবশ্যই দায়ী করা হবে। আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিন জনের ওপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়। ঘুমন্ত ব্যক্তির জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত। (সুনানে আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১২২৬, নং ৪৩৮৪ সত্যায়নে সহীহ সুনানে তিরমিযী খ-২, পৃ-৬৪, নং-১১৫০) তিনি আরো বলেন, ভুলের অপরাধ ভুলে যাওয়া এবং জোর করে করানো অপরাধ আমার উম্মত থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। (ধরা হবে না) সংগ্রহে তাবরানী সত্যায়নে সহীহ্ আল জামি' আস সগীর খ-১, পৃ-৬৫৯, নং-৩৫১৫)

সুতরাং তোমাদের মধ্যেকার কেউ যদি সালাত আদায় করতে ভুলে যায় অথবা সালাত আদায় না করেই শুয়ে যায়, সে যেন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই তার সালাত আদায় করে নেয় অথবা পরের দিন ঐ সালাতের সময়ে আদায় করে নেয়।' (সুনানে ইবনে মাজাহ খ-১, পৃ-৩৭৭ নং-৬৯৮ সত্যায়নে সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ খ-১, পৃ-১১৬, নং-৫৭২)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ .

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বর্ণনা করেন : তোমরা যখন বিছানায় যাও তখন শয়তান তোমাদের মাথার পেছনে তিনটা গিরা দেয়, এরপর সে প্রত্যেক গিরায় ফুঁ দেয়; রাত যদিও দীর্ঘ তবুও তুমি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দাও। যখন কেউ উঠে আল্লাহর নাম নেয় তখনই তার প্রথম গিরা অকার্যকর হয়ে যায়। যখন অজু করে তখন তার দ্বিতীয় গিরা অকার্যকর হয়ে যায় এবং যখন সে ফরয সালাত আদায় করে তখন তার তৃতীয় গিরা অকার্যকর হয়ে যায়। তখন কোন ব্যক্তি নতুন উদ্যমে এবং ভাল চেতনায় উজ্জীবিত হয়।' (সহীহ আল-বুখারী খ-২, পৃ-১৩৪–১৩৫, নং-২৪৩)

আঠারোতম অধ্যায়

বিধানগত স্বপ্নাবলী

নিম্নে নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণের ঐ সকল স্বপ্নাবলীর সংগ্রহ করা হয়েছে যেগুলো ইসলামী শরী'আতের সংবিধানের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এ সকল ব্যাখ্যাকৃত স্বপ্ন ইসলামী বিধান প্রণয়নের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী যুগের স্বপ্নের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করা যাবে না। তাঁদের ঐ সকল স্বপ্ন যেগুলো রাসূল ﷺ-এর সময়ে দ্বীনী বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল সেগুলো ইসলামী আইনের অংশ হিসেবে রাসূল ﷺ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যেখানে ঐ সকল স্বপ্ন যেগুলো ভবিষ্যত ঘটনাবলী (যেমন জান্নাত-জাহান্নাম অথবা তার অধিবাসী) সংক্রান্ত ছিল এগুলো রাসূল ﷺ বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ফলে, এ সংগ্রহ হল শুধু পাঠকদের ঐ সম্পর্কে ধারণা দান করা যার মাধ্যমে নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাথীগণের স্বপ্ন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারেন এবং এ সঙ্গে স্বপ্নের মাধ্যমে যে সকল বিধান এসেছে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

আযান

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رضى) قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهٖ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلاَةِ طَافَ
بِىْ وَاَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِىْ يَدِهٖ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ
اللّٰهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ فَقُلْتُ نَدْعُوْ بِهٖ
اِلَى الصَّلاَةِ قَالَ اَفَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ
لَهٗ بَلٰى قَالَ فَقَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ

اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّىْ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ قَالَ وَتَقُوْلُ اِذَا اَقَمْتَ الصَّلاَةَ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ . فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا رَاَيْتُ فَقَالَ : اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَاَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهٖ فَاِنَّهٗ اَنْدٰى صَوْتًا مِنْكَ . فَقُمْتُ مَعَ بِلاَلٍ فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهٖ قَالَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهٖ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهٗ وَيَقُوْلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ مَا رَاٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ .

অর্থাৎ, 'আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন ঘণ্টা জোগাড় করার নির্দেশ দিলেন যাতে উহা বাজিয়ে লোকদেরকে সালাতের জন্য ডাকা হবে। স্বপ্নে এক ব্যক্তি একটি ঘণ্টা হাতে আমার সামনে হাজির হলেন এবং আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর বান্দা আপনি কি উহা বিক্রি করবেন? লোকটি জিজ্ঞেস করলেন আপনি এর দ্বারা

কি করবেন? আমি উত্তর দিলাম : আমরা লোকদেরকে সালাতের জন্য ডাকার উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহার করবো। তিনি বললেন : আমি কি এমন একটা প্রস্তাব দিব যা এর চেয়েও ভাল? আমি বললাম : 'অবশ্যই' তখন তিনি বলে যেতে লাগলেন :

আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে ইবাদতের উপযুক্ত আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই।) – ২ বার

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

হাইয়া আলাস সালাহ (সালাতের জন্য এসো)

হাইয়া আলাস সালাহ (সালাতের জন্য এসো)

হাইয়া আলাল ফালাহ (কল্যাণের জন্য এসো)

হাইয়া আলাল ফালাহ (কল্যাণের জন্য এসো)

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই।) এরপর তিনি কয়েক পা পিছনে গেলেন এবং বললেন : যখন আপনারা সালাতের জন্য দাঁড়াবেন (ইকামাত) তখন বলবেন :

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার,

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ

হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ,

ক্বাদকা মাতিস সালাহ, (সালাত শুরু হলো)

ক্বাদকা মাতিস সালাহ। (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

সকাল হওয়ার সাথে সাথে আমি আল্লাহর রাসূলের নিকট গেলাম এবং আমি যা স্বপ্নে দেখেছিলাম তা তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন : আল্লাহ

চাহে ত এটা সত্য স্বপ্ন। সুতরাং তুমি বেলালের সঙ্গে যাও এবং তুমি যা দেখেছ তা তাকে শিখাও। এরপর সে তা মানুষকে সালাতের জন্য আহ্বান জানাতে ব্যবহার করবে। কেননা তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে উঁচু এবং মিষ্ট। সুতরাং আমি বেলাল (রা)-এর নিকট গেলাম এবং আমি যা শিখেছি তা তাকে শিখিয়ে দিলাম এবং তিনি তা সালাতে আহ্বানের জন্য ব্যবহার করলেন। ওমর (রা) তার ঘরে থেকে এগুলো শুনলেন এবং চাদর টানতে টানতে তিনি আল্লাহর রাসূলের নিকট এসে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাকে যেরূপ দেখানো হয়েছে আমাকেও এরূপ দেখানো হয়েছে। আল্লাহর রাসূল বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। (সুনানে আবু দাউদ খ-১, পৃ-১২৭-১২৮, নং-৪৯৯ সত্যায়নে সহীহ সুনানে আবু দাউদ খ-১, পৃ-৯৮-৯৯, নং-৬৪৯)

আল্লাহ যা চান

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ اَتَى رَجُلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ لَقِيْتُ بَعْضَ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ اَنْتُمْ لَوْلاَ اَنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : قَدْ كُنْتُ اَكْرَهُهَا مِنْكُمْ فَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ .

অর্থাৎ, 'হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলেন, অতঃপর বললেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি কিছু ইহুদী খৃষ্টানদের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম, তারা বললেন : তোমরা ভাল লোক তবে তোমরা বল যে, আল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ চাইলে। নবী করীম ﷺ বললেন একথা তোমার নিকট শুনে আমি ইহা অপছন্দ করলাম, অতএব তোমরা বল : আল্লাহ চাহেন তো, অতপর মুহাম্মদ ﷺ চাহেন তো। (দু' বাক্যের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমে বাক্যে বুঝা যায় যে, আল্লাহ এবং

রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা সমান এবং দ্বিতীয় বাক্যে মুহাম্মদ ﷺ-এর ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল বুঝায়। (মুসনাদে আহমদ, বর্ণনার শেষাংশ ও সুনানে আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১৩৮৬, নং-৪৯৬২ তে পাওয়া যায়। সত্যায়নে সহীহ সুনানে আবী দাউদ খ-৩, পৃ-৯৪০, নং-৪১৬৬)

কালো মহিলা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِىْ رُؤْيَا (رضى) النَّبِىِّ ﷺ فِى الْمَدِيْنَةِ : رَاَيْتُ امْرَاَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةِ فَتَاَوَّلْتُهَا اَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ اِلٰى مَهْيَعَةَ وَهِىَ الْجُحْفَةُ .

অর্থাৎ, 'আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেন, (স্বপ্নে) আমি দেখলাম একজন কালো রং-এর চুল আলগা মহিলা মদীনা থেকে বের হয়ে মাহীয়াহতে অবস্থান নিল। আমি ব্যাখ্যা করলাম যে, মদীনার মহামারী মদীনা থেকে বের হয়ে মাহীয়াহ যার নাম জুহফাতে অবস্থান নিয়েছে।' (আল জুহফা ছিল নির্ধারিত 'মীকাত' তাদের জন্য যারা ইহরাম বাঁধে। জুহফা হলো একটি পরিত্যক্ত গ্রাম যা মক্কার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত, মক্কা-মদীনার রাস্তায় বারিগ শহরের নিকটে।

(সহীহ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-১৩২, নং-১৬২)

আল মুহাল্লাব (আল-মুহাল্লাব ইবন আবী সাফরাজ আহমাদ (মৃত্যু-১০৩৪. একজন আন্দালুসীয় (স্পেনীশ) পণ্ডিত, তিনি মালিকী মাযহাবের লোক এবং ভাল হাদীসবেত্তাও। তিনি ইবন আবী সাফরাহ নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর লিখিত পুস্তকের মধ্যে সহীহ আল-বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং সংক্ষিপ্ত শিরোনাম আন নাসীফ ফী ইখতিসারুস সহীহ (মুজামুল মুয়াল্লিফীন, খ-১৩ পৃ-৩১) বর্ণনা করেন যে, এ বর্ণনা হলো ঐ সকল ব্যাখ্যায়িত স্বপ্নের অন্তর্গত যেগুলো হলো নীতিগর্ভ রূপক কাহিনীর অন্তর্গত। কালো মহিলা এবং মহামারীর মধ্যেকার সম্পর্ক سَوْدَاءُ কালো سُوْءٌ সূ (খারাপ) এবং دَاءٌ দা (অসুস্থতা) ইত্যাদি শব্দ থেকে বের হয়েছে। তার ছেড়ে দেয়া আলগা চুল খারাপ জিনিসের প্রসারণ এর ইঙ্গিত দেয়। (ফতহুল বারী, খ-১২, পৃ-৪৪৪)

উড়ন্ত চুড়ি

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَدِمَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِيْنَةِ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اِنْ جَعَلَ لِىْ مُحَمَّدٌ الْاَمْرَ مِنْ بَعْدِهٖ تَبِعْتُهٗ فَقَدِمَهَا فِىْ بَشَرٍ كَثِيْرٍ مِنْ قَوْمِهٖ فَاَقْبَلَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ وَمَعَهٗ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِىْ يَدِ النَّبِيِّ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيْدَةٍ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مُسَيْلَمَةَ فِىْ اَصْحَابِهٖ قَالَ : لَوْ سَاَلْتَنِىْ هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا اَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ اَتَعَدّٰى اَمْرَ اللّٰهِ فِيْكَ وَلَئِنْ اَدْبَرْتَ لَيَعْفِرَنَّكَ اللّٰهُ وَاِنِّىْ لَاُرَاكَ اُرِيْتُ فِيْكَ مَا اُرِيْتُ وَهٰذَا ثَابِتٌ يُجِيْبُكَ عَنِّىْ) ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَاَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : اِنَّكَ اَرَى الَّذِىْ اُرِيْتُ فِيْكَ مَا اُرِيْتُ ـ فَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ فِىْ يَدَىَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَاَهَمَّنِىْ شَاْنُهُمَا فَاُوْحِىَ اِلَىَّ فِى الْمَنَامِ اَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَاَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِىْ فَكَانَ اَحَدُهُمَا الْعَنْسِىُّ صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَالْاٰخَرُ مُسَيْلَمَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ .

অর্থাৎ, আবদুল্লাহ 'ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুসাইলামা কাজ্জাব (তার নাম ছিল মাসলামাহ, মুসাইলামাহ হলো তার ছোট আকার (তাসগীর)। ইয়ামামাহভিত্তিক হানীফা গোত্রের অন্তর্গত। নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের পর সে নুবুওয়তীর দাবী করে। পরবর্তীতে আরেক

মহিলা নুবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার সাজাহকে বিয়ে করে শক্তিযুক্ত করে। সে ছিল তামীম গোত্রের। খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে তিনি মুসাইলামাকে পরাস্ত করেন। এটা ছিল আকরাবা যুদ্ধে ৬৩৪ খৃঃ। (Shorter Encyclopaedia of Islam p. 416))

তার গোত্রের অনেক লোক নিয়ে মদীনায় আসলো যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ সেখানে ছিলেন, সে বলল : যদি মুহাম্মদ ﷺ তার পরে তার খিলাফত আমাকে দান করেন, তাহলে আমি তার অনুসরণ করতে পারি।" আল্লাহর রাসূল ﷺ ছাবিত ইবন কায়েসকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলেন, তার হাতে ছিল এক খণ্ড কাঠ। তিনি ﷺ বলেন, যদি তুমি এ কাষ্ঠখণ্ডও চাও তাহলে তাও তোমাকে দিব না।

আমি আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমার ব্যাপারে কিছুই করব না। যা হোক, যদি তুমি আমাকে অনুসরণ করতে অস্বীকার কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করবেন এবং আমি তোমাকে সে অবস্থায়ই পাব যে অবস্থায় আমাকে দেখানো হয়েছে স্বপ্নে)। এখানে ছাবিত রয়েছে সে আমার পক্ষ থেকে উত্তর দিবেন এরপর নবী করীম ﷺ তাকে ছেড়ে আসলেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন যে, সে আল্লাহর রাসূলের বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল : তোমাকে তাই দেখানো হবে যা আমাকে স্বপ্নের মধ্যে দেখানো হয়েছে। এর উত্তরে আবু হুরাইরা (রা) আল্লাহর রাসূলের কথা উল্লেখ করেন : ঘুমন্ত অবস্থায় আমি আমার হাতে দু'টি স্বর্ণের চুড়ি দেখতে পেলাম।

এগুলো আমাকে বিরক্ত করে ছাড়ল। (চুড়ি হল মহিলাদের অলঙ্কার তাই রাসূল ﷺ নিজ হাতে সেগুলো দেখে বিরক্তবোধ করেন।) তবে আমি ঐগুলো যাতে খুলে ফেলি সেজন্য আমাকে উৎসাহিত করা হলো, আমি ঐগুলো খুলে ফেললে উড়ে চলে গেল। (সেগুলো উড়ে শেষ হয়ে যাওয়ার দ্বারা পরিষ্কার নির্দেশনা এই যে, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। তারা শুধু ধ্বংসই হবে না বরং তাদের মিথ্যা দাবিও মূলোৎপাটিত হবে। তাদের পিছনে কোন চিহ্ন থাকবে না।)

আমি দুটো চুড়ি দ্বারা দু'জন বিখ্যাত মিথ্যাবাদীকে বুঝেছি যারা আমার পরে আগমন করবে। তাদের একজন হলো সন'আর আনাসী অন্যজন হলো ইয়ামামার মুসাইলামা।' (ইয়েমেনের একটি শহর হলো সানআ, যেখান

থেকে আসওয়াদ আল-আনাসী নুবুওয়তের দাবি করে। সে নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় মারা পড়ে ফিরোজ ইয়ালামীর হাতে। মিথ্যা নবী মুসাইলামা ছিল উত্তর পূর্ব আরব ইয়ামামার। সে ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে ওয়াহ্শীর হাতে নিহত হয়, যে ওয়াহ্শী রাসূল ﷺ-এর প্রিয় চাচা হামযা (রা) এর হত্যাকারী।

(সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১২২৮-২৯, নং ৫৬৫০)

গাভী

عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ أَنِّىْ أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلٰى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِىْ إِلٰى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرٌ فَإِذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِيْهَا بَقَرًا وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِىْ آتَانَا اللّٰهُ بِهِ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ .

অর্থাৎ, 'আবু মূসা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেন : আমি এক স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মক্কা থেকে এমন এক ভূমির দিকে হিজরত করছিলাম যেখানে রয়েছে খেজুর গাছ। আমি চিন্তা করলাম যে, এটা ইয়ামামাহ অথবা হাজার-এর ভূমি হবে, হঠাৎ করে উহা ইয়াসরিবের দিকে ঘুরে গেল। (নবী করীম ﷺ-এর হিজরতের পূর্বে মদীনার নাম।)

আমি দেখলাম সেখানে অনেকগুলো (জবাইকৃত) গরু। (এ বাড়তি অংশ হাদীসের অন্যান্য বর্ণনায় পাওয়া যায় (সহীহ মুসলিম, শারহুন নববী খ-৮, পৃ. ৩৮) এবং আল্লাহর নিকট যা-ই আছে তা উত্তম। ঘটনাক্রমে গরুগুলো উহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী সাহাবীদের প্রতীকে পরিণত হলো এবং ভাল (যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম) ছিল সত্য এবং পুরস্কারের ভাল। যা আল্লাহ্ বদর যুদ্ধের পরে আমাদের ওপর প্রদান করেছিলেন।' ঐ বিজয়গুলো যা আল্লাহ গ্রহণ করেছিলেন তা হল খায়বার ও মক্কা বিজয়।

(সহীহ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-১৩১-২, নং-১৫৯)

পানি উঠানো

عن ابى هريرة (رضى) ان رسول الله ﷺ قال : بينا انا نائم رايتنى على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذها ابن ابى قحافة فنزع منها ذنوبا او ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له ثم استحالت غربا فاخذها عمر بن الخطاب فلم ار عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن .

অর্থাৎ, 'আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বর্ণনা করেন : "আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম, আমি আমাকে একট কূপের পাশে দেখতে পেলাম, যেখানে একটা বালতি দেখতে পেলাম। আল্লাহ্ যত চান আমি তত বালতি পানি তা থেকে উত্তোলন করলাম। ইবন আবী কুহাফা (আবু বকর আস সিদ্দীক (রা)-এর কুনিয়াত (উপনাম) ছিল ইবন আবী কুহাফা। কেননা তার পিতার নাম আবু কুহাফা) এরপর আমার নিকট থেকে বালতিটি নিলেন এরপর এক দুই বালতি পানি তুলে নিলেন। তবে তার উত্তোলনের মধ্যে দুর্বলতা ছিল—আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন।

এরপর বালতিটি চলে গেল একজন বিরাট লোকের নিকট এবং ওমর ইবনে খাত্তাব ইহা গ্রহণ করেন। আমি ওমরের মত অন্য কাউকে এত দৃঢ়তার সাথে পানি উত্তোলন করতে দেখিনি। এমনকি লোকেরা (ইচ্ছামত নিজেরা পান করল) এবং তাদের উটগুলোকে পূর্ণমাত্রায় পান করাল; এমনকি উটগুলো পানির পাশেই শুয়ে পড়ল।' (নবী করীম ﷺ-এর স্বপ্নের প্রতীক হলো আবু বকর (রা) চেষ্টার সময় (প্রাথমিক সময়) মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিবেন, এক দু বছর। আর ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সমৃদ্ধির সময়ে অনেক বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। (সহীহ্ আল বুখারী খ-৯, পৃ-১২২ নং-১৪৮)

পদক্ষেপ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : رَاَيْتُنِىْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا اَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَاَةِ اَبِىْ طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ : هٰذَا بِلَالٌ . وَرَاَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ لِعُمَرَ . فَاَرَدْتُ اَنْ اَدْخُلَهُ فَاَنْظُرَ اِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ . فَقَالَ : عُمَرُ بِاَبِىْ وَاُمِّى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَلَيْكَ اَغَارُ .

অর্থাৎ, 'জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : (স্বপ্নে) আমি আমাকে দেখলাম জান্নাতে প্রবেশ করছি, আরো দেখলাম আবু তালহার স্ত্রী রুমাইছাকে। এরপর আমি পদশব্দ শুনতে পেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম : সে কে? কেউ বললেন : ইনি বিলাল (রা)। (আবু হুরাইরা (রা)-এর অন্য বর্ণনায়, নবী করীম ﷺ হযরত বিলাল (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কি আমল করেছেন যার জন্য নবী করীম এর পূর্বে তাঁর পদধ্বনি শুনতে পেলেন। বিলাল (রা) জবাব দিলেন আমি ইসলামের জন্য এমন কোন খিদমত করিনি যার দ্বারা কোন উপকার পেতে পারি তবে দিনে রাতে যখনই অজু করেছি তখনই আল্লাহ যে পরিমাণ চান সালাত আদায় করেছি। (সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১৩১১, নং-৬০১৫)

এরপর আমি একটা প্রাসাদ দেখলাম যার উঠানে একজন মহিলা বসা এবং আমি জিজ্ঞেস করলাম : এ প্রাসাদটি কার? কেউ উত্তর দিলেন : ওমর। আমি এর মধ্যে প্রবেশ করে এর চারদিক দেখতে চাইলাম, কিন্তু আমার তোমার (ওমর (রা)) মর্যাদাবোধের কথা স্মরণ হওয়ায় (প্রবেশ করিনি)। ওমর (রা) বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মর্যাদাবোধ কখনোই আপনাকে রুদ্ধ করবে না?' (এ কাব্যিক বর্ণনার শাব্দিক অর্থ হয় 'আমার সম্মান কি আপনার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হবে?' (সহীহ আল-বুখারী খ-৫, পৃ-২১-২২, নং-২৮)

নাড়িভুঁড়ি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : رَاَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدِفَ اَبَا بَنِىْ كَعْبٍ هٰؤُلاَءِ يَجُرُّ قُشْبَهُ فِى النَّارِ .

অর্থাৎ, 'আবু হুরায়রা (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বলতে শুনেছেন : আমি দেখলাম আমর ইবন লুহাই ইবন কাম'আহ ইবন খিনদিফ (সে প্রথম ইসমাঈলী ধর্মের পরিবর্তন করে, মূর্তি স্থাপন করে এবং মূর্তির সামনে আনুষ্ঠানিক পশু কুরবানীর ব্যবস্থা করে (বাহীরাহ, সায়ীবাহ, অসীলা এবং হাম (আল কুরআন ৫:১০৩, The life of Muhammad পৃ. ৩৫. সে একটা মূর্তি হুবল সিরিয়া থেকে এনে কা'বার মধ্যে স্থাপন করে এবং লোকদের ইহা পূজা করার আহ্বান জানায় (আর রাহীকুল মাখতুম পৃ. ৩৪) কা'ব এর পিতা জাহান্নামে তার নাড়ী-ভুঁড়ি টানছে।'

(সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১৪৮৫ নং-৬৮৩৮)

যীশু এবং খৃষ্টান বিরোধী

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرَانِىْ اللَّيْلَةِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَاَيْتُ رَجُلاً اٰدَمَ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنْ اُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلٰى رَجُلَيْنِ اَوْ عَلٰى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ اِذَا اَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ اَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ .

অর্থাৎ, 'আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা) উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন : গত রাতে আমি আমাকে কা'বার নিকটে দেখলাম, সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখলাম লাল-সাদার মিশ্রণ, ঐ মিশ্রণে সম্ভবত কোন লোককে সবচেয়ে সুন্দর দেখাবে। তার চুল ছিল সোজা এবং কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ প্রকারের চুলের মধ্যে ইহা হলো সর্বোত্তম। তিনি তার চুল আঁচড়িয়েছেন এবং তা থেকে পানি টপকাচ্ছিল। তিনি কা'বার চত্বরে তাওয়াফ করছিলেন, দু'জন লোকের ওপর ভর দিয়ে অথবা দুজন লোকের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : ইনি কে? কেউ উত্তর দিলেন : তিনি হলেন মারইয়ামের পুত্র মাসীহ। অতঃপর আমি দেখলাম আরেকজন লোক (লাল আভাযুক্ত বড় দেহী)। (এ বাড়তি অংশ এ হাদীসের অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, দেখুন ছহীহ্ লিল বুখারী খ-৯, পৃ-১২৫ নং ১৫৩)

খুবই কোঁকড়ানো চুল, ডান চক্ষু কানা, যাকে দেখতে প্রসারিত আঙ্গুরের মত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? কেউ উত্তর দিলেন : ইনি হলেন মিথ্যাবাদী মাসীহ (মসীহুদ দাজ্জাল)।

(সহীহ আল-বুখারী, খ-৯, পৃ-১০৬, ১০৭ নং ১২৮)

ইবনে কাতাম তাকে অনেকের চেয়ে বেশি লোকের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং ইবন কাতাল ছিলেন খুযা'আ গোত্রের মুস্তালিক উপগোত্রের একজন লোক।' (এ হাদীসের অন্য বর্ণনায় এ বাড়তি অংশ পাওয়া যায়।

(সহীহ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-১২৫, নং-১৫৩)

কা'বা

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ (رضى) قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَائِمٌ اِذْ ضَحِكَ فِىْ مَنَامِهٖ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِمَّ ضَحِكْتَ قَالَ : اِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِىْ يَؤُمُّوْنَ هٰذَا الْبَيْتِ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدِ اسْتَعَاذَ بِالْحَرَمِ فَلَمَّا بَلَغُوا

الْبَيْدَاءَ خُسِفَ بِهِمْ مَصَادِرُهُمْ شَتَّى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ . قُلْتُ : وَكَيْفَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى؟ قَالَ : جَمَعَهُمُ الطَّرِيْبُ مِنْهُمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَابْنُ السَّبِيْلِ وَالْمَجْبُوْرُ يَهْلِكُوْنَ مَهْلِكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُوْنَ مَصَادِرَ شَتَّى .

অর্থাৎ, 'আয়েশা (রা) উম্মুল মু'মিনীন (রা) বলেন : রাসূল ﷺ ঘুমের মধ্যে হেসে দিলেন, অতঃপর যখন জাগলেন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিসে আপনাকে হাসাল? তিনি বলেন : নিশ্চয়ই আমার উম্মতের কিছু লোক কা'বার ওপর আক্রমণ করবে কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য। অন্য বর্ণনাগুলোতে নবী করীম ﷺ এ ব্যক্তিকে আল-মাহদী (সঠিক পথ প্রাপ্ত) তিনি আরো বলেছেন, তিনি তাঁর বংশ থেকে আসবেন। তিনি আরো বলেন যে, ইমাম মাহদী সাত বছর পৃথিবী শাসন করবেন। যে সময়ে তিনি ন্যায় বিচার ও সমতা সারা স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

(দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ খ-২, পৃ-১১৪০))

সে এ ঘরের মধ্যে আশ্রয় চাবে। যখন তারা মদীনার দক্ষিণের এক সমতল ভূমিতে (এ সমতল যা আল বাইদা নামে পরিচিত, মক্কার পথে অবস্থিত।) পৌঁছাবে তখন ভূমি ধসে যাবে এবং তাদেরকে গিলে ফেলবে। তাদের মূল হবে বিভিন্ন রকমের এবং আল্লাহ তাদেরকে তাদের নিয়ম অনুযায়ী পুনরুত্থান ঘটাবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল তাদের মূল নিয়ত বিভিন্ন রকমের হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ কিভাবে তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থান ঘটাবেন? তিনি উত্তর দিলেন, "রাস্তা তাদেরকে একত্র করেছে" তাদের কেউ কেউ এসেছে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, অন্যরা সফরকারী, অন্য অনেকে আসতে বাধ্য হয়েছে : কিন্তু তারা সকলে একই দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে ধ্বংস হবে এবং তাদের সকলের পুনরুত্থান হবে বিভিন্ন মর্যাদায়।'

(সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১৪৯৪, নং ৬৮৯০, শব্দাবলী মুসনাদে আহমাদের।)

চাবি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَمَا اَنَا نَائِمُ الْبَارِحَةَ اِذْ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ حَتّٰى وُضِعَتْ فِىْ يَدِىْ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَنْتَقِلُوْنَهَا .

অর্থাৎ, 'আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেন, গত রাতে আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম আমাকে অলঙ্কারপূর্ণ বক্তব্যের চাবি, ভীতি প্রদর্শন দ্বারা সাহায্য (শত্রুর মনে ভীতির সঞ্চার করা, পৃথিবীর ভূ-ভাগের সম্পদের চাবিকাঠি এনে আমার হাতে দেয়া হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) আরো বলেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ এ দুনিয়ার সকল স্বার্থ ত্যাগ করেছিলেন। আর তোমরা লোকেরা সে সকল সম্পদ তোমাদের মধ্যে বন্টন করে নিচ্ছ।' (সহীহ আল-বুখারী, খ-৯, পৃ-১০৬ নং ১২৭ এবং ছহীহ মুসলিম খ-১, পৃ-২৬৬ নং ১০৬৩)

মিসওয়াক

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَانِى فِىْ الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَذَبَنِىْ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخِرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِىْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ اِلَى الْاَكْبَرِ .

অর্থাৎ, 'আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা) থেকে আল্লাহর রাসূলের বক্তব্য এভাবে বর্ণিত আছে : আমি একটি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মিসওয়াক করছিলাম (দাঁতন, এক খণ্ড ক্ষুদ্র লাঠির মত যার দ্বারা দাঁত ঘষা হয় (এবং পরিষ্কার করা হয়, মাথা চাবিয়ে বা থেতলিয়ে ব্রাশের মত ব্যবহার হয়) সাধারণভাবে আরক এর গাছের শাখা। (Arabic-English Lexicon খ-১, য-১৪৭৩) এবং দু'জন লোক আমার নিকট থেকে তা পেতে চাচ্ছিলেন। তাদের একজন

অন্যজনের থেকে বয়স্ক। আমি মিসওয়াকটি অপেক্ষাকৃত কম বয়সীর হাতে তুলে দিচ্ছিলাম এবং বয়স্ককে দেয়ার জন্য বলে বলা হলে আমি বয়স্ককে তা দিলাম।' (সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২২৮, নং-৫৬৪৮)

নবী করীম ﷺ এ স্বপ্নের দ্বারা ইসলামে বড়দের শ্রদ্ধা করার নীতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়।"

লাইলাতুল কদর

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ اُنَاسًا اُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ وَاَنَّ اُنَاسًا اُرُوْا اَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اِلْتَمِسُوْهَا فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ .

অর্থাৎ, 'ইবন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, কিছু লোককে (তাদের স্বপ্নে) দেখানো হয়েছিল যে, লাইলাতুল ক্বদর হবে শেষ সাত দিনের মধ্যে। (রমজান মাসের)। নবী করীম ﷺ বলেন : তোমরা একে (মাহে রমযানের) শেষ সাত দিনের মধ্যে খোঁজ।'

(সহীহ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-১০০ নং ১২০)

প্রাসাদ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَاَةٌ تَتَوَضَّاُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ قُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهٗ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا . قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَبَكٰى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَالَ اَعَلَيْكَ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغَارُ .

অর্থাৎ, "আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন তারা আল্লাহর রাসূলের দরবারে বসা ছিলেন, তখন তিনি বলেন : আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম, আমি আমাকে জান্নাতে পেলাম, হঠাৎ করে আমি একজন মহিলাকে একটি

প্রাসাদের পাশে অযু করতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম এ প্রাসাদটি কার? উত্তর দেয়া হলো : ইহা ওমর ইবনুল খাত্তাব-এর। এরপর আমি ওমরের মর্যাদাবোধ স্মরণ করলাম এবং দ্রুত ফিরে আসলাম। এ কথা শুনে ওমর (রা) কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন : আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মর্যাদাবোধ আপনাকে বাধাগ্রস্ত করল?" (সহীহ আল-বুখারী পৃ-১২৩-৪ নং ১৫০)

কাদামাটির মধ্যে সিজদা করা

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ (رضى) قَالَ انْطَلَقْتُ اِلٰى اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ فَقُلْتُ اَلاَ تَخْرُجُ بِنَا اِلٰى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ فَخَرَجَ فَقَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِىْ مَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اِعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَ الْاَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهٗ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ تَطْلُبُ اَمَامَكَ فَاَعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ تَطْلُبُ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ خَطِيْبًا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ مِنْ اَمَامَكَ رَمَضَانَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ اِعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَاِنِّىْ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَاِنِّىْ نُسِّيْتُهَا وَاَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِىْ وِتْرٍ وَاِنِّىْ رَاَيْتُ كَاَنِّىْ اَسْجُدُ فِىْ طِيْنٍ وَمَاءٍ . وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيْدَ النَّخْلِ وَمَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَزْعَةٌ فَاُمْطِرْنَا فَصَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ وَالْمَاءِ عَلٰى جَبْهَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَرْنَبَتِهِ تَصْدِيْقَ رُؤْيَاهُ .

অর্থাৎ, 'আবু সালামাহ হতে বর্ণিত যে, একদা তিনি আবু সায়ীদ আল-খুদরীর নিকট গেলেন এবং তাকে আসতে বললেন এবং খেজুর বাগানে বসে গল্প করতে বললেন। সুতরাং আবু সায়ীদ খুদরী আসলেন এবং তাকে রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে যা শুনেছেন তা বলতে বললেন : আবু সায়ীদ (রা) উত্তর দিলেন : একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ মাহে রমাদানের প্রথম দশদিন ইতিকাফ (ই'তিকাফ হলো মসজিদে অতিরিক্ত ইবাদতের জন্য আটকে থাকা, অবস্থান করা।) করলেন এবং আমরাও তার সঙ্গে ইতিকাফ করলাম। জীবরাঈল তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন, আপনারা যে রাত খুঁজছেন তা আপনাদের সামনে রয়েছে।

২০শে রমাদান রাসূল ﷺ নিম্নলিখিত খুতবা প্রদান করেন : যারা নবীর সঙ্গে ই'তিকাফ করেছো তারা তা চালিয়ে যাবে। আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছিল তবে তার তারিখ আমি ভুলে গিয়েছি। যাহোক, ইহা শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে হবে। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি (ঐ রাতে) কাদামাটির মধ্যে সিজদা দিচ্ছিলাম। ঐ দিনগুলোতে মসজিদের ছাদ তৈরি করা হতো খেজুরের ডাল দ্বারা এবং ঐ সময়ে (খুতবার সময়) আকাশ ছিল পরিস্কার, কোন মেঘ ছিল না। হঠাৎ করে এক খণ্ড ছোট্ট মেঘ আসল এবং বৃষ্টি নামল। নবী করীম ﷺ তার ইমামতিতে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, আমি আল্লাহর রাসূলের কপাল এবং নাকে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম। এটা ছিল তাঁর স্বপ্নের প্রত্যয়ন।

(সহীহ আল-বুখারী খ-১, পৃ-৪৩২-৪৩৩, নং-৭৭৭)

দোয়াত কলমের সিজদা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) اَنَّهٗ رَاَى رُؤْيَا اَنَّهٗ يَكْتُبُ فَلَمَّا بَلَغَ اِلٰى سَجْدَتِهَا قَالَ رَاَى الدَّوَاةَ وَالْقَلَمَ وَكُلَّ شَيْءٍ بِحَضْرَتِهٖ انْقَلَبَ سَاجِدًا قَالَ فَقَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمْ يَزَلْ يَسْجُدُ بِهَا بَعْدُ .

অর্থাৎ, 'আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন, যাতে তিনি দেখলেন তিনি সূরা সোয়াদ লিখতে ছিলেন। যখন তিনি সিজদার

আয়াতে পৌঁছালেন, তিনি দেখলেন দোয়াত, কলম এবং তার চারপাশে যা কিছু আছে সবই সিজদা করছে। তিনি একথা রাসূল ﷺ কে বললে তিনি তখন থেকে ঐ আয়াতে সিজদার বিধান চালু করে দেন।'

(মুসনাদে আহমাদ এবং সত্যায়নে আল ফাতহুর রব্বানী খ-৪, পৃ-১৮২ নং ৯২০)

সিজদারত বৃক্ষ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَاَيْتُنِىْ اللَّيْلَةَ وَاَنَا نَائِمٌ كَاَنِّىْ اُصَلِّىْ خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُوْدِىْ فَسَمِعْتُهَا وَهِىَ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِىْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَضَعْ عَنِّىْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِىْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ - قَالَ الْحَسَنُ قَالَ لِىَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لِىْ جَدُّكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَاَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مِثْلَ مَا اَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ .

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার আমি যখন রাসূল ﷺ-এর মজলিসে ছিলাম, এক ব্যক্তি তার সাক্ষাত করলেন এবং বললেন : গত রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি একটা গাছের নিচে সালাত আদায় করছিলাম এবং আমি যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলাম এবং সিজদা করলাম, 'গাছটিও আমার সঙ্গে সিজদা করল। আমি শুনলাম ইহা উচ্চারণ করছিল–

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِىْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَضَعْ عَنِّىْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِىْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ -

আল্লাহুম্মাক তুবলি বিহা ইনদাকা আজরান, ওয়াদা আন্নী বিহা বিজরান ওয়াজ'আলহা লী ইনদাকা জুখরান, ওয়া তাকাব্বালহা মিন্নী কামা তাকাব্বালতাহা মিন আবদিকা দাউদ'।

(হে আল্লাহ! এর কারণে আমাকে একটা নেকি লিখে দাও, এর দ্বারা আমার পাপকে হাল্কা করে দাও এবং একে তুমি সেরূপভাবে কবুল কর যেমনভাবে তুমি তোমার বান্দা দাউদ (আ)-এর পক্ষ থেকে কবুল করেছ।) ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আমি দেখেছি নবী ﷺ-কে সিজদা করতে, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তিনি গাছটির ভাষায় মুনাজাত করতেন ঐ ব্যক্তি যেমন তাকে অবহিত করেছেন।' (সুনান ইবনি মাজাহ খ-২, পৃ ১২৮-১২৯ নং ১০৫৩ সত্যায়নে সহীহ সুনানে তিরমিযী খ-১, পৃ-১৮০ নং-৪৭৩)

সিজদা

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ابْنِ ثَابِتٍ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ : رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَسْجُدُ عَلٰى جَبْهَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اِنَّ الرُّوْحَ لاَ تَلْقَى الرُّوْحَ ـ وَاَقْنَعَ النَّبِىُّ ﷺ رَاْسَهُ هٰكَذَا فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلٰى جَبْهَةِ النَّبِىِّ ﷺ .

অর্থাৎ, 'উমারা তাঁর পিতা খুযাইমা ইবনে ছাবিতকে বলতে শুনেছেন, তিনি একটি স্বপ্নে দেখেন তিনি নবী করীম ﷺ-এর কপালের ওপর সিজদা করছেন। যখন তিনি আল্লাহর রাসূলের নিকট ইহা বলেন, তিনি বলেন : 'নিশ্চয়ই আত্মারা মিলিত হয় না।' (দেখুন ৪৮-৪৯ নং পৃষ্ঠায় এ বাক্যের ব্যাখ্যা) এরপর নবী করীম ﷺ তাঁর মাথা নোয়ালেন এরপর তিনি তাঁর কপাল রাসূল ﷺ-এর কপালে লাগালেন।'
(মুসনাদে আহমদ খ-৫, পৃ.-২১৫ এবং সত্যায়নে ফতহুর রব্বানী খ-১৭ পৃ-২১৬-২১৭ শারহুস সুন্নাহ খ-১২ পৃ-২২৫ নং ৩২৮৫)

পাথর, চুলা এবং রক্তের নদী

عَنْ سَمُرَةَبْنِ جُنْدُبٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ لِاَصْحَابِهِ : هَلْ رَاَى اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ـ

قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُصَّ وَاِنَّهٗ قَالَ ذَاتَ
غَدَاةٍ : اِنَّهٗ اَتَانِى اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ وَاِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِىْ وَاِنَّهُمَا
قَالاَ لِى انْطَلِقْ وَاِنِّىْ انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَاِنَّا اَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ
مُضْطَجِعٍ وَاِذَا اٰخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَاِذَا هُوَ يَهْدِىْ
بِالصَّخْرَةِ لِرَاْسِهٖ فَيَثْلَغُ رَاْسَهٗ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُهَا هُنَا
فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَاْخُذُهٗ فَلاَ يَرْجِعُ اِلَيْهِ حَتّٰى يَصِحَّ رَاْسَهٗ كَمَا
كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهٖ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْاُوْلٰى
قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا هٰذَانِ قَالَ قَالاَ لِىْ انْطَلِقْ
انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ
وَاِذَا اٰخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ وَاِذَا هُوَ يَاْتِىْ اَحَدَ
شِقَّىْ وَجْهِهٖ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهٗ اِلٰى قَفَاهُ ، مَنْخِرَهٗ اِلٰى قَفَاهُ
وَعَيْنَهٗ اِلٰى قَفَاهُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ اَبُوْ رَجَاءٍ فَيَشُقُّ قَالَ ثُمَّ
تَحَوَّلُ اِلَى الْجَانِبِ الْاٰخَرِ فَيَفْعَلُ بِهٖ مِثْلَ مَا فَعَلَ
بِالْجَانِبِ الْاَوَّلِ فَمَا يَفْرَغُ مِنْ ذٰلِكَ الْجَانِبِ حَتّٰى يَصِحَّ
ذٰلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا
فَعَلَ الْمَرَّةَ الْاُوْلٰى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا هٰذَانِ قَالَ قَالاَ
لِىْ انْطَلِقِ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا عَلٰى مِثْلِ التَّنُّوْرِ قَالَ
فَاَحْسِبُ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ فَاِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَاَصْوَاتٌ قَالَ
فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَاِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَاِذَا هُمْ يَاْتِيْهِمْ

لَهَبٌ مِنْ اَسْفَلَ مِنْهُمْ فَاِذَا اَتَاهُمْ ذٰلِكَ اللَّهَبُ ضَوضَوْاقَا،
قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰؤُلاَءِ قَالَ قَالاَ لِيْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ
فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلٰى نَهْرٍ حَسِبْتُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَحْمَرَ
مِثْلَ الدَّمِ وَاِذَا فِى النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَاِذَا عَلٰى شَطِّ
النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيْرَةً وَاِذَا ذٰلِكَ السَّابِحُ
يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَاْتِيْ ذٰلِكَ الَّذِيْ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ
الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ
يَرْجِعُ اِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ اِلَيْهِ فَغَفَرَ لَهُ فَاهُ فَاَلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ
قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَانِ قَالَ قَالاَ لِى انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ
فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجلٍ كَرِيْهِ الْمَرْاٰةِ كَاَكْرَهِ مَا اَنْتَ رَاءٍ
رَجُلاً مَرْاٰةً وَاِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا قَالَ قُلْتُ
لَهُمَا مَا هٰذَا قَالَ قَالاَ لِيْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا
فَاَتَيْنَا عَلٰى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيْعِ وَاِذَا
بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لاَ اَكَادُ اَرَى رَاْسَهُ طُوْلاً فِى
السَّمَاءِ وَاِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ اَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَاَيْتُهُمْ قَطُّ قَالَ
قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَا مَا هٰؤُلاَءِ قَالَ قَالاَ لِيْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ
قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا اِلٰى رَوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ اَرَ رَوْضَةً
قَطُّ اَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ اَحْسَنَ قَالَ قَالاَ لِيْ اِرْقِ فِيْهَا قَالَ
فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا اِلَى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ

وَلَبَنٍ فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ قَالَ قَالاَ لَهُمُ اذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِيْ ذٰلِكَ النَّهَرِ قَالَ وَاِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِيْ كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوْا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْا فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ قَالاَ لِيْ هٰذِهٖ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ فَسَمَا بَصَرِيْ صُعُدًا فَاِذَا قَصْرٌ مِّثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ فَالَ قَالاَ لِيْ هٰذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمَا ذَرَانِيْ فَأَدْخُلَهٗ قَالاَ أَمَّا الْاٰنَ فَلاَ وَأَنْتَ دَاخِلَهٗ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَاِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هٰذَا الَّذِيْ رَأَيْتُ قَالَ قَالاَ لِيْ أَمَا اِنَّا سَنُخْبِرُكَ أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهٗ بِالْحَجَرِ فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْاٰنَ فَيَرْفُضُهٗ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهٗ اِلٰى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهٗ اِلٰى قَفَاهُ وَعَيْنُهٗ اِلٰى قَفَاهُ فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُوْ مِنْ بَيْتِهٖ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْاٰفَاقَ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ فِيْ مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ فَاِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِيْ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَاِنَّهٗ اٰكِلُ الرِّبَا وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمَرْاٰةَ

الَّذِىْ عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا فَانَّهٗ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ وَاَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِىْ فِى الرَّوْضَةِ فَانَّهٗ اِبْرَاهِيْمُ وَاَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهٗ فَكُلٌّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وَاَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيْحًا فَانَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ .

অর্থাৎ, 'সামুরা ইবন জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল প্রায়ই তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করতেন : তোমাদের কেউ কি স্বপ্ন দেখেছ? সুতরাং আল্লাহ্ যতদূর চান ততদূর পর্যন্ত তাঁর নিকট অনেকেই বলতেন। এক সকালে নবী ﷺ বলেন, গত রাতে আমার নিকট দু'ব্যক্তি আসেন (স্বপ্নে) আমাকে জাগিয়ে বলেন : চলুন! আমি তাদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলাম এবং আমরা এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম যে শুয়েছিল অন্য এক ব্যক্তি তার মাথার নিকট বিশাল পাথরখণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যখন সে অন্য ব্যক্তির মাথার ওপর শিলাখণ্ডটি নিক্ষেপ করছে এবং একে গুড়া গুড়া করে ফেলে, পাথর খণ্ডটি গড়িয়ে চলে যায় এবং নিক্ষেপকারী এর পিছনে পিছনে যায়। যখন সে একে ফেরত নিয়ে আসে শুয়ে থাকা লোকটির মাথা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং পাথরখণ্ডধারী লোকটি পূর্বের ন্যায় তার ওপর আঘাত করে।

আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম : সুবহানাল্লাহ (পবিত্রতা আল্লাহর) এ দুব্যক্তি কারা? তারা বললেন : চলুন! সুতরাং আমরা অগ্রসর হলাম এমনকি আমরা এক লোকের নিকট আসলাম যে, পিঠের ওপর সটান শুয়ে আছে অপর ব্যক্তি চলুন! একটি বাঁকা লোহা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে শায়িত ব্যক্তির মুখের একদিকে লোহাটি বাধিয়ে ঐ অংশ তার ঘাড় পর্যন্ত ছিড়ে ফেলে। এরপর সে তার নাক ছিঁড়ে ফেলল এবং চোখ উপড়ে ফেলল। সে ঐ লোকের অন্যদিক একই রূপে ছিড়ে ফেড়ে ফেলার পূর্বেই তার পূর্বের

পাশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসল। এরপর সে পূর্বে যা করেছিল তারই পুনরাবৃত্তি করল।

আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে বললাম সুবহানাল্লাহ! এ দু'ব্যক্তি কারা? আমাকে তারা বললেন : সামনে চলুন! সামনে চলুন! সুতরাং আমরা অগ্রসর হলাম। এমনকি আমরা প্রচুর পরিমাণে কাদার লাইন করা, ছোকানো গর্ত (যার মধ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে গোলমাল ও চিৎকারের ধ্বনি আসছিল) (বর্ণনাকারী এ ব্যাপারে নিশ্চিত নন যে আল্লাহর রাসূল একথা বলেছিলেন কি-না।) নবী করীম আরো যোগ করেন : যখন আমরা এর ভিতরের দিকে তাকালাম, আমরা উলঙ্গ নারী-পুরুষদের দেখতে পেলাম যাদের নীচে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

আগুনের লেলিহান শিখা যখনই তাদের নিকট পৌছাচ্ছে তারা চিৎকার করছে। আমি আমার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলাম : এরা কারা? তারা আমাকে বলল : সামনে চলুন! সামনে চলুন! সুতরাং আমরা সামনে অগ্রসর হলাম এমনকি আমরা একটা নদীর নিকট আসলাম (রক্তের মত লাল) (বর্ণনাকারী ..... কিনা) নবী করীম আরো যোগ করেন : একটি লোক নদীর মধ্যে সাঁতার কাটছিল এবং তার তীরে এক লোক এক স্তূপ পাথর নিয়ে দাঁড়ানো।

যখনই সাঁতারকারী তীরের নিকটে আসে, এবং সে হা করে, তীরে দাঁড়ানো ব্যক্তি তার মুখের মধ্যে একটা পাথরখণ্ড নিক্ষেপ করে এবং সাঁতারকারী (দূরে চলে যায়) এবং পুনরায় সাঁতার কাটতে থাকে (ফিরে আসার জন্য) যখনই সাঁতারকারী ফিরে আসে, আরেকটি পাথর তার মুখে নিক্ষেপ করা হয়। আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম : এ দু'ব্যক্তি কারা? তারা উত্তর দিলেন : সামনে চলুন! সামনে চলুন! সুতরাং আমরা সামনে চললাম এমনকি আমরা এমন এক কুৎসিত চেহারার লোকের নিকট আসলাম যে তোমরা এমন কখনো দেখনি। তার পাশে আগুন ছিল যা সে প্রজ্জ্বলিত করছিল এবং চারপাশে হাঁটছিল।

আমি আমার সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? তারা আমাকে বললেন : সামনে চলুন! সামনে চলুন! তাই আমরা এমনকি আমরা একটি গাঢ় অন্ধকার সবুজ বাগানের নিকট আসলাম যাতে রয়েছে ঘন সবজি, সবগুলো বসন্ত রং-এর। বাগানের মাঝে রয়েছে খুবই লম্বা এক ব্যক্তি তার মাথা আমি প্রায় দেখতেই পেলাম না তার বিশাল উচ্চতার কারণে এবং তার চারপাশে

এত শিশু যে আমি ইতোপূর্বে তত দেখিনি। আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, ইনি কে? তারা উত্তর দিল : সামনে চলুন! সামনে চলুন! সুতরাং আমরা চলতে থাকলাম এমনকি আমরা একটি চমৎকার বাগানের নিকট আসলাম যে বাগান এতই সুন্দর ও বৃহৎ যে ইতোপূর্বে আমি এত বড় বাগান দেখিনি। আমার সঙ্গীদ্বয় চলতে বললেন : সুতরাং আমি ওপরে গেলাম।

নবী করীম ﷺ আরো বলেন : সুতরাং আমরা আরোহণ করতে থাকলাম এমনকি আমরা একটা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত শহরে এসে পৌঁছালাম। অতঃপর আমরা (দারোয়ানকে) দরজা খুলতে বললাম, ইহা খোলা হলো। আমরা যখন শহরে প্রবেশ করলাম আমি দেখলাম কিছু লোক যাদের চেহারার এক দিক এত সুন্দর যে এমন আর দেখা যায় নি এবং তাদের চেহারার অপর দিক এত কুৎসিত যে অত কুৎসিত আর দেখা যায় নি। আমার সঙ্গীদ্বয় লোকদেরকে দুগ্ধ সাদা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন যে নদী (ঐ শহরে) প্রবাহিত ছিল।

লোকেরা তার মধ্যে নিজেদের নিক্ষেপ করলেন এবং তারা তাদের কুৎসিত দর্শন চেহারা দূর হওয়ার পর আমাদের সামনে হাজির হলেন এমনকি তারা সর্বোৎকৃষ্ট চেহারার লোক হলেন। নবী করীম ﷺ আরো যোগ করেন। আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে বললেন : এ স্থানটি জান্নাতের বাগান এবং ঐটি হল আপনার বাড়ি। আমি ওপরের দিকে তাকালাম এবং একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম যা সাদা মেঘের মত। আমার দু'সঙ্গী আমাকে বললেন : ঐ প্রাসাদ হলো আপনার ঘর। আমি তাদের বললাম : আপনাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহর রহমত হোক! আমাকে এর মধ্যে প্রবেশ করতে দিন! তারা উত্তর দিলেন : আপনি এর মধ্যে এখন প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে আপনি (একদিন) এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন। আমি তাদের বললাম : আজ রাতে আমি অনেক আশ্চর্যজনক জিনিস দেখেছি; আমি যেগুলো দেখেছি সেগুলোর অর্থ কি? তারা উত্তর দিলেন : আমরা আপনাকে জানাব।

প্রথম ব্যক্তি যার মাথা শিলাখণ্ড দ্বারা ভাঙ্গা হচ্ছিল। সে হলো ঐ ধরনের ব্যক্তি যে, কুরআন পড়ত কিন্তু তা পালন করত না এবং সে ঘুমিয়ে সালাত কাযা করত।

দ্বিতীয় যে ব্যক্তির পার্শ্ব আপনি অতিক্রম করলেন, যার মুখ, নাক এবং চোখ ঘাড় পর্যন্ত ছিড়ে ফেলা হচ্ছিল, সে হলো ঐ ব্যক্তি যে সকাল বেলা তার ঘর

থেকে বের হত এবং প্রচুর মিথ্যা বলত এবং সেগুলো চোখ যতদূর যায় ততদূর ছড়িয়ে যেত।

তৃতীয় উলঙ্গ নারী-পুরুষ প্রসঙ্গে যাদের আপনি দেখেছেন চলার মধ্যে তারা হলো ব্যভিচারী নারী পুরুষ।

চতুর্থ যে ব্যক্তি নদীর মধ্যে সাঁতার কাটছিল এবং শিলাখণ্ড তাকে গিলতে দেয়া হচ্ছিল সে হলো ঐ ব্যক্তি যে সুদ খেত।

পঞ্চম মারাত্মক দর্শক ব্যক্তি, যাকে আপনি আগুনের নিকটে দেখেছেন, একে প্রজ্জ্বলিত করছেন এবং এর চারদিকে ঘুরছেন। তিনি হলেন ফেরেশ্‌তা মালিক, দোযখের পাহারাদার।

ষষ্ঠ, যে লম্বা ব্যক্তিকে আপনি বাগানের মধ্যে দেখেছেন তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম এবং তার চারপাশে যে সকল শিশু তারা হলো ঐ সকল শিশু যারা মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। বর্ণনাকারী আরো যোগ করেছেন : কিছু মুসলমান নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের শিশুদের কি অবস্থা? নবী করীম ﷺ বলেন : তাদের শিশুরাও। অতঃপর তিনি আরো যোগ করেন : আমার সঙ্গীদ্বয় আরো বলেন : সপ্তম- আপনি কিছু লোক যাদের দেখলেন অর্ধেক সুন্দর ও অর্ধেক কুৎসিত, তারা হলো ঐ সকল লোক যারা ভাল-মন্দ কাজের সংমিশ্রণ ঘটাত, তারা কিছু ভাল কাজ ও কিছু খারাপ কাজ করত, অবশেষে আল্লাহ তাদের মাফ করে দিলেন।' (সহীহ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-১৩৮-১৩৯ নং ১৭১)

পরকালীন জীবনে যে সকল শাস্তি প্রদান করা হবে, আল-কুরআনের শিক্ষা অবহেলা করা, সালাত আদায়ে অবহেলা, মিথ্যা বলা, ব্যভিচার করা এবং সুদ খাওয়া নবী করীম ﷺ-এর এ স্বপ্নে এগুলো চাক্ষুষ দেখানো হয়েছে। এ দৃশ্যাবলি অলীক কিংবা কল্পনা নয় এবং জাহান্নামের শাস্তির বাস্তব রূপ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, যারা এ সকল পাপের সাথে জড়িত।

পালতোলা

عَنْ اَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ (رضى) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلٰى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَاَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْاَسِرَّةِ اَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ شَكَّ اِسْحَاقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ فِي الْاُوْلٰى قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرِ فِيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ

অর্থাৎ, 'আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ উবাদা ইবনুস সামিত-এর স্ত্রী উম্মে হারাম বিনতে মিলহানকে মাঝে মাঝে দেখতে যেতেন। একদিন নবী করীম ﷺ তাকে দেখতে গেলেন তিনি তাকে কিছু খাবার দিলেন এবং রাসূল ﷺ-এর মাথায় কোন উকুন আছে কিনা। তা খুঁজতে লাগলেন। এরপর আল্লাহর রাসূল ঘুমিয়ে পড়লেন খানিক পরে তিনি মুচকি হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন।

উম্মে হারাম জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! কিসে আপনাকে হাসাল? তিনি বললেন : আমার কিছু অনুসারীদের আমার সাথে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত অবস্থায় হাজির (স্বপ্নে) করা হলো, তারা সাগরের মাঝে রাজা-বাদশাদের মত (বর্ণনাকারী ইসহাক নিশ্চিত নন আনাস (রা) রাজাগণ

সিংহাসনে নাকি রাজাগণ সিংহাসনে বসে আছেন বলেছেন।) পাল তুলে তাদের সিংহাসনের ওপর চলছিল। উম্মে হারাম বলেন : আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

সুতরাং আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করলেন এবং তাঁর মস্তক মুবারক রেখে ঘুমিয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় মুসকি হাসতে হাসতে জাগলেন। (উম্মে হারাম বলেন) : আমি বললাম : কিসে আপনাকে হাসাল? হে আল্লাহর রাসূল। তিনি উত্তর দিলেন : আমার কিছু অনুসারীদের (স্বপ্নে) আমাকে দেখানো হলো তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছেন। তিনি (হারাম) পূর্বের মত আবার বললেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি উত্তরে বললেন : তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত।

মাবিয়া ইবন আবু সুফিয়ানের খিলাফতকালে উম্মে হারাম পাল তুলে গিয়েছিলেন, তীরে পৌছে তিনি তার আরোহী বাহনের ওপর থেকে পড়ে গিয়ে শাহাদাতবরণ করেন। (সহীহ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-১০৮-১০৯ নং-১৩০)

তরবারী

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ فِىْ رُؤْيَاىَ اَنِّىْ هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهٗ فَاِذَا هُوَ مَا اُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهٗ اُخْرٰى فَعَادَ اَحْسَنَ مَا كَانَ فَاِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

'আবু মূসা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি তরবারী চালনা করলাম এবং ইহা মাঝখান থেকে ভেঙ্গে গেল। উহা হলো উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষয়-ক্ষতির প্রতীক। অতপর আমি আবার তরবারী চালনা করলাম, তখন ইহা ইতোপূর্বেকার সবচেয়ে সুন্দর তরবারীতে পরিণত হলো। উহা মক্কা বিজয়ের প্রতীক এবং মু'মিনদের জমায়েত যা আল্লাহ্ করেছেন।' (প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৩-১৩৪, নং-১৬৪)

ঊনিশতম অধ্যায়

সাধারণ স্বপ্ন

নিচে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে অথবা তাঁদের আলোকে কতিপয় স্বপ্নের ব্যাখ্যার সংগ্রহ তুলে ধরা হলো, যা স্বপ্নের ব্যাখ্যার নির্ভরযোগ্য গাইড বা নির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করা যায় (শুধুমাত্র) ভাল স্বপ্নের অর্থ-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। কুরআনের উপমা এবং দৃষ্টান্তের সংগ্রহ কোনভাবেই সম্পূর্ণ নয়। সেগুলো খুবই অল্প সংখ্যক যা নবী করীম ﷺ-এর ব্যাখ্যাগত নীতি হিসেবে গৃহীত, সুন্নাহ থেকে সংগৃহীত।

যদিও এ ব্যাখ্যাবলীর অধিকাংশই বর্তমানে বিদ্যমান মুসলিম লেখক যেমন আকিলির Ibn Seern's Dictionary of Dreams, মুহাম্মাদ হাছরানীর অনূদিত Dreams and Interpretations -এর গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যাবে, তবে এর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। এ সকল গ্রন্থতে বিভিন্ন অনির্ভরযোগ্য উৎসের সাথে কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে কৃত ব্যাখ্যাগুলো মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে এবং সেগুলো মূলের কোন উল্লেখ করা হয়নি। এর ফলে সাধারণ পাঠকবর্গের পক্ষে কুরআন-হাদীসভিত্তিক ব্যাখ্যা এবং এর বাইরের ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারা অসম্ভব। যা হোক এ সংগ্রহে ব্যাখ্যায় সকল উৎস প্রদত্ত হয়েছে, যাতে পাঠকবর্গ তাদের মূল সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হতে পারে।

আজান

কেউ নিজেকে আজান দিতে দেখলে এর দ্বারা এটা বুঝা যেতে পারে যে, তার হজ্জ করার পরিকল্পনা সফলতা লাভ করবে। (শারহুস্ সুন্নাহ খ-১২ পৃ-২২৪)

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ ـ

অর্থাৎ, 'মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা দাও।' (সূরা-২ আল-হাজ্জ : আয়াত-২৭)

গোসল করা

নিজেকে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করার অর্থ হতে পারে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেছেন, অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়া ও দুর্যোগ দূর হওয়া। নিম্নের আয়াতে কারীমায় আল্লাহ্ তা'আলা আইয়ুব (আ) প্রসঙ্গে বলছেন–

(শারহুস্ সুন্নাহ খ-১২ পৃ-২২০)

هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ -

অর্থাৎ, 'ইহা হলো গোসল করার ও পান করার জন্য ঠাণ্ডা পানি এবং আমি তার পরিবার তাকে ফেরত দিব এবং তাদের সঙ্গে সমসংখ্যক।' (অতিরিক্ত সন্তান-সন্ততি) (সূরা–৩৮ ছোয়াদ : আয়াত-৪২-৪৩)

পাখি

পাখিদের উড়তে অথবা কারো মাথার ওপরে চক্কর মারতে দেখা (স্বপ্নে) কোন প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়া অর্থ দিতে পারে। নিম্নের আয়াত থেকে দাউদ (আ) প্রসঙ্গে (শারহুস্ সুন্নাহ খ-১২ পৃ.-২২১)

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّهٗٓ اَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ -

অর্থাৎ, 'পাখিগুলো জড়ো হয় এবং সকলে (দাউদ-এর সঙ্গে) ফিরে আসে (আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাওবার দিকে) এ আমি তাঁর রাজত্বকে শক্তিশালী করি।' (সূরা –৩৮ ছোয়াদ : আয়াত-১৯-২০)

উড়া

স্বপ্নে কোন জিনিস বা অপছন্দনীয় ব্যক্তি উড়ে যাওয়া এ নির্দেশনা দেয় যে সমস্যাটির শীঘ্রই সমাধান হবে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ فِىْ يَدَىَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَاَهَمَّنِىْ شَاْنُهُمَا فَاُوْحِىَ اِلَىَّ فِى الْمَنَامِ اَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَاَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِىْ فَكَانَ اَحَدُهُمَا الْعَنْسِىَّ صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَالْاٰخَرُ مُسَيْلَمَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ .

অর্থাৎ, 'আবু হুরায়রা (রা) উদ্ধৃত করেন, আল্লাহ্ বলেন : ঘুমের মধ্যে আমি আমার দুই হাতে দুটি স্বর্ণের চুড়ি দেখলাম, তবে এ দুটি আমাকে বিরক্ত করছিল। তবে আমাকে উহা খুলে ফেলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হলো, আমি তা খুলে ফেলার পর তা উড়ে গেল। আমি দুটি চুড়িকে দু'জন বিখ্যাত মিথ্যাবাদীর প্রতীক মনে করছি যারা আমার পরে বের হবে (আবির্ভাব হবে)। তাদের একজন হলো সানআর আল আনসী এবং অপরজন হলো ইয়ামামার মুসাইলামা।' (দেখুন 'চুড়ি উড়া' তৃতীয় অধ্যায়ে এর ব্যাখ্যা। সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১২২৮-২৯ নং ৫৬৫০)

পোশাক পরা বা আবরণ

পোশাক পরা অথবা আবরণ (গ্রহণ) দ্বারা স্বামী বা স্ত্রী বুঝানো হতে পারে। এটা হলো আল্লাহর দেয়া উপমা 'লিবাস' (যার অর্থ পোশাক, আবরণ) আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে–

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ .

অর্থাৎ, 'তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাদের আবরণ।'
(সূরা আল-বাকারা–২ ঃ ১৮৭)

গাভী

মোটা গাভী ভাল ফসলের দিকে এবং কৃশকায় গাভী খারাপ ফসলের দিকে ইঙ্গিত করে। এটা ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা থেকে গৃহীত। যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা ইউসুফ (আ) করেছিলেন। আল-কুরআন ঘোষণা করে–

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ
سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّيَ
اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ
دَاَبًا فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْبُلِهٖٓ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ـ
ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلاَّ

قَلِيْلاً مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ . ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ .

অর্থাৎ, 'হে ইউসুফ! সত্যবাদী ব্যক্তি, আমাদেরকে ব্যাখ্যা করুন (স্বপ্নে দেখা) সাতটি মোটা তাজা গাভীকে সাতটি চিকন গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শস্যের শীষ এবং সাতটি শস্যের শুকনা শীষ, যাতে আমি ফিরে গিয়ে লোকদের বলতে পারি। (ইউসুফ (আ)) বলেন : প্রথম সুফলা সাত বছর তোমাদের যথারীতি চাষাবাদ করতে হবে এবং তোমরা যা কর্তন করবে তা গুদামে রেখে দিবে তবে ঐ সামান্য অংশ ছাড়া যা তোমরা খাও। এরপর আসবে সাতটি শুষ্ক বছর এবং তোমরা পূর্ববর্তী বছরগুলোর জমা করা খাদ্য খাবে, শুধুমাত্র বিশেষভাবে সংরক্ষিত অংশ ছাড়া। এরপর আরেক বছর আসবে যাতে জনগণ প্রচুর পানি পাবে, যাতে তারা নিংড়াতে পারবে (আঙ্গুর ও জলপাই)।' (সূরা–১২ ইউসুফ : আয়াত-৪৬-৪৯)

খেজুর

যদি কেউ ইবন তাব এর তরতাজা খেজুর দেখে (স্বপ্নে) এর দ্বারা বুঝা যাবে কারো ধর্মীয় অনুশীলন উত্তম হবে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ كَانَا فِىْ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَاُتِيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَاَوَّلْتُ اَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِى الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ دِيْنَنَا قَدْ طَابَ .

অর্থাৎ, 'আনাস ইবনে মালিক (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : গতরাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম আমরা উকবা ইবন রাফির ঘরে ছিলাম এবং সেখানে ইবন তাব (হাদীসে উল্লিখিত বিষয়ে ব্যাখ্যা ষোলতম অধ্যায়ের (৩) শাব্দিক ব্যাখ্যায় দেখুন।) এর তরতাজা খেজুর আনা হলো। আমি একত্রে এরূপ ব্যাখ্যা করলাম যে, এ দুনিয়ায় আমাদের উচ্চতা (اَلرِّفْعَةُ)

গ্রহণযোগ্য হয়েছে, পরকালীন জীবনের পরিণতি (اَلْعَاقِبَةُ) ও সুন্দর এবং আমাদের দ্বীনও হবে সুন্দর (طَيِّبٌ)।" (সহীহ্ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২২৮ নং ৫৬৪৭ এবং সুনান আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১৩৯৭ নং ৫০০৭)

স্বপ্নে কেউ পাকা খেজুর খেলে, সেগুলো অর্জন করলে ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহর দয়া গৃহীত হওয়া অর্থ দেয়, অথবা যাকাত দেবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া অর্থ দেয়া অথবা অপচয় বন্ধ করার জন্য মনে করিয়ে দেয়া। এ প্রতীকগুলো নিম্নলিখিত আয়াত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ .

অর্থাৎ, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি বাগান সৃষ্টি করেন, যা লতানো ও অলতানো, তাতে থাকে খেজুর, শস্য এবং বিভিন্ন ধরনের খাদ্য, আরো থাকে যাইতুন, বেদানা সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন। তোমরা তার ফল ভক্ষণ কর যখন ফল ধরে এবং তার হক আদায় কর (যাকাত দাও) ফসল কাটার দিন। এবং অপচয় কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।'

(সূরা–৬ আল-আন'আম : আয়াত-১৪১)

দরজা

স্বপ্নে কেউ দরজা বা গেট দিয়ে প্রবেশ করতে দেখলে, তার গৃহীত প্রকল্পের সফল সমাপ্তিকে বুঝাতে পারে অথবা বিতর্কে জয়লাভ করা, আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী। (শারহুস সুন্নাহ খ-১২, পৃ-২২১)

اُدْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ .

অর্থাৎ, 'তোমরা দ্বার দিয়ে তাদের ওপরে প্রবেশ কর, কেননা যখন তোমরা প্রবেশ করবে বিজয় তোমাদেরই হবে।' (সূরা–৫ আল মায়িদা : আয়াত-২৩)

স্বপ্নে দরজা খোলা দ্বারা দু'আ কবুল হওয়া বুঝাতে পারে অথবা প্রয়োজন পূরণ হওয়া 'ইস্তিফতাহ' শব্দ দ্বারা আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে এ অর্থ গ্রহণ করা যায়।

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ .

অর্থাৎ, 'যদি তোমরা বিজয় চাও, তাহলে বিজয় তোমাদেরই।'

(সূরা–৮ আল আনফাল : আয়াত-১৯)

ডিম

স্বপ্নে ডিম দেখার দ্বারা মহিলাকে বুঝানো হতে পারে। নিম্নলিখিত আয়াতে কারীমায় যে উপমা ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা। (প্রাগুক্ত খ-১২ পৃ-২২০)

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُوْنٌ .

অর্থাৎ, 'এবং তাদের সঙ্গে থাকবে সতী নারীসমূহ, যাদের চোখ হলো নীচু, বড় এবং সুন্দর, নম্র এবং খাঁটি, ভাল, সংরক্ষিত ও লুক্কায়িত ডিমের মত।'

(সূরা–৩৭ আস্ সাফফাত : আয়াত-৪৮-৪৯)

উর্ধারোহণ

স্বপ্নে উর্ধ্ব আরোহন, আরোহণ অথবা আকাশে উড়া দ্বারা উর্ধ্বারোহণ অথবা মর্যাদায় আসীন হওয়া (রিফা'হ)-কে বুঝায়। এ ব্যাখ্যা নবী ইদ্রীস (আ)-এর ব্যাপারে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত শব্দ رَفَعْنَا দ্বারা গ্রহণ করা যেতে পারে।

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا .

অর্থাৎ, 'এবং আমি তাঁকে উচ্চ স্থানে আরোহন করালাম।'

(সূরা–১৯ মারিয়াম : আয়াত-৫৭)

উড়ন্ত ঝর্না

স্বপ্নের মধ্যে উড়ন্ত ঝর্না চলমান পুরস্কার বুঝায় যা কোন ব্যক্তির ভাল কাজের ফলে হয়।

عَنْ اُمِّ الْعَلاَءِ وَهِىَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ : طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ فِى السُّكْنٰى حِيْنَ

اقْتَرَعَتِ الاَنْصَارُ عَلٰى سُكْنَى الْمُهَاجِرِيْنَ فَاشْتَكٰى فَمَرَّضْنَاهُ حَتّٰى تُوُفِّيَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِيْ اَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ : رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِيْ عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ قَالَ : وَمَا يُدْرِيْكَ؟ قُلْتُ : لاَ اَدْرِيْ وَاللّٰهِ قَالَ : اَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ اِنِّيْ لاَرْجُوْ لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلا بِكُمْ . قَالَتْ اُمُّ الْعَلاَءِ : فَوَ اللّٰهِ لاَ اُزَكِّيْ اَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ : وَرَاَيْتُ لِعُثْمَانَ فِى النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِيْ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ : ذَاكَ عَمَلُهٗ يَجْرِيْ لَهٗ .

অর্থাৎ, 'খারিজা ইবনে যায়েদ ইবন ছাবিত (রা) বর্ণনা করেন যে, উম্মুল আ'লা (বর্ণনাকারী বলেন যে তিনি ছিলেন একজন আনসারী মহিলা যিনি আল্লাহর রাসূলকে আনুগত্যের শপথ দিয়েছিলেন।) বলেছেন : আনসারগণ যখন প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করলেন এবং মুহাজিরগণকে তাদের গৃহে স্থান করে দিলেন, আমরা উসমান ইবনে মাজউনকে তুললাম। পরবর্তীতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আমরা তার যত্ন নিলাম এমনকি তিনি ইন্তিকাল করলেন।

অতঃপর আমরা তাঁকে তাঁর কাপড়ের মধ্যে রাখলাম। যখন আল্লাহর রাসূল আমাদের দেখতে আসলেন, আমি (মৃতদেহকে লক্ষ্য করে) বললাম : আল্লাহর রহমত আপনার ওপর বর্ষিত হোক হে আবুছ ছায়িব, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মান দিয়েছেন। নবী করীম ﷺ বলেন : তুমি কিভাবে তা জানলে? আমি উত্তর দিলাম : আল্লাহর কসম, আমি জানি না।

তিনি ﷺ বলেন : তার জন্য যেহেতু মৃত্যু এসে গেছে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার আশা করি। আল্লাহর কসম আমি যদিও আল্লাহর রাসূল, আমিও জানি না আমার বা তোমাদের কি ঘটবে। উম্মুল

আলা বলেন : আল্লাহ্‌র কসম আমি অন্য কারোর তাকওয়ার ওপরে সাক্ষ্য দান করিনি। তিনি আরো বলেন : পরবর্তীতে আমি উসমানের ব্যাপারে উড়ন্ত ধারণা স্বপ্নে দেখলাম। সুতরাং আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট গমন করলাম এবং তার নিকট উহা উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন : "উহা তার ভাল কাজের পুরস্কারের প্রতীক, যা তাকে সার্বক্ষণিক নেকি দান করছে।'

(ছহীহু লিল বুখারী খ-৯, পৃ-১১৯-২০ নং-১৪৫)

আসবাবপত্র

স্বপ্নে আসবাবপত্র অথবা কার্পেট দেখা, বিশ্রামের সময় আসা, কঠিন সময় দূর হওয়া নির্দেশ করে, অথবা এর দ্বারা কাঙ্ক্ষিত অফিসের প্রশাসনিক পদে আরোহন করা বুঝায়, আল-কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের প্রয়োগ থেকে এটা বুঝায়–

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ .

অর্থাৎ, 'গদির ওপর ঘুরা, যা রেশমের বর্ডার দেয়া এবং নিকটবর্তী দু'বাগানের ফল ঝুলে থাকবে।' (সূরা–৫৫ আর রাহমান : আয়াত-৫৪)

স্বপ্নে আসবাবপত্র (দেখা) নারী এবং শিশুদের প্রতীক হিসেবে গণ্য হতে পারে। যেমন নিম্নলিখিত আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ـ اِنَّا اَنْشَاْنَاهُنَّ اِنْشَاءً ـ فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا اَتْرَابًا .

অর্থাৎ, (তারা থাকবে) ঘূর্ণমান গদির ওপর এবং আমরা তাদেরকে বিশেষভাবে কুমারী হিসেবে সৃষ্টি করেছি যারা তাদের সমবয়স্ক স্বামীদেরকে ভালবাসবে।" (সূরা–৫৬ আল ওয়াকিয়াহ : আয়াত-৩৪-৩৭)

বাগান

স্বপ্নে বাগান দেখা ইসলামে প্রাচুর্যকে নির্দেশ করে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ : رَاَيْتُ كَاَنِّيْ فِيْ رَوْضَةٍ وَّوَسَطَ الرَّوْضَةِ عَمُوْدٌ فِيْ اَعْلَى الْعَمُوْدِ عُرْوَةٌ فَقِيْلَ لِيْ ارْقَهْ قُلْتُ لَا

اَسْتَطِيْعُ فَاَتَانِىْ وَصِيْفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِىْ فَرَقِيْتُ فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ فَانْتَبَهْتُ وَاَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهَا فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الْاِسْلاَمِ وَذٰلِكَ الْعَمُوْدُ عَمُوْدُ الْاِسْلاَمِ وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقٰى لاَ تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالْاِسْلاَمِ حَتّٰى تَمُوْتَ .

অর্থাৎ, 'আব্দুল্লাহ ইবন সালাম বলেন : আমি (স্বপ্নে দেখলাম যে) নিজেকে একটা বাগানে দেখলাম, যার মাঝখানে একটা খাম্বা যার ওপরে একটি হাত ধরা আছে। আমাকে খাম্বার ওপরে উঠতে বলা হলে আমি বললাম : 'আমি পারব না।' এরপর একজন দাস আসল এবং আমার কাপড় গুটিয়ে দিল, সুতরাং আমি আরোহণ করলাম এবং হাত ধরাকে আটকালাম। আমি ইহা ধরা অবস্থায় জাগলাম। যখন আমি এর বর্ণনা রাসূল ﷺ কে দিলাম তিনি বললেন : ঐ বাগানটি ইসলামের বাগানের প্রতীক এবং হাত ধরা হলো (ঈমানের) হাত ধরা। (এ স্বপ্ন) নির্দেশনা দেয় যে, তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকবে।' (সহীহ আল বুখারী খ-৯, পৃ-১১৭ নং-১৪২)

উপহার

স্বপ্নে উপহার পাওয়া দ্বারা সুখের পরশ পাওয়া নির্দেশ করে। নিম্নলিখিত কুরআনের আয়াত দ্বারা উহা বুঝায়– بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ

'নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের উপহার নিয়ে খুশি।' (সূরা–২৭ আন নামল : আয়াত-৬)

স্বর্ণ

স্বর্ণ প্রদত্ত হওয়া অথবা স্বর্ণ পাওয়া দ্বারা উপযুক্ত স্ত্রী পাওয়াকে বুঝানো হয়ে থাকতে পারে অথবা সফল বিবাহ বুঝানো হতে পারে। এ প্রতীক রাসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে পাওয়া যেতে পারে, যাতে রাসূল ﷺ স্বর্ণকে শুধু মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُرَيْرٍ يَعْنِيْ الْغَافِقِيَّ اَنَّهٗ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهٗ فِيْ يَمِيْنِهٖ وَاَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهٗ فِيْ شِمَالِهٖ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِيْ .

অর্থাৎ, 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (র) থেকে তিনি আলী ইবন আবী তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ তার ডান হাতে রেশম নিলেন, অতঃপর তার বাম হাতে নিলেন স্বর্ণ, অতঃপর বললেন : এ দুটি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।' (সুনান আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১১৩৩ নং ৪০৪৬ সত্যায়নে সহীহ সুনানে আবু দাউদ খ-২, পৃ-৭৫৬-৬৬ নং ৩৪২২ নাসায়ী এবং আহমদেও।)

হাজ্জ

কেউ হজ্জ বা উমরা করার সময় যদি অভিভাষ্য শ্রবণ করে তার অর্থ হয় উহা ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে–

اَبُوْ جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ : تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِيَ نَاسٌ فَسَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَاَمَرَنِيْ فَرَاَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَاَنَّ رَجُلاً يَقُوْلُ لِيْ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَاَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي اَقِمْ عِنْدِيْ فَاَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِيْ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِيْ رَاَيْتُ .

অর্থাৎ, আবু জামরাহ নাসর ইবনু ইমরান আদ্দুবায়ী বলেন : আমি হাজ্জে তামাত্তু করার নিয়ত করলাম। লোকেরা আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। পরবর্তীতে আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস

করলে তিনি আমাকে ইহা করতে বললেন। পরে আমি স্বপ্নে দেখলাম কেউ আমাকে বলছেন : 'হাজ্জে মাবরূর' (অর্থাৎ, তোমার হজ্জ যেন কবুল হয়।) এবং গৃহীত উমরাহ। সুতরাং আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, 'উহাই ছিল আবুল কাসিম (আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা) নবী করীম ﷺ-এর কুনিয়াত, তাঁর ﷺ শিশুপুত্র আল-কাসিম-এর নাম দ্বারা তৈরি।)-এর সুন্নাহ।' অতঃপর তিনি আমাকে বলেন : তুমি আমার সঙ্গে থাক এবং আমি তোমাকে আমার সম্পদের একটি অংশ দান করব।' আমি (শুবাহ্) জিজ্ঞেস করলাম, কেন তিনি আপনাকে আমন্ত্রণ জানালেন? তিনি (আবু জামরাহ্) বলেন, 'আমি যে স্বপ্নে দেখেছিলাম তার কারণে।' (ছহীহ্ লিল বুখারী খ-২, পৃ-৩৭৩, নং ৬৩৮)

হাত ধরা

স্বপ্নে শক্ত করে হাত ধরা এ নির্দেশনা দেয় যে সে ইসলামকে শক্ত করে ধরে থাকবে।

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে ছালাম বলেন : আমি (স্বপ্নে দেখলাম ..... (বাগান) ...... ধারণ করে থাকবো।' (সহীহ্ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-১১৭, নং-১৪২)

চাবি

স্বপ্নে কারো হাতে চাবি দেখা, অথবা চাবি পাওয়া, এ নির্দেশনা দেয় যে সে প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভ করবে (সহীহ মুসলিম, শারহুন নববী খ-হ, পৃ-৩৯)। এ ব্যাখ্যা রাসূল ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীসের চাবির বাস্তবায়নের ভিত্তিতে করা হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَمَا اَنَا نَائِمُ الْبَارِحَةَ اِذْ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ حَتّٰى وُضِعَتْ فِىْ يَدِىْ .

অর্থাৎ, 'আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেন : গতরাতে আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম, আমাকে অলঙ্কারপূর্ণ বক্তব্য দান করা হলো,

বিরোধীদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারের দ্বারা সমর্থন করা হয়েছে। জমীনের খনির চাবিগুলো এনে আমার হাতে রাখা হয়েছে।' (সহীহ্ আল বুখারী খ-৯, পৃ-১০৬ নং ১২৭, সহীহ্ মুসলিম খ-১, পৃ-২৬৬, নং-১০৬৩)

হাসা

স্বপ্নের মধ্যে হাসা ভাল খবর আসার দিকে ইঙ্গিত করা হতে পারে, এটা ভাল সময়ের আশা করা যায়, নিম্নলিখিত কুরআনে আয়াতের বাস্তবায়নের দ্বারা (এ ইঙ্গিত গ্রহণ করা হয়)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ .

অর্থাৎ, 'সেদিন কিছু চেহারা হবে উজ্জ্বল, হাস্যোজ্জ্বল এবং ভাল সংবাদে বিজয়ী বিজয়ী ভাব।' (সূরা–৮০ আবাসা : আয়াত-৩৮-৩৯)

ডাণ্ডাবেড়ি

কাউকে ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে রাখা দ্বারা ধর্মের ওপর অটল থাকার অর্থ প্রদান করে। নবী করীম ﷺ-এর সাহাবী আবু হুরায়রা (রা)-এর মতে,

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ : كَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِى النَّوْمِ وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِى الدِّيْنِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ لاَ تَكُوْنُ الْأَغْلاَلُ إِلاَّ فِى الْأَعْنَاقِ .

অর্থাৎ, 'মুহাম্মাদ ইবন সীরীন বলেন, আবু হুরায়রা (রা) স্বপ্নে গলায় বেড়ি দেখা অপছন্দ করতেন এবং লোকেরা সাধারণত ডাণ্ডাবেড়ি দেখতে পছন্দ করে। ডাণ্ডাবেড়ি হলো কারো ধর্মের প্রতি সদা-সর্বদা লেগে থাকার প্রতীক।' (ইমাম আন নববী উল্লেখ করেন যে, পায়ে শিকল قَيْدٌ পছন্দ করা হয়, কেননা উহা পাপ এবং শয়তানী কাজ ত্যাগ করা বুঝায়, অন্যদিকে ঘাড়ের শিকল জাহান্নামীদের লক্ষণ। (আল কুরআন ১৩:৫, ৩৪:৩৩, ৩৬:০৮, ৪০:৭১. সহীহ মুসলিম শারহুন নববী খ-৮, পৃ-২৮। সহীহ্ আল-বুখারী খ-৯, পৃ-১১৮-১১৯, নং-১৪৪ আরো দেখুন সুনানে আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১৩৯৫-৬, নং-৫০০১)

মক্কা

স্বপ্নে কেউ মক্কায় প্রবেশ করতে দেখার অর্থ হলো নিরাপত্তার অবস্থায় পৌছান ও শান্তির অবস্থানে পৌছান। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা অনুযায়ী- وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا 'যে এর (মক্কার) মধ্যে প্রবেশ করল সেই নিরাপদ।' (সূরা-৩ আলে ইমরান : আয়াত-৯৭)

বিবাহ

স্বপ্নে কেউ বিয়ে করতে দেখা দ্বারা আসন্ন বিবাহ বুঝায়। স্বপ্নের সময় যদি বিয়ের পরিকল্পনা না থাকে তাহলে হয়তো যার সঙ্গে বিয়ে হতে দেখেছে তাদের বিয়ের প্রস্তাব দিবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُرِيْتُكِ قَبْلَ اَنْ اَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ رَاَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَقُلْتُ لَهٗ اِكْشِفْ فَكَشَفَ فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَقُلْتُ اِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهٖ ثُمَّ أُرِيْتُكِ يَحْمِلُكِ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَقُلْتُ اِكْشِفْ فَكَشَفَ فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَقُلْتُ اِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهٖ .

অর্থাৎ, 'আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : (স্বপ্নে) তোমাকে আমার নিকট দুবার দেখানো হয়েছে তোমাকে আমি বিয়ে করার পূর্বেই। আমি দেখলাম একজন ফেরেশতা কাউকে (স্ত্রী) রেশমী কাপড়ের মধ্যে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, আমি তাকে বললাম : তাকে উন্মুক্ত করুন এবং আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ইহা তুমি। আমি নিজে নিজে বললাম : যদি ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তাহলে ইহা অবশ্যই হবে।' (অতঃপর তোমাকে পুনরায় দেখানো হলো বাক্যটি অনুবাদে গ্রন্থকার বাদ দিয়েছেন।) পরবর্তীতে আমি একই ফেরেশতাকে (স্বপ্নে) দেখলাম কাউকে রেশমী কাপড়ের মধ্যে

বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তাকে বললাম তাকে উন্মুক্ত করুন' এবং আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম পুনরায় ইহা তুমিই। আমি নিজে নিজে বললাম : যদি ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তাহলে অবশ্যই ইহা ঘটবে।

(সহীহ আল-বুখারী খ-৯ পৃ-১১৫-৭, নং১৪০)

দুগ্ধ

স্বপ্নে দুধ খাওয়া অর্থ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জিত হবে–

عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّىْ لَاَرَى الرِّىَّ يَخْرُجُ مِنْ اَطْرَافِىْ فَاَعْطَيْتُ فَضْلِىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ : مَنْ حَوْلَهٗ فَمَا اَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : اَلْعِلْمُ .

অর্থাৎ, 'আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : রাসূল ﷺ বলেন : আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম (আমি স্বপ্নে দেখলাম) আমাকে এক বাটি দুধ দেয়া হলো, আমি এ থেকে এত পরিমাণ পান করলাম, আমি দেখতে পেলাম যে, এর আদ্যতা আমার ঠোঁট পর্যন্ত পৌছেছে। এরপর এর বাকী অংশ আমি ওমর ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম।' তার পাশে উপবিষ্টজনেরা জিজ্ঞেস করলেন, উহার ব্যাখ্যা আপনি কি করছেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন : ইহা (ধর্মীয়) জ্ঞান।' (সহীহ আল-বুখারী খ-৯ পৃ-১১২ নং-১৩৫)

পর্বত

স্বপ্নে পর্বত দেখা দ্বারা প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়া বুঝতে পারে। আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে নবী দাউদ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ......

وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ .

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই! আমি পর্বতকে অধীন করেছি সে তাঁর (দাউদ-এর) সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা আমার গুণকীর্তন করে। ...এবং আমি তাঁর রাজত্বকে শক্তিশালী করেছি।' (সূরা-৩৮ ছোয়াদ : আয়াত-১৮-২০)

মুক্তা

স্বপ্নে মুক্তা দেখা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সঙ্গ জোটার দিকে (সে পুরুষ বা নারী যাই হোক) নির্দেশ করতে পারে। নিম্নের আয়াতগুলো যুবক-যুবতীদের জন্য জান্নাতে সঙ্গী দেয়া হবে-

وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ .

অর্থাৎ, 'এবং সেখানে থাকবে বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুর (নারী বা পুরুষ সঙ্গী) তারা হবে লুক্কায়িত মুক্তার মত।' (সূরা-৫৬ আল ওয়াকিয়াহ : আয়াত-২২-২৩)

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُوْنَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا .

'সেখানে থাকবে অল্প বয়স্ক চিরস্থায়ী ছেলেরা যারা তাদের খিদমত করবে; যখন তুমি তাদের দেখ, তাহলে তোমার নিকট মনে হবে তারা যেন ছড়িয়ে থাকা মুক্তা।' (সূরা-৭৬ আদ-দাহর : আয়াত-১৯)

নবী

নবী করীম ﷺ-কে স্বপ্নে দেখা আল্লাহর বিশেষ রহমত, কারণ ইহা সত্য স্বপ্ন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ رَاَنِىْ الْمَنَامِ فَقَدْ رَاَنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِىْ .

অর্থাৎ, 'আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন : যে স্বপ্নে আমাকে দেখবে, সে সত্যিকারেই আমাকে দেখবে, কেননা শয়তান আমার আকার ধারণ করতে পারে না।'

(সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১২২৫ নং-৫৬৩৫ এবং পৃ-১২২৬ নং ৫৬৩৯)

এটা হলো এমন এক দৃষ্টির ক্ষেত্র যাতে কিছু পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ বিদ্যমান মুসলমানদের মধ্যে। অনেক লোক নবী করীম ﷺ-কে দেখার এবং তাঁর নিকট থেকে বিশেষ নির্দেশনা পাবার দাবি করেন। অনেকে বলেন তারা স্বপ্নে দেখেছেন, অন্যরা বলেন, তারা একেবারে জাগ্রত অবস্থায়ই দেখেছেন"। যারা এ ধরনের দাবি করে সাধারণ জনগণের শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। নিম্নলিখিত কিছু দাবি, যার দ্বারা তারা বিভিন্ন ধরনের বিদ'আত এবং স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁরা রাসূল ﷺ-এর ওপর অনেক বিষয় আরোপও করে। এ সকল দাবির মূলভিত্তি পূর্বে উল্লিখিত হাদীসখানি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ হাদীসটি নির্ভরযোগ্য এবং বিশুদ্ধ, এ হাদীস অস্বীকারও করা যাবে না। তবে এ হাদীস-এর অর্থের ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় নোট করা দরকার−

ক. হাদীসখানি এ নির্দেশনা দেয় যে, শয়তান মানুষের স্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং তা বিভিন্ন আকারে এবং তাদেরকে খারাপ দিকে নেয়ার চেষ্টা করে।

খ. এ হাদীসখানি বর্ণনা করে যে, শয়তান আল্লাহর রাসূলের প্রকৃত আকার বা চেহারা ধারণ করতে পারে না।

গ. এ হাদীসে একথা দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ-এর আকৃতি স্বপ্নের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে।

যেহেতু নবী করীম ﷺ স্বপ্ন সম্পর্কে তাঁর সাহাবীদের এ বর্ণনা দিয়েছেন, তার চেহারা কাদের নিকট পরিচিত, এর অর্থ হলো, যদি কোন ব্যক্তি জানে রাসূল ﷺ -এর প্রকৃত চেহারা কি? তিনি কাউকে যদি ঐ (চেহারার) বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিল কাউকে দেখেন, তাহলে নিশ্চিত হতে পারেন যে, আল্লাহ নবী করীম ﷺ-এর দর্শন করিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। (ইমাম আন নববী "আল-কাজী" এমত প্রকাশের জন্য উল্লেখ করেছেন।

(দেখুন : সহীহ মুসলিম শারহুন নববী খ-৮ পৃ-৩০)

রাসূল ﷺ-কে স্বপ্নে দেখার এ হাদীস উদ্ধৃত করার পর ইবন সীরীন বলেন− শুধু যদি তিনি নবী করীম ﷺ কে সঠিক আকৃতিতে দেখেন। (সহীহ আল-বুখারী খ-৯ পৃ-১০৪, নং ১২২ সুনানে আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১৩৯৬ সত্যায়নে সহীহ সুনানে আবী দাউদ খ-৩, পৃ-৯৪৭ নং-৪২০১)

এটাও উদ্ধৃত হয়েছে যে, যখনই কোন ব্যক্তি ইবন সীরীন (রহ) কে বলতেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ কে স্বপ্নে দেখেছে, তিনি তাকে বর্ণনা করতে বলতেন যাকে তিনি দেখেছেন। যদি তাঁর বর্ণিত ব্যক্তি ইবন সীরীন-এর পরিচিত ব্যক্তির সাথে না মিললে তিনি বলতেন : তুমি নবী করীম ﷺ কে দেখনি।' (ইবন হাজার ঘোষণা করেন যে, এ বর্ণনা সহীহ্।

(দেখুন ফাতহুল বারী খ-১২, পৃ-৪০০)

কুলাইব (র) বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি ইবন আববাস (রা)-কে বললেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ কে স্বপ্নে দেখেছেন, এবং ইবন আব্বাস (রা) তাঁকে স্বপ্নে দেখা ব্যক্তির বর্ণনা দিতে বললেন। যখন তিনি বললেন তাঁর চেহারা আল-হাসান ইবন আলীর মত। ইবন আব্বাস বললেন তিনি বাস্তবিকই নবী করীম ﷺ কে দেখেছেন। (ইবন হাজার এই বর্ণনা আল হাকীম থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন এর বর্ণনা ধারা যাইয়িদ (ভাল) (দেখুন ফাতহুল বারী খ-১২, পৃ-৪০০)

আল-কুরআনের অন্যতম প্রতিলিপিকারী ইয়াযীদ আল-কারীম থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইবন আব্বাস (রা)-এর সময়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ কে স্বপ্নে দেখেন এবং তাকে অবহিত করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহর রাসূল মাঝে মাঝে বলতেন : 'শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম নয়, সুতরাং যে স্বপ্নে আমাকে দেখে সে আমাকেই দেখে। আপনি কি আমাদেরকে ঐ ব্যক্তির বর্ণনা দিতে পারেন যাকে আপনি দেখেছেন। ইয়াযীদ উত্তর দিলেন : হ্যাঁ। আমি একজন লোককে দেখেছি যার উচ্চতা মধ্যম, হাল্কা বাদামি মিশ্রণ, সুন্দর হাসিমুখ, কালো চুল, সুন্দর গড়নে চেহারা। তাঁর চুল এখান থেকে এখান পর্যন্ত (এক চিবুক থেকে অন্য চিবুক পর্যন্ত (হাদীসের এ পয়েন্টে বর্ণনাকারী আওফ (রা) ইয়াযীদ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যা বলেছিলেন তা মনে রাখতে পারেন নি।) ইবন আব্বাস (রা) বলেন, যদি তুমি জাগ্রত অবস্থায়ও তাঁকে দেখতে তাতেও তুমি এত সুন্দর বর্ণনা দিতে পারতে না। (মুসনাদ আহমদ সত্যায়নে আলফাত্হুর রব্বানী খ-১৭, পৃ-২২৫)

আল্লাহ্ শয়তানকে নবী করীম ﷺ-এর প্রকৃত রূপ ধারণ করার ক্ষমতা দেন নি। যদিও শয়তনের পক্ষে এটা সম্ভব যে কোন অপরিচিত অজ্ঞ লোকের

নিকট নবী করীম ﷺ-এর আকার ধারণ করে এবং বলবে যে সেই আল্লাহর রাসূল। (আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইবন আবু আসিম-এর বর্ণনা এই যে, নবী করীম ﷺ বলেন : যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে আমাকে প্রকৃতপক্ষে দেখেছে, এজন্য আমাকে যেকোন আকারে দেখা যেতে পারে এ বাক্য নির্ভরযোগ্য নয়। (ইবন হাজার (র)-এর মতে দেখুন ফতহুল বারী খ-১২, পৃ-৪০০)

এরপর সে বিদ'আত ছড়িয়ে দিতে পারে স্বপ্নদ্রষ্টার মধ্যে এবং তাকে জানাতে পারে যে, সেই মাহদী (প্রতীক্ষিত সংস্কারক) অথবা এমনকি নবী যীশু, যিনি কিয়ামতের পূর্বে আবার আসবেন।' যে সকল লোকেরা বিভিন্ন ধরনের বিদ'আত চালু করে তার অধিকাংশই স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে। এ ধরনের দাবি অসংখ্য। লোকেরা বিশেষ করে এ ধরনের দাবি তাদের অজ্ঞতার কারণে মেনে নেয়। কারণ, তারা উপরে উল্লিখিত হাদীসের বাস্তবায়ন সম্পর্কেও অজ্ঞ। যেহেতু ইসলামী শারীয়াহ পরিপূর্ণ, স্বপ্নের মধ্যে নবী করীম ﷺ-এর নামে নতুন সংযোজন অবশ্যই মিথ্যা। এ ধরনের দাবির মধ্যে দুটির যেকোন একটি নিহিত রয়েছে।

১. হয়ত নবী করীম ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মিশন পূর্ণ করতে পারেন নি (আউযু বিল্লাহ)

২. আল্লাহ জাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, এ কারণে প্রয়োজনীয় বিধান নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় দিতে পারেন নাই। (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।) এ দুয়ের বাস্তবায়ন অবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ যা ইসলামের মৌল নীতির বিরোধী। কেননা নবী করীম ﷺ তাঁর জীবদ্দশায়ই তাঁর মিশনকে পূর্ণ করেছিলেন এবং আল্লাহ ভবিষ্যত জানেন।

নবী করীম ﷺ-কে জীবিত অবস্থায় দেখার জন্য, নিচের বর্ণনা থেকে নিশ্চিত সমর্থন পাওয়া যেতে পারে যার অর্থ নিম্নের হাদীস থেকে পাওয়া যায় নবী করীম ﷺ-কে স্বপ্নে দেখার মাধ্যমে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِىْ فِى الْيَقْظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِىْ .

অর্থাৎ, 'আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন : 'যে আমাকে স্বপ্নের মধ্যে দেখবে, আমাকে জাগরিত হওয়ার পরেও দেখবে এবং শয়তান আমার আকার ধারণ করতে পারে না।'

(সহীহ আল বুখারী খ-৯, পৃ-১০৪, নং-১২২ এবং সুনানে আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১৩৯৬ সত্যায়নে সহীহ সুনানে আবী দাউদ খ-৩, পৃ-৯৪৭ নং ৪২০১)

ইবন হাজার (র) এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন, 'জাগরিত হওয়ার পরেও দেখবে' অর্থ হলো যে ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে স্বপ্নের মধ্যে দেখবে সে স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তার প্রতিফলন দেখতে পাবে। কারণ এটা হলো সত্য স্বপ্ন। (ইবন হাজার উল্লেখ করেন যে, কিছু পণ্ডিতের মত ঐ ছিল যে, এর অর্থ সে লোক নবী করীম ﷺ-কে শেষ বিচারের দিন দেখতে পারে। তিনি বলেন এ ব্যাখ্যা দুর্বল। কেননা যারা তাঁকে দেখেনি তারাও বিচারের দিবসে তাঁকে দেখবেন। (দেখুন ফতহুল বারী খ-১২, পৃ-৪০১)

ইমাম আন-নববী বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হয়তো–

১. এ যুগের লোকেরাও তাকে দেখতে পাবে। হাদীস তখন এ অর্থ দিতে পারে যে, যারা মদীনায় হিজরত করতে অক্ষম তাদের মধ্যে যে বা যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখবে, আল্লাহ তাদেরকে মদীনায় হিজরত করার সুযোগ করে দিবেন। অতপর সে তাঁর স্বচক্ষে রাসূল ﷺ-কে দেখতে পাবে।

২. সে তাঁর স্বপ্নকে জাগ্রত অবস্থায়, তার পরবর্তী জীবনে বাস্তবায়িত দেখতে পারে।

৩. তার পরবর্তী জীবনে রাসূল ﷺ-কে দেখার বিশেষ সুযোগ লাভ করবে। (সহীহ মুসলিম : শারহুন নববী খ-৮, পৃ-৩০)

এ ছাড়াও অন্যান্য বিশুদ্ধ বর্ণনায়, এ হাদীসের একটা অংশ (এটা হবে) যেন সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে।' (সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১২২৫ নং ৫৬৩৬)

এ বাড়তি জোর দেয়া 'যেন তিনি জাগ্রত অবস্থায় তাকে দেখেন যেন তাকে দেখেছেন।' একইভাবে যিনি তাকে ঘুমের মধ্যে দেখেছেন যেন তাঁকে বাস্তবেই দেখেছেন।

জাগ্রত অবস্থায় নবী করীম ﷺ কে দর্শন করা নিঃসন্দেহে শয়তানী কারসাজি, নিরর্থক। মিরাজের রাতে রাসূল ﷺ-এর জেরুসালেম এবং জান্নাতে অলৌকিক ভ্রমণের সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক পূর্ববর্তী নবীদের দেখিয়েছিলেন এবং নবী মুহাম্মদ ﷺ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিছু লোকেরা এক্ষেত্রে দাবি করেন যেন আমাদের নবী ﷺ অন্য নবীদেরকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলেন, বাস্তব কথা হলো যে, নবী করীম ﷺ-এর মর্যাদার সমতা দাবি করা, অথবা তাঁর কোন সাহাবী, মুত্তাকি পণ্ডিতগণের প্রথম প্রজন্ম তাঁদের নিজেদের জন্য এ দাবি করেন নি।

নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে সর্বোত্তম প্রজন্ম বলে ঘোষণা করেছেন। ইসলামের নামে যেকোন ধরনের বিদ'আত, তা নবী করীম ﷺ-এর দর্শনের ভিত্তিতেই হোক অথবা অন্যরকম, তা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য– নবী করীম ﷺ-এর বহু বর্ণনা দ্বারা সেগুলো নিষেধ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا شَىْءٌ مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ .

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তিই আমাদের এ বিষয় (ইসলামে) কোন নতুন কিছু আবিষ্কার করে, যা তার মধ্যে নেই, তা বাতিল।'

(সহীহ আল-বুখারী খ-৩, পৃ-৫৩৫ নং ৪৬১ সহীহ মুসলিম খ-৩, পৃ-৯৩১ ন ৪২৬৬ সুনানে আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১২৯৪ নং-৪৫৮৯)

সমঝোতা

স্বপ্নের মধ্যে সমঝোতা (সন্ধি) করা দেখলে কোন ব্যক্তির কাজ-কর্ম সম্পর্কে ভাল ও স্থিরতা আসবে। আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা এ নির্দেশনা পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন–

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ .

অর্থাৎ, 'তাদের মধ্যে সমঝোতার ব্যবস্থা করাতে কোন দোষ নেই, সমঝোতাই উত্তম।' (সূরা–৪ আন নিসা : আয়াত-১২৮)

ডানপাশ

যদি কোন ব্যক্তি কোন অবস্থানের ডান দিকে পরিচালিত হয়, এটা দ্বারা নিরাপত্তা লাভ অথবা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া বুঝায়। এ প্রতীকী ব্যাখ্যার ভিত্তি হচ্ছে রাসূল ﷺ কর্তৃক তাঁর কোন একজন সাহাবীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা–

اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ اِنَّ رِجَالاً مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانُوْا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُصُّوْنَهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَاَنَا غُلاَمٌ حَدِيْثُ السِّنِّ وَبَيْتِى الْمَسْجِدُ قَبْلَ اَنْ اَنْكِحَ فَقُلْتُ فِىْ نَفْسِىْ لَوْ كَانَ فِيْكَ خَيْرٌ لَرَاَيْتَ مِثْلَ مَا يَرٰى هٰؤُلاَءِ فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِىَّ خَيْرًا فَاَرِنِىْ رُؤْيَا فَبَيْنَمَا اَنَا كَذٰلِكَ اِذْ جَاءَنِىْ مَلَكَانِ فِى يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ يُقْبَلاَنِ بِىْ اِلٰى جَهَنَّمَ وَاَنَا بَيْنَهُمَا اَدْعُو اللّٰهَ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ اُرَانِىْ لَقِيَنِىْ مَلَكٌ فِىْ يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ فقَالَ لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلُ اَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلاَةَ فَانْطَلَقُوْا بِىْ حَتّٰى وَقَفُوْا بِىْ عَلٰى شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَاِذَا هِىَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ لَهٗ قُرُوْنَ كَقَرْنِ الْبِئْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ

وَأَرَى فِيْهَا رِجَالاً مُعَلَّقِيْنَ بِالسَّلاَسِلِ رُءُوْسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيْهَا رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ فَانْصَرَفُوْا بِيْ عَنْ ذَاتِ الْيَمِيْنِ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ . فَقَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ .

অর্থাৎ, 'ইবনে ওমর (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূলের কিছু সাহাবী স্বপ্ন দেখতেন এবং তা আল্লাহর রাসূলের নিকট বলতেন, যিনি আল্লাহর ইচ্ছায় সেগুলোর ব্যাখ্যা করতেন। যুবক হিসেবে, বিয়ের পূর্বে, আমি প্রায়ই মসজিদে ঘুমাতাম (একদিন) আমি নিজেকে বললাম : যদি তোমার মধ্যে কোন ভাল জিনিস থাকত তাহলে তুমিও (স্বপ্নে) অন্যান্য লোকের মত দেখতে। আমি যখন ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়লাম, আমি দু'আ করলাম, হে আল্লাহ্! যদি তুমি আমার মধ্যে ভালাই দেখ, আমাকে একটি ভাল স্বপ্ন দেখাও।

আমি যখন স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসল তাদের প্রত্যেক হাতে লোহার চুড়ি। তারা আমাকে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে গেল, আমি তাদের দুজনের মাঝে ছিলাম, আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করছিলাম : হে আল্লাহ্! আমি জাহান্নাম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। এরপর আমি দেখলাম হাতে লোহার চুড়ি পরিহিত অপর এক ফেরেশ্‌তা এগিয়ে আসলেন। তিনি আমাকে বললেন : ভীত হয়ো না, তুমি অত্যন্ত ভাল লোক হবে যদি তুমি সালাত (নফল) একটু বেশি পড়!" অতপর তারা দু'জন আমাকে জাহান্নামের কিনারায় নিয়ে গেল। ইহা কূপের কিনারার মত কোকড়ানো ছিল এবং থামগুলোও ছিল কূপের থামের মত"।

প্রতি দুটা থামের (পিলার) মাঝখানে একজন করে ফেরেশতা লোহার চুড়িওয়ালা। আমি সেখানে উহার মধ্যে অনেক লোক দেখলাম উল্টো করে ঝুলানো এবং তাদের মধ্যে আমার পরিচিত কুরাইশ বংশের কিছু লোকও ছিল যাদের আমি চিনলাম। এরপর তারা আমাকে ডান দিকে নিয়ে গেল। আমি এ স্বপ্ন হাফসার (হাফসা (রা) ছিলেন তাঁর বোন এবং তিনি রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্যে একজন।) নিকট বললাম এবং তিনি তা আল্লাহর রাসূলের নিকট বললেন। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আবদুল্লাহ একজন ভাল লোক। তবে যদি সে রাতে সালাত আদায় করত। নাফি (নাফী (রা) ছিলেন ইবন ওমর (রা)-এর মুক্ত ক্রীতদাস যে তার ছাত্র ছিলেন এবং ঐ সময়ের একজন বুঝমান পণ্ডিত ছিলেন।) বলেন, তারপর থেকে আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা) অনেক সালাত আদায় করতেন।'

(সহীহ আল বুখারী খ-৯, পৃ-১২৭-১২৮, নং ১৫৫)

কক্ষ

কেউ নিজেকে কোন রুমের মধ্যে অথবা অনেকগুলো কক্ষের মধ্যে দেখলে বুঝা যাবে সে ভীতি থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছে। নিম্নোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে–

وَهُمْ فِى الْغُرُفَاتِ اٰمِنُوْنَ .

অর্থাৎ, তারা কক্ষগুলোর মধ্যে শান্তি এবং নিরাপত্তার মধ্যে থাকবে।:

(সূরা–৩৪ সাবা : আয়াত-৩৭)

রশি

স্বপ্নে রশি দেখা এবং একে শক্ত ও মজবুতভাবে ধরে রাখা, আল্লাহর সঙ্গে চুক্তি অর্থাৎ ইসলামকে আঁকড়ে থাকা অর্থ দেয়া যেতে পারে। আল-কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের প্রতীক বিবেচনা করে–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

অর্থাৎ, 'তোমরা আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' (সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-১০৩)

শাসক

স্বপ্নে কোন শাসক দ্বারা সম্বোধিত হওয়া দ্বারা কোন উচ্চপদে সমাসীন হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে। আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে এর দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়–

فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ .

অর্থাৎ, '(শাসক) যখন তার সঙ্গে কথা বললেন, তিনি বললেন : নিশ্চয় তুমি আজ (থেকে) আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি।'

(সূরা ইউসুফ : আয়াত-১২ঃ ৫৪)

যৌন সম্ভোগ

যৌন সম্ভোগমূলক স্বপ্নগুলো মৌলিকভাবে শয়তানী, অতএব তা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। যা হোক, সেগুলো ভাল হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়। যদি তারা বিবাহিত হয়। যদি ব্যক্তির স্বপ্নে ধাতু বের হয়, তাহলে তাকে সম্পূর্ণ নিয়মমাফিক ফরয গোসল করতে হবে। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তির নিয়মিত সালাত আদায়ের ইচ্ছা করে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ وَهِىَ جَدَّةُ اِسْحٰقَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهٗ وَعَائِشَةُ عِنْدَهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْمَرْاَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِى الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهٖ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَقَالَ لِعَائِشَةَ : بَلْ اَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِيْنُكِ نَعَمْ فَلْيَغْتَسِلْ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ اِذَا رَاَتْ ذَاكِ .

অর্থাৎ, আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, উম্মে সুলাইম আল্লাহর রাসূলের নিকট আসলেন, যখন তিনি আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! যখন কোন মেয়েলোক তাই

দেখে এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে যা পুরুষেরা দেখে, তখন তার কি করা উচিত? আয়েশা (রা) বলেন : হে উম্মে সুলাইম, আপনি মহিলাদের অন্য বর্ণনায় আয়েশা (রা) বলেন, 'আমি তার কথায় অসম্মতি জানালাম যে, মহিলাদের স্বপ্নদোষ হয়'। (সহীহ মুসলিম খ-১, পৃ-১৮০, নং-৬১২)

হাস্যকর বানাবেন, আপনার ডান হাত ধুলো মলিন হোক! (অসম্মতি জ্ঞাপনের আরবি প্রাচীন ভাব।) নবী করীম ﷺ আয়েশা (রা) কে বললেন : তোমার ডান হাত ধুলোমলিন হোক। অতপর তিনি উম্মে সুলাইমকে বলেন ঃ হে উম্মে সুলাইম! তাকে গোসল করতে হবে যদি সে কোন বস্তু বের হয়েছে দেখে।' (যৌন অনুভূতি সহ পানি ঝরা। সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ-১৭৮ নং ৬০৭ সহীহ আল বুখারী খ-১, পৃ-১৭১-১৭২, নং-২৮০, শব্দাবলী মুসলিমের।)

জাহাজ

স্বপ্নে জাহাজ দেখার অর্থ সফলতা অথবা বিপদ এড়ানো। নূহ (আ)-এর সম্পর্কে আল-কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত থেকে এ অর্থ গ্রহণ করা যায়।

(শারহুস সুন্নাহ খ-১২ পৃ-২২০)

فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنَاهَا اٰيَةً لِّلْعَالَمِيْنَ .

অর্থাৎ, 'অতঃপর আমি তাকে রক্ষা করলাম, এবং তার সঙ্গে যারা নৌকার আরোহী ছিল এবং উহাকে সারা পৃথিবীবাসীর জন্য নিদর্শন বানালাম।'

(সূরা–২৯ আল-আনকাবুত : আয়াত-১৫)

জামা

স্বপ্নে জামা গায়ে দেয়া, ধর্মের সঙ্গে লেগে থাকা অর্থ দান করে। জামা যত লম্বা হবে ইসলামের প্রতি তাঁর দায়িত্ব তত বেশি–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوْا عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ

دُوْنَ ذٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجْتَرُّهُ قَالُوْا : فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : اَلدِّيْنَ .

অর্থাৎ, 'আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রা) বলেন, তিনি আল্লাহ্র রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন : আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন (স্বপ্নে) আমাকে দেখানো হল লোকদের জামা পরানো অবস্থায়, কিছু তাদের জামা শুধু বুককে আবৃত করেছে, আর কিছু লোকদের জামা আরো নিচে। অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার সামনে দেখানো হল, তিনি এত দীর্ঘ জামা পরিধান করেছিলেন যে, তাকে তিনি টেনে নিচ্ছিলেন (তার পিছনে) তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন "আপনি একে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? তিনি উত্তর দিলেন : 'দ্বীন'। (অর্থাৎ দ্বীনের অনুসরণ)।

রেশমী কাপড়

স্বপ্নে রেশমী কাপড় গ্রহণ করা অথবা প্রদান করা বিবাহ্ নিকটবর্তীর নির্দেশনা দেয়। যেহেতু রেশমী কাপড় শুধু মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। রেশমী সম্পর্কে স্বপ্ন দেখাটা কোন মহিলার প্রতীক।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُكِ قَبْلَ اَنْ اَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ رَاَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَقُلْتُ لَهُ : اِكْشِفْ فَكَشَفَ فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَقُلْتُ : اِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ ثُمَّ اُرِيْتُكِ يَحْمِلُكِ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَقُلْتُ اكْشِفْ فَكَشَفَ فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَقُلْتُ : اِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ .

অর্থাৎ, 'আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : (স্বপ্নে) তোমাকে আমার নিকট দুবার দেখানো হয়েছে তোমাকে আমি বিয়ে করার

পূর্বেই। আমি দেখলাম একজন ফেরেশতা কাউকে (স্ত্রী) রেশমী কাপড়ের মধ্যে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, আমি তাকে বললাম : তাকে উন্মুক্ত করুন এবং আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ইহা তুমি। আমি নিজে নিজে বললাম : যদি ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তাহলে ইহা অবশ্যই হবে।' (অতঃপর তোমাকে পুনরায় দেখানো হলো বাক্যটি অনুবাদে গ্রন্থকার বাদ দিয়েছেন।) পরবর্তীতে আমি একই ফেরেশতাকে (স্বপ্নে) দেখলাম কাউকে রেশমী কাপড়ের মধ্যে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তাকে বললাম তাকে উন্মুক্ত করুন' এবং আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম পুনরায় ইহা তুমিই। আমি নিজে নিজে বললাম : যদি ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তাহলে অবশ্যই ইহা ঘটবে।

(সহীহ আল-বুখারী খ-৯ পৃ-১১৫-৭, নং১৪০)

এক খণ্ড রেশমী কাপড় হাতে নিয়ে জান্নাতের মধ্যে উড়ে বেড়ানো স্বপ্নে দেখা কারো তাকওয়ার দিকে নির্দেশ দেয়।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَاَنَّ فِىْ يَدِىْ سَرَقَةً مِنْ حَرِيْرٍ لاَ اَهْوِىْ بِهَا اِلَى مَكَانٍ فِى الْجَنَّةِ اِلاَّ طَارَتْ بِى اِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : اِنَّ اَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ ـ اَوْ قَالَ : اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ .

অর্থাৎ, 'ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার হাতে একখণ্ড রেশমী কাপড়, জান্নাতের যেদিকেই আমি উহা দ্বারা ইশারা করি সে আমাকে সে দিকেই নিয়ে যায়। আমি ইহা হাফসা (সহীহ আল-বুখারী খ-৯ পৃ-১১৮, নং ১৪৩) (রা)-এর নিকট বললাম, তিনি ইহা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বললে, তিনি উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই তোমার ভাই একজন সৎ লোক অথবা নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ একজন ভাল লোক। (দেখুন টীকা-২৪৭)

তরবারী

স্বপ্নে তরবারী দেখা, কারো বন্ধু-বান্ধব এবং সঙ্গীগণ তার সাহায্যে আসবে এ দিকে নির্দেশ করে। (সহীহ মুসলিম শারহুন নববী খ-৮, পৃ-৩৮)

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ فِى رُؤْيَاىَ اَنِّىْ هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهٗ فَاِذَا هُوَ مَا اُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهٗ اُخْرٰى فَعَادَ اَحْسَنَ مَا كَانَ فَاِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

অর্থাৎ, আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : আমি একটি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি তরবারী চালালাম এবং ইহা মাঝ থেকে ভেঙ্গে গেল। উহা মু'মিনদের উহুদের দিনে কষ্টের প্রতীক। অতঃপর আমি আবার তরবারী চালনা করলাম, তখন ইহা ইতোপূর্বেকার মধ্যে সর্বোত্তম তরবারী হিসেবে দেখা দিল। উহা বিজয়ের (মক্কা বিজয়ের প্রতীক) এবং মু'মিনদের জমায়েত আল্লাহ যাদেরকে দলে দলে সমবেত করেছিলেন। (সহীহ আল বুখারী খ-৯, পৃ-১৩৩-৪, নং-১৬৪)

গ্রন্থপঞ্জি

১. আসিমী, আব্দুর রহমান ইবন কাসিম আল মাজমু, ফতওয়ায়ে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ, বৈরুত, তারুল আরাবিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৯৭৮

২. আকিলি, মুহাম্মাদ এম. আল-, Ibn Seerin's Dictionary of Dreams : According to Islamic Inner Traditions, ফিলাডেলফিয়া, পার্ল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯২

৩. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল, সহীহ্ সুনান আবী দাউদ, বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলাম, ১ম সংস্করণ ১৯৮৯

৪. সহীহ্ সুনান আত্ তিরমিযী, বৈরুত আল-মাকতাব আল ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৮

৫. সহীহ্ সুনান ইবন মাজাহ, বৈরুত, আল-মাকতাব আল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৮

৬. আনসারী, মুহাম্মদ তুফাইল সুনান ইবনি মাজাহ, লাহোর, কাজী পাবলিকেশনস্ ১ম সংস্করণ ১৯৯৩

৭. বাগভী, আল-হুসাইন ইবন মাসউদ আশ-শারহুস সুন্নাহ্ বৈরুত। দামেস্ক, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩

৮. বাজী, সুলাইমান ইবন খালফ আন-, আল মুনতাকা শারহ্ মুয়াত্তা আল-ইমাম মালিক, বৈরুত, দারুল কিতাব আল আরাবি, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৪

৯. Clinical Medicine : A Textbook for Medical Students and Doctore, সম্পাদনায় পারভীন কুমার এবং মাইকেল ক্লার্ক, লন্ডন, বেএলইর টিন্ডাল, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৯৪

১০. ফরীদ, আহমাদ, তাযীল আস মুকইয়া ফি তাবীরীর রুইয়া, মিশর, দারুদ্ দাওয়াহ্ আস সালাফিয়াহ।

১১. গিব এন্ড ক্রামার্স, এইচ, এ, আর, এবং জে, এইচ, Shorter Encyclopaedia of Islam, নিউইয়র্ক কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৩

১২. গাইলাউমি, এ, The life of Mohammad, করাচি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৫

১৩. হাসান, আহমাদ, সুনান আবু দাউদ, লাহোর মোহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭

১৪. হাথুরানী, মুহাম্মাদ রফীক, Dreams and Interpretations, নিউ দিল্লী, ইদারা ইশায়াত ই দীনীয়াত (য) লিঃ ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪

১৫. হুজেজ, থমাস পাটরিক, A Dictionary of Islam, লাহোর প্রিমিয়ার বুক হাউস, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৯

১৬. ইবনুল আছীর, আল-মুবারাক ইবন মুহাম্মাদ, আন নিহায়া ফী গারিবিল হাদীস ওয়াল আছার, মিশর, দার ইহইয়া আল কুতুবুল আরাবিয়্যা।

১৭. ইবন আব্দুল বার, ইউসুফ, আত্তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মায়ানী ওয়াল আসানীদ, মিশর, ফাদালাহ্ প্রেস, ১৯৬৭

১৮. ইবন হাজার আল আসকালানী, আহমদ ইবন আলী, ফতহুল বারী, কায়রো, মিশর, আল মাতবা আহ আসসালাফিয়্যা কোং প্রথম সংস্করণ, ১৯৬১

১৯. ইবন কাসীর, ইসমাঈল, তাফসীরু কুরআনিল আজীম, রিয়াদ, মাকতাবাত আল-উবাইকান, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৩

২০. ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর, ইলামুল মুওয়াক্কীন, বৈরুত, দারুল ফিকর, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৭

২১. খান, মুহাম্মদ, মুহসিন, সহীহ আল-বুখারী, লাহোর, কাজী পাবলিকেশন্স, ৬ষ্ঠ সংস্করণ-১৯৮৬

২২. মুবারাকপুরী, সাফিউর রহমান আল- আর রাহীকুল মাখতুম, (সীলকৃত সুধা) রিয়াদ, মাকতাবা দারুস সালাম, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫

২৩. নববী, ইয়াহইয়া ইবন শরফুদ্দীন আন-, সহীহ মুসলিম, শারহুন নববী, দুবাই, দারু আবু হাইয়ান, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫

২৪. রহীমুদ্দীন, মুহাম্মদ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, লাহোর, মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, ১৯৮০

২৫. রবসন, জেমস, মিশকাত আল মাসাবিহ, লাহোর, শ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, পুণর্মুদ্রণ ১৯৯০

২৬. সিদ্দীকী, আব্দুল হামীদ সহীহ মুসলিম, লাহোর, শ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, ১৯৮৭

২৭. The New Encyclopaedia Britannica, শিকাগো, ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ইং ১৫শ সংস্করণ ১৯৯১,

২৮. জিরিকলী, খাইরুদ্দ দ্বীন আজ, আল আ'লাম, বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালায়ীন, ৭ম সংস্করণ, ১৯৮৪

পিস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম		মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবী, বাংলা, ইংরেজী)		১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN		২০০
৩.	কিতাবুত তাওহীদ	- মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৪.	বিষয়ভিত্তিক-১-কুরআন ও হাদীস সংকলন	-মোঃ রফিকুল ইসলাম	৩৫০
৫.	বিষয়ভিত্তিক -২ - লা-তাহ্যান (Don't be Sad)	- ড. আইদ আল কারনী	৪০০
৬.	রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাসি কান্না ও জিকির	- মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২১০
৭.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা	- ইকবাল কিলানী	১৫০
৮.	রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন	-মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
৯.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন	- যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১০.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন	-ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
১১.	রাসূল (স.) এর ২৪ ঘন্টা	- মুফতী আবুল কাসেম গাজী	২২৫
১২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী	- মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
১৩.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী	- মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২০০
১৪.	রাসূল (স.) সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন	-সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
১৫.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন	-মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
১৬.	রাসূল (স.) লেনদেন ও বিচার ফয়সালা	- মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
১৭.	রাসূল (স.) জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে	- ইকবাল কিলানী	১৩০
১৮.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	- ইকবাল কিলানী	২২৫
১৯.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে)	- ইকবাল কিলানী	২২৫
২০.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব)	- ইকবাল কিলানী	১৭০
২১.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী	-সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১২০
২২.	Golden Usefull Wordbook (আরবী-বাংলা-ইংরেজী)	- মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী	১২৫
২৩.	দোয়া কবুলের পূর্বশত	- মোঃ মোজাম্মেল হক	১০০

বের হচ্ছে ....

ক. কবীর গুনাহ, খ. বুলুগুল মারাম বা বাছাইকৃত ১৫০০ হাদীস, গ. জাদু টোনা, ঘ. শেখ আহমদ দিদাত লেকচার সমগ্র ঙ. ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র, চ. বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

২৪.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫
২৫.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০
২৬.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ ও তার প্রমাণভিত্তিক জবাব	৬০
২৭.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার -আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০
২৮.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০
২৯.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০
৩০.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
৩১.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫
৩২.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০
৩৩.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০
৩৪.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০
৩৫.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০
৩৬.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০
৩৭.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০
৩৮.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
৩৯.	সালাত : রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নামায	৬০
৪০.	ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০
৪১.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
৪২.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিৎ	৫০
৪৩.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
৪৪.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৪৪.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
৪৬.	পোশাকের নিয়মাবলী	৪০
৪৭.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৪৮.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ (সা.)	৫০
৪৯.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
৫০.	ইসলাম এবং সেকিউল্যরিজম	৫০
৫১.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
৫২.	সিয়াম : আল্লাহ'র রাসূল (স.) রোজা রাখতেন যেভাবে	৫০
৫৩.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
৫৪.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
৫৫.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
৫৬.	ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
৫৭.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০
৫৮.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০
৫৯.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০
৬০.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০
৬১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
৬২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৬৩.	বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০
৬৪.	রমজানের ত্রিশ শিক্ষা ডা. জাকির নায়েক	২০০
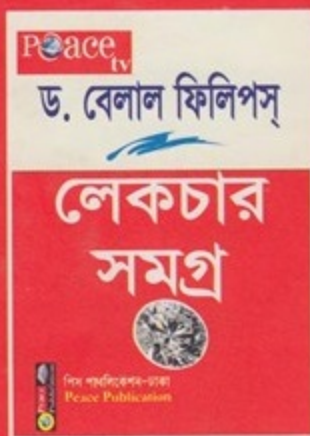
পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace.rafiq@yahoo.com